ভারত মহিলা

মাসিক পত্রিকা।

শ্রীমতী সরযূবালা দত্ত

সম্পাদিত।

দ্বাদশ খণ্ড।

ঢাকা।

উয়ারী, "ভারত-মহিলা" কার্য্যালয় হইতে

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য ২৸৵০ দুই টাকা চারি আনা

সূচী পত্র।

বিষয়	লেখক লেখিকা	পৃষ্ঠা
অতিথি (কবিতা)	শ্রীমতী আশালতা সেন	৩৩০
অন্তরময়ী (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	২১৩
অন্তিম বিদায় (কবিতা)	শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১১১
অব্যক্ত (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	১১৪
আবাহন (কবিতা)	শ্রীমতী কাব্যকুসুমাঞ্জলি রচয়িত্রী ...	৪
ঈশা খাঁ (উপন্যাস)	শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৯৫, ১১৪
কবির তর্পণ (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	৮০
কৃত্তিবাস	শ্রীযুক্ত স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	৫০
কোজাগর পূর্ণিমায় (কবিতা)	শ্রীযুক্ত অবনীমোহন চক্রবর্ত্তী	১৮৭
গৌরীর উক্তি (কবিতা)	৺হেমন্তকুমারী দত্ত	১৪৯
চিত্রকরের চিত্ররহস্য	কুমারী যামিনী সেন এম, বি	১০১
চেতনার প্রেরণা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	১৪৪
ছাত্রজীবনের স্মৃতি	শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত বি, এল ...	২৬৩, ৩০৭
জাতীয় সাহিত্য	শ্রীযুক্ত স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	৯
দাম্পত্য শাসন (গল্প)		২২৭
দেওঘর	শ্রীমতী কুসুমা দেবী ...	১১৮
দুষ্টুকার বীজাণুর কথা		১৬১
নিঃসম্বল (কবিতা)	শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন চৌধুরী	১৭৩
পশু প্রকৃতি		১৫৪, ২১৫
পার্ব্বতীর প্রণয়	শ্রীযুক্ত বরপ্রসাদ শাস্ত্রী	১৯১
পূজা (কবিতা)	শ্রীমতী সরোজবাসিনী গুপ্তা	৮৪
প্রমোদ কানন	কুমারী যামিনী সেন এম, বি	২১৪
প্রার্থনা (কবিতা)	৺হেমন্তবালা দত্ত	২১০
বড় দিন (গল্প)	৺ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৮
বলিদান (গল্প)	শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু বি, এস-সি ...	২৮
বাঙ্গলার গীতিকবিতা	শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস	৩০৯
বাঙ্গলার কথাসাহিত্যে নূতন ধারা	শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম, এ	১০৫
বায়ু পরিবর্ত্তন (গল্প)	শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় ...	১২৩
বিবিধ প্রসঙ্গ	... ১, ৩৩, ৬৫, ৯৭, ১২৯, ১৬৫, ১৯৭, ২৪১, ২৭৩	
ভগ্ন দেবালয়ে	কুমারী যামিনী সেন এম, বি ...	৭৬
ভিখারিণী (গল্প)	শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়	৮৪

অনুমতিক: বিষয়ক গল্প	কুমারী যামিনী সেন এম, বি
অন্ন সংসারের বিপদ	শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচি এম, বি ৫৮
আত্মরক্ষা (গল্প)	শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র সরকার বি, এ ... ২১১
আমেরিকেট কুলার ওয়েলসলী	শ্রীমতী চঞ্চলা গুপ্ত ২৭৯
দুঃখ ও সুখ (কবিতা)	শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রকুমার দত্ত ২৮৩
মিলন ও বিরহ (কবিতা)	শ্রীমতী সরোজবাসিনী গুপ্তা ৩৪৪
মোসলেম নারীর শিক্ষানৈপুণ্য	শ্রীযুক্ত আবুল মোতালেব ১৪৯
যক্ষ্মারোগ ও সমাজসংস্কার	২২৫
রামমোহন বাণিকী	ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় ১১২
রোগীর পথ্য	১৪৭
শেষ বউ (গল্প)	শ্রীমতী মুক্তকেশী গুপ্ত ৩৭
শ্রেষ্ঠ ষ্টোন ষ্ল্যাবওয়েল	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৫৭
শিকারী	কুমারী যামিনী সেন এম, বি ১৪৬
শ্যামনগরের জমিদার (ঐতিহাসিক)	শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত বি, এল ... ১৪৬,৬০,১৫৫, ১৮৮, ১৪০, ১৭৫, ২০৫, ২৩৭, ২৮১
সকালে মাতৃস্নান	শ্রীমতী রমণ সিলাই বি, এ ১৩, ১০২
সন্ন্যাসিনী	শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত ৭২
সম্পাদের বেদনা (গল্প)	কুমারী ইন্দুবালা সেন ১৬৩
সাহিত্যের ধারা	২৯৮
সাজ বাঙ্গালী সাজ (কবিতা)	শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ... ১৯৬
সুখ ও দুঃখ (কবিতা)	শ্রীমতী বিদ্যাবতী সেন ৩৩০
সুদূর জগতের কথা	কুমারী যামিনী সেন এম, বি ১৭৩
সুপ্রিয়া	শ্রীযুক্ত ভবতারণ বসু ২৬৮
সেণ্ট এলিজাবেথ	শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত ২৪২
স্বরূপের ঠিকানা (কবিতা)	হেমন্তবালা দত্ত ৩০৬
স্বর্গ ও নরক	কুমারী যামিনী সেন এম, বি ৪১
স্বর্গীয়া বসুমাতাই সরকার	২০২
স্বাস্থ্য কথা	৮৪
হজরত রাবিয়া বসরী	মিসেস এম আহমদ ২৫, ২২১

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। (মনু)

The woman's cause is man's : they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free :
If she be small, slight-natured miserable,
How shall men grow ? (Tennyson.)

বঙ্গানুবাদ :—স্ত্রী-পুরুষের উন্নতি অবনতি একসূত্রে গ্রথিত। নারী অনুন্নত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে পুরুষ কখনই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। (ব্রিটিশ রাজকবি লর্ড টেনিসন)

"I will be as harsh as truth, and as uncompromising as Justice ; I am in earnest——I will not excuse, I will not retreat a single inch———and I will be heard." (William Lloyd Garrison.)

মর্ম্মানুবাদ :—আমি সত্যের ন্যায় কঠোর ও ন্যায়ের মত অনমনীয় হইব। আমি বুঝিয়াছি, আমি কিছুতেই একবিন্দুও পশ্চাৎপদ হইব না। আমি নিশ্চিত জানি, তোমরা আমাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। (লয়ড গ্যারিসন)

১২শ ভাগ | বৈশাখ, ১৩২৩। | ১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

নব বর্ষ

মঙ্গলময় পরমেশ্বরের চরণে প্রণিপাত করিয়া আমরা নূতন বৎসরের কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছি। গত বৎসর পারিবারিক অসুখ বিসুখে ভারত-মহিলা পরিচালনে আমাদের নানা ত্রুটি ঘটিয়াছে, এমন কি, এক সময়ে ইহার জীবন-সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। দয়াময় দয়া করিয়া ইহাকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন, এজন্য আজ তাঁহাকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি। নব বর্ষে যথোচিত ভাবে কর্ত্তব্য পালনে তিনি আমাদের সহায় হউন।

দেশের দশা

দেশের অবস্থার কথা ভাবিলে বুক ফাটিয়া যায়। গত বৎসরের জলপ্লাবনে পূর্ব্ববঙ্গে এবং অনাবৃষ্টিতে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়াদিনাজপুর যে দারুণ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল তাহার এখনও নিবৃত্তি হয় নাই। বাঁকুড়ায় সাহায্য-দানকার্য্য চলিতেছে। জলপ্লাবনে প্রকৃতির ভৈরবী মূর্ত্তি দেখিয়া বিপন্ন পূর্ব্ব-বঙ্গবাসীর প্রতি ব্রাহ্মসমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতির করুণ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল, গবর্ণমেণ্টও দয়া করিয়াছিলেন ; জলের সঙ্গে সঙ্গে দাতা ও সেবকদিগের করুণাস্রোত শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, কিন্তু দুরবস্থা দূর হয় নাই। এখনও ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, শ্রীহট্ট প্রভৃতি জিলার বহু লোক নিদারুণ অন্নকষ্টে প্রপীড়িত। নীরবে তাহারা জঠরজ্বালা সহ্য করিতেছে। অদৃষ্টবাদী ভারত-বাসী অদৃষ্টের দোহাই দিয়া সকল যাতনাই সহিতে অভ্যস্ত—এ যাতনাও সহিতেছে। হে অনাথনাথ ভগবান্, এই মূক নিরন্নদের প্রতি তুমি সদয় হও, তুমি ইহাদের রক্ষার উপায় কর।

শিক্ষা বিস্তার

দেশের এই অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, প্রকৃতির উপদ্রবে দেশবাসী কি বৎসরের পর বৎসর এই ভাবেই প্রপীড়িত হইবে ? প্রকৃতির খেয়াল হইতে আত্মরক্ষার শক্তি কি মানুষের নাই ?—ভগবান সে শক্তি মানুষকে দিয়াছেন, পশ্চিমদেশবাসীদের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া আমরা তাহা

বেশ বুঝিতেছি। শিল্প বিজ্ঞানের সাহায্যে পশ্চিমদেশীয়গণ অগাধ ধন সঞ্চয় করিতেছে, তাহাদের খাদ্যাভাব হয় না। শিল্প বিজ্ঞানের কথা ছাড়িয়া শুধু কৃষির কথা আলোচনা করিলেও দেখিতে পাই, তাহারা পাথরে সোণা ফলাইতেছে। আমরা আমাদের সোণার থালা ভরিতে সিকি শস্য উৎপাদন করিতেছি, আর তাহারা প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া, সম সমান ভূমি হইতে তিনগুণ চতুর্গুণ শস্য ফলাইয়া লইতেছে। শিক্ষার অভাবই এই দুর্দশার একমাত্র কারণ। আমাদের কৃষকেরা শিক্ষা লাভ করিয়া উন্নত প্রণালীতে চাষবাস করিতে আরম্ভ করুক, লাভজনক শস্য উৎপাদনে মনোযোগী হউক, প্রকৃতির উৎপাতে তাহাদিগকে প্রাণ হারাইতে হইবে না। দেশের নেতাদের দৃষ্টি কবে এদিকে আকৃষ্ট হইবে? তাঁহারা জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে কবে অগ্রসর হইবেন?

মুসলমান বালিকার প্রতিভা

"হাবলুল মাতিন" নামক উর্দ্দু সংবাদপত্রের সম্পাদক মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা কুমারী বেগম সুলতান "কেম্ব্রিজ সিনিয়র লোকাল একজামিনেশন" নামক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত কোন মুসলমান বালিকা ঐ পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হয় নাই, বেগম সুলতানই মুসলমান বালিকাদিগের পথিপ্রদর্শকরূপে ঐ পরীক্ষার্থে প্রস্তুত হইয়াছিল। বালিকা যে কেবল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহা নহে, তাহার ন্যায় অল্প বয়সে কোন ছাত্র বা ছাত্রী ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। কুমারী ১৪ বৎসর বয়সে ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইহার উপর বালিকা কোন বিদ্যালয়ে কখনও অধ্যয়ন করে নাই। ভদ্র মুসলমানের অন্তঃপুর-চারিণীরা যেরূপ পর্দ্দানশিন হইয়া থাকেন, বালিকা সেইরূপ পর্দ্দানশিন থাকিয়া বাটীতে বিদ্যাচর্চ্চা করিত। এই পরীক্ষা দিবার জন্য বালিকাকে ইংরাজী, ফরাসী, সঙ্গীত, অঙ্ক, ভূগোল, প্রাকৃতিক ভূগোল, ইতিহাস, অস্থিবিদ্যা এবং স্বাস্থ্যবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় অধ্যয়ন করিতে হইয়াছে। আমরা বালিকার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

ইউরোপীয় যুদ্ধ

যুদ্ধের অবস্থা দেখিয়া আমরা ক্রমেই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিতেছি। এ পাপ যুদ্ধের অবসান কত দূরে? শান্তির সম্ভাবনা যেন ক্রমেই দূরে পলায়ন করিতেছে। বেলজিয়াম নাবিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ, রাজা প্রজা আজ গৃহহীন। ফ্রান্স ছয়য় জার্ম্মাণীর নিষ্ঠুর পেষণে ক্রমেই শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছে, তাহার প্রায় অর্দ্ধেক পুং-বল নাকি গতাসু। ইংলণ্ডেরও আঠার বছরের ছেলেদের যুদ্ধে ডাক পড়িয়াছে। জনসংখ্যা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে, ধনবলের অপচয়ের সঙ্গে সঙ্গে, শিল্প বাণিজ্যের অসম্ভব ক্ষতিতে ইংলণ্ডেরও যে শক্তিক্ষয় হইতেছে তাহা পূরণ করিতে কত যুগ লাগিবে কে জানে? জার্ম্মাণীর কি হইতেছে সে খবরে আমাদের আবশ্যক নাই, সে-ও যে নিতান্তই হীনবল হইতেছে তাহা না বলিলেও চলে। এদিকে আমরাও মরিতেছি। আমাদের তৈজসপত্রের মূল্য দিন দিন বাড়িতেছে। পাটের কাটতি কমিয়া যাওয়ায় কৃষক-সমাজে হাহাকার। জাপান ও আমেরিকা এই সুযোগে খুব অর্থ লুটিতেছে। যুদ্ধনিযুক্ত সভ্যজাতিদের শিল্পাদি এখন এক প্রকার বন্ধ, এই সুযোগে জাপান ও আমেরিকাই প্রধানভাবে জগতের শিল্প দ্রব্যের অভাব দূর করিতেছে। আমরা যদি জাগ্রত জাতি হইতাম তবে এই সময়ে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিয়া অনেক লাভবান হইতে পারিতাম। কিন্তু যে দেশের গোণে কুড়ি গণ্ডা লোক অশিক্ষিত সে জাতি মহা সুষুপ্তির ক্রোড়ে নিমজ্জিত। খবরের কাগজওয়ালারা শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির জন্য যতই চীৎকার করুক,—আর গবর্ণমেণ্ট যতই কমিটি নিয়োগ করুন,—দেশের জনসাধারণ শিক্ষা লাভ না করিলে, তাহাদের আত্মজ্ঞান জাগ্রত না হইলে শিল্প বিজ্ঞানের উন্নতি হইবে না। যে দেশে শিক্ষার যত বিস্তার সে দেশে শিল্প বিজ্ঞানের তত উন্নতি। সুতরাং যুদ্ধে আর যে যত পারে সুবিধা করিয়া লউক, আমাদের কোন সুবিধাই হইবে না, বীজ না পুঁতিয়া ফলের আশা বাতুলেই করে, জনসাধারণকে অশিক্ষিত রাখিয়া দেশে শিল্প বিজ্ঞানের উন্নতির আশাও পাগলেই করে। এ যুদ্ধে আমাদের লাভ কিছু হইবে না। আমাদের ক্ষতিই হইতেছে, ক্ষতিই হইবে। এখন আমরা চাই শুধু শান্তি—শান্তি—শান্তি!

ভূদেব বাবু ও ভারতবর্ষের ইতিহাস

সম্প্রতি এডুকেশন গেজেটে স্বর্গীয় ভূদেব বাবু সম্বন্ধে একটী সুন্দর আখ্যায়িকা প্রকাশিত হইয়াছে।

এক সময়ে স্কুল সমূহের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ৺ কূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি গ্রীস রোম ও ইংলণ্ডের ইতিহাস লিখিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখেন নাই, ইহার কারণ কি? উত্তরে তিনি বলেন—"গ্রীক, রোমীয় এবং ইংরাজ এই তিনটী সুপ্রধান স্বদেশভক্ত জাতির ইতিহাসে ভারতবাসীর শিখিবার জিনিস অনেক আছে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস ত দুইটী প্রায়শ্চিত্তের ইতিহাস মাত্র।" ভারতবাসীর কি কি পাপের কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দেন,"(১) স্বধর্ম্মী বিদ্বেষ।—হিন্দু তাহার নিম্ন শ্রেণীকে অন্ত্যজ বর্ণ নাম দিয়া পশুর অপেক্ষাও অধিক ঘৃণা করিয়াছে। একজন ডোম বা মেথর উঠান দিয়া গেলে তখায় গোবর জল ছড়া দেওয়া হয়—একটী ছাগল আসিয়া তথায় মলত্যাগ করিলেও শুধু ঝাড়ু দিলেই চলে। অথচ হিন্দুর পরম পবিত্র শাস্ত্র বলেন, "সর্ব্বঘটে নারায়ণ" আছেন, এবং বিদ্যাবিনয় সম্পন্ন "ব্রাহ্মণে এবং শ্বপাকে" সমদর্শন করিতে হয়! আধুনিক কালের "সাধারণ" হিন্দু অন্ত্যজের সুখে দুঃখে শিক্ষায় উদাসীন। ব্যবহারক্ষেত্রে হিন্দুর এই স্বধর্ম্মীবিদ্বেষের জন্য ভগবান তাঁহার অসীম কৃপায় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্বধর্ম্মীপ্রেমিক জাতিকে—মুসলমানকে—শাস্তা ও শিক্ষকরূপে ভারতে প্রেরণ করেন। ইঁহারা আহারে ব্যবহারে স্বধর্ম্মীর মধ্যে পণ্ডিতে এবং মূর্খে, সুলতানে এবং ভিক্ষুকে প্রভেদ করেন না। ঈদের দিনে সর্ব্বশ্রেণীর মুসলমান সহস্র সহস্র একত্র হইয়া বিশ্বনিয়ন্তার বন্দনা করেন; ইহা কি সুন্দর দৃশ্য! অন্ত্যজ প্রভৃতি যতক্ষণ হিন্দুধর্ম্মী মানে ততক্ষণই ঘৃণিত; উহারা যেই মুসলমান হয়, অমনি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু বলেন, "সেলাম মিয়া সাহেব!" তখন উহাদের বসিবার জন্য কাঠের চৌকী দিতে হয়! এই স্বধর্ম্মী বিদ্বেষের প্রায়শ্চিত্ত বহুশত বৎসর ধরিয়া মুসলমান রাজত্বে চলার পরে মহারাষ্ট্রে ও পঞ্জাবে ঐ দোষটা একটু কাটিয়াছিল। মোগলের সহিত ধর্ম্মযুদ্ধের সময়, বিবাহে ও আহারে বর্ণভেদ সত্ত্বেও, মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুদিগের মধ্যে সক্ষম ব্যক্তি মাত্রেই বর্ণ-নির্ব্বিশেষে প্রাধান্যের পথ উন্মুক্ত পাইয়াছিল। তাহাতেই হোলকার জাতিতে ধনগড় (ধাঙ্গড়), গাইকবাড় মেষপালক এবং সিন্ধিয়া জাতিতে কাছার হইলেও আজ রাজতক্তে উপবিষ্ট লক্ষিত হইতেছেন। পঞ্জাবে শিখদিগের মধ্যেও সকল বর্ণের লোকই সিংহ পদবীধারী এবং বিবাহ সম্বন্ধে পার্থক্য রাখিয়াও দৃঢ় সম্মিলন প্রাপ্ত।

(২) স্বদেশী-বিদ্বেষ—ভারতবাসীদিগের মধ্যে বাঙ্গালী, উড়িয়া, বিহারী, মহারাষ্ট্রীয়, পঞ্জাবী, নেপালী, কাশ্মিরী, হিন্দু, মুসলমান, প্রভৃতির পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ। এই পাপের জন্য মহারাষ্ট্রীয় এবং শিখ প্রাদেশিকভাবে গণ্ডীর বাহির হইতে পারে নাই; সকলেই যে ভারত-মাতার সন্তান এবং তাহাদের ভালবাসার পাত্র ইহা বুঝিয়া স্বদেশী-প্রেমিক হইতে পারে নাই। শিখ সর্দ্দার প্রভৃতি বড় বড় সহর বিজয় করিয়াছিল; মহারাষ্ট্রীয় বার্গি (অশ্বারোহী) নিষ্ঠুরভাবে রাজপুতনা ও বাঙ্গালা লুণ্ঠিয়াছিল এবং লুঠেরাই থাকিয়া গিয়াছিল; ভারতে একচ্ছত্র মহারাষ্ট্রসাম্রাজ্য স্থাপন করিবার অতটা সুবিধা পাইয়াও স্বদেশী-পীড়ন পাপের জন্য তাহা করিতে পারিল না। এই স্বদেশী বিদ্বেষ পাপের ক্ষালন জন্য ভগবান স্বদেশপ্রেমিক-শ্রেষ্ঠ ইংরাজকে ভারতে প্রেরণ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ওয়েলশ, স্কচ, আইরিশ, ডিসেণ্টার, প্রোটেষ্টাণ্ট, প্রেস্‌বিটিরিয়ান, রোমান কাথলিক, প্রভৃতি ভেদ আছে, কিন্তু সকলেই দেশের কাজে একজোট। ক্লাইব একজন সামান্য ইংরাজ কেরাণী ছিলেন। বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার রাজকোষের ধনে উহাকে কেহ স্বদেশদ্রোহী করিতে পারে নাই। কিন্তু তিনি অনায়াসে মিরজাফর প্রভৃতিকে ভাঙ্গাইয়া লইলেন। কোন একজন ইংরাজকে কিছু পাইতে দেখিলে সমস্ত জাতিই পরিতৃপ্ত হয়। ইংরাজের আগমনে ও সুদৃঢ় রাজ্যশাসনে সমগ্র ভারত যে এক দেশ তাহা সুস্পষ্ট হইয়াছে; ইঁহাদের প্রদত্ত রেলপথে সকল যাতায়াতের সুবিধায় ভারতের আভ্যন্তরিক সম্মিলনসাধন দ্রুতবেগেই হইতেছে এবং ইংরাজ ভারতের ঐ একচ্ছত্র সম্মিলন সাধন করিয়া অশ্বমেধ এবং রাজসূয় যজ্ঞের ফলভাগী হইয়াছেন। ফলতঃ ভারতবাসীর মধ্যে ধর্ম্ম এবং বর্ণ-নির্ব্বিশেষে একটা "জাতীয় ভাব ও স্বদেশী প্রেম" বিধি-প্রেরিত ইংরাজের রাজত্ব কালেই সাধারণের মধ্যেও সুপরিস্ফুট হইতেছে এবং বহুকাল ইহাদের শাসনে থাকিয়াই ভারতবাসী উহা সম্পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হইবে। সকল ভারত-

বাসীরই মুসলমানের আদর্শে স্বধর্ম্মী-প্রেম ও ইংরাজদের আদর্শে স্বদেশী-প্রেম অনুশীলন করিবার খুবই সুবিধা ইংরাজদের আমলে হইয়াছে। কিন্তু পবিত্র ভারতভূমিতে স্বধর্ম্মের এবং স্বদেশের প্রতি ভক্তি ভালবাসার পোষণ উপলক্ষে অপর ধর্ম্মের বা অপর দেশীয়ের প্রতি বিদ্বেষ করিয়া ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হওয়া চলিবে না; উহা ভারতবাসীর প্রকৃতিবিরুদ্ধ এবং তাহার পক্ষে জ্ঞানকৃত পাপ হইবে। ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ভারতবাসী এখনও পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উদার উচ্চ এবং সূক্ষ্মদর্শী আছেন।"

মুসলমান মহিলাগণের সমিতি

কলিকাতা ৭৬ এ লোয়ার সার্কুলার রোডে বঙ্গীয় মুসলমান মহিলাগণ এক সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। গত ২১এ ফেব্রুয়ারী এই সমিতির প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল।

কলিকাতাবাসী মুসলমান মহিলাগণের-মধ্যে সংভাব সংস্থাপন এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য। অনিষ্টকর সামাজিক কুপ্রথাগুলি বর্জ্জন করিয়া যাহাতে মুসলমান সমাজ বলিষ্ঠ হইয়া উঠিতে পারেন, এবং যাহাতে মুসলমান দরিদ্র মহিলারা শিল্পশিক্ষা করিয়া আপনারা উদরান্নের সংস্থান করিতে পারেন সমিতি তাহার ব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করিবেন। মৌলবী আবদুল করিমের সহধর্ম্মিণী সমিতির প্রধান নায়িকা সভাপতি। মিসেস মাহবুব এবং মিসেস সামসুল উলাম কহলুদীন প্রিন্সেস আকবর জহান বেগম সহকারী সভাপতি। মিসেস চৌধুরী মহম্মদ ইস্‌মাইল সম্পাদিকা নিযুক্ত হইয়াছেন।

সমিতির দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে ৩০ জন মহিলা উপস্থিত ছিলেন। ৯০ জন মহিলা সমিতির কার্য্যে যোগ দিয়াছেন। সমিতি মুসলমান নারীদিগের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের উদ্‌যোগ করিবেন শুনিয়া আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি। দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে উর্দি সলাম বেগম স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে একটি রচনা পাঠ করেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবানের নিকট এই সমিতির উন্নতি প্রার্থনা করি।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন

গত শুভ ক্রাইষ্টের অবকাশে যশোহরে "বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের" নবম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ২১শে এপ্রিল শুক্রবার বেলা ১টার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, পি, এইচ, ডি, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার নানা স্থান হইতে ও কলিকাতা হইতে প্রায় তিন শত প্রতিনিধি সভার কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। বহু দর্শক উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এবার সভাস্থলে কয়েকটী ভদ্র মহিলা ও সাহিত্য সম্মিলনের কয়েক জন ভূতপূর্ব্ব সভাপতি উপস্থিত ছিলেন। যশোহরের বিখ্যাত লেখিকা শ্রীমতী মানকুমারী একটী আবাহনগীত লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন; তাহা সভাস্থলে পঠিত হয়। স্থানান্তরে তাহা মুদ্রিত হইল। সে দিন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্নের রচিত একটী মঙ্গলসঙ্গীত গীত হইলে সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। তৎপরে সংস্কৃত, পালি ও উর্দ্দু ভাষায় রচিত মঙ্গল গীত অন্যান্য কয়েক ব্যক্তি গান করিলে বেলা অন্ন রায় শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর সাহিত্য সম্মিলনের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় সমবেত প্রতিনিধিমণ্ডলীকে ও দর্শকগণকে আহ্বান করিলেন। তাঁহার বক্তৃতার সার মর্ম্ম এই যে বাঙ্গালা দেশের উন্নতি সাহিত্যের ভিতর দিয়াই হইবে—এজন্য এ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষে এখানকার ভাষা, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যার আলোচনা একান্ত প্রয়োজন, তাঁহার মতে এই জাতীয় উন্নতি সাধনের নিমিত্ত স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেরই সচেষ্ট হওয়া উচিত। পরিশেষে বক্তা বর্ত্তমান সম্মিলনের সাফল্য কামনা করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ যথারীতি সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। তাঁহার অভিভাষণে (১) যশোহরের অবস্থা (২) বঙ্গের জাতীয় সাহিত্য (৩) সংস্কৃত সাহিত্য (৪) সংস্কৃত-সাহিত্যের বিশ্বজয় (৫) সংস্কৃতের প্রতিদ্বন্দ্বী (৬) প্রাদেশিক ভাষা সমূহের উৎপত্তি (৭) বাঙ্গালা সাহিত্যের অভ্যুদয় (৮)

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য (৯) নব্য বাঙ্গালা সাহিত্য (১০) নব্য বাঙ্গালা সাহিত্য লেখকগণ (১১) জাতীয় সাহিত্য ও (১২) সাহিত্যের আদর্শ এই কয়টী প্রসঙ্গে নানা বিষয়ক আলোচনা স্থান পাইয়াছিল।

পরদিন প্রাতে ৮ টার সময় দ্বিতীয় দিনের সভা আরম্ভ হয়। এ দিন সম্মিলনের চারি বিভাগে চারিজন সভাপতি আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, সাহিত্য বিভাগে মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, দর্শন বিভাগে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, বিজ্ঞান বিভাগে ভারত গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব ভূতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত পি, এন, বসু এবং ইতিহাস বিভাগে বিশ্বকোষ সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সভাপতির করিয়াছিলেন। বিজ্ঞান বিভাগে ১৭টী প্রবন্ধ পঠিত হয়। সাহিত্য শাখায় প্রায় চল্লিশটী প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল।

ঐ দিন বেলা ২টার সময় বিষয় নির্ব্বাচন সমিতির অধিবেশন হয় এবং অপরাহ্ণ ৪টার সময় পুনরায় সম্মিলিত সভার বৈঠক বসে। সভার কার্য্য শেষ হয় বেলা ৫টার সময়। পরিশেষে রায় শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুরের আহ্বানে সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন আগামী বর্ষে বড়দিনের অবকাশে বাঁকিপুরে হইবে বলিয়া স্থির হয়।

আবাহন

(যশোহরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের পঞ্চম অধিবেশনে পঠিত)

(১)

স্বাগত হে সুধীগণ!
লহ প্রীতি-আবাহন,
স্বাগত সতীশচন্দ্র বিদ্যা বিভূষণ!
মনস্বী যশস্বী ধীর,
প্রিয় পুত্র ভারতীর,
তোমা সবা নিরখিয়া কৃতার্থ এ মন!

(২)

বিধির স্নেহের দান
এই সব সুসন্তান,
বিজ্ঞান-দর্শন-বিৎ সুকবি ভুবনে,
নাশিতে বিষাদতমঃ,
ফুটেছ জ্যোতিষ্ক সম,
আলোকিত হিয়া মম ভাস্বর কিরণে!

(৩)

কি দেখিছ চাহি চাহি?—
আর সে সে দিন নাহি—
ধন জন-ফল-পুষ্প ভরা নিরন্তর—
গৌড়ের সুযশঃ চন্দ্র,
জননী যশোরেশ্বরী
সাজাইয়া দিয়াছিলা মম কলেবর!

(৪)

খুলনা আমারি সঙ্গে,
মিশি ছিল এক অঙ্গে,
আজি যদি গেছে দূরে—তবু নহে পর,
কতই গৌরবে বিধি
ভরি দিলা মম হৃদি,
সেই "রত্ন-প্রসবিনী" আমি যশোহর।

(৫)

স্মরিতে আকুল চিত্ত,
নাহি সে প্রতাপাদিত্য,
নাহি আর সীতারাম, বীর পুত্র সব;
ধার্ম্মিক সরল শান্ত
নাহি সে বরদাকান্ত,
নলডাঙ্গা, নড়াইল, ন'পাড়া নীরব!

(৬)

সেই যে ভিষক্‌বর,
কবিরাজ গঙ্গাধর,
শমন সভয়ে যারে ছিল কৃতাঞ্জলি,
ভারতে সুখ্যাতি যার,
"চরকের টীকাকার"
সে আমার সুখ স্বপ্ন পুত্রধন বলি!

(৭)

আমারে যে নিতি নিতি
শুনাত মধুর গীতি,

স্বরস-কিন্নর-কণ্ঠে সে মধু কিন্নর ;
সাহিত্য গগন-রবি,
শ্রীমধুসূদন কবি।
জননী আমারে বাছা করেছে অমর !

(৮)

সেনহাটী কালিয়ার,
তারা আজি নাহি হায়,
সেই ধন্বন্তরি-সম সুবৈদ্য সকল ;
সাহিত্যে যে সুপ্রকাশ,
নাহি সে ঠাকুরদাস,
হারিয়েছি রত্ন কত প্রাণের সম্বল।

(৯)

'প'ড়ে পাওয়া নিধি' সম,
পুত্রবর প্রিয়তম,
সে যে মোর যদুনাথ ধাত্রী শিক্ষাকার,
নিষ্কাম সন্ন্যাসী সম
কৃষ্ণচন্দ্র নিরুপম ;
সেও গেছে কোল খালি করিয়া আমার !

(১০)

অমৃতবাজারে সেই
সোণার শিশির নেই,
হেমন্ত, বসন্ত সব বিদায় করিয়া,
এবে আছি ভীব-লোকে,
বরষা লইয়া চোখে,
স্মৃতির শ্মশান আছে মরমে পড়িয়া !

(১১)

—বলিব কি সবিশেষ,
যা'রা আছে অবশেষ,
সঙ্কোচে সে নাম ক'টি আনিনা আননে ;
—ভয়ে ভয়ে বলি তবে,
যদুনাথ আদি সবে,
সাধিছে এ মহাযজ্ঞ জীবনের পণে।

(১২)

আজি আমি দীনা ক্ষীণা,
শোক-তাপ-বিমলিনা,
আজি কিসে সেকালের দিব পরিচয়,
দুর্ভিক্ষ-জ্বলিত-হিয়া,
তাহে জ্বর ম্যালেরিয়া,
আত্মদ্রোহ অহরহঃ করিতেছে ক্ষয়।

(১৩)

এখন যকৃৎ পিলে,
সত্ত্ব রক্ত মাংস গিলে,
করিছে কঙ্কালসার নশ্বর শরীর ;
জগত-জীবন বায়ু,
গরাসিছে পরমায়ু,
কালিয়ের বিষে ভরা আজি হেথা নীর।

(১৪)

হেন দৈন্য-ক্ষুণ্ণ-দেশে,
তোমরা মিলিলে এসে,
বঙ্গের অমূল্যমণি ভারতগৌরব !
কেমনে কোথায় রাখি,
অশ্রু-জলে রুদ্ধ আঁখি,
ক্ষমা কোরো প্রাচীনার দোষ ত্রুটি সব।

(১৫)

বসো বাপ ! তরুচ্ছায়,
শৈশাসন-স্নিগ্ধতায়,
শ্রম দূর কর মম অকল-বীজনে,
বন-ফল দাও মুখে,
তৃপ্তি পাই ভাবাবুকে,
শ্রীরাম অতিথি এবে ভ্রমণা-সদনে।

শ্রীকাব্য-কুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী
মধুভবন। সাগরদাঁড়ী

মধুমক্ষিকাবিষয়ক স্বপ্ন

মুক্ত বাতায়ন সম্মুখে শিশুদের জননী উপবিষ্টা ; বাবলা গাছের তলায় শিশুরা ক্রীড়া-নিমগ্ন ছিল ; মুক্ত বাতায়ন-পথে তাহাদের হাস্যকলরব ও উত্তপ্ত মধ্যাহ্ন বায়ু গৃহে প্রবেশ করিতেছিল। বাবলাফুলের পরাগরঞ্জিত ও ক্ষৌদ্রপূর্ণ মধুমক্ষিকাদল ভোঁ ভোঁ রবে একবার গৃহমধ্যে আসিতেছিল, আবার বাবলা বৃক্ষে যাইয়া বসিতেছিল। শিশুদের জননী

টেবিলের সম্মুখস্থ একখানা অনুচ্চ কাষ্ঠাসনে বসিয়া শিশুদের ছিন্ন বস্ত্রগুলির সংস্কার কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। টেবিলের উপরে একটা বৃহৎ বেত্রপেটিকাতে অনেকগুলি ছিন্ন বস্ত্র রক্ষিত ছিল; তাঁহা হইতেই আজ কতকগুলি বাছিয়া করিয়া ক্রোড়স্থিত পুস্তকের উপর রাখিয়াছিলেন। হস্ত সূচীকার্য্যে রত, চক্ষু সূচীর তীক্ষ্ণ অগ্রভাগের একবার বস্ত্রমধ্যে প্রবেশ ও পুনরায় বহির্গমন দর্শনে নিযুক্ত। মধুমক্ষিকার বিষাদপূর্ণ রব এবং শিশুদের ক্রীড়া কোলাহল তাঁহার কর্ণে ক্রমশঃই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিল, হস্তও সূচীপরিচালনে শিথিলতর হইয়া আসিল। দীর্ঘপক্ষ, মধুসংগ্রহ কার্য্যে অক্ষম, মধুমক্ষিকাগণ তাঁহার মস্তকের চতুর্দ্দিকে ভোঁ ভোঁ রবে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। জননী ক্রমশঃই নিদ্রাবেশে অভিভূত হইতে লাগিলেন। বস্ত্রধৃত হস্ত সম্মুখস্থ টেবিলের উপর ও মস্তক তৎপার্শ্বেই রক্ষা করিয়া, পূর্ব্বোক্ত আসনেই বসিয়া রহিলেন। শিশুদের কণ্ঠস্বর স্বপ্নজাত, কখন অদূরে ও কখন সুদূরোত্থিত বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে তাহাদের ক্রীড়াধ্বনি যেন একেবারেই থামিয়া গেল কিন্তু তাঁহার প্রত্যাশিত অজাত, গর্ভস্থ নবম শিশুটিকে যেন দেহাভ্যন্তরে সুস্পষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন। অবনত মস্তকে, নিদ্রিতাবস্থায়, মধুমক্ষিকা পরিব্যাপ্ত হইয়া তাঁহার মস্তিষ্ক-পটে কতকগুলি চিত্রের আবির্ভাব হইতে লাগিল; মধুমক্ষিকাগণের দেহ যেন বর্দ্ধিতায়তন হইয়া, মনুষ্যদেহে পরিণত হইয়া তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিতে লাগিল। তৎপরে তাহাদের মধ্যস্থিত একজন তাঁহার সম্মুখীন হইয়া, তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিল, "যেস্থানে আপনার অজাত শিশুটি নিদ্রামগ্ন আছে, আপনার শরীরে সেই পার্শ্ব অর্থাৎ তাহার মধ্যস্থিত শিশুটি আমি স্পর্শ করিতে চাই। আমার হস্তস্পর্শে সে আমারই অনুরূপ হইবে।"

জননী প্রশ্ন করিলেন, "আপনি কে?" সে ব্যক্তি বলিল, "আমি স্বাস্থ্য। আমি যাহাকে স্পর্শ করি তাহার শিরায় ইশরায় সর্ব্বদাই সতেজ ও উষ্ণ শোণিত প্রবাহিত হইয়া থাকে। শ্রান্তি অথবা বেদনা যে কি তাহা সে কখনও বুঝিতে পারে না। জীবন তাহার পক্ষে একটা দীর্ঘ সুখ-হাস্য।"

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই অপর একজন বলিয়া উঠিল, "না, না, ইহাকে নহে, আমাকেই শিশুটি স্পর্শ করিতে দিন্। আমি ধন, আমার স্পর্শে সংসারের সকল অভাব দূর হয়। আমি যাহাকে স্পর্শ করি সে ইচ্ছা করিলেই অন্য মানবগণের শক্তি ও স্বাস্থ্যের ব্যবহার পাইয়া নিজে সুখে জীবন ধারণ করিতে পারে। তাহার চক্ষু যে পদার্থলাভে লোলুপ হইবে, হস্ত তাহাই সম্মুখে উপস্থিত করিতে সক্ষম হইবে। "আমার এই দ্রব্যের অভাব" এই কথার অর্থও সে কখন হৃদয়ঙ্গম করিবে না।" অজাত শিশু এতচ্ছ্রবণে ভয়ে নিশ্চল হইয়া রহিল। তৎপরে অন্য একজন বলিল, "আমাকে শিশুটী স্পর্শ করিবার অনুমতি দান করুন। আমি যশ। আমি যাহাকে স্পর্শ করি তাহাকে উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গে—যেস্থান হইতে সকলেই তাহাকে দেখিতে পাইবে, এইরূপ স্থানে আরোহণ করাই। মৃত্যুর পরেও সে বিস্মৃতি-সাগরে মগ্ন হয় না। যুগ যুগান্তর পর্য্যন্ত তাহার নাম ধ্বনিত হয়। একযুগের প্রতিধ্বনি তাহার পরবর্ত্তী যুগ সযত্নে তুলিয়া লয়। একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া চিরস্মরণীয় থাকা!"

জননীর নিঃশ্বাসক্রিয়া স্বাভাবিক ভাবেই চলিতে লাগিল, ইহাদের কথায় তাঁহার মন অবিচলিতই থাকিল। মস্তিষ্ক পটেও নূতন নূতন চিত্রের আবির্ভাব হইতে লাগিল।

একজন বলিল, "আমাকে শিশুটী স্পর্শ করিতে দিন্। আমি প্রেম। আমি তাহাকে স্পর্শ করিলে সে জীবন-পথে কখন একাকী পরিভ্রমণ করিবে না। ঘোর অন্ধকারতম প্রদেশে, পথনির্ণয় করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ কালে আর একখানি হস্ত সম্মুখেই পাইবে। সমগ্র জগত তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেও একজন তাহাকে সুমধুর স্বরে বলিবে, "তুমি এবং আমি, আমরা উভয়ে।" শিশু কাঁপিয়া উঠিল।

সেই মুহূর্ত্তে আর একজন বলিল, "আমার শিশুকে স্পর্শ করিবার অনুমতি প্রদান করুন। আমি প্রতিভা। পৃথিবীতে অদ্যাবধি এমন কিছু সংঘটিত হয় নাই যাহা আমি করিতে অক্ষম। রণবীর সেনানী, রাজনীতিজ্ঞ চিন্তাশীল পণ্ডিত এবং রাষ্ট্র বিভাগে কার্য্যকুশল পুরুষ সিংহ সকলে আমারই স্পর্শে কৃতকার্য্যতা লাভ করে। সুলেখক, যাঁহারা অতীতের কথাও লেখেন না অথবা ভবিষ্যৎ বংশাবলীর বোধগম্য বিষয়ের আলোচনা করেন না,

কিন্তু বর্ত্তমান প্রয়োজনানুযায়ী বিষয়সম্বন্ধে লিখিয়া সিদ্ধকাম হন তাঁহাদেরও আমিই স্পর্শ করিয়া থাকি। এই শিশুটিকে স্পর্শ করিলে তাহাকে কখন অকৃতকার্য্যতা দুঃখে কাতর ক্রন্দন করিতে হইবে না।

জননীর মস্তকের চতুষ্পার্শ্বে মধুমক্ষিকার দল উড়িতেছিল, তাহাদের দীর্ঘ পদগুলি তাঁহাকে প্রায় স্পর্শই করিতেছিল, এমন সময়ে তাঁহার মস্তিষ্ক-চিত্রপটে আর একটি চিত্রের আবির্ভাব হইল। গৃহের অন্ধকারতম কোণ হইতে বিবর্ণ ও বহুরেখাঙ্কিত-মুখ, গহ্বরপ্রবিষ্ট-কপোল এবং মৃদুহাস্য-কম্পিতাধর ঠিক ব্যক্তি তাহার সম্মুখীন হইয়া শিশুর উদ্দেশে হস্তপ্রসারণ করিল। জননী সভয়ে পশ্চাতে সরিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?" সে ব্যক্তি নিরুত্তর রহিল। জননী তাহার নেত্রপল্লব মধ্যস্থিত চক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বলিলেন, "আপনি শিশুকে কি বর দিতে পারেন, স্বাস্থ্য?"

সে বলিল, "আমার স্পর্শে মানব-রক্তে এমনই প্রচণ্ড, উত্তাপময় জ্বরের আবির্ভাব হয় যে সেই জ্বর অগ্নিশিখার ন্যায় তাহার রক্ত লেহন করে। জীবনের অবসানের সঙ্গেই শুধু সেই জ্বরের উপশম হয়।" জননী বলিলেন, "ধন দিতে পারেন?"

সে মস্তক ঈষৎ হেলাইয়া বলিল, "না। আমি যাহাকে স্পর্শ করি সে ভূতলে স্বর্ণখণ্ড দর্শন করিয়া যখন নত হইয়া তাহা গ্রহণ করিতে উদ্যত হয়, ঠিক সেই সময়েই মস্তকোপরি আকাশমার্গে দিব্য জ্যোতির প্রকাশ হয়। মস্তক উত্তোলন করিয়া দিব্য জ্যোতি দর্শনাকাঙ্ক্ষায় শিথিলীভূত তাহার অঙ্গুলীর মধ্য দিয়া স্বর্ণখণ্ড ভূমিতে পতিত হয়; অথবা তাহার অজ্ঞাত সারে তাহার হস্ত হইতে অন্য কেহ তাহা লইয়া দূরে প্রস্থান করে।"

জননী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "যশ দিতে পারেন?"

সে বলিল, "তাহাও সম্ভবপর নহে। আমি যাহাকে স্পর্শ করি কেবল তাহারই নিমিত্ত বালুকাপৃষ্ঠে অজ্ঞাত হস্তাঙ্কিত পথের আবির্ভাব হয়, অপরে সে পথ দেখিতে পায় না। আমি যাহাকে স্পর্শ করি, তাহার সম্বন্ধে ইহাই একমাত্র গন্তব্য পথ। এই পথে যাইতে যাইতে কখনও উচ্চ গিরিশৃঙ্গ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া সহসা নিম্ন উপত্যকা অভিমুখে চলিয়া আইসে। অনন্তদৃষ্ট হইলেও তাহাকে এই নির্দ্দিষ্ট পথই অনুসরণ করিতে হইবে।"

জননী পুনরপি বলিলেন, "প্রেম ও দিতে পারেন না?" সে বলিল, "আমি যাহাকে স্পর্শ করি, সে প্রেমের জন্য সুধার্ত্ত হইবে বটে, কিন্তু তাহা লাভ করিবে না। প্রেমের অভিমুখে সে যখন হস্ত প্রসারণ করিবে, স্নেহভাজন ব্যক্তিকে যখন হৃদয়ে ধারণোদ্যত হইবে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই সুদূরে দিগন্তপ্রান্তে আলোক-রেখার আবির্ভাব হইবে। তাহাকে তৎক্ষণাৎই তাহার উদ্দেশে যাইতে হইবে। তাহার প্রেমাস্পদ তাহার সহযাত্রী হইতে স্বীকৃত হইবে না, তাহাকে একাকী সমগ্র পথ ভ্রমণ করিতে হইবে। সে যখন স্বীয় উত্তপ্ত হৃদয়ে প্রেমাস্পদকে "আমার—আমারই—নিতান্তই আমার" বলিয়া সস্নেহ আলিঙ্গনে উদ্যত হইবে তখনই "বিসর্জ্জন কর, বিসর্জ্জন কর, প্রেম তোমার নিমিত্ত নহে' এই বাণী শুনিতে পাইবে।"

জননী জিজ্ঞাসা করিলেন, "জীবনপথে সে কৃতকার্য্যতা লাভ করিবে ত?"

সে বলিল, "সে সর্ব্বথা অকৃতকার্য্য হইবে। অন্যদের সহিত দ্রুতগমনে সে সর্ব্বদাই পশ্চাতে থাকিবে, অপর সকলেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাহার বহুপূর্ব্বে উপস্থিত হইবে। অজ্ঞাত ও অভিনব স্বর দ্বারা সে আহূত হইবে। নবালোক-ইঙ্গিতে তাহাকে তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত করাইবে, কাজেই সে সকলের পশ্চাতে থাকিয়া যাইবে। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর বিষয় এই যে, সুদূরে, উত্তপ্ত বালুকারাশির অপর পারে, সাধারণ মানবচক্ষে যাহা সুবিশাল মরুভূমি প্রতীয়মান হইবে, ইহার চক্ষে সেস্থানে সুনীল সমুদ্র বিরাজমান থাকিবে। সেই বিশাল সমুদ্র চির সূর্য্যকিরণোজ্জ্বল এবং সমুদ্রজল নীলকান্ত মণির ন্যায় আভাযুক্ত; তীরস্থ সমুদ্রফেনা শুভ্র শুভ্রবর্ণ এই বিশাল সমুদ্র মধ্যে উত্তপ্ত তরল স্বর্ণমণ্ডিত পর্ব্বতশৃঙ্গবিশিষ্ট একটি সুন্দর প্রদেশ তাহার দৃষ্টিগোচর হইবে।"

মাতা বলিলেন, "সে সেই রাজ্যে যাইতে পারিবে ত?" সে ব্যক্তি কৌতুকপূর্ণ হাস্যপূর্ব্বক নীরব রহিল।

মাতা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে রাজ্য বাস্তব রাজ্য ত?" সে বলিল, "বাস্তব কাহাকে বলা যায়?"

জননী তাহার অর্দ্ধমুদ্রিত নেত্রপল্লবমণ্ডিত চক্ষের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া, কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, "স্পর্শ কর।"

সে জননীর কিঞ্চিৎ সন্নিহিত হইয়া নিদ্রিত শিশুর দেহে সস্মিতমুখে হস্তস্থাপনপূর্ব্বক অতি মৃদুস্বরে কি যেন বলিল। জননীর কর্ণে কেবল ইহাই প্রবেশ করিল, "তোমাকে এই বর দান করিলাম যাহা পূর্ণ আদর্শ, যাহা অন্যের নিকট কল্পনামাত্র, তোমার নিকট তাহা সর্ব্বদা ধ্রুবসত্যরূপে প্রতীয়মান হউক্।"

শিশু আনন্দে অধীর হইল, কিন্তু জননী গাঢ়তর নিদ্রায় মগ্ন হইলেন, মস্তিষ্কপটের চিত্রগুলিও অন্তর্হিত হইয়া গেল। তাঁহার গর্ভস্থ অজাত শিশু স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। সে দিবসের সূর্য্যকিরণ কখনও দেখে নাই, তাহার অস্ফুট চক্ষুর সহিত আলোকের পরিচয় এখনও হয় নাই; কিন্তু তথাপি অর্দ্ধবিকশিত মস্তিষ্কের মধ্যে ও চক্ষে এক অভিনব আলোকের অনুভূতি হইল। আলোক তাহার এখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই, আলোক হয়ত কখন সে চক্ষে দেখিবেও না, কিন্তু সে না দেখিলেও ত আলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই। আলোক কোন স্থানে না কোন-স্থানে চিরবিরাজমান। শিশুর কাছে সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব আলোকের অনুভূতি এখন হইতেই আরম্ভ হইল।

ইতিমধ্যেই বর পূর্ণ হইয়াছে। আদর্শ তাহার পক্ষে ধ্রুবসত্য হইয়াছে। *

জাতীয় সাহিত্য †

"নানান্ দেশের নানান্ ভাষা,
বিনা স্বদেশের ভাষা—পুরে কি আশা!"

বঙ্গভাষা আজ আর উপেক্ষিত নহে, বাঙ্গালী বলিয়া যাঁহারা গর্ব্ব করেন, তাঁহাদের নিকট বঙ্গভাষা বরং অপেক্ষিত। যখন বাঙ্গালীর ছেলে, বঙ্গভূমির বক্ষের উপর দাঁড়াইয়া বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলা, বা বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ অধ্যয়ন করাকে লজ্জাজনক, কতকটা বা প্রত্যবায়-জনক মনে করিতেন, সে দুর্দ্দিন কাটিয়া গিয়াছে, সে মোহ ভাঙ্গিয়াছে।

মহাকবি কৃত্তিবাস হইতে কবিবর ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বহু মনস্বী বঙ্গসন্তান, বঙ্গবাণীর স্বর্ণমন্দির রচনায় সাহায্য করিয়াছেন, রাজা রামমোহন, প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর, অমর বঙ্কিমচন্দ্র, চিন্তাশীল অক্ষয়কুমার প্রভৃতি বহু প্রতিভাশালী সারস্বতগণ সেই মন্দির-গাত্র নানাবিধ শিল্পসৌন্দর্য্যে খচিত করিয়াছেন। বঙ্গভাষা এখন বাঙ্গালীর একটা প্রকৃত স্পর্দ্ধার পদার্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যে জাতির নিজের পরিচয়যোগ্য ভাষা নাই, বা নিজের জাতীয় সাহিত্য নাই, সে জাতির বড়ই দুর্ভাগ্য। বাঙ্গালী ভারতের যে প্রাচীন মহাবংশের ভগ্নাংশ, সেই প্রাচীন আর্য্যজাতির ভাষা এবং সাহিত্য-ভাণ্ডার অনন্ত ও অমূল্য রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ। সুতরাং বাঙ্গালীকে নিজের জাতীয় সাহিত্যগঠনে সম্পূর্ণরূপে পরের প্রত্যাশী হইতে হয় নাই। জগতের অপর অপর শিক্ষিত ও সমুন্নত জাতির সমক্ষে, নিজের জাতীয় সাহিত্য লইয়া দাঁড়াইবার যোগ্যতায় বাঙ্গালী এখন বঞ্চিত নহে, এ কথা সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া বর্ত্তমানে বঙ্গভাষার যতটা শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে, ইহাই যে বর্দ্ধিষ্ণু বঙ্গবাসীর পক্ষে পর্য্যাপ্ত, এ কথা আমি কদাচ স্বীকার করিতে পারি না।

ক্ষেত্রকর্ষণ পরিশ্রমসাধ্য কার্য্য হইলেও, সেই কর্ষিত ক্ষেত্রে বীজ বপন ও উপযুক্ত সেচনাদির দ্বারা অঙ্কুরিত বীজের রক্ষণ এবং পরিবর্দ্ধন, অধিকতর পরিশ্রমসাধ্য ও বিবেচনা-সাপেক্ষ। অঙ্কুরিত শস্যের আপদ্ অনেক। সেই সমস্ত আপদ্ হইতে রক্ষা করিয়া শস্যকে ফলোন্মুখ করিয়া তোলা বড়ই দক্ষতা-সাপেক্ষ। যে সময়ে জলসেচনের প্রয়োজন, তখন জল, যখন আতপ নিবারণের প্রয়োজন, তখন ছায়ার ব্যবস্থা আবশ্যক। এই সমুদয়ের কোন একটির অভাবেই কর্ষিত ভূমি শস্যশালিনী হইতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের বঙ্গভাষার সম্বন্ধেও ঐ রীতির অনুসরণ বিধেয়। বহুকাল, বহুশত বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম-সহকারে কৃত্তিবাস প্রভৃতি সাধকগণ তাঁহাদের আরাধ্যা বঙ্গভাষার ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী অনেক

* কুমারী যামিনী সেন এম্. বি, কর্ত্তৃক ইংরাজী হইতে অনুবাদিত।

† গত ১৯শে চৈত্র, রংপুর উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের নবম অধিবেশন সভাপতি জষ্টিস আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক পঠিত।

প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি সেই কর্ষিত ভূমির উর্ব্বরতা বর্দ্ধনের নিমিত্ত নানা আয়াস করিয়াছেন। দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের এখন সেই ভূমির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে; সকলেই সুফলের আশায় সেই ভূমির দিকে লোলুপনয়নে চাহিতেছেন। কত আশায় উৎফুল্ল হইয়া নিজের মাতৃভাষার প্রতি ভক্তি ও আদর সহকারে দৃষ্টিপাত করিতেছেন; এমন সময়ে, দেশবাসীর এই আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ, উৎকণ্ঠাপূর্ণ সময়ে, ঐ কর্ষিত ভূমিতে বীজ বপন করিতে হইবে। সুতরাং তাহাতে যে কত সতর্কতার প্রয়োজন কত পূর্ব্বাপর বিবেচনার প্রয়োজন, তাহা বঙ্গবাসী মাত্রেরই বিশেষ বিবেচ্য। এতদিনের চেষ্টায় যে বঙ্গসাহিত্যের ক্ষেত্র পরিপাটীরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, আমাদের এবং আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের অবিবেচনার ফলে তাহা যেন নষ্ট না হয়, তাহার উর্ব্বরতা যেন কতকগুলি আবর্জ্জনা-জনিত ক্ষারদাহে দগ্ধীভূত না হয়, ইহাই আমার অভিলাষ।

"বিশেষ বিবেচনা-সাপেক্ষ" কেন বলিলাম, তাহাই বিবৃত করিতেছি।

এতকাল অর্থাৎ প্রায় গত সার্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া বঙ্গভাষা যে ভাবে, যে গতিতে বঙ্গীয় জনসমাজে প্রসার লাভ করিতেছিল এখন বঙ্গভাষার সেই গতির ক্ষিপ্রতা ক্রমেই বাড়িতেছে। পূর্ব্বে ছিল, যাঁহারা শিক্ষিত, কি প্রতীচ্য কি প্রাচ্য, উভয়বিধ শিক্ষার কোন একটিতে যাঁহারা সম্পন্ন, বঙ্গভাষার কতিপয় কমনীয় গ্রন্থ সেই অল্পসংখ্যক ব্যক্তির অবসর-বিনোদনের উপাদান মাত্র হইত। কার্য্যান্তরব্যাপৃত চিত্তকে কদাচিৎ প্রসন্ন করিবার জন্য তাঁহারা বঙ্গভাষার গ্রন্থাবলী পাঠ করিতেন। প্রকৃতপক্ষে যাহাদের লইয়া বঙ্গদেশ, যাহাদিগকে বাদ দিলে বাঙ্গালা দেশের প্রায় সমস্তই বাদ পড়ে, সেই বঙ্গের আপামর সাধারণের মধ্যে বঙ্গভাষার আদর কতটা ছিল? এক প্রকার ছিলই না, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কৃত্তিবাস, কাশীদাস ব্যতীত অপর কয়জন বঙ্গসাহিত্য-রথীর নাম বঙ্গের জনসাধারণের মধ্যে সুপরিচিত? শিক্ষিত জন-সঙ্ঘের সংখ্যা সাত কোটি বঙ্গবাসীর তুলনায় মুষ্টিমেয় বলিলেও অতিরঞ্জন হয় না। এই মুষ্টিমেয় সমাজে যে বঙ্গভাষা এত দিন আবদ্ধ ছিল, এখন সেই বঙ্গভাষা অতি ক্ষিপ্রগতিতে বাঙ্গালার সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রসার লাভ করিতেছে। সুতরাং এই সময়ে ভাষা যাহাতে সংযত চরণে চলে, যাহাতে উচ্ছৃঙ্খল না হয়, সে পক্ষে বঙ্গের জাতীয় জীবনের উদ্বোধন-কর্ত্তাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আর সেই সঙ্গেই আমাদের সুন্দরী মাতৃভাষা কি উপায়ে সুন্দরীতমা হইবে, তাহাও ভাবিতে হইবে, কেবল গীতিকাব্য, মহাকাব্য বা গল্পগুচ্ছে জাতীয় সাহিত্য পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না। জাতীয় সাহিত্যের বিরাট্ সৌধের চত্বরে শিল্প, বিজ্ঞান, বার্ত্তাশাস্ত্র, সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি,—সর্ব্বপ্রকার রত্নের সমাবেশ আবশ্যক। সর্ব্ববিধ কলার বিলাসে জাতীয় সাহিত্য-মন্দির বিলসিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যথা তাহাকে অসঙ্কোচে "জাতীয় সাহিত্য" বলিতে পারা যায় না। বর্ত্তমান কালে, যখন বঙ্গভাষার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি অল্পবিস্তর ভাবে নিপতিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, তখন বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক ঐ ভাষার গতিকে বঙ্গবাসীর ভবিষ্যৎ অভ্যুদয়ের অনুকূল ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া লইতে হইবে। জাতীয়তা গঠন করিতে হইলে জাতীয় সাহিত্য গঠন সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। সেই জাতীয় সাহিত্য কিরূপ ভাবে গঠিত হইলে আমাদের মঙ্গল হইবে, কি প্রকারে, কোন্ দিকে জাতীয় সাহিত্যের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে ভবিষ্যতে আমাদের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে, সেই সম্বন্ধেই আমি দুই একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

আমাদের দেশে "শিক্ষিত" বলিতে আমরা কি বুঝি? সর্ব্বসাধারণে কোন্ সম্প্রদায়কে "শিক্ষিত" বলিয়া স্বীকার করে? বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশে শিক্ষার কেন্দ্র মাত্র বিশ্ব-বিদ্যালয়। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন, দেশবাসিগণ অসঙ্কোচে তাঁহাদিগকেই শিক্ষিত আখ্যা এবং শিক্ষিতের প্রাপ্য সম্মান প্রদান করেন। ভারতবর্ষের নানা বিপ্লবের মধ্যেও যাঁহারা পরম যত্নে বুকে বুকে রাখিয়া, আমাদের প্রাচীন শাস্ত্ররাজি রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, সেই সংস্কৃত-ব্যবসায়ী অধ্যাপক-বর্গের আসন দেশবাসী এখনও অনেক উচ্চে প্রদান করিয়া থাকেন; যদি অধ্যাপকবৃন্দ আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন, তবে উত্তরকালেও সে উচ্চাসনে তাঁহারা অধিকারী থাকিবেন সত্য, কিন্তু সংখ্যাগত হিসাব ধরিলে, বঙ্গের প্রতি পল্লীতেই প্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সদ্ভাব

পরিদৃষ্ট হয়। যেখানে হয় ত পূর্ব্বে পাশ্চাত্য শিক্ষার আদৌ প্রচার ছিল না, বর্ত্তমানে সে স্থানেও উক্ত শিক্ষার প্রতি লোকের আদর দেখা যাইতেছে। যেরূপ ভাবে গত কতিপয় বৎসরের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার ভূয়ঃপ্রচার ঘটিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, অদূরবর্ত্তী সময়ে বঙ্গে, ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তির অভাব আছে,এমন পল্লী থাকিবে না। সুতরাং বঙ্গের ভবিষ্যৎ জন-মত পরিচালনের এবং জনসাধারণের মত-গঠনের ভার উক্ত শিক্ষিতগণের হস্তেই ক্রমে ন্যস্ত হইবে। যাঁহারা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব জন্মভূমিতে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন, যদি অকপটভাবে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিবেশীদিগের, চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীসমূহের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারিবেন। তাঁহাদের পল্লী-বাসিগণ তাঁহাদিগের নিকটে অনেক আশা করেন। যে যে পল্লীতে তাঁহাদের বাস, সেই সেই পল্লীর এবং তৎ তৎ সমাজের সর্ব্ববিধ উৎকর্ষাপকর্ষের জন্য তাঁহারাই অনেকটা দায়ী। আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক এবং স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় উন্নতির জন্য দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় অনেকটা দায়ী; কেন না, লোকের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বাদ দিলে মানুষের আর কিছুই থাকে না, সেই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আকর্ষণ পূর্ব্বক যদি তাঁহারা বিবেচনা সহকারে লোকমত পরিচালন করিতে পারেন, তাঁহাদের প্রতিবেশীরা অম্লান-মনে তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে চলিবে। যে যে গুণ থাকিলে মানুষের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ভাজন হওয়া যায়, শিক্ষিতগণের শিক্ষাসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই গুণে সম্পন্ন হইতে হইবে। দয়া, সদ্‌বেদনা, পরদুঃখকাতরতা, সত্যপ্রিয়তা, বিনীত ভাব প্রভৃতি স্বর্গীয় সম্পদে হৃদয়কে সম্পন্ন করিতে পারিলেই প্রকৃত পক্ষে শিক্ষার ফল ফলিয়াছে বলা যাইতে পারে। অন্যথা কেবল পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতাকেই শিক্ষার চরমফল প্রাপ্তি বলিতে পারি না। স্বজাতিকে আত্মমতের অনুকূল করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে স্বজাতির শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আকর্ষণ আবশ্যক, এ কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কেবল সামাজিক, বা কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনে সমাজের প্রকৃত মঙ্গল সাধন হয় না। প্রাত্যহিক কার্য্যের যেমন একটা তালিকা অন্ততঃ মনে মনে থাকিলেও কার্য্যের শৃঙ্খলা হয়, সময়ের সদ্ব্যবহার হয়, তদ্রূপ জাতীয় সাহিত্য যদি সুগঠিত হয়, তবে সেই সাহিত্যের দ্বারা জাতীয়তা গঠনের পক্ষেও বিশেষ সহায়তা ঘটে। এই জাতীয় সাহিত্য গঠনের প্রকৃত ভার এখন ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের হস্তেই ন্যস্ত হইতেছে। অবকাশমত কোন ভাবুক ভাবের স্রোতে ভাসিয়া দু'একটি কবিতা রচনা করিলেন, বা চিন্তাপূর্ণ দু'একটা প্রবন্ধ পাঠ করিলেন, তাহাতে জাতীয় সাহিত্যের প্রকৃত গঠন হইবে না। তপস্যার ন্যায় একাগ্রতা-পূর্ণ চেষ্টায় ঐ সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষায়ও বঙ্গভাষায় অধ্যাপনা হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যাঁহারা শিক্ষালাভ করিতেছেন, তাঁহারা উভয়বিধ শিক্ষায় শিক্ষিত হইতেছেন। বঙ্গভাষায়ও তাঁহারা পাণ্ডিত্য সম্পন্ন হইতেছেন। এই ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের হস্তে বঙ্গভাষার ভবিষ্যৎ উন্নতির ভার নিহিত। সুতরাং তাঁহাদের এ সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে দু'একটি কথা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

এই ইংরাজী শিক্ষিতগণ যদি একটু আদরের সহিত মাতৃভাষার আলোচনা করেন, মাতৃভাষারই হিতকল্পে মাতৃ-ভাষার আলোচনা করেন, তবে তাহাতে সুফলের আশা অনেক। দেশের যাহারা উচ্চশিক্ষাবর্জ্জিত, সেই জন-সাধারণকে তাঁহারা অতি অল্প আয়াসেই মাতৃভাষার প্রতি অধিকতর আগ্রহসম্পন্ন করিতে পারিবেন। কেন না,—তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মত গঠনের ও সাধারণ সদনুষ্ঠানের প্রধান উপকরণ বা এক হিসাবে কর্ত্তা হইবেন। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করা এবং সেই সঙ্গে ঐ মাতৃভাষাকে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বরেণ্য করিয়া তোলা ইংরাজী শিক্ষিতগণের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। কেন না, তাঁহারা প্রতীচ্য ভাষায় পারদর্শী হইয়া সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন, লোক-সমাজের স্পৃহনীয় আসনে উপবেশন করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতেছেন,—তাঁহাদের কথায়, তাঁহাদের আচারব্যবহারের, তাঁহাদের আদৃত রীতিনীতির উপর জনসাধারণের মঙ্গলামঙ্গল নিহিত। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে অতি সহজেই সাধারণকে স্বমতের বশবর্ত্তী করিতে পারিবেন। সুতরাং তাঁহাদের কর্ত্তব্য বড়ই গুরুতর। তাঁহাদের সামান্য স্খলনে, সামান্য উপেক্ষায় একটি মহতী জাতির—উদীয়মান জাতিরও স্খলন বা অধঃপতন হইতে পারে।

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ"

এই মহাবাক্য স্মরণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পাদক্ষেপ করিতে হইবে। তরণীর কর্ণধারের অনেক সতর্কতা আবশ্যক। অন্যথা নিমজ্জনের আশঙ্কা বলবতী।

যাহারা অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষাপ্রাপ্ত, তাহারা যে ইংরাজী শিক্ষা করিয়া পরে আবার বঙ্গভাষা শিক্ষা করিবে, এরূপ আশা কদাচ করা যায় না। তাহাদিগকে, সেই mass অর্থাৎ সাধারণ জনসঙ্ঘকে সৎপথে পরিচালিত করিতে যেমন দেশের শিক্ষিতগণই একমাত্র সমর্থ, সেইরূপ তাহাদিগকে অসৎপথে—উৎসন্নের পথে অধঃপতিত করিবার ক্ষমতাও তাঁহাদেরই হস্তে। সরলবিশ্বাস-সম্পন্ন জনসঙ্ঘের চিত্ত, শিক্ষিতগণ শিক্ষার চাকচিক্যে বশীভূত করিয়া যেদিকে ইচ্ছা প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন। সুতরাং শিক্ষিতগণের হস্তে দেশের প্রকৃত সম্পদ্ এবং বিপদ্ এই দুইএরই হেতু নিহিত রহিয়াছে। এক হিসাবে ইহাও এক মহা আতঙ্কের কথা, চিন্তার কথা! যাঁহাদের উপর দেশের সম্পদ্, বিপদ্, উভয়ই নির্ভর করিতেছে,—তাঁহাদের কর্ত্তব্য যে কত গুরুতর, তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

দেশের জন-সঙ্ঘকে যদি সৎপথেই লইয়া যাইতে হয়,—মানুষ করিয়া তুলিতে হয়—বাঙ্গালী জাতিকে একটা মহাজাতিতে পরিণত করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের মনের সম্পদ্ যাহাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা করিতে হইবে। পাশ্চাত্য ভাষায় অনিপুণ থাকিয়াও যাহাতে বঙ্গের ইতর-সাধারণ, পাশ্চাত্য প্রদেশের যাহা উত্তম, যাহা উদার এবং নির্ম্মল, তাহা শিখিতে পারে, এবং শিখিয়াও আত্মজীবনের ও আত্মসমাজের কল্যাণ সাধন করিতে পারে,—তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্যে যাহা নির্দ্দোষ—আমাদের পক্ষে যাহা পরম উপকারক, যে সমুদয় গুণগ্রাম অর্জ্জন করিতে পারিলে, আমাদের সুন্দর সমাজদেহ ও দেশাত্মবোধ আরও সুন্দরতর, সুন্দরতম হইবে; সেই সকল বিষয় আমাদের মাতৃভাষার সাহায্যে বঙ্গের সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত করিতে হইবে। ক্রমেই যে ভয়ঙ্কর কাল আসিতেছে, সেই কালের সহিত প্রতিযোগিতায় দেশবাসীদিগকে জয়ী করিতে হইলে, কেবল এ দেশীয় নহে, পাশ্চাত্য আয়ুধেও সম্পন্ন হইতে হইবে। দু'একটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

প্রথমতঃ, ইউরোপের ইতিহাস। ইতিহাস অল্পবিস্তর প্রায় সকল জাতিরই কিছু না কিছু আছে। বর্ত্তমান কালে ইউরোপ জগতের অভ্যুদিত দেশ-সমূহের শীর্ষস্থানীয়। সুতরাং ইউরোপের ইতিহাস আলোচনা-পূর্ব্বক দেখিতে হইবে, যে, কেমন করিয়া কোন্ শক্তির বলে, বা কোন্ গূঢ় কারণে ইউরোপের কোন্ জাতির অভ্যুদয় ঘটিয়াছে, কোন্ পথে পরিচালিত হওয়ায় কোন্ জাতির কি উন্নতি হইয়াছে, সেই উন্নতির কারণ এবং পথ, আমাদের এ দেশীয়গণের পক্ষে প্রযোজ্য কি না, তাহার প্রয়োগে আমাদের এ দেশে কতটা মঙ্গলের সম্ভাবনা,—বিষয় বিশেষ বিবেচনার সহিত আলোচনা করিয়া, যদি সঙ্গত মনে হয়, এ দেশের পক্ষে হানিজনক না হয়, তবে সেই পথে আমাদের জাতিকে ধীরে ধীরে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। সেই প্রবর্ত্তনের একমাত্র সহজ পথ—ঐ সকল কারণ, ঐ সকল উপায়, প্রণালী, অতি বিশদরূপে আমাদের মাতৃভাষার দ্বারা সাধারণের মধ্যে প্রচার করা; এই প্রচারের একমাত্র কর্ত্তা, যাঁহারা ইংরাজী ভাষায় দক্ষতা লাভ করিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষায়ও যাঁহাদের বিশেষ অধিকার জন্মিয়াছে, মাত্র তাঁহারাই, অন্যে নহে।

দেশের কল্যাণ কামনায় এবং স্বীয় মাতৃভাষার পরিপুষ্টি বাসনায় যাঁহারা এই মহাব্রতে দীক্ষিত হইবেন, তাঁহাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য ইউরোপীয় ইতিহাসের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা। মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, প্রচার-কর্ত্তাদের সামান্য ত্রুটিতে আমাদের অভ্যুদয়োন্মুখ জাতির মহা অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। সুতরাং দেশের শিক্ষিতগণের প্রতি-পদবিক্ষেপেই বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন।

যেমন এই অভ্যুদয়ের কথা বলিলাম, তেমনই এই সঙ্গে দেখিতে হইবে, কোন্ পথে যাওয়ায়, কোন্ দুর্নীতির আশ্রয় বশতঃ, ইউরোপীয় জাতির অধঃপাত ঘটিয়াছে, বা ঘটিতেছে, সর্ব্বনাশ হইয়াছে। কোন্ জাতি উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরূঢ় হইয়াও কোন্ কর্ম্মের দোষে অধঃপাতের অতলতলে নিপতিত হইয়াছে,—পতনের সেই সেই কারণ-নিচয় অতি সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়া, সেই সেই সর্ব্বনাশের হেতুগুলি

পরিহার করিতে হইবে। আমাদের মাতৃভাষার স্বচ্ছ দর্পণে এই ভাবে দোষগুণের প্রতিবিম্বন পূর্ব্বক দোষের পরিহার ও গুণের গ্রহণের প্রতি দেশবাসীর আগ্রহ এবং ঔৎসুক্য জন্মাইতে হইবে।

ইহকালই জীবনের সর্ব্বস্ব নহে। এই ইহকালকেই একমাত্র সার ভাবিয়া কার্য্য করার ফলে ঐহিকবাদী ইউরোপীয়দিগের মধ্যে ধর্ম্মভাব আদৌ নাই বলিলেই হয়, ধর্ম্মভাবের অত্যন্ত অভাবের ফলেই বর্ত্তমান শোণিত তরঙ্গিণী রণভূমিতে ইউরোপ বিপর্য্যস্ত। ইউরোপের ঐ অসদ্ভাবের অর্থাৎ ঐহিকবাদিতার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, বরং যতটা সম্ভব, উহার দূরে সরিয়া যাইয়া আমাদিগের জাতীয়তা ও চির-স্পৃহণীয় ধর্ম্মভাবকে জাগ্রত রাখিতে হইবে। আমাদের জাতীয় সাহিত্যের ভিত্তি ধর্ম্মভাবের উপর স্থাপিত করিয়া, উহাতে পশ্চিমের গ্রহণযোগ্য বিষয়ের সমাবেশ পূর্ব্বক সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি করিতে হইবে। যাহা আছে, মাত্র তাহা লইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। এ দুর্দ্দিনে জাতীয়-সম্পদের যাহাতে বৃদ্ধি হয়, সর্ব্বতঃপ্রকারে তাহা করিতে হইবে।

তারপর ইউরোপের সাধারণ সাহিত্য অর্থাৎ কাব্য—নাটকাদি। আমার বোধ হয়, পাশ্চাত্য সাহিত্যের এই অংশে বিশেষ মনোনিবেশের প্রয়োজন। দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি, গণিত প্রভৃতি জটিল বিষয়সমূহের আলোচনা অপেক্ষা এই সমুদয় আপাতরম্য কাব্যনাটকাদির আলোচনায় ইংরাজী শিক্ষিতগণের অনেকেই কালক্ষেপ করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ তারুণ্যের অরুণ আভায় এই সকল বিদেশীয় চিত্র প্রথমতঃ বড়ই সুন্দর বলিয়া প্রতীত হয়। হওয়াও অস্বাভাবিক নহে। আমাদের বিশেষ প্রণিধান সহকারে দেখা দরকার যে পাশ্চাত্য সমাজের চিত্র তদীয় জাতীয় কাব্যনাটকাদিতে কি ভাবে প্রতিফলিত। ইউরোপের সামাজিক চিত্রাবলীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, হাবভাব, বিন্যাস কৌশল প্রভৃতি আমাদের সাহিত্যে এবং সমাজে গ্রহণযোগ্য কিনা—ঐ ঐ চিত্রাবলীর আদর্শে যদি আমরা স্বকীয় সমাজচিত্রের ছায়াপাত করি, তবে তাহাতে আমাদের জাতীয়তা অক্ষুণ্ণ থাকিবে কিনা অথবা ঐ বিদেশীয় চিত্র আমাদের সাহিত্যে এবং সমাজে সম্পূর্ণরূপে পরিহার্য্য কি না,—এই চিন্তা হৃদয়ে বদ্ধমূল রাখিয়া ইউরোপীয় কাব্যনাটকাদি পাঠ করিয়া, উহার যে সকল অংশ উৎকৃষ্ট, অনুকরণীয় এবং কল্যাণ-জনক, তাহা আমাদের মাতৃভাষার সাহায্যে সাধারণের গোচর করিতে হইবে, সাধারণের মানস-সম্পদের উৎকর্ষ বিধান করিতে হইবে। এইরূপ করিতে পারিলে, আমাদের মাতৃভাষারও লাবণ্য বর্দ্ধিত হইবে। যাহা সৎ, যাহা সাধু নির্ম্মল ও নির্দ্দোষ, তাহা যে জাতির বা যে সমাজেরই হউক না কেন, সাগ্রহে গ্রহণ করিতে হইবে।

"গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ"

এইভাবে জাতীয় সাহিত্য যদি গঠিত হয়, তবে সেই সাহিত্যের সাহায্যেই আমাদের নবজাতা জাতীয়তা সুগঠিত হইবে, এবং জগতের অন্যান্য সভ্য জাতির সহিত আমরা সমকক্ষতা করিতে পারিব। অন্যথা সে সম্ভাবনা অতি অল্প। ইতিহাস এবং কাব্য-নাটক-উপন্যাসাদি সম্বন্ধে যে কথা বলিলাম, ইউরোপীয় দর্শন এবং অপরাপর কলা (art) প্রভৃতি সম্বন্ধেও ঐ কথাই প্রযোজ্য। যাহা কিছু বিদেশীয়, তাহাই উত্তম, সুতরাং আমাদের গ্রাহ্য, বা যাহা কিছু বিদেশীয়, তাহাই অস্পৃশ্য, সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাজ্য,—এরূপ কথা বলিতে আমি সাহস করি না। বিদেশীয় বা স্বদেশীয় বুঝি না, যাহা উত্তম, তাহা যে দেশীয়ই হউক না কেন, সর্ব্বথা গ্রাহ্য; আর যাহা সর্ব্বথা দোষমুক্ত নহে, তাহা আত্ম-পর-জ্ঞান বর্জ্জনপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই সোজা পথ ছাড়া ইহার অন্য কোন সমাধান জাতীয় সাহিত্যের বা সমাজের অনুকূল হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। এমন অনেক প্রথা থাকিতে পারে, অথবা আছেও, যাহা ইউরোপীয় সমাজের কতকটা অনুকূল হইলেও, আমাদের সমাজের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। সেরূপ প্রথার প্রচলনে প্রয়াস করা যে কেবল পণ্ডশ্রম, তাহাই নহে; তাহাতে আমাদের স্মরণাতীত কাল হইতে সুসংবদ্ধ সমাজেরও বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা। যেমন ইউরোপীয় বিবাহপদ্ধতি। পাশ্চাত্য দৃষ্টিতে উহা যতই সুন্দর ও আপাতরম্য মনে হউক না কেন,—এ দেশের অস্থিমজ্জার সহিত যে সংস্কার অবিভাজ্যরূপে বিজড়িত, ঐ বিবাহপদ্ধতি সেই সংস্কারের এবং সেই সংস্কার পরিচালিত ও পরিবর্দ্ধিত সমাজের পক্ষে কদাচ হিতকরী হইতে পারে না। সুতরাং তাদৃশী পদ্ধতির ঐন্দ্রজালিক চিত্রে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গ উজ্জ্বল করিতে চেষ্টা করা অনুচিত। যাহা

তোমার সমাজের বা জাতীয়তার পরিপন্থি, তাহাকে আড়ম্বর-পূর্ণ সাজ-সজ্জায় সাজাইয়া সৌন্দর্য্যের প্রলোভনে তোমার স্বজাতির আপামর সাধারণকে মজাইও না। মনে রাখিও, তুমি যে পথ আজ নির্দ্দিষ্ট করিয়া যাইতেছ, উত্তর-কালে তোমারই দেশের শতসহস্র যাত্রী সেই পথে গমনা-গমন করিবে। সুতরাং আপাত প্রশংসায় ও যশের প্রতি উদাসীন থাকিয়া, যাহা তোমার স্বজাতির এবং স্বসমাজের হিতকর, তাদৃশ চিত্র অঙ্কিত কর, তাদৃশ আদর্শ তোমার সাহিত্যের মন্দিরে স্থাপিত কর, যাহার অনুকরণে তোমার ভবিষ্যৎ জাতি সমুন্নত হইবে। তোমার যে বিবাহপদ্ধতি আছে, পৃথিবীর অন্য কোন জাতির পদ্ধতি অপেক্ষা উহা নিকৃষ্ট নহে, প্রত্যুত অনেকাংশে উৎকৃষ্ট; সুতরাং ঐ উৎকৃষ্ট পদ্ধতির যে যে অংশ অশিক্ষিত, সংস্কৃতানভিজ্ঞ সাধারণ জনসমাজে এখনও সম্পূর্ণরূপে অনুবোধিত হয় নাই, তাহা তোমার বঙ্গ-সাহিত্যের সাহায্যে ইতর-ভদ্র-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধারণে প্রচারিত কর। এবং পার ত, তোমার সেই উৎকৃষ্ট চিত্রের সম্মুখে বিদেশীয় চিত্রের আবরণ উন্মোচন করিয়া তুলিয়া ধর, তুলনায় তোমার স্বজাতিকে বুঝাইয়া দাও যে, কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা তোমার পক্ষে গ্রাহ্য ও তোমার সমাজের অনুকূল। মোহের ঘোরে যাহার মস্তিষ্ক বিকৃত, তাহার যাহাতে মস্তক শীতল হয়, সেইরূপ ভৈষজ্যের বিধান কর। যাহাতে রোগ বৃদ্ধি হয়, তোমার জাতীয় চিকিৎসা গ্রন্থে তাদৃশ ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া সমাজকে উৎসন্ন করিও না। তোমার প্রাচীন শাস্ত্রভাণ্ডারে যে সকল অমূল্য রত্নরাজি স্তূপীকৃত রহিয়াছে, এখনও যাহাদের আবরণ সম্পূর্ণরূপে উন্মোচিত হয় নাই, মাত্র কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি ব্যতীত সাধারণে এখনও যে সমুদয় রত্নের অতুল কান্তি নিরীক্ষণ করে নাই, তোমার জাতীয় সাহিত্যের সাহায্যে সেই সেই রত্নের মালা গাঁথিয়া তোমার স্বজাতির কণ্ঠে পরাইয়া দাও, তাহাদিগকে বুঝিতে দাও, শিখিতে দাও, দেখিতে দাও, এবং দেখিয়া, তুলনা করিয়া ভাল মন্দ বাছিয়া লইতে দাও, দেখিবে, তাহারা এদেশের অপরাজিতা বা শেফালিকা ফেলিয়া অন্য দেশের ভারলেট্ মাথায় করিবে না। নিজেদের কি আছে, কি ছিল, ইহা যাহারা না জানে, তাহারাই পরের দ্বারে উপস্থিত হয়। তোমার স্বদেশবাসীদিগকে তোমার প্রাচীন সম্পদের পরিচয় দাও, বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দাও, তাহাদের মনে আত্ম-সম্মান উদ্বুদ্ধ করিয়া তোল। তবেই ত তোমার জাতীয়তা গঠিত হইবে। সর্ব্বাগ্রে জাতীয় সাহিত্য গঠন কর, তবে ত জাতির গঠন হইবে। নতুবা সমস্তই আকাশ-কুসুম।

মনে কর, বিলাতের বাবস্থাপক-সভা (বা পার্লিয়া-মেণ্ট)। তোমার দেশের পক্ষে বর্ত্তমান সময়ে ঐরূপ সভার উপযোগিতা কত দূর, তাহা বিশেষ বিবেচ্য। কিন্তু বিলাতের লোকতন্ত্র যেরূপভাবে গঠিত, তাহার পক্ষে ঐ সভার উপযোগিতা প্রচুর। সে দেশের পক্ষে যাহা আবশ্যক, তাহাই যে এ দেশেরও আবশ্যক, উহা বলা বড়ই দুষ্কর। দেশভেদে, দেশবাসিভেদে, দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থাভেদে, এবং দেশের শিক্ষা-দীক্ষার ভেদে, দেশের পরিচালন সভাসমিতিরও ভেদ আবশ্যম্ভাবী। সুতরাং তোমার দেশের পক্ষে তোমার প্রাচীন পদ্ধতিই অনুকূল, না বিদেশীয় পদ্ধতি অনুকূল, তাহা বিশেষ বিচার করিয়া, তোমার জাতীয় সাহিত্যের দর্পণে ঐ উভয় ছবিরই দোষগুণের আলোচনা কর, এবং দেশবাসী-দিগকেও বুঝিয়া লইতে দাও যে, কোন্‌টা তাহাদের গ্রাহ্য। মুক্ত পুরুষের ন্যায়, আর্ষ প্রকৃতির ন্যায়, নিরপেক্ষ হইয়া লোকের হিতকামনায় সাহিত্য গঠন কর, দেশের ও জাতির মঙ্গল হইবে। ইউরোপের রাজনৈতিক ক্ষেত্রের আদর্শে যদি তোমার স্বদেশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে চাও, মনে রাখিও, বর্ত্তমান সময়ে তোমার বিফলাশ হওয়াই সম্ভব। হৈমন্তিক শস্যের জন্য যে ক্ষেত্র প্রস্তুত, তাহাতে আশু ধান্যের বীজ বপনে, মাত্র কৃষকের মনস্তাপের বৃদ্ধি হয়, আর সেই সঙ্গে বীজ ধ্বংস ও ক্ষেত্রের উর্ব্বরতাও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। যে দেশের শাস্ত্রে, শিক্ষাদীক্ষায় ও রাজনীতিতে রাজা মানব নহে, দেবতা বলিয়া কীর্ত্তিত, সেই ভারতবর্ষে, পাশ্চাত্য রাজনীতির ছায়াপাতে সেই দেবতাকে আবার মানবের আসনে অধঃপাতিত করিও না। তোমার প্রাচীন রাজনীতির উজ্জ্বল চিত্র উত্তমরূপে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক, প্রতিভার সাহায্যে তাহা তোমার মাতৃভাষায় আলোচনা করিয়া পাশ্চাত্য রাজনীতির সহিত তুলনায় সর্ব্বসাধারণকে বুঝিতে দাও যে, তোমার পূর্ব্বপুরুষগণের রাজনৈতিক ধারণা

কত উচ্চ ছিল। গুপ্তহত্যা, রাজবিদ্বেষ এবং রাজদ্রোহ কেবল ঐহিক নহে, পারত্রিক অকল্যাণেরও আকর, এ কথা তোমার ধর্মশাস্ত্র উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছে। যদি এই সকল কঠিন সমস্যা মাতৃভাষার সাহায্যে সমাধান করিতে পার, তবেই প্রকৃতপক্ষে তোমার মাতৃভাষার সেবা সার্থক হইবে, তোমার জ্ঞানার্জ্জন সার্থক হইবে, আর সেই সঙ্গে বঙ্গভাষার সেবা করিয়া তোমার জন্মও সার্থক হইবে। অবশ্য এই কঠিন কার্য্য এক সময়ে, বা একের দ্বারা কদাচ অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। কিন্তু এই পথে যদি একবার তোমার জাতীয় সাহিত্যের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে পার, তবে দেখিবে, আরও কত পথিক তোমার প্রদর্শিত পথে যাত্রা করিবে। পথ যদি উত্তম, সুগম এবং সুশীতল ছায়াসম্পন্ন হয়, তবে তাহাতে কোন দিনই যাত্রীর অভাব হয় না। যাহা ভাল, নিষ্পাপ এবং নির্দ্দোষ, তাহার সেবা কে না করিতে চায়? সেই সেবায় সেবিতের লাভালাভ কিছুই নাই, কিন্তু সেবকের আত্ম-তৃপ্তি অপরিসীম। এই গুরুতর কার্য্যের প্রথম অনুষ্ঠাতৃগণের মনে রাখিতে হইবে যে, কেবল অন্ধভাবে পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুবাদে বা মাত্র তাহার উজ্জ্বল অংশের প্রদর্শনেই, আমাদের ঐ মহৎ উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইবে না; প্রত্যুত, তাহাতে ক্ষতির সম্ভাবনাই অধিক। পাশ্চাত্য সাহিত্যের নিরপেক্ষ ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমালোচনাপূর্ব্বক, তাহার অসদংশের বর্জ্জন করিয়া সদংশ, যাহা এদেশের অনুকূল, ঐ অংশ, যদি তাহাতে কোনরূপ দোষ-লেশ না থাকে, তবে তাহাই আমাদের মাতৃভাষার কমনীয় আভরণে অলঙ্কৃত করিয়া, জাতীয় সাহিত্যের অন্তর্নিবিষ্ট করিতে হইবে। এইভাবে ইউরোপীয় সাহিত্যের গ্রাহ্য অংশগুলি যদি আমরা গ্রহণ করিতে পারি, তবেই ক্রমে আমাদের বঙ্গভাষা আশাতীত ভাবে পরিপুষ্টি লাভ করিবে। ইউরোপীয় ভাষায় অনভিজ্ঞ বা অনভিজ্ঞ থাকিয়াও এদেশবাসীরা ইউরোপের শিক্ষার উত্তম ফলে বঞ্চিত থাকিবে না, প্রত্যুত, ক্রমেই তৎ তৎ ফলে সম্পন্ন হইবে। প্রাচীন জাপান এই উপায়-বলেই অধুনাতন নবীন জাপানে উন্নীত হইতে পারিয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত কার্য্যের মধ্যেই একটা বিষয়ে সর্ব্বদা আমাদিগকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অশ্বের উপরে নর্ত্তনাদি করিয়া যাহারা দর্শকদিগের প্রীতি ও কৌতুক উৎপাদন করে, তাহারা যেমন প্রধানতঃ সর্ব্বদাই স্মরণ রাখে যে "অশ্বপৃষ্ঠ হইতে স্খলিত না হই" তদ্রূপ আমাদিগকেও সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমরা এই কার্য্য করিতে যাইয়া স্খলিত না হই।' অর্থাৎ আমাদের যাহা মজ্জাগত সংস্কার সেই পবিত্র ধর্ম্মভাব হইতে যেন বিচ্যুত না হই। আমাদের রাজনীতি প্রভৃতির কোনটিই ধর্ম্মভাবশূন্য নহে। ভারতবর্ষের মৃত্তিকার এমনই একটা গুণ আছে যে, এখানে ধর্ম্ম ভাববর্জ্জিত কোন বস্তুই স্থায়ী হইতে পারে না, এপর্য্যন্ত পারে নাই। যাহাদের আহারে বিহারে, আচারে ব্যবহারে, সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের প্রভাব বিদ্যমান, তাহাদের জাতীয় সাহিত্যের কোনও চিত্র যদি ধর্ম্মভাব বাহক না হয়, তবে তাহা কদাচ বাণীর পাদপদ্মে অর্পণ করা যাইবে না; সে চিত্র গোধূলি গগনের লোহিত মেঘখণ্ডের মত অতি অল্পকালের মধ্যেই বিলুপ্ত হইবে। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, লোপামুদ্রা, অরুন্ধতী প্রভৃতি যাহাদের জাতীয় সাহিত্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; রাম, যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, দধীচি, কর্ণ যাহাদের সাহিত্যের আদর্শ পুরুষ, কবিগুরু রত্নাকর, মহর্ষি দ্বৈপায়ন, কবিকুলগুরু কালিদাস, ভবভূতি যাহাদের জাতীয়-সাহিত্য-সঙ্গীতের গায়ক, আর সর্ব্বোপরি, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা যাহাদের শ্রোতসঙ্গীত-রূপ অমৃতের নির্ঝর, তাহাদের নবীন জাতীয় বঙ্গসাহিত্যে কোনরূপ অপবিত্র ভাব বা আচার যেন প্রবেশ না করে, তৎপক্ষে সর্ব্বদাই প্রখর দৃষ্টির প্রয়োজন। সকল জাতিরই এক একটা লক্ষ্য থাকা আবশ্যক; আছেও। লক্ষ্যহীন জাতি কদাচ অভ্যুদয়-শালী ও কালজয়ী হইতে পারে না। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যে যে জাতি অভ্যুদিত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই একটা না একটা স্থির লক্ষ্য ছিল। এবং সেই লক্ষ্য ধরিয়াই, তাহারা ক্রমে তাহাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করিতে পারিয়াছে। লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারিলে, কিছুই অসম্ভব নহে। অতি দুষ্কর এবং দুঃসাধ্য কার্য্যও সুসম্পন্ন করা যাইতে পারে। এই যে ইউরোপ এত অতুল ঐহিক শ্রীবৃদ্ধিতে সম্পন্ন, ইহার কারণ কি? অর্থ বা অর্থকর বাণিজ্য উহাদের একমাত্র লক্ষ্য। ঐ লক্ষ্যের প্রতি স্থিরদৃষ্টি আছে বলিয়াই, অন্য কোন বাধাবিপত্তিতে উহাদিগকে ব্যাহত করিতে পারে না; লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইবার জন্য, প্রাণকেও উহারা অতি তুচ্ছ জ্ঞান করে।

লক্ষ্য স্থির ছিল বলিয়াই, ধর্ম্মপ্রাণ অগ্নি উপাসকগণ অম্লান-বদনে, ইরাণ ছাড়িয়া ভারতবর্ষে চলিয়া আসিয়াছিলেন,—আমেরিকার পিউরিটানেরা মাতৃভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক গহনবনে আশ্রয় লইয়াছিলেন। যে যে জাতি যে যে বৃহৎ কার্য্যই করুক না কেন, তাহার মূলে কিন্তু একটা স্থির লক্ষ্য থাকা চাই! তাই বলিতেছিলাম, আমাদের এই জাতীয় সাহিত্যের মন্দির-নির্ম্মাণেও একটা স্থির লক্ষ্য আবশ্যক। অন্যথা আমরা সফলকাম হইতে পারিব না। আমাদের সেই লক্ষ্য কি হওয়া উচিত? কোন্ লক্ষ্যে স্থিরচিত্ত থাকিয়া, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি হইতে পারিয়াছিলেন? কোন্ লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হওয়া নিবন্ধনই আমরা ক্রমে অধঃপতিত হইতেছি? ইহাই আমাদের সর্ব্বাগ্রে দ্রষ্টব্য ও বিবেচ্য।

ভারতবর্ষ যে এত উন্নত হইয়াছিল, সে একমাত্র ধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া। যদি ভারতকে আবার বড় করিতে চাও, যদি আবার তোমাদের লুপ্ত সম্পদের বিনষ্ট সম্মানের পুনরধিকার চাও, তবে সেই পিতৃপিতামহের লক্ষ্যে দৃষ্টি স্থির কর। একাগ্রচিত্ত হও, অবাধে তোমার অভিপ্রেত মৎস্যচক্র ভেদ করিতে পারিবে। ধর্ম্মভাব হিন্দুজাতির প্রধান লক্ষ্য ছিল; ধর্ম্মভাবকেই তোমার বর্ত্তমান জাতীয়তারও প্রধান লক্ষ্য কর। তোমার সাহিত্য, তোমার রাজনীতি, সমাজনীতি, আচারব্যবহার সর্ব্বত্রই সেই ভারতস্পৃহনীয় ধর্ম্মভাবের স্ফুরণ কর। দয়া, সমবেদনা, পরার্থপরতা, সত্য, তিতীক্ষা প্রেম প্রভৃতি স্বর্গীয় সম্পদে তোমার সাহিত্য কানন যদি সম্পন্ন করিতে পার, তবেই তোমার জাতীয় অভ্যুদয় হইবে। অন্যথা যাত্রার দলের প্রহ্লাদের ন্যায় তুমি ভক্তের ভাণ করিবে মাত্র, প্রকৃত পক্ষে তোমার কোনই শ্রীবৃদ্ধি হইবে না। অন্তরের সমস্ত আবেগ, উৎসাহ ও নির্ভর একত্র করিয়া যদি জাতীয় সাহিত্য গঠন করিতে পার, দেশের ও জাতির মঙ্গল হইবে।

এইভাবে অন্তের সুচারু ও সদ্ভাবপূর্ণ পদার্থ লইয়া নিজের জাতীয় সাহিত্যের নির্ম্মাণ ও জাতীয় আদর্শের গঠন ইতঃপূর্ব্বেও হইয়াছে। বরঞ্চ ইতঃপূর্ব্বে অতি প্রবলরূপেই এইকার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল বলিয়া সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাচীন রোমের নিজের জাতীয় সম্পদ্ আমাদের প্রাচীন সম্পদের ন্যায় এত অধিক পরিমাণে ছিল না; আমাদের সহিত তুলনা করিলে রোমের প্রাচীন সম্পদ্ ধর্ত্তব্যের মধ্যেই পড়ে না। রোমে যখন জাতীয় জীবনের প্রথম উন্মেষ হইল, তখনকার দিনে প্রধান জাতির অভ্যুদয় দর্শনে রোমবাসীদের হৃদয়েও যখন জাতীয়তা গঠনের স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠিল, জগতে বরণীয় হইবার আকাঙ্ক্ষায় রোমবাসিগণের অন্তঃকরণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, তখন তাহারা মাত্র নিজের পরিধিত প্রাচীন সম্পদেই আর পরিপুষ্ট থাকিতে পারিল না। পিপাসার্ত্ত হইয়াই যেন চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল তখন গ্রীসের চরম উন্নতির সময়। সর্ব্বপ্রকারে এবং সর্ব্বাংশে গ্রীস তখন জগতের একটা আদর্শ জাতি। বীরত্বে, ধীরত্বে, জ্ঞানে, সম্মানে গ্রীস তখন সকলের শ্রেষ্ঠ। গ্রীসের সেই চরম অভ্যুদয়ের সময়ে রোমের লোলুপদৃষ্টি গ্রীসের প্রতি পতিত হইল। গ্রীসের শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, গ্রীসের কলাবিদ্যা, গ্রীসের শিক্ষাদীক্ষা প্রভৃতি সমস্তই রোম ক্রমে স্বীয় জাতীয় সাহিত্যের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া লইতে লাগিল। গ্রীসের যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু সুন্দর, সে সমস্তই রোম নিজের জাতীয়তা গঠনের প্রধান উপাদানরূপে গ্রহণ করিল। দেখিতে দেখিতে রোম গ্রীসের সমকক্ষ, এমন কি অনেকাংশে গ্রীস অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট হইয়া উঠিল। গ্রীসের অনুকরণ করিতে যাইয়া কিন্তু রোম স্বীয় জাতীয়তার বিসর্জ্জন করে নাই। গ্রীসের যাহা কিছু উত্তম পরিচ্ছদ, যাহা কিছু সুন্দর অলঙ্কার, তাহা রোমের জাতীয় ছাঁটে ছাঁটিয়া, জাতীয় ছাঁচে ঢালাই করিয়া রোম পরিধান করিল এবং নবীন সাজে সাজিয়া রোম যখন মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইল, তখন রোমের সেই নানারত্নখচিত কিরীটের প্রভায়, প্রাচীন গ্রীস যেন কতকটা হীনপ্রভ হইয়া পড়িল। প্রাচীন গ্রীসের অঙ্গে বহু শতাব্দী ধরিয়া যে সমুদয় জরাজনিত পলিত ভাব জন্মিয়াছিল, যাহা কিছু সুন্দর ছিল, তাহার পরিবর্জ্জন করিয়া রোম গ্রীসকে যেন একেবারে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিল। রোমের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রীসের মস্তক হেঁট হইল।

কিন্তু এই গ্রীস-রোমের বৃত্তান্ত সম্পূর্ণরূপে ভারতবর্ষে প্রযুক্ত হইতে পারে না। রোমীয়দিগের নিজের প্রাচীন দ্রব্যসম্ভার তত অধিক ছিল না, তাহাদের গৃহ একপ্রকার

শূন্য ছিল, হয়ত গৃহের কোন এক কোণে দু' একটি প্রাচীন পদার্থের কঙ্কাল মাত্র পড়িয়াছিল, তাই রোমীয়গণ দু'হাতে গ্রীসের যতটা পারিয়াছে দ্রব্যজাত সংগ্রহ করিয়া নিজের শূন্যপ্রায় গৃহ পরিপূর্ণ করিয়াছে। তত সতর্কতার সহিত সংগ্রহ করিতে হয় নাই।

আমাদের কথা ইহা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক। আমাদের প্রাচীন সম্পদ্ প্রচুর। তাহার ভাণ্ডার অক্ষয়। সুতরাং আমাদের বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। আমাদের যাহা আছে, তাহার কোন একটিরও মর্য্যাদার হানি হইতে পারে এরূপ কোন পরস্ব আমরা কদাচ গ্রহণ করিব না। অথচ, আমাদের যাহা নাই, অন্যের প্রচুর আছে, সেইরূপ পদার্থ যদি আমাদের জাতীয়তার পরিপন্থি না হয়, তবে গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিব না। রোমের ন্যায় আমাদের গৃহ শূন্য নহে যে, যে ভাবে পারি, গৃহ পূর্ণ করিব; আমাদের ঘর পরিপূর্ণ, সেই পরিপূর্ণ গৃহের শোভা বৃদ্ধির পক্ষে যাহা অনুকূল, সেই পরিপূর্ণ গৃহের অনুরূপ যে সাজ সরঞ্জাম, তাহা যদি অন্য কোন জাতির নিকট পাই, তবে অম্লান হৃদয়ে গ্রহণ করিব। যাহা আমার জাতীয়তার অনুকূল নহে, তাহা কদাচ স্পর্শ করিব না। আমার নিজের জাতীয়তায় কোনরূপ কলঙ্ক স্পর্শ হইতে পারে, এরূপ আবর্জ্জনা কদাচ আমার জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গে ছড়াইতে দিব না। এই ভাবে যদি আমরা চলিতে পারি, বিবেচনার সহিত পাদক্ষেপ করিতে পারি, কিংশুক পরিহার পূর্ব্বক কমল চয়ন করিতে পারি, তবেই আমাদের জাতীয়তা অক্ষুণ্ণ থাকিবে, এবং সেই সঙ্গে আমাদের জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় সম্পদ এই দুইই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করিবে।

আমাদের যাহা নিজস্ব, যাহা লইয়া আমরা গৌরব করি, আমাদের সেই জাতীয় গৌরবের বস্তু, প্রাচীন শিক্ষা দীক্ষা, শিল্পকলা, দর্শন ইতিহাস প্রভৃতির যাহাতে কোনরূপে অঙ্গ-হানি ঘটে, এরূপ কার্য্য যেন আমরা কদাচ না করি, কদাচ যেন জাতীয়তার বিসর্জ্জন না দিই। অথচ যে ভাবে হউক, যদি ঐ ঐ বস্তুর কোনরূপ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারি তবে তাহাতে যেন বদ্ধপরিকর হই। নিজের যাহা আছে, তাহাত আছেই, কেহ তাহা অপহরণ করিতেছে না, সুতরাং সে পক্ষে নিশ্চিন্ত থাকিয়া যাহা অন্যের আছে, অন্যে যাহার বলে বলীয়ান্, অথচ আমার নাই, তাহা পাইবার জন্য যদি আমার আন্তরিক আগ্রহ না জন্মে, তবে কদাচ আমি ঐ বলবানের সমক্ষে দাঁড়াইতে পারিব না। কেবল পূর্ব্ব গৌরব-স্মরণ করিয়া, পূর্ব্বের অতীত সম্পদের আলোচনা করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলে কোনই ফলোদয় হয় না। নিজের জাতীয় জীবনের শক্তি যাহাতে বর্দ্ধিত হয়, তাহার প্রয়াস স্বতঃপরতঃ করিতে হইবে। শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে। আমার এই ছিল, আমি এই ছিলাম, এইরূপ ব্যর্থ ও অলস চিন্তায় কোনই লাভ নাই, বরং ক্ষতিই অধিক। এই ভাবে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া যদি আমরা আমাদের মাতৃ-ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারি, আমাদের জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গ পুষ্ট করিতে পারি তবেই আমাদের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে, আমরা এই ঘোর দুর্য্যোগেও আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিতে পারিব। অন্যথা সে সম্ভাবনা অতি অল্প। যাহা কিছু নীচ, যাহা কিছু সঙ্কীর্ণ, যাহা কিছু অসৎ, ধর্ম্মভাব-বর্জ্জিত, তাহা উরগক্ষত-অঙ্গুলির ন্যায় পরিহার করিয়া, যাহা সুন্দর, নির্ম্মল, নিষ্পাপ, মনোহর, যাহাতে দানব মানব হয়, মানব দেবতা হয়, তাদৃশ সম্ভাবপুষ্প চয়ন করিব, এবং সেই সম্ভাব-কুসুমে আমার জননী অনাদৃতা, উপেক্ষিতা বঙ্গবাণীকে অলঙ্কৃতা করিব, মায়ের সন্তান আমরা মাতৃ-পূজা করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইব। যে বায়ু মধুকণা বহন করে না, তাহা আমরা আঘ্রাণ করিব না, যে নদী মধুমতী নহে, তাহার আমরা সেবা করিব না, যে লতা মধুময় কুসুমে কুসুমিত নহে, তাহার প্রতি আমরা চাহিব না। এইভাবে যদি আমরা চলিতে পারি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমাদের অনুকূল হইবে, সহায় হইবে। নিঃসপত্নভাবে আমরা পূর্ব্বোদিত চন্দ্রমার ন্যায় শ্রীসম্পন্ন হইতে পারিব। হিমাচল যে দেশের পর্ব্বত, জাহ্নবী-যমুনা যে দেশের প্রবাহিনী, সাম যে দেশের সঙ্গীত, রামায়ণ-মহাভারত যে দেশের ইতিহাস আমরা সেই দেশের অধিবাসীর যোগ্যতা লাভ করিতে পারিব। আপনারা আজ আমাকে যে উচ্চ সম্মান প্রদান করিয়াছেন,—বঙ্গবাণীর চরণপ্রান্তে বসিবার সুযোগ দান করিয়াছেন, তজ্জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক আমি আবার বলি, আপনাদের ভাষা, আপনাদের ভাব, আপনাদের চিন্তা

—এ সমস্তই সুন্দর হউক, অন্যের অনুদ্বেজক হউক, যাহারা আপনাদের সন্নিকর্ষে আসিবে, তাহাদিগকেও উন্নতির পথে লইয়া, আপনারা নিজে ভাগীরথীর প্রবাহের ন্যায়, অবাধিত গতিতে, উন্নতির অমৃতময় পারাবারে মিশিয়া যাউন। নিজের জাতীয়তা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জগতের বরেণ্য হউন। বিধাতার কৃপায়,

মধু ক্ষরতু তে বিক্তং মধু ক্ষরতু তে মুখম্।
মধু ক্ষরতু তে শীলং লোকা মধুময়োঽস্তু তে

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

শ্যামনগরের জমিদার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় শ্যামনগরের জমিদার। তিনি বিদ্যোৎসাহী হিন্দু, সংস্কৃতে এম, এ। ধর্ম্মনিষ্ঠা, গভীর পাণ্ডিত্য, শিক্ষা ও সংকর্ম্মানুরাগের জন্য তিনি সর্ব্বসাধারণের অতিশয় শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁহার বিশাল জমিদারীর আয় প্রচুর। মাজিষ্ট্রেট, কমিশনার প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে সম্মান করিতেন, কিন্তু তিনি স্বাভাবিক মানুষ ছিলেন, সর্ব্বদা আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া চলিতেন। তাঁহার পত্নী যমুনা দেবী স্বামীর নিকট বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজীতে সুশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।

বিষ্ণুপদ বাবু স্বগ্রামে একটী প্রথম শ্রেণীর কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য সেই কলেজে তিনি সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র কৃষ্ণপদ ২১ বৎসর বয়সে সেই কলেজ হইতে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। সেই সময়েই নিজেদের কলেজের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক পরেশ বাবুর কন্যা মালবিকার সহিত কৃষ্ণপদের বিবাহ হয়। বিবাহান্তে কৃষ্ণপদ ও তাহার বন্ধু হরকুমার প্রভৃতি কয়েকটী যুবক উচ্চতর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে বিষ্ণুপদ বাবুর কলিকাতার বাসাবাটীতে থাকিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িতে আরম্ভ করে। কৃষ্ণপদ ও হরকুমার যথাক্রমে প্রকৃতি বিজ্ঞান ও গণিতে এম, এ, পরীক্ষায় প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হইল। তাহাদের বাসার আর তিনজন ছাত্রও অন্যান্য বিষয়ে এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। তৎপর কৃষ্ণপদ ও হরকুমার দুজনেই রাসায়ন ও প্রেমচাঁদ বৃত্তি প্রাপ্ত হয়। বিষ্ণুপদ বাবু স্বগ্রামে একটী আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় এবং একটী বিজ্ঞানাগারও স্থাপন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণপদ ও হরকুমারের মনে হইল, বিলাতে গিয়া বিজ্ঞান শাস্ত্র হাতে হেতেড়ে কাজ করিয়া না শিখিলে এদেশের আর্থিক অবস্থার প্রকৃত উন্নতি করিতে পারা যাইবে না। এজন্য তাহারা বিলাত যাইবার আকাঙ্ক্ষা বিষ্ণুপদ বাবুকে জানাইল। তিনি পরেশ বাবু ও নিজ পুরোহিত বৃদ্ধিমান ও তেজস্বী ব্রাহ্মণ রামকমল বিদ্যালঙ্কারের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। স্থির হইল, বিলাতে গিয়া তাহারা যথাসম্ভব দেশীয় ভাবে থাকিবে। হিন্দুর অখাদ্য আহার করিবে না। বিলাতে অবস্থান কালে প্রতিদিন ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিবে। বিলাত হইতে ফিরিয়া শাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিবে এবং সম্পূর্ণ দেশীয় ভাবে চলিবে। তাহাদের সঙ্গে দুইজন পাচক ব্রাহ্মণ ও দুইজন হিন্দুস্থানী চাকর বিলাতে চলিল। ছয়জন বিদ্যার্থীর বিলাত যাওয়া স্থির হইল; কৃষ্ণপদ বিজ্ঞান, হরকুমার গণিত, বিমলচন্দ্র ব্যারিষ্টারী ও সিবিল সার্ভিস, শৈলেন্দ্র ইঞ্জিনিয়ারিং, রমানাথ ডাক্তারী এবং ভবানীচরণ ব্যারিষ্টারী পড়িবে। জাহাজে এই ছয়জন সম্পূর্ণ দেশীয় ভাবেই চলিত। সেই জাহাজে একজন সেলনপ্রাপ্ত ইংরেজ লক্ষ দেশে ফিরিতেছিলেন, তাঁহার সঙ্গে ইহাদের খুব ঘনিষ্ঠতা হইল এবং বিলাতে তিনি তাহাদের সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন। বিলাতে গিয়া তাঁহার সাহায্যে মি: মরীস নামক একজন ব্যারিষ্টারের সঙ্গে তাহাদের বন্ধুতা হইল। সম্পূর্ণ দেশীয় ভাবে এই ছয় জনের জন্য পাঁচ জন তিন বৎসর বিলাতে বাস করিয়া শিক্ষা সমাপ্ত করিল। শুধু ভবানীচরণ পড়াশোনা ছাড়িয়া দিয়া এক সদাশয়া খিয়েটারের দলে যোগ দিয়া মামাদেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কৃষ্ণপদের দেশে ফিরিতে আর বিলম্ব নাই এমন সময়ে তাহাদের উকীল যোগেশ বাবুর এক টেলিগ্রাম পাইয়া গোল বাঁধিল। কৃষ্ণপদ বিলাত যাত্রা করিবার ছয়মাস পরে তাহার একটী কন্যা জন্মিয়াছিল, কন্যাটীর নাম রাখা হইয়াছিল সাবিত্রিকা।]

যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কথা

(১)

হরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কমলানাম্নী যে ভগিনী কৃষ্ণপদ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত পরেশবাবুর কন্যা মালবিকার বিবাহের ঘটকালি করেন তিনি এই অধমের "আঁধার ঘরে সাঁঝের প্রদীপ আলিয়া" থাকেন। উক্ত মহাশয়া আমার দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী। তাই বলিয়া কেহ মনে করিবেন না যে আমি এক পত্নী বর্ত্তমানে দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিয়া কুলীনগিরি জাহির করিতেছি। আমার সাড়ে সাতাইশ বৎসর বয়সের সময় আমার প্রথমা পত্নী আড়াই বৎসরের একটী পুত্র রাখিয়া কলেরা রোগে প্রাণত্যাগ করায়, তাঁর মৃত্যুর ছয় মাস পরে তাঁর মামাতভগিনী কমলার পাণিগ্রহণে বাধ্য হইয়াছি। যখন কমলাকে বিবাহ করি তখন আমার ওকালতীর পঞ্চম বর্ষ। আমি সরলপুর জেলাকোর্টে ওকালতী করি। এই কয়েক বৎসরে পশার এক রকম হইয়াছে। কমলাকে যে বৎসর বিবাহ করিলাম সেই বৎসর কৃষ্ণপদবাবুর পিতার বাঁধা উকীল রাধামাধব বাবুর মৃত্যু হইল।

সেই সময় কমলা তাহার পিত্রালয়ে ছিল। কিসে কি হইল বলিতে পারি না; একদিন কৃষ্ণপদ বাবুর পিতার স্বহস্ত লিখিত পত্রে জানিলাম যে রাধামাধব বাবুর স্কুলে আমি তাঁহার উকীল নিযুক্ত হইয়াছি। উকীল-কি স্বরূপে আমি বার্ষিক আড়াই হাজার টাকা পাইব। কোন কাজ করিতে হউক আর নাই হউক, মফস্বলে যাইতে হইলে তাহার পৃথক্ কি দৈনিক পঞ্চাশ টাকা হিসাবে। বার্ষিক আড়াই হাজার টাকা কি আমার ইচ্ছামত বৎসরান্তে অথবা মাসে মাসে লইতে পারিব। ইহাতে আমার ভারী সুবিধা হইল। বলিতে কি, কৃষ্ণপদবাবুদের জমিদারী যেরূপ সুশাসিত তাহাতে তাঁহাদের মামলা মোকদ্দমা এক রকম না থাকার মধ্যে। কৃষ্ণপদবাবুর বিলাত যাওয়ার এক বৎসর পরে আমার এই পদলাভ হইল। আমি যথাসময়ে হরকুমারকে ও কৃষ্ণপদবাবুকে বিলাতে পত্র লিখিয়া এ সংবাদ দিলাম।

(২)

কৃষ্ণপদ বাবুর পিতা শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়ের মত ধার্ম্মিক, পরোপকারী দয়ালু, বিদ্যোৎসাহী, বিপন্নের বন্ধু এবং উদার-হৃদয় লোকের যে শত্রু থাকিতে পারে আমার এ কথা বিশ্বাস হইত না, কিন্তু আমার উকীল-বন্ধু জাহ্নবী-কান্ত বলিতেন যে বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি সর্ব্বদা বিষ্ণুপদ বাবুর সর্ব্বনাশের চেষ্টায় ফিরিতেছেন। এই বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় পিতৃমাতৃহীন ও সকল প্রকার সহায়-হীন অবস্থায় বিষ্ণুপদ বাবুর পিতা স্বর্গীয় রামপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হয়েন, এবং বিষ্ণুপদ বাবুর পিতাই নিজ ব্যয়ে তাঁহাকে লেখাপড়া শিখাইয়া তাঁহার কাজ কর্ম্মের যোগাড় করিয়া দেন। বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় লোকটী বুদ্ধিমান। বড় লোকদিগকে সন্তুষ্ট করিবার বিদ্যায় তাঁহার দ্বিতীয় নাই। তিনি সামান্য হেড্ কনেষ্টবল হইতে দারোগা, তৎপর পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টর, তৎপর ডেপুটী সুপারি-নটেন্‌ডেণ্ট অব পুলিশ হয়েন। অবশেষে ৫৮ বৎসর বয়সে পেন্‌সন্ লইয়া সরলপুর জেলার সদরে বাস করিতেছেন। ইঁহার কার্য্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি দিয়াছেন।

বিশ্বনাথ যত দিন না ডেপুটি সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট অব পুলিশ হইয়াছিলেন ততদিন বিষ্ণুপদ বাবুর পিতা হইতেই যে তাঁর সব সে কথা সকলকেই অকপট চিত্তে বলিতেন কিন্তু ঐ উচ্চপদ লাভের পর হইতেই তিনি বিষ্ণুপদ বাবু বা তাঁহার পিতা বা তাঁহাদের কোন প্রসঙ্গ সহিতে পারিতেন না। পেনসন্ লওয়ার এক বৎসর পর তাঁহার এক কন্যার সহিত কৃষ্ণপদ বাবুর বিবাহের প্রস্তাব করিবার জন্য বিশ্বনাথ স্বয়ং শ্যামনগরে গমন করেন। কিন্তু বিষ্ণুপদ বাবু কি কারণে বলিতে পারি না, তাঁর পুত্রের সহিত বিশ্বনাথ বাবুর কন্যার বিবাহের প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই। ইহাতে বিশ্বনাথ বাবু নিজেকে অপমানিত বোধ করেন এবং যে কোন উপায়েই হউক এই অপমানের উপযুক্ত প্রতিশোধ দিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে থাকেন। তারপর পরেশ বাবুর কন্যার সহিত কৃষ্ণপদ বাবুর বিবাহ হওয়াতে বিশ্বনাথ বাবুর ক্রোধের মাত্রা দ্বিগুণ হয়। কারণ, পরেশ বাবু গরীব অধ্যাপক, আর বিশ্বনাথ টাকার কুমীর, গভর্ণমেণ্টের খেতাব প্রাপ্ত রায় বাহাদুর। পরেশ বাবুর স্ত্রী নাকি বিশ্ব-নাথ বাবুর দূর সম্পর্কে মামাতভগিনী। যাহাই হউক, কয়েক বৎসর নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল। বিশ্বনাথ বাবু বিষ্ণুপদ বাবুর কোন ক্ষতি করিতে পারিলেন না।

(৩)

কৃষ্ণপদবাবুদিগের বিলাত যাইবার দুই বৎসর পরে মিঃ কক্স নামক এক জন ইংরেজ সিবিলিয়ান সরলপুরের ম্যাজি-ষ্ট্রেট্ হইয়া আসিলেন। এই ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত বিশ্বনাথ-বাবুর খুব দহরম মহরম হইল।

বিশ্বনাথ বাবুকে তিনি অতি বিশ্বস্ত, গবর্ণমেণ্টের পরম হিতৈষী, নিমক-হালাল রাজকর্ম্মচারী বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। এই সুযোগে নানারূপ ঘটনার সৃষ্টি করিয়া বিশ্বনাথ বাবু বিষ্ণুপদ বাবুকে অতি অহঙ্কারী, রাজপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ও নিতান্ত স্বাধীনচিত্ত জমিদার বলিয়া কক্স সাহেবের মনে ধারণা জন্মাইয়া দিলেন; সাহেবের মন বিষ্ণুপদ বাবুর প্রতি নিতান্ত বিরূপ হইয়া উঠিল।

কিছুদিন পরে সরলপুর জেলার একজন ধনী মুসলমা-নের উত্তরাধিকারীদের বিরুদ্ধে তাঁহার বিধবা পত্নী মোহ-রাণার জন্য তিন লক্ষ টাকার দাবীতে এক নালিশ রায়ের করিয়া সেই টাকা তাঁহার মৃত স্বামীর ত্যাজ্য বিস্তীর্ণ জমি-দারী হইতে আদায়ের প্রার্থনা করিল। বাদিনীকে বিবাহ

করিবার সময় পূর্ব্বোক্ত জমিদার সাহেব তিন লক্ষ টাকা দেন-মোহরের আদায়ের জামিন স্বরূপে তাঁহার পূর্ব্বকথিত জমিদারী বন্ধক রাখেন এবং একখানি সাদা কাগজে তাহা লিখিয়া দেন। বামিনী ঐ জমিদারের তৃতীয়পক্ষের পত্নী, ইঁহাকে বিবাহ করিবার দশ বৎসর পর জমিদার সাহেবের মৃত্যু হয়। তাঁহার প্রথমা ও দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত পুত্রেরা তাহাদের বিমাতাকে তাহাদের পিতার গৃহ হইতে তাড়াইয়া দেয়। তাহারা এই অনাথাকে তাহার প্রাপ্য মোহরাণা বা তাহার স্বামীর ত্যাজ্য সম্পত্তিতে তাহার প্রাপ্য ন্যায্য অংশ কিছুই দেয় নাই। এমন কি কুলাঙ্গারেরা এই অসহায়া নারীর অলঙ্কারগুলি পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইয়াছিল। বিধবার পিতৃকুলে কেহ ছিল না। তাহার দূর সম্পর্কে এক পিসতুত ভ্রাতা সরলপুরের কালেক্টরীতে সামান্য বেতনে দপ্তরীর কার্য্য করিত। নিরুপায় হইয়া বিধবা এই দপ্তরীর আশ্রয় গ্রহণ করিল। দপ্তরী তাহার ভগিনীর দুঃখে কাতর হইয়া সকল কথা একজন মুসলমান উকীলকে জানাইল। এই উকীল আবার সেই সকল কথা ফক্স সাহেবকে জানাইলেন এবং বলিলেন যে, "আমি এই অসহায়া মহিলার জন্য বিনা পয়সায় খাটিতে রাজী আছি। কিন্তু কোর্টফী যোগাড় করিবার মত অর্থ তাহার নাই। হুজুর যদি উহাকে কোর্টফীর দায় হইতে মুক্তি দেন তাহা হইলে সে তাহার প্রাপ্য তিন লক্ষ টাকা দেন-মোহর পাইবার জন্য দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারে।" ফক্স সাহেব বলিলেন, "আমি এ বিষয়ে অসহায়া বিধবার কি করিতে পারি? দেওয়ানী আদালতের সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই।"

মুসলমান উকীল। এই বিধবাকে সাহায্য করিবার ক্ষমতা হুজুরের আছে। হুজুরের জানা আছে যে অত্যন্ত গরীবের বিনা কোর্টফীতে দেওয়ানী মোকদ্দমা করিবার বিধান আছে। এজন্য দেওয়ানী আদালতে প্রার্থনা করিতে হয়। প্রার্থী প্রকৃত নিঃস্ব কিনা এই বিষয় তদন্তের ভার কালেক্টরের উপর দেওয়া হয়। কালেক্টর সাহেব স্বয়ং বা তাঁহার অধস্তন কোন কর্ম্মচারীর দ্বারা সেই বিষয়ের তদন্ত যদি প্রার্থী প্রকৃতপক্ষে নিঃস্ব বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি বিনা কোর্টফীতে নালিশ করিতে পারে।

ফক্স সাহেব। কিন্তু ইহাতে গভর্ণমেণ্টের রাজস্বের ক্ষতি হয়। সেই ক্ষতি কেমন করিয়া পূরণ করা যাইবে?

মুসলমান উকীল। হুজুর, তাহারও ব্যবস্থা আছে। প্রার্থী মোকদ্দমা ডিক্রিতে পর যদি তাহার কিছু আদায় হয়, তাহা হইলে সেই আদায়ী সম্পত্তি হইতে সর্ব্বপ্রথমে এখন গভর্ণমেণ্ট যে কোর্টফী লইতেছেন না সেই কোর্টফীর টাকা কাটিয়া লওয়া হইবে।

ফক্স সাহেব। আর যদি প্রার্থী মোকদ্দমা হারিয়া যায় বা কিছু মাত্র আদায় না হয়, তাহা হইলে কি হইবে?

মুসলমান উকীল। তাহা হইলে অবশ্য গভর্ণমেণ্টের ক্ষতিপূরণ করিবার আর উপায় নাই। এই বিধবার সম্বন্ধে সে আশঙ্কা নাই। তার মোহরাণার ভাল দলিল আছে। তাহাতে বড় একটা জমিদারী বন্ধক আছে। সেই জমিদারীটা আবার শ্যামনগরের জমিদার বিষ্ণুপদ বাবুর নিকট বন্ধক আছে। তিনি তাঁহার বন্ধকী দলিলের দরুণ কয়েক মাস হইল উহা ডিক্রী করিয়া রাখিয়াছেন।

ফক্স সাহেব। আপনি যে বিষ্ণুবাবুর কথা বলিলেন আমি তাঁহাকে জানি। তিনি বড় শক্ত লোক। তাঁর কাছে যে জমিদারী বন্ধক আছে, তাহা হইতে আপনার মক্কেল কেমন করিয়া টাকা আদায় করিবে, আমি বুঝিতে পারিতেছি না। তবে, আইনের কূট আপনারা ভাল বুঝেন।

মুসলমান উকীল। হুজুর, আমার মক্কেলের মোহরাণার দলিল বিষ্ণুবাবুর দেহানের পূর্ব্বেকার। সুতরাং বিষ্ণুবাবু আমার মক্কেলের দাবীর টাকা দিতে বাধ্য। না দিলে তিনি তাঁর ফলভোগ করিবেন, আর মোকদ্দমার ফল যাহাই হউক আমার মক্কেলের স্বামীর ত্যাজ্য সম্পত্তি হইতে গভর্ণমেণ্টের কোর্টফীর টাকা সর্ব্বপ্রথমে আদায় হইবে। আগে গভর্ণমেণ্টের প্রাপ্য টাকা আদায় হইবে, তারপর অন্যের পাওনার কথা।" অতঃপর ফক্স সাহেব অসহায় মুসলমান বিধবাকে সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন। তারপর সেই বিধবা বিনাকোর্টফিতে তিন লক্ষ টাকার দাবীতে সরলপুরের সবজজ আদালতে নালিশ করিল এবং সেই নালিশে বিধবার স্বামীর উত্তরাধিকারীদিগকে ও বিষ্ণুবাবুকে পক্ষ করিল এবং বিষ্ণুবাবুর নিকট বিধবার

স্বামী যে জমিদারী বন্ধক রাখিয়াছিলেন এবং যে বন্ধকীর তমস্থকের দরুণ নালিশ করিয়া বিষ্ণুবাবু ইতিপূর্ব্বে ডিক্রী করিয়া রাখিয়াছেন, সেই বন্ধকী সম্পত্তি হইতে বিধবার মোহরাণার দরুণ তিন লক্ষ টাকা ও আদালতের খরচ আদায় করিবার প্রার্থনা করিল।

বিষ্ণুবাবুকে এই মোকদ্দমায় জবাব দিতে হইল। বাদিনীর স্বামীর সম্পাদিত সাদা কাগজে লেখা স্থাবর সম্পত্তির জামিন আদালত গ্রাহ্য করিলেন না। বিষ্ণুবাবুর বিরুদ্ধে সেই মোকদ্দমা খরচাসহ ডিস্‌মিস হইল। বিধবা তাহার স্বামীর উত্তরাধিকারীদিগের বিরুদ্ধে এই মর্ম্মে ডিক্রী পাইল যে দাবীকৃত তিন লক্ষ টাকা ও তাহার আদালত খরচা বাদিনী তাহার স্বামীর পরিত্যক্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি হইতে আদায় করিতে পারিবে এবং এই মোকদ্দমার কোর্টফীর দরুণ গভর্ণমেণ্টের যে আড়াই হাজার টাকা পাওনা আছে সেই টাকা সর্ব্বপ্রথমে ঐ সম্পত্তি হইতে আদায় হইবে। মুসলমান জমিদারের যে কিছু সম্পত্তি তখন ছিল তাহা বিষ্ণুবাবুর কাছে রেহানে আবদ্ধ। সেই জমিদারের অন্যান্য সম্পত্তি তাঁর দেনার দায়ে তৎপূর্ব্বেই বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল।

গভর্ণমেণ্টের পাওনা আড়াই হাজার টাকা আদায়ের জন্য গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে কালেক্টর ফক্স সাহেব ঐ আড়াই হাজার টাকার ডিক্রীজারী করিয়া বিষ্ণুবাবুর নিকট বন্ধকী সম্পত্তি ক্রোক করিয়া তাহা নিলাম করাইলেন। রায়বাহাদুর বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় সেই সম্পত্তি তাঁর এক সম্বন্ধীর দেনাতে তিন হাজার টাকা ডাকিয়া লইলেন এবং যথাসময়ে নীলাম খরিদের রায়নামা লইয়া নীলামী সম্পত্তিতে দখল লইয়া খরিদসূত্রে কালেক্টরীতে নাম রেজেষ্টরী করিয়া লইলেন। এই সকল ব্যাপার এমন গোপনে হইল যে অনেকে ইহা জানিতেই পারিল না।

তৎপর বিষ্ণুবাবু ঐ সম্পত্তি সম্বন্ধে তাঁহার যে বন্ধকী ডিক্রী হইল সেই ডিক্রীর টাকা রায়বাহাদুরের সম্বন্ধীর নিকট আপোষে চাহিয়া পাঠাইলেন। রায়বাহাদুরের সম্বন্ধী রায়বাহাদুরের পরামর্শ অনুসারে বিষ্ণুবাবুকে জানাইলেন যে, "ঐ সম্পত্তি তিনি গভর্ণমেণ্টের দেনার দায়ে নীলাম খরিদ করিয়াছেন। তিনি বিষ্ণুবাবুর বন্ধকী ডিক্রীর টাকা পরিশোধ করিতে বাধ্য নহেন। ইচ্ছা করিলে বিষ্ণুবাবু আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে অথবা আর যাহা যাহা ইচ্ছা হয় তাহা করিতে পারেন। তবে তিনি যদি রায়বাহাদুরের নিকট এই সম্পত্তি ভিক্ষা চাহেন, রায়বাহাদুর তৎসম্বন্ধে বিবেচনা করিতে পারেন। কারণ এই সম্পত্তি এইক্ষণে প্রকৃত পক্ষে রায়বাহাদুরের; সম্বন্ধী রায়বাহাদুরের বেনামীদার মাত্র।" এই ইতর জনোচিত ভাষায় লিখিত পত্র পাইয়া বিষ্ণুবাবু একটু হাসিয়া তাঁহার পূর্ব্বকথিত বন্ধকী ডিক্রীজারী করিবার ব্যবস্থা করিলেন এবং সেই ডিক্রীজারীতে বন্ধকী সম্পত্তি নীলাম করাইয়া স্বয়ং খরিদ করিয়া আদালত সাহায্যে তাহাতে দখল লইলেন। তাহার পর নীলাম খরিদা সেই জমিদারী সম্পত্তিতে নিজের নাম রেজেষ্টরী করিবার জন্য কালেক্টরীতে দরখাস্ত করিলেন। রায়বাহাদুর ও তাঁহার সম্বন্ধী উভয়েই এই বিষয়ের নোটীশ পাইয়া বিষ্ণুবাবুর দরখাস্তে আপত্তি দাখিল করিয়া বলিলেন যে "যখন বিষ্ণুবাবুর নীলাম খরিদ পত্তনি, এবং আপত্তিকারীদের নীলাম খরিদ গভর্ণমেণ্টের দেনা আদায় জন্য ডিক্রীজারিতে, এবং যখন আপত্তিকারী পূর্ব্বাবধি ঐ সম্পত্তিতে দখলকার আছেন এবং কালেক্টরীতে নামজারী করিয়াছেন তখন বিষ্ণুবাবুর নামজারীর দরখাস্ত মঞ্জুর হইতে পারে না।"

কালেক্টর সাহেব বিষ্ণুবাবুর নামজারীর দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিলেন। সেই আদেশের বিরুদ্ধে বিষ্ণুবাবু প্রথমে কমিশনারের নিকট, তৎপর রেভিনিউ বোর্ডের নিকট আপীল করিয়া বিফল-মনোরথ হইলেন। তাঁহাদের সকলেরই সেই এক কথা, গভর্ণমেণ্টের পাওনা আর সব পাওনার অগ্রগণ্য। বাধ্য হইয়া বিষ্ণুবাবু ঐ সম্পত্তি পাইবার জন্য রায়বাহাদুর বিশ্বনাথ ও তাঁহার সম্বন্ধীর বিরুদ্ধে আট লক্ষ টাকার দাবীতে এক মোকদ্দমা রুজু করিলেন। রায়বাহাদুর সেই বিশাল জমিদারী নির্ব্বিবাদে ভোগ করিতে লাগিলেন।

এদিকে বিষ্ণুবাবু সংবাদ পাইলেন যে সেই মুসলমান জমিদারের বিধবা পত্নীর অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। যে দপ্তরী তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিল মোকদ্দমায় হারিবার পর তাহাকে সে তাড়াইয়া দিয়াছে। বিধবার এই দুরবস্থায়

কথা শুনিতে পাইয়া বিষ্ণুবাবু তাহার প্রাণাজ্জনের উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

(৪)

এই সময়ে বোম্বাই প্রদেশে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইল। প্লেগাক্রান্ত রোগীদিগকে অনেক স্থলে তাহাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্লেগ-হাসপাতালে নিয়া যাওয়া লইয়া গভর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য বিভাগের সহিত বোম্বাই প্রদেশের লোকদিগের ধাঙ্গাহাঙ্গামা হইতে লাগিল। সেখানকার লোকেরা এই বিষয়ে প্রতীকারের জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট দরখাস্ত করিল। স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ম্মচারীরা গভর্ণমেণ্টকে বুঝাইল যে প্লেগ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে প্লেগ-হাসপাতালে না লইয়া গিয়া তাহার নিজ বাড়ীতে থাকিতে দিলে প্লেগের বীজ অতি শীঘ্র ও অতি সহজে সর্ব্বত্র প্রসারিত হইয়া পড়িবে এবং তাহা হইলে প্লেগ রোগ দমন করা এক প্রকার অসাধ্য হইয়া পড়িবে। সুতরাং গভর্ণমেণ্ট প্লেগ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে প্লেগ-হাসপাতালে পাঠাইবার নিয়ম রহিত করিতে পারিলেন না। এতৎ বিষয়ক অশান্তি দিন দিন বাড়িতে লাগিল। কয়েক দিবস পরে প্লেগ দমন নিযুক্ত এক ডাক্তারসাহেব ও তাঁহার কয়েকজন অধস্তন কর্ম্মচারীকে কে গুলির আঘাতে হত্যা করিল। এই ঘটনায় বোম্বাই প্রদেশে,শুধু বোম্বাই প্রদেশেই বা কেন, সমগ্র ভারতবর্ষে মহা ভীতির সঞ্চার হইল। ভারতবর্ষপ্রবাসী ইংরেজেরা এ দেশের সর্ব্বত্র রাজবিদ্রোহের ষড়যন্ত্র চলিতেছে ভাবিয়া দুশ্চিন্তায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। গোয়েন্দা বিভাগের কর্ম্মচারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইল। মারাঠাদিগের মধ্যে কয়েকজন রাজবিদ্রোহের আয়োজনকারী বলিয়া ধৃত হইল এবং বিচারে কঠিন শাস্তি পাইল।

এই সময়ে কলিকাতা সহরে প্লেগের শুভাগমন হইল। সঙ্গে সঙ্গে প্লেগ দমনের নানাবিধ উপায় অবলম্বিত হইতে লাগিল। প্লেগ-হাসপাতাল স্থাপিত হইল। বোম্বাই প্রদেশের কাণ্ড স্মরণ করিয়া কলিকাতাবাসী হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকই কলিকাতা ছাড়িয়া অন্যত্র পলায়নে তৎপর হইল।

বাংলাপ্রদেশে বোম্বাইপ্রদেশের, নাটকের পুনরাভিনয়ের আশঙ্কা করিয়া তদানীন্তন বাংলার শাসনকর্ত্তা ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, "কলিকাতা হইতে কাহারও পলায়ন করিবার প্রয়োজন নাই। কোন প্লেগাক্রান্ত ব্যক্তিকে তাহার ও তাহার আত্মীয়-স্বজনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্লেগ-হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইবে না।" ইহাতে আশঙ্কা কিঞ্চিৎ কমিল বটে কিন্তু কলিকাতা হইতে যে পারিল পলায়ন করিতে বিরত হইল না। প্লেগবিভাগের কর্ম্মচারীদের অতি-সতর্কতাও বেশ চলিতে লাগিল। বাংলাদেশেও রাজবিদ্রোহের ষড়যন্ত্র চলিতেছে বলিয়া গভর্ণমেণ্টের সন্দেহ হইল এবং ইহার প্রতীকারের জন্য গোয়েন্দা বিভাগের কর্ম্মচারীরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। রায়বাহাদুর বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় গোয়েন্দা বিভাগে নিযুক্ত হইলেন। তবে, তাঁহার নিয়োগের কথা সাধারণের অজ্ঞাত রহিল।

(৫)

সেই বৎসর বাংলাপ্রদেশের নানাস্থানে ডাকাইতি হইতে লাগিল। অনেকে বলিতে লাগিল যে ইংরেজীশিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকেরা রাজবিদ্রোহের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ডাকাইতির দ্বারা অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছে। দু এক স্থানে ডাকাইতিলিপ্ত বলিয়া কয়েকজন ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক ধৃতও হইল। বিচারে তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও দণ্ড হইল। এই দণ্ডপ্রাপ্ত যুবকদিগের মধ্যে বিষ্ণুপদ বাবুর এক সম্পন্ন প্রজার পুত্র ছিল। এই যুবকের বাটী সরলপুর জেলায়, স্থাবনগর হইতে এক ক্রোশ উত্তরে।

এই ব্যাপারটাকে রায়বাহাদুর বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ম্যাজিষ্ট্রেট কক্স সাহেবের নিকট বিষ্ণুপদ বাবুর বিরুদ্ধে শাণিত অস্ত্র স্বরূপে ব্যবহার করিলেন। রায়বাহাদুর বুঝাইলেন, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবও বুঝিলেন যে, সে সময়ের রাজনৈতিক ডাকাইতিতে বিষ্ণুপদ বাবু গুপ্তভাবে লিপ্ত আছেন। তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর রাজবিদ্রোহী। তাহা না হইলে তাঁর বিস্তৃত জমিদারীর মধ্যে বিলাতি কাপড় এত কম বিক্রয় হয় কেন, তাঁর জমিদারীর মধ্যে যে সব তাঁতীর বাস, তারা কয়েক বৎসর হইতে চাষ ছাড়িয়া, পুনরায় তাঁত ধরিবে কেন। বিষ্ণুপদ বাবু তাহাদিগকে তাঁত কিনিবার ও সুতা কিনিবার জন্য কখনও বা অল্প সুদে কখন বা বিনা সুদে টাকা ধার দিবেন কেন। তাঁর খাসদখলের জমিতে কাপাসের চাষের জন্য অত টাকা খরচ করিবেন কেন? শুধু কি তাই, তাঁর কর্ম্মচারীরা

প্রজাদিগের বাড়ী বাড়ী গিয়া বলিয়া বেড়ায় যে তারা যদি নিজের উন্নতি করিতে চায় তাহা হইলে যেন সাধ্যপক্ষে বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার করে না। তার ফলে বিষ্ণুপদবাবুর জমিদারীর মধ্যে বিলাতি কাপড় ও অন্যান্য বিদেশী দ্রব্যের কাটতিও অসম্ভব রূপে কমিয়া গিয়াছে। কলিকাতায় যে একটা দিয়াশলায়ের কারখানা হইয়াছে তাহার প্রধান উদ্‌যোগী বিষ্ণুপদ বাবু। আর সেই কারখানার দিয়াশলায়ের কাটতি সরলপুর জেলায় সবচেয়ে বেশী। ঐ কারখানার দিয়াশলায় তত ভাল নয়, দামও বিদেশী দিয়াশলায় অপেক্ষা একটু বেশী, তথাপি বিষ্ণুপদ বাবুর প্রজারা ঐ দিয়াশলাই খরিদ করিতে বাধ্য হয়। বিষ্ণুপদবাবুর এমনি কড়া শাসন। যদি কেহ এই সকল বিষয়ে তাঁর অবাধ্য হয় তাহা হইলে বিষ্ণুপদ বাবুর কর্ম্মচারীরা তাঁর ভিটায় ঘুঘু চরাইয়া ছাড়িয়া দেয়।

এই যে বিষ্ণুপদবাবুর কলেজের সংলগ্ন একটী বিজ্ঞানাগার আছে, আর এই যে তিনি তাঁর ছেলেকেও আর কয়েকজন যুবককে বিজ্ঞান শিখিবার জন্য বিলাত পাঠাইয়াছেন এবং এই যে একটা খুব বড় করিয়া বিজ্ঞান মন্দির ফাঁদিবার উদ্‌যোগ করিতেছেন, ইহার কি কোন গূঢ় উদ্দেশ্য নাই? বোম্বাই প্রদেশের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রকারীদিগের সহিত বিষ্ণুবাবু ও তাঁর কয়েকজন কর্ম্মচারীর যোগ আছে বলিয়া সন্দেহ হয়। এ সকল গোপনীয় বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ সহজে পাওয়া যায় না। অনেকটা অনুমান ও চারিদিকের অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া এই সকল বিষয়ের প্রতীকারের চেষ্টা করিতে হয়। পূর্ব্বাবধি সাবধান না হইলে বিশেষ আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হইতে পারে। বিষ্ণুবাবুর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রালয়ে বোমা প্রস্তুত হইয়া থাকে, এরূপ সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। তবে তিনি এমন সাবধান যে যদি এখন তাঁর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রালয়ে অনুসন্ধান করা যায় তাহা হইলে তাঁর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ সংগ্রহ করা সহজ হইবে না। তাঁকে হাতেকলমে ধরা অতি কঠিন ব্যাপার।

এমন সময় একদিন সংবাদ পাওয়া গেল যে কলিকাতায় একজন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটকে লক্ষ্য করিয়া গুলি নিক্ষেপ করিবার অভিযোগে এক বাঙ্গালী যুবক ধৃত হইয়াছে। সেই গুলি ম্যাজিষ্ট্রেটের গায়ে না লাগিয়া তাঁর পার্শ্বস্থিত একজন বিহারী কনেষ্টবলের হাতে লাগিয়া কিঞ্চিৎ আহত হইয়াছে। এই ঘটনার দুই দিবস পরে সংবাদ পাওয়া গেল, ফতেপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটকে কে গুলি করিয়া গুরুতর রূপে আহত করিয়াছে। তাঁর প্রাণের আশা নাই। বহুযত্নে তাঁকে কলিকাতায় আনয়ন করা হইয়াছে।

ঠিক সেই সময়ে পঞ্জাব প্রদেশে জাঠদিগের মধ্যে, তাহাদের অভিমতের বিরুদ্ধে একটী আইন পাশ হওয়ায় দাঙ্গাহাঙ্গামা উপস্থিত হইল। ইহাতেও গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা বিচলিত হইলেন এবং এই ব্যাপারেও যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রকারীরা লিপ্ত আছে তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের দৃঢ় ধারণা জন্মিল।

(৬)

এই সময়ে একদিন বিভাগীয় কমিশনার বাহাদুর সরলপুর জেলায় শুভাগমন করিলেন এবং বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়ের পরামর্শ করিবার জন্য বিষ্ণুপদ বাবু ও পরেশ বাবুকে শ্যামনগর হইতে সরলপুরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বিষ্ণুপদ-বাবু ও পরেশবাবু সরলপুরে আসিয়া কমিশনার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার সহিত বিষ্ণুপদ বাবু ও পরেশ বাবুর কি কথা হইল বলিতে পারি না। যে দিন বিষ্ণুপদ বাবু ও পরেশ বাবু কমিশনার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন সেই দিবস প্রায় এক প্রহর রাত্রির সময় আমি বিষ্ণুবাবুর সরলপুরের বাসাবাড়ীতে বসিয়া তাঁহার সহিত মামলামোকর্দ্দমা সংক্রান্ত কথা কহিতেছি; নিকটেই পরেশবাবু বসিয়া সংবাদপত্র পড়িতেছেন। আমরা একটী দোতালা ঘরে বসিয়া আছি এমন সময় সেই বাড়ীর গাড়ী-বারান্দায় একখানি ঘোড়াগাড়ী লাগিবার শব্দ শুনিলাম। আমি সেই শব্দ শুনিয়া বলিলাম, "এখন কে আসিলেন?" বলিতে বলিতে একজন ভৃত্য শশব্যস্তে আসিয়া বলিল, "কর্ত্তা, মেজেষ্টার সাহেব আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন।" নীচে গাড়ীতে অপেক্ষা করিতেছেন। আমাদের বিস্ময়ের অবধি রহিল না তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট গিয়া তাঁহাকে সেলাম করিয়া

গাড়ী হইতে নামিবার জন্ত বিনয় অনুরোধ করিলাম। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব খুব ভদ্রভাবে বলিলেন, "আমি বিশেষ জরুরী কাজের জন্ত বিষ্ণুবাবুকে এমন অসময়ে বিরক্ত করিতে আসিয়াছি। বিষ্ণুবাবু, আপনি ও পরেশবাবু, আপনারা এখন যে অবস্থাতে আছেন সেই অবস্থাতেই আমার সঙ্গে আমার গাড়ীতে আমার কুঠীতে চলুন। পোষাক পরিবর্ত্তন করিবার আবশ্যক নাই। যোগেশবাবুও ইচ্ছা করিলে আমাদের সহিত আসিতে পারেন।" তখন শীতকাল, আমাদের কয়জনের গায়ে আলোয়ান ছিল। বিনা বাক্যব্যয়ে আমরা তিন জনে যে পোষাকে ছিলাম সেই পোষাকেই ম্যাজিষ্ট্রেটের গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। আমার মনে নানারূপ দুশ্চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। পরেশবাবু অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়া রহিলেন। বিষ্ণুবাবুর মুখ গম্ভীর হইল। গাড়ী ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠির দিকে ছুটিল। কুঠিতে পৌঁছিয়া আমরা সকলেই সেই গাড়ী হইতে নামিলাম। ফক্স সাহেব খুব খাতির দেখাইয়া আমাদিগকে বসিতে বলিলেন। আমরা প্রত্যেকে এক এক খানি চেয়ার অধিকার করিলাম। ফক্স সাহেব একবার সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন এবং প্রায় দুই মিনিট পরে কমিশনার সাহেবকে সঙ্গে করিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমরা তিন জনে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া কমিশনার সাহেবকে সেলাম করিলাম। কমিশনার সাহেব আমাদিগকে প্রতি-সেলাম করিয়া আমাদিগের প্রত্যেকের সহিত করমর্দ্দন করিয়া আমাদিগকে বসিতে বলিলেন এবং স্বয়ং আসন গ্রহণ করিলেন। ফক্স সাহেবও এক খানি চেয়ার অধিকার করিলেন। এক মিনিট কেহই কোন কথা বলিলেন না। ঘরের একটী বড় ঘড়ির টক্ টক্ শব্দ সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে লাগিল।

কমিশনার সাহেব সর্ব্বপ্রথমে কথা কহিলেন। তিনি পকেট হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন, "বিষ্ণুবাবু, পরেশ বাবু, আমার নিতান্ত অনিচ্ছায় আজ আমাকে একটী অত্যন্ত অপ্রিয় কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। কি করিব বলুন, আমরা গভর্ণমেণ্টের চাকর, গভর্ণমেণ্টের আদেশ প্রতিপালন করিতে বাধ্য। আমি অত্যন্ত দুঃখের সহিত আপনাদিগকে জানাইতেছি যে মহামান্ত বড়লাট সাহেব বাহাদুর আপনাদিগের দুই জনের বিরুদ্ধে এই ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়াছেন। আমার উপর এই ওয়ারেণ্ট জারীর ভার পড়িয়াছে। এই ওয়ারেণ্ট দেখুন। ইহা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, আপনাদিগের নির্ব্বাসনের আদেশ হইয়াছে।" বিষ্ণুবাবু ও পরেশ বাবু এক সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, "বিনাবিচারে নির্ব্বাসন!" আমার ত চক্ষু স্থির হইল, মাথা ঘুরিতে লাগিল। ভাবিতে লাগিলাম যে, "আমি জাগিয়া আছি না স্বপ্ন দেখিতেছি!" কমিশনার সাহেব বলিলেন, "বিনাবিচারে নির্ব্বাসন দিবার ক্ষমতা বড়লাট বাহাদুরের আছে। এই দেখুন, আপনাদের ওয়ারেণ্টে সে কথা লেখা আছে। যোগেশ বাবু উকীল, তিনি বুঝিতে পারিবেন, কোন্ আইনের বিধান মতে মহা-মান্ত বড়লাট বাহাদুর এই ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়াছেন।"

বিষ্ণুবাবু। মহামান্ত বড়লাট বাহাদুরের আদেশ আমার শিরোধার্য্য। আমাকে যেখানে ইচ্ছা লইয়া চলুন, আমার সম্বন্ধে যা ব্যবস্থা হয় করুন, তাহাতে আমি কিছুমাত্র চিন্তিত নই। কিন্তু এই পরেশ বাবুকে লইয়া গেলে ওঁর বড় কষ্ট হইবে এবং আমার কলেজেরও খুব ক্ষতি হইবে।

কমিশনার সাহেব। এ বিষয়ে আমার নিজের কোন হাত নাই। আমি মহামান্ত বড়লাট বাহাদুরের আদেশ পালন করিতেছি মাত্র। আপনাদের আহারাদির, পরিচ্ছদাদির ও বাসস্থানের উপযুক্ত বন্দোবস্ত হইয়াছে, সে জন্ত আপনারা চিন্তিত হইবেন না। আপনারা আর আধ ঘণ্টা এই কক্ষে বিশ্রাম করুন। সেই সময় উত্তীর্ণ হইলে আমি নিজে আপনাদের দুই জনকে সঙ্গে করিয়া স্পেশাল ট্রেনে রওনা হইব।

পরেশবাবু। কোথায় লইয়া যাইবেন?

কমিশনার সাহেব। ক্ষমা করিবেন। এখন সে কথা প্রকাশ করিবার আদেশ নাই। আপনারা প্রস্তুত হউন। শুনুন যোগেশ বাবু, আমি যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ইহাদের দুই জনকে লইয়া স্পেশাল ট্রেণে রওনা হইতেছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনাকে এই স্থানে অপেক্ষা করিতে হইবে। মিঃ ফক্স আমাদের সঙ্গে ষ্টেশনে যাইবেন। আমাদিগকে ট্রেণে উঠাইয়া দিয়া ট্রেণ

ছাড়িলে পর তিনি তাঁর কুঠীতে ফিরিয়া আসিবেন। তারপর আপনি আপনার বাসায় ফিরিয়া যাইতে পারিবেন। আজ রাত্রে কেন, কাল বেলা বারটা পর্য্যন্ত আপনি এই সকল বিষয়ের কোন কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারিবেন না। তারপর এসম্বন্ধে আমাদের কোনরূপ নিষেধ নাই। আপনাদিগকে আর একটু বিরক্ত করিব। আপনাদিগের পরিচ্ছদ পরীক্ষা করিয়া দেখিব কোনরূপ অস্ত্র আছে কি না।

আমরা তিন জনেই আমাদের কাপড় চোপড় ঝাড়া দিলাম। তাহা হইতে সন্দেহজনক কোন জিনিষ পাওয়া গেল না। তখন কমিশনার সাহেব বিষ্ণুবাবুকে বলিলেন, "আপনি এইক্ষণে ইচ্ছা করিলে যোগেশ বাবুকে আপনার অনুপস্থিতি কালে আপনার সম্পত্তির পরিচালনা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে পারেন।" বিষ্ণুবাবু বলিলেন, "আমার এখন আর কিছু বলিবার নাই। আমার কর্ম্মচারীরা যাহা কর্ত্তব্য বোধ করেন, তাহা করিবেন। আপনাদিগকে আমার এইমাত্র বিনীত অনুরোধ, যে আমাদের অনুপস্থিতিকালে আমার স্কুল কলেজাদির যেন কোনরূপ ক্ষতি না হয়।"

কমিশনার সাহেব। আপনার অনুরোধ আমার মনে থাকিবে। আমি আশা করি আপনারা শীঘ্রই আপনাদের আত্মীয়স্বজনের সহিত পুনরায় মিলিত হইবেন।

দেখিতে দেখিতে আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। কমিশনার সাহেব ও ম্যাজিষ্ট্রেট ফক্স সাহেব, বিষ্ণুবাবু ও পরেশ বাবুকে সঙ্গে করিয়া রেলওয়ে ষ্টেশন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আমি একাকী সেই ঘরে বসিয়া রহিলাম। ম্যাজিষ্ট্রেটের ভৃত্যেরা আমার নিকট চুরট ও দিয়াশলাই দিয়া গেল। আমি ও-রসে বঞ্চিত বলিয়া খানসামাকে চুরট ও দিয়াশলাই সরাইয়া লইয়া যাইতে বলিলাম। বসিয়া বসিয়া আকাশ পাতাল কত কি ভাবিতে লাগিলাম। আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। ফক্স সাহেব ষ্টেশন হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বিদায় দিলেন। ঘোড়ার গাড়ীতে করিয়া আমাকে আমার বাসায় পৌঁছাইয়া দেওয়া হইল। (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত।

হজরত রাবিয়া বসরী

যে সমস্ত মোস্‌লেম রমণী পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজ পুণ্য ও তপস্যা বলে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অক্ষয় অমর হইয়া গিয়াছেন, তাপস-কুলরাণী রাবিয়া তাঁহাদের মধ্যে একজন। ঈশ্বরের নিয়মই এইরূপ যে, যখন যে জাতি উন্নতি লাভ করে, তখন তাহার মধ্যে খাতনামা মহাজনদিগের আবির্ভাব হয়। তাই মুসলমান রাজ্য যখন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশে বিস্তারলাভ করিতেছিল, সেই সময় পারস্য উপসাগরের উপকূলে টাইগ্রীস নদীর মোহনা স্থিত, প্রসিদ্ধ বসরা নগরীর এক ক্ষুদ্র পল্লীতে তপস্বিনী রাবিয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মহাম্মদ ইসমাইল। রাবিয়া অতি শৈশবেই মাতৃহারা হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি একমাত্র পিতার যত্নে লালিত পালিত হন।

ইসমাইলের অবস্থা তত ভাল ছিল না। তাঁহাকে কঠিন পরিশ্রম করিয়া উদর পালন করিতে হইত। এইরূপে দুঃখে কষ্টে পিতার কন্যার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। কিছুদিন পর, দশ বৎসর বয়সের সময়, রাবিয়ার উপর এক আকস্মিক বিপদ ঘটে। আরবের লুণ্ঠন-প্রিয় বর্ব্বর বেদুইন জাতি ডাকাতি করিবার জন্য রাবিয়ার বাসগ্রাম আক্রমণ করে এবং অন্যান্য বহু লোকের সহিত ইসমাইলকেও ধরিয়া লইয়া গিয়া দাসরূপে আবদ্ধ রাখে। নিরাশ্রয়া বালিকা পিতৃশোকে অধীর হইয়া পড়িলেন। নিজে পরিশ্রম করিয়া খাইবার যোগ্য বয়স ও ক্ষমতা তাঁহার হয় নাই। তিনি মহাবিপদে পড়িলেন। পল্লীবাসী লোকেরা তাঁহার বিপদে দয়াপরবশ হইয়া স্থির করিলেন যে, রাবিয়া প্রতিদিন তাঁহাদের এক এক গৃহস্থের অতিথি হইবেন। এইরূপে তিনি প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন এবং শৈশবকাল হইতেই দুঃখে কষ্টে জীবন যাপন করিয়াছিলেন বলিয়া, অত্যন্ত কর্ম্মঠ ও সংযমী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি কখনও অলসতার প্রশ্রয় দেন নাই—যেদিন যাহার অতিথি হইতেন, সেখানেই গিয়া কাজকর্ম্ম করিতেন। বিনা পরিশ্রমে বসিয়া খাইতেন না।

একদিন রাবিয়া তাঁহার নির্জ্জন কুটীরখানিতে বসিয়া বসিয়া বিষণ্ণ মনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছেন, স্নেহশীল পিতার

দয়াময়তার কথা মনে করিয়া শোকে কষ্টে অধীর হইয়াছেন, এমন সময়ে জীর্ণ-বস্ত্র-পরিহিত, শুষ্কাস্থিচর্ম্ম এক বৃদ্ধ দৌড়িয়া তাঁহার কুটীরদ্বারে উপনীত হইলেন এবং "জল—জল" বলিয়া মাটীতে পড়িয়া গেলেন। রাবিয়ার কুটীরে জল ছিল না, তিনি জল আনিতে দৌড়িয়া গেলেন; ফিরিয়া আসিয়া দেখেন বৃদ্ধ পিতা ইসমাইলের প্রাণবায়ু তাঁহার ক্ষীণ দেহ পরিত্যাগ করিয়াছে। তিনি তখন আরও দ্বিগুণ শোকে অধীর হইলেন। বৃদ্ধ পিতা তাঁহার একমাত্র কন্যাকে দেখিবার নিমিত্ত দুস্তর মরুভূমি পার হইয়া প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিলেন, অথচ একবিন্দু জলের অভাবে তাঁহার মৃত্যু হইল! এ দুঃখে রাবিয়ার কোমল হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল এবং দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রুধারায় তাঁহার বক্ষস্থল সিক্ত করিল।

কিছুদিন পর রাবিয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেন। তিনি যেমন কাল তেমনই কুৎসিৎ ছিলেন সুতরাং বিবাহ করিয়া সংসারসুখ লাভের ইচ্ছা তাঁহার মনে আদৌ উদয় হয় নাই।

লীলাময় বিধাতার লীলাখেলা অতীব আশ্চর্য্য। তিনি যাহাকে ভালবাসেন, যাঁহারা তাঁহার প্রেমে মাতোয়ারা, তাঁহাদের উপরেই দুঃখের উপর দুঃখের বোঝা চাপাইয়া দেন। সেই অসভ্য বর্ব্বর বেদুইন জাতি পুনরায় রাবিয়ার বাস-পল্লী আক্রমণ করিল এবং অন্যান্য বহুলোকের সহিত রাবিয়াকেও ধরিয়া লইয়া গিয়া বসরা নগরের এক ধনাঢ্য লোকের নিকট দাসীরূপে বিক্রয় করিল। রাবিয়ার প্রভুগৃহে বিদ্যোৎসাহী পণ্ডিতগণের সমাগম হইত এবং সকলে মিলিয়া নানা প্রকার আমোদে মত্ত হইতেন। একদা এইরূপ সম্মিলনসময় রাবিয়া অন্যান্য দিনের ন্যায় আহার সামগ্রী পরিবেশন করিতেছেন, এমন সময় এক পণ্ডিত অস্থি-গ্রন্থি হইতে মাংস লইতে গিয়া গ্রন্থির সংস্থান দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি আশ্চর্য্য! ইহা কেমন কৌশলে স্থাপিত, মানুষের শরীরেও কি ঠিক এইরূপ?" উত্তরে এক হাকিম বলিয়া উঠিলেন, "মানুষের শরীরেও ঠিক এইরূপ, তবে চতুষ্পদ ও দ্বিপদের মধ্যে সামান্য প্রভেদ রহিয়াছে।" প্রথম ব্যক্তি বলিল, "এই সময় উহা দেখিতে পাইলে কি আনন্দই না হইত!" এই কথা মদমত্ত গৃহকর্ত্তার কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র রাবিয়াকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "এই দাসীটার পা কাটিয়া দেখিলেইত হয়।" আদেশ পাইবামাত্র কয়েকজন তাঁহাকে চাপিয়া ধরিল এবং একজন হাকিম ছুরিদ্বারা সন্ধিস্থান কাটিয়া ফেলিল। রাবিয়া মহাবিপদ ও যন্ত্রণায় পড়িয়াও হিমাদ্রি সদৃশ অচল অটল হইয়া রহিলেন। অস্থিগ্রন্থির সংস্থান দর্শনে এক পণ্ডিত বলিয়া উঠিলেন, "আল্লার কি আশ্চর্য্য সৃষ্টি!" এ হেন কষ্টের সময়ও খোদার মধুময় নাম রাবিয়ার কর্ণে অতুল স্বর্গীয় অমৃত বর্ষণ করিল। তিনি দুঃখ যন্ত্রণা সব ভুলিয়া গেলেন এবং ভগবৎ প্রেমে আত্মহারা হইয়া "শোক্‌রে খোদা" (খোদাকে ধন্যবাদ) বলিয়া যন্ত্রণার লাঘব করিলেন। সাধ্বী রাবিয়া যথার্থই ঈশ্বর-প্রেমিকা ছিলেন। খোদার নাম শুনিলেই তিনি আপনাকে ভুলিয়া যাইতেন। দয়াময় পরমেশ্বরের নাম তাঁহার পবিত্র সরল হৃদয়ে অক্ষয় অক্ষরে অঙ্কিত ছিল; তাই সেই নাম শুনিবামাত্র সব দুঃখ যন্ত্রণা ভুলিয়া গেলেন এবং মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া পড়িয়া আত্মহারা হইয়া বলিতে লাগিলেন—"দয়াময় প্রভো, আজিকার যন্ত্রণায় হৃদয়ঙ্গম করিলাম, এতদিন আমাকে কতদিক দিয়া কত ঘরে রাখিয়াছ; আহত হইয়া জানিলাম, কত সুখেই না ছিলাম! হায়, কতজনই না আমার ন্যায় কষ্ট পাইতেছে! বিধাতা, কবে তুমি তাহাদের সেই সব দুঃখ আমার বুকে চাপিয়া দিয়া তাহাদিগকে মুক্তিদান করিবে? দয়াময়, আমি দুর্ব্বলা বালিকা হইলেও তোমার মধুমাখা নামে সব যন্ত্রণা নিঃশব্দে বহন করিতে পারিব।"

আরবের আতিথেয়তা দেশ বিখ্যাত। রাবিয়ার প্রভু প্রথমে অতিথিসৎকার না করিয়া আহার স্পর্শ করেন না। একদিন রাবিয়ার প্রভুগৃহে অতিথিসমাগম হয় নাই, ক্রমে রাত্রি গভীর হইয়া আসিল, তবুও কোন অতিথি আসিল না। অতঃপর গৃহকর্ত্তা দাসদাসীদিগকে বিদায় দিয়া একাকী অতিথির প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং ধীরে ধীরে ভৃত্যাবাসের নিকট দিয়া বাহিরে রাস্তার ধারে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, রাত্রি গভীর হইয়াছে, প্রকৃতি নীরব নিস্তব্ধ। গৃহস্বামী স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন এমন সময়ে এক মধুবর্ষী করুণ স্বর তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। তিনি ধীরে ধীরে স্বর লক্ষ্য করিয়া পদবিক্ষেপ করিতে করিতে রাবিয়ার কক্ষদ্বারে উপনীত হইলেন। অগত

নীরব, পশু পক্ষী সকলই ঘুমঘোরে অচেতন, শুধু রাবিয়া জাগরিত থাকিয়া দয়াময় আল্লার নিকট কাতর-করুণ-কণ্ঠে নিবেদন করিতেছেন—"ওগো হৃদয়স্বামী, তোমাকে শত ধন্যবাদ; হে আমার অন্নদাতা প্রভু, তোমাকেও শত ধন্যবাদ। তোমার নিকট যে মাথা রাখিবার স্থান ও জীবন ধারণের অন্নজল পাইতেছি তজ্জন্যও তোমাকে ধন্যবাদ; আর তোমার আদেশে যে যন্ত্রণা পাইয়াছি তাহার জন্য আরও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমি জ্ঞানহীনা, তোমার দয়াতেই অনাথের নাথ পরমেশ্বর, তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি। হে জগতের পতি, তোমার কাছে আর কি চাহিব? দয়াময় প্রভো, তোমাকে ডাকিলেই যে অনন্ত অপার্থিব সুখ পাই, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তো তাহার তুলনা নাই। ইচ্ছা হয়, সর্ব্বক্ষণ কেবল তোমাকে হৃদয়ে বসাইয়া সেই সুখ তোমাকেই দেখাই—আর আনন্দে তোমার নাম জপিতে জপিতে নাচিয়া বেড়াই।"

—"প্রভো, যাতনা পাইলে দুঃখ হয় তাই কাঁদি, নিজের জন্য নহে, ভাবি আরও কত শত শত জন বেদনায় তৃপিতেছে। জগৎপিতা! মানব দুর্ব্বল, কেন তুমি তোমার দুর্ব্বল সন্তান-সন্ততিদিগকে এত দুঃখ কষ্ট দেও? হে নিখিলনাথ—অনাথের গতি,—পতিতের পাবন, তুমি জান—ইচ্ছা হয়, সর্ব্বদাই ভক্তিভরে তোমার সেবায় রত থাকি; কিন্তু দয়াময়, আমি অজ্ঞের দাসী, তাই প্রত্যহ বিলম্বে পদতলে উপস্থিত হই। তুমি করুণাময়, আমায় ক্ষমা করিও। আমি অকৃতজ্ঞ নহি, তোমাকে শত শত ধন্যবাদ।"

গৃহকর্ত্তা এই সব দেখিয়া শুনিয়া অধীর হইয়া পড়িলেন। সামান্য দাসীর এইরূপ নিষ্কাম ভগবৎপ্রেম দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইলেন। যাহাদ্বারা একদিন কত যন্ত্রণা পাইয়াছেন, তাহারই মঙ্গলের জন্য করুণ প্রার্থনা! এমন সরলভাবে জগতের হিতকামনা কতই না বিরল। গৃহকর্ত্তা উন্মত্তের ন্যায় প্রাসাদে ফিরিলেন। লজ্জা ভয় ও ভক্তি একযোগে আসিয়া তাঁহার হৃদয় আলোড়িত করিয়া দিল।

সে দিবস তাঁহার চিন্তায় অতিবাহিত হইল। পর রাত্রে তিনি পুনরায় রাবিয়ার কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, তাঁহার কক্ষ স্বর্গীয় আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে এবং রাবিয়া তন্ময়চিত্তে কাতরস্বরে প্রার্থনা করিতেছে—"ওরে, ভিখারী, ওরে অন্ধ, ওরে ক্ষুধার্ত্ত, ওরে পশু, আয়, আমার দুঃখী ভাই বোন, আমার বুকে আয়, তোদের যন্ত্রণা যে আমার অসহ্য! তোদের দুঃখ, কষ্ট, জরা, ব্যাধি আমাকে দিয়া তোরা শান্তিলাভ কর। দয়াময়, যতদিন তুমি তাহাদিগকে সুখী না কর ততদিন আমি সুখ চাহি না!"

—"প্রভো! তুমি রহিম, তুমি রহমান, যতদিন তুমি পাপীকে পরিত্রাণ না কর, তাপিতকে শান্তি না দাও, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান না কর, ততদিন আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিও না। যদি কেবল সুখের জন্য স্বর্গ চাই, তবে সে স্বর্গ আমার পক্ষে হারাম হউক, যদি কেবল নরকের ভয়ে মুক্তি চাই, তবে সেই নরকেই আমার বসতি হউক; তোমার সাধনাই আমার স্বর্গ, তোমার বিচ্ছেদই আমার নরক, তোমার আদেশই আমার অবলম্বন, তোমার ইচ্ছাই আমার সুখ।"

গৃহস্বামী আর পূর্ব্বের সেই গৃহস্বামী নহেন। এখন তাঁহার পদমর্য্যাদার অভিমান নাই, ধন ঐশ্বর্য্যেরও গৌরব নাই। রাবিয়ার নিঃস্বার্থ প্রেম দর্শনে তিনি দাসী ও প্রভুর বিভিন্নতা ভুলিয়া গেলেন। চতুর্থ দিবসে তিনি রাবিয়াকে ডাকিয়া বলিলেন,—"দেবী, আমায় রক্ষা করুন, আপনি রমণীকুলের উজ্জ্বল শিরোমণি। আপনারই প্রভাবে আমার মোহজনিত অন্ধকার দূরীভূত হইয়াছে। আমি এখন জগতপিতা করুণাময় পরমেশ্বরকে চিনিতে পারিয়াছি। মা! আমি আপনার নির্ব্বোধ সন্তান, আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার স্বার্থহীন পরের হিতকামনা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে, ভক্তির সহিত আপনাকে মুক্তিদান করিলাম, আপনি এখন স্বাধীনভাবে বিচরণ করুন।"

রাবিয়া লজ্জাবনত মস্তকে উত্তর দিলেন,—"প্রভো! আমাকে নিরাশ্রয়া করিবেন না। আমি অনাথিনী, আপনার নিকট আশ্রয় পাইয়া খুব সুখেই আছি। কি দোষে আমায় পরিত্যাগ করিতেছেন? আপনার দয়ায় আমার অন্ধকার হৃদয় আলোকিত হইয়াছে। সেবা দ্বারা দাসীরূপে সামান্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছি মাত্র। আমায় তাড়াইয়া দিবেন না।"

গৃহকর্ত্তা পুনরায় ভক্তিগদগদকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—

"ওহো! আপনি মানবী নহেন, স্বর্গীয় তপস্বিনী। নরাধম সন্তানের পাপপূর্ণ গৃহ আপনার বাসের উপযুক্ত স্থান নহে। আমার কৃত কার্য্যের জন্য আমি অনুতপ্ত হইতেছি, সন্তান জ্ঞানে ক্ষমা করিয়া আশীর্ব্বাদ করুন। এখন হইতে আপনি মুক্ত, স্বেচ্ছায় বিচরণ করুন।"

পিঞ্জরাবদ্ধ পাখী মুক্তি পাইলে যেমন উৎফুল্ল হইয়া কেবল আকাশে উড়িয়া উড়িয়া আনন্দে গান করিয়া বেড়ায়, হজরত রাবিয়াও সেইরূপ মুক্তিলাভের পর দিবানিশি প্রভু পরমেশ্বরের গুণগানে মত্ত হইলেন। কোরআন শরীফ পাঠ এবং আরাধনা উপাসনাতেই তাঁহার দিবসরজনী কাটিয়া যাইতে লাগিল। অতঃপর তিনি এক জঙ্গলে গিয়া কঠোর যোগাভ্যাসে রত হইলেন; সেই অরণ্য প্রদেশেই তিনি সিদ্ধিলাভ করেন আল-এসলাম।

মিসেস্ এম, আহমদ্।

বলিদান

প্রথম পরিচ্ছেদ

সে দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে বৃদ্ধ মহেশপাল তাহার গৃহের দাবায় বসিয়া তাম্রকূট সেবন করিতেছিল। অনতিদূরে গৃহের অঙ্গনে নবীন পরিচ্ছদ-ভূষিত একটি সুকুমার শিশু একটা মহিষ-শিশুর সহিত ক্রীড়া করিতেছিল। বালক একবার কচিহাতে উহার কণ্ঠালিঙ্গন করিতেছিল, একবার উহাকে ঘাস খাওয়াইতেছিল, আবার আদর করিয়া উহার মুখে চুম্বন দিতেছিল।

বৃদ্ধ মহেশ মুগ্ধনেত্রে বালকের ক্রীড়া দেখিতেছিল। দেখিতে দেখিতে সে তন্ময় হইয়া পড়িল। কলিকায় তামাক পুড়িয়া কখন ভস্ম হইয়া গেল, সেদিকে তাহার লক্ষ্যই রহিল না।

এই শিশু মহেশের পৌত্র। ইহার নাম দুলাল। দুলালের পিতা রমেশ আজ প্রায় দুই বৎসর হইল বৃদ্ধ পিতার বুকে দারুণ আঘাত করিয়া এক অসীম অজানা রাজ্যে প্রস্থান করিয়াছে। তদবধি বৃদ্ধ মহেশ পুত্রের চিহ্ন এই ক্ষুদ্র পৌত্রটির মুখের পানে চাহিয়া বাঁচিয়া আছে। হৃদয়ের হে-মমতা সমস্ত শিশুটিকে ঢালিয়া দিয়া, তাহাকে অবলম্বন করিয়া, সংসারের পরীক্ষা-সাগরে ভাসিয়া চলিয়াছে। বৃদ্ধ এক মুহূর্ত্ত পৌত্রকে কাছছাড়া হইতে দেয় না,—কি জানি নিষ্ঠুর ভগবান যদি অন্ধের লড়ি, বৃদ্ধের বুকজুড়ান ধনটিকে কাড়িয়া লন। এইরূপে পৌত্রটিকে বুকের ভিতর চাপিয়া রাখিয়া বৃদ্ধ সংসারের সকল শোক তাপ ভুলিয়াছিল। বৃদ্ধ তাহার চোখের মণি, আঁধার ঘরের আলো, সুখশান্তি আশা-ভরসার কেন্দ্র এই ছোট শিশুটির মুখে হাসি দেখিলে আহ্লাদে গদগদ হইত;—কিরূপে পৌত্র সুখী হইবে, কিরূপে তাহার মুখে একটু হাসি ফুটিবে কেবল তাহারই চিন্তা করিত।

একদিন নিকটস্থ প্রান্তরে কয়েকটি মহিষ চরিতেছিল। দুলাল একটি মহিষের বাচ্চা দেখিয়া বলিল, "দাদু, আমি ঐ বাচ্চাটি নেব।" অমনি দরিদ্র বৃদ্ধ ৫৲ টাকা মূল্যে ঐ বাচ্চাটি কিনিল। তদবধি উহা মহেশের গৃহে আছে। সকাল সন্ধ্যায় দুলাল উহাকে ঘাস খাওয়ায়, উহার সহিত উঠানে ছুটাছুটি করে।—আর বৃদ্ধ ঘরের দাবায় বসিয়া অতৃপ্তনয়নে পৌত্রের ক্রীড়া দেখে। এইরূপ দুলাল প্রতিদিনই ক্রীড়া করে, প্রতিদিনই বৃদ্ধ তাহা দেখে, তবুও তাহার তৃপ্তি হয় না। স্নেহের এমনি মোহ!

অল্পদিনের ভিতর মহিষটাও তাহাদের পরিবারের একজন হইয়া উঠিল। অবোধ পশুরাও স্নেহের মর্ম্ম বুঝে! মহিষটা দুলাল নিকটে গেলে তাহার গা' চাটিয়া দেয়, দুলাল তাহার পিঠে চড়িলে তাহাকে লইয়া ধীরে ধীরে বেড়ায়। মহিষকে আর বাঁধিয়া রাখিতে হয় না। সে এখন আপন ঘর চিনিয়াছে, খেলার সাথী দুলালকে চিনিয়াছে। দুলালকে দেখিলে পুচ্ছ ঊর্দ্ধে তুলিয়া হর্ষধ্বনি করে। দুলালও দিবারাত্রি আহার নিদ্রা ভুলিয়া মহিষের সহিত ক্রীড়া করে। বৃদ্ধ মুগ্ধ ভাবে তাহা দেখে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তখন আশ্বিন মাস। পূজা আসিয়া পড়িয়াছে। হিন্দুদিগের ঘরে ঘরে মহোৎসব লাগিয়াছে। বোধ হয় ত্রিদিব হইতে এই আনন্দ ও উৎসবের বন্যা প্রতিবৎসর চারিটী দিনের জন্য পৃথিবীতে আসে। তাই চারিটী দিন পৃথিবীকে বিপুল আনন্দে ও উৎসবে মাতাইয়া আবার দীর্ঘ দিনের জন্য কোন্ অজানা দেশে চলিয়া যায়। এই দিনে হিন্দুদিগের

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার প্রাণে এক অননুভূতপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার হয়। নিতান্ত দরিদ্র ব্যক্তিগণও সাধ্যানুসারে উৎসবের অনুষ্ঠান করে, আত্মীয়বর্গের জন্য নূতন পরিচ্ছদাদি ক্রয় করে,—শোক দুঃখ ভুলিয়া আনন্দে মত্ত হয়।

দরিদ্র মহেশ পৌত্রের জন্য বহুমূল্য ভেলভেটের পরিচ্ছদ কিনিয়াছিল। দুলালের এই চমৎকার পোষাক পাইয়া কি আনন্দ! দেখিয়া বৃদ্ধ আনন্দে আত্মহারা হইল।

পরদিন প্রভাতে যখন জমিদার বাটির নহবৎখানায় সুমধুর রসনচৌকী বাজিয়া মায়ের আগমনের কথা চতুর্দ্দিকে প্রচার করিয়া দিল, তখন বৃদ্ধ মহেশের প্রাণেও কেমন অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দ জাগিয়া উঠিল। কিন্তু এই আনন্দ অপেক্ষাও, দুলাল নূতন পরিচ্ছদে সাজিয়া জমিদার বাড়ী প্রতিমা দেখিতে যাইবে, সমবয়স্ক সঙ্গীদিগকে আপনার সুন্দর পোষাক দেখাইবে, আনন্দে উৎফুল্ল হইবে,—এই কল্পনা তাহাকে অধিক উৎফুল্ল করিল। বৃদ্ধ দুলালকে সস্নেহে ঘুম হইতে জাগাইয়া বলিল "দাদু! আজ যে পূজা। উঠ, তোমার সুন্দর পোষাক পর, চল, ঠাকুর দেখে আসি।" দুলাল ঘুম হইতে জাগিয়া সানাইর সুর শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল। তাহার মাতা তাহাকে সুন্দর পোষাক, জরির টুপি, লাল মোজা ও বার্নিস করা কালো জুতা পরাইয়া দিল। দুলাল দাদুর কোলে চড়িয়া বলিল, "দেখ দাদু! আমাকে কেমন সুন্দর লাজাল ছেলের মত দেখায়।" তৎপর দাদুর সাধারণ বেশের দিকে চাহিয়া বলিল, "আর তোমাকে চাকরের মত দেখায়,—দূর্! দূর্!" এই আনন্দের সময় সহসা বৃদ্ধের মনে পুত্রের কথা জাগিয়া উঠিল,—টপ্‌টপ্ অশ্রুবিন্দু তাহার শ্মশ্রুল গণ্ড বাহিয়া ঝরিতে লাগিল। বালক ভাবিল, তাহার দাদু বুঝি চাকর বলাতে অভিমানে কাঁদিতেছে। ব্যথিত হইয়া, কচিহাতে দাদুর কণ্ঠ জড়াইয়া বলিল, "না দাদু, আমি দুষ্টুমি করে বলেছি। তুমিও লাজাল, আমিও লাজাল,—কেমন? তুমি কেঁদনা দাদু, তাহলে আমারও যে কান্না পায়।" বৃদ্ধ দুলালকে বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিয়া একটি প্রগাঢ় চুম্বন করিল।

সহসা মহিষ-শিশুর কথা মনে পড়াতে দুলাল দাদুর কোল হইতে নামিয়া বলিল, "ওহো! ছোনাকে ত আমার নতুন পোষাক দেখাতে মনে নেই। তুমি একটু দাঁড়াও ত দাদু, আমি ছোনাকে পোষাক দেখিয়ে আসি। নইলে ছোনা রাগ করবে যে।" দুলাল সোণাকে পোষাক দেখাইতে গেল। ইতাবসরে বৃদ্ধ ঘরের দাবায় বসিয়া তামাকু সাজিতে লাগিল। তাম্রকূট সেবন করিতে করিতে পৌত্রের খেলা দেখিতে লাগিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার কত ভবিষ্যৎ সুখের কথা মনে জাগিল, বৃদ্ধ মনে মনে কত আকাশ-কুসুম রচনা করিল। মানুষ আশাতেই বাঁচিয়া থাকে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সেদিন বৈকাল বেলা মহেশ তাহার পৌত্রকে বলিল, "দাদু! শিগ্‌গির করে খেয়ে নেও। সন্ধ্যাবেলা আরতি দেখ্‌তে যাবে। তখন কত ঢাক ঢোল বাজবে, আর তালে তালে আরতি হবে। রাত্রিরে যাত্রাগান হবে, কিন্তু অত রাত্রি পর্য্যন্ত তুমি জেগে থাক্‌তে পার্বে না,—অসুখ হবে।"

দুলাল মাথা দুলাইয়া বলিল, "আমি যাত্‌লা দেখ্‌ব দাদু। যাত্‌লা কেমন ভালো। কত লাজা আসে,—আল লাজাল ছেলে আসে। তাদের দুকলের আমার মত পোষাক।" তারপর যাত্রার যুদ্ধের কথা মনে পড়াতে ভীতকণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা দাদু যাত্‌লাতে ললাই করে কেন? তলোয়াল নিয়ে-ইছ্ তাতে কত ধার, গায়ে লাগ্‌লে দুম্‌করে কেটে যায়,—দেই তলোয়াল নিয়ে ললাই করে। তাতে মরে যায় না? তবে ললাই করে কেন!"

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিল, "দূর ওগুলো সত্যি তলোয়ার নয়,—আর সত্যি সত্যি কেউ মরেও না। ওসব ভোঁতা তলোয়ারে কাটে না।"

শিশু একটু সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল, "গলায় লাগ্‌লেও কাটে না, হাতে লাগলেও কাটে না, আর পায়ে?—"

"না কোন জায়গায় লাগলেও কাটে না।" "সত্যি? তবে আমায় একটা তলোয়াল কিনে দেবে?" "আচ্ছা।"

সহসা বাহির হইতে কে ডাকিল, "মহেশপাল বাড়ী আছ?" মহেশ উত্তর করিল, "কে গো?"

বাহির হইতে উত্তর আসিল, "জমিদার বাড়ীর পাইক। একবার বাইরে এস,—জমিদার মহারাজের আদেশ নিয়ে এসেছি।"

বৃদ্ধের বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সহসা জমিদার তাহাকে কি আদেশ দিলেন ভাবিয়া বৃদ্ধ অধীর হইল। দুলালকে ঘরের ভিতর যাইতে বলিয়া, মনে মনে ইষ্টনাম জপিতে জপিতে বৃদ্ধ বাহিরের দিকে অগ্রসর হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বৃদ্ধ যাহা আশঙ্কা করিয়াছিল তাহাই হইল। জমিদারের পাইক বলিল, "কলা অষ্টমী পূজা। বলির জন্ত মোটে সাতটী মহিষ পাওয়া গিয়াছে। চার জোড়া মহিষ বলি দেওয়া জমিদারদের রীতি, কিন্তু অনেক স্থানে খুঁজিয়াও আর একটি মহিষ মিলিল না। তাই কর্ত্তা মহারাজ তোমার মহিষটি লইয়া যাইতে আদেশ করিয়াছেন। সে জন্ত তোমাকে দস্তরমত দাম দেওয়া হইবে।"

বৃদ্ধের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এই মহিষ তাহার দুলালের খেলার সাথী, তাহার প্রাণ। এই মহিষ লইবার জন্ত জমিদারের আদেশ! বৃদ্ধ ভীত কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "কিন্তু এই মহিষ"—পাইক বলিল "কিন্তু টিন্তু বুঝিনা। জমিদারের আদেশ দিতেই হইবে। মিছামিছি কিন্তু টিন্তু করিয়া কর্ত্তার বিরাগভাজন হইবে,—দামও পাইবে না।"

বৃদ্ধ নিরুপায় ভাবে হাত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে বলিল, "ভাই, এই মহিষ আমার নাতিটার বড় আদরের জিনিষ, সে ওকে আপন ভাইয়ের মত দেখে। ওকে নিলে আমার নাতি বাঁচিবে না।"

উচ্চ হাস্ত করিয়া পাইক বলিল, "হেঃ, মহিষ হ'ল কিনা মানুষের ভাই, কত রঙ্গই জান। এ বুঝি টাকা আদায়ের ফন্দী। নাও,—মহিষটা দাও। আমি দশগুণ দাম আদায় করে দেব, তবে (চতুর্দ্দিকে চাহিয়া নিম্নস্বরে) আমাকে অর্দ্ধেক দিবে।"

বৃদ্ধ পাইকের হাত ধরিয়া কাতর ভাবে বলিল, "ভাই, তুমি এক কাজ কর। কর্ত্তা মহাশয়কে যাইয়া সকল কথা বল,—আমি তোমায় ২৲ টাকা বখ্‌শিশ দিব, আর আমি নিজেও তোমার সঙ্গে গিয়ে তাঁকে সব কথা বুঝিয়ে বল্‌ব।"

বখ্‌শিশের লোভে পাইক স্বীকৃত হইল। সে মহেশকে সঙ্গে করিয়া জমীদার বাটীতে প্রস্থান করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কাছারি ঘরে মোসাহেবপরিবৃত জমিদার গজেশ বাবু বসিয়া রক্তবর্ণ তরল পদার্থের সেবা করিতেছিলেন। স্বচ্ছ স্ফটিকপাত্রে রঙ্গীন পানীয় টল টল করিতেছিল, আর মো-সাহেবগণ একটু প্রসাদ পাইবার আশায় পাত্রের প্রতি সঘন লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতেছিল। জমিদার বাহাদুর স্বহস্তে পাত্র পূরিয়া স্বয়ং এক চুমুক পান করিয়া প্রসাদ সেবকদলের ভিতর বণ্টন করিতে ছিলেন। সেবকদল জমিদারের দিকে পেছন ফিরিয়া, চক্ চক্ করিয়া প্রসাদ গলাধঃকরণ করিতেছিল। জমিদারের চক্ষের সম্মুখে তাহারা মদ খাইতে পারে না,—জমিদারের দিকে পশ্চাৎ দর্শন করাইবার ইহাই কারণ। ক্রমে স-সভাসদ জমিদারের চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করিল, কণ্ঠ জড়িত হইয়া আসিল, সকলের 'দিল খোলাসা' হইয়া গেল. তাহারা নিজেদের বিভিন্নতা ভুলিয়া গিয়া নানা সুরে গান ধরিল।

এমন সময় পাইক মহেশকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া মাতালগণ সমস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল, "এসো দাদা এক চুমুক খাও।"

বৃদ্ধ অপ্রতিভ হইয়া সরিয়া গেল। জমিদার বলিলেন, "খাবে না তুমি?"

মহেশ কাতর ভাবে বলিল, "হুজুর, গরীবের সঙ্গে পরিহাস করেন কেন! আমি এসব খাইনা।"

সহসা মাতালদিগের হৃদয় ভক্তিরসাপ্লুত হইল। তাহারা গদ্‌গদভাবে বলিল, "আপনি মদ খান না, তা হ'লে আপনি নিশ্চয়ই শ্রীবিষ্ণুর অবতার,—বৈকুণ্ঠ ছেড়ে এই পাপ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। তবে দিন্ একবার আপনার ঠ্যাং খানা, আমরা পূজা করে কৃতার্থ হই।"

জমিদার কাঁদিতে কাঁদিতে মহেশের পা জড়াইয়া বলিলেন, "মাতঃ! আপনি বলে দিন কোন্ পথে গেলে রাজা হরিশ্চন্দ্রের মত সশরীরে স্বর্গ প্রাপ্ত হব? আহা! সেখানে নিত্য নিত্য নাকি ফুল ফোটে। সেখানে কেবল ঠাণ্ডা বাতাস ঝির্ ঝির্ করিয়া বহে। মাতঃ! আপনার শ্রীচরণে প্রণাম করি, আমায় একবার সেখানে—।" জমিদার মহেশের পায়ে মাথা খুঁড়িতে লাগিল। ভীত, বিস্মিত মহেশ সরিয়া গেল, জমিদার আকুল ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,

"মা বিকুর দয়া হল না। তবে আমি এখনই প্রাণত্যাগ করি, ভক্তগণ হরিধ্বনি দাও।" জমিদার গৃহতলে ধরাশায়ী হইয়া পড়িলেন, এবং পাষাণে মস্তক প্রতিহত হইয়া বড় আঘাত পাইলেন। সকলে মিলিয়া তাহাকে ধরিয়া তুলিল। তিনি উঠিয়া গৃহের দরজায় বসিলেন, সকলে বাতাস করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে তিনি মহেশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পাইককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই মহিষ নাকি? দেখি কত বড় শিং?"

পাইক বলিল, "আজ্ঞে এর নাম মহেশ পাল, এরই মহিষ আছে।"

জমিদার জড়িত স্বরে বলিলেন, "তবে বাবা, তোমার মহিষটা কাল আমায় একটু ধার দেবে। বলি দিয়ে আবার ফিরিয়ে দেব।"

মহেশ কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল, "মহারাজ! মহিষটা আমার নাতির। সে উহাকে বড় ভালবাসে। উহা দিলে সে কাঁদিয়া অস্থির হইবে। আমায় ক্ষমা করুন।

জমিদার পার্শ্ববর্ত্তী সভাসদের স্কন্ধদেশে মাথা রাখিয়া বলিলেন, "কাঁদবে ত আমার কি? আমি মহিষ চাই বাবা। তোমার নাতির জন্য আমার বলি বন্ধ হবে নাকি বাবা? কি বল জলধর?" সভাসদগণ একবাক্যে বলিল, "নিশ্চয়ই না। তা' কি হয়?"

বৃদ্ধ সকরুণ দৃষ্টিতে জমিদারের দিকে চাহিয়া বলিল, "মহারাজ! গরীবের মা বাপ। আপনি সমস্ত বুঝিয়া বিচার করুন। দেখুন আমার ঐ একটিমাত্র নাতি। আমি বৃদ্ধ, পুত্রহীন। একমাত্র ঐ নাতির মুখের দিকে চেয়ে বেঁচে আছি। আমার নাতি ঐ মহিষটীকে এত ভালবাসে যে ভাইও ভাইকে এত ভালবাসে না। ঐ মহিষ কাড়িয়া নিলে তাহার প্রাণ বাঁচান দায় হইবে। তাই আমি মহিষ দিতে চাই না। আর, আর—ছেলে বেলা হ'তে যে মহিষ-শিশু পালন করেছি তা কি বলির জন্য দিতে পারি? ছলালের মত সেও যে আমার প্রাণের জিনিস। কর্ত্তামহাশয়, আমায় ক্ষমা করুন।"

সভাসদ বলরাম মদের পিপাসুক পান করিত, কিন্তু মাতাল হইত না। সে বিজ্ঞভাবে বলিল, "নে নে, তোর বক্তিমে রাখ্। দেবীর জন্য মোষ দিবি সেজন্য ভারি ত দুঃখ। এ ত তোর নিজ থেকেই দেওয়া উচিত। পুজোয় তোর মোষ লাগ্‌বে সেত তোর ভাগ্যি!

বৃদ্ধ ধীরভাবে বলিল "ভাগ্যি নয় কর্ত্তা। আমার মনে হয় এ সব ভুল। আমরা না বুঝে এ সব কি কচ্ছি? ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে কতকগুলি নিরীহ পশুকে দেবীর সাম্‌নে বলি দিচ্ছি। আর তাদের না বাপ ভীষণ দুঃখে জর্জ্জরিত হয়ে আমাদিগকে কত অভিশাপ কচ্ছে। আমাদের ছেলেকে কেউ যদি অমন ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে হত্যা করে, তা হ'লে আমরা কি হত্যাকারীকে ক্ষমা কর্ত্তে পারি? আমরা কি বিচারের জন্য, তার সর্ব্বনাশের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি না?

"আপনারা, শুধু আপনারা কেন, আমার মনে হয় সকলেই বড় ভুল বুঝেছেন। মা, বিশ্বজননী,—পৃথিবীর প্রাণীমাত্রেই তাঁর সন্তান। তিনি মা হ'য়ে সন্তানের রক্তপান কর্ব্বেন এ কি সম্ভব কথা? আপনারা শাস্ত্রের দোহাই দিচ্ছেন যে আপনারা মহিষাসুর বধ কচ্ছেন। কিন্তু" মাতালগণ বৃদ্ধের কথা শুনিল না, বুঝিলও না।

জমিদার হুঙ্কার করিয়া কহিলেন, "ওসব শুন্‌তে চাই না বাবা! মহিষ চাই।"

মহেশ যুক্তকরে বলিল, "মহারাজ, আমায় ক্ষমা করুন।" "না, কিছু শুন্‌তে চাই না। মহিষ চাই। নতুবা গর্দ্দান্ নেব বাবা। রাম, যাও ত বাবা, এর মহিষ নিয়ে এস। কাল বলি হবে। আমি নিজ হাতে বলি দেব। সাত পুরুষ যাবত পূজায় চার জোড়া মোষ বলি দিচ্ছি। তার ব্যতিক্রম করে কি বাপ দাদার মুখে কালি দেব, বাবা।" বৃদ্ধ মাথায় হাত দিয়া গৃহের মেঝেয় বসিয়া পড়িল, সে কাতর হৃদয়ে ভগবানের সাহায্য প্রার্থনা করিল। জানিনা ভগবান দুর্ব্বলের প্রার্থনা শুনিলেন কিনা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরদিন যথাসময়ে জমিদার বাটীতে বলির বাজনা বাজিয়া উঠিল। দুলালের মহিষ বলির জন্য জমিদারগৃহে নীত হইয়াছে। দুলাল আজ আর জমিদার বাড়ী ঠাকুর দেখিতে যায় নাই। সে সমস্ত বেলা মাদুর বুকে মাথা গুঁজিয়া দুলিয়া দুলিয়া কাঁদিয়াছে। বৃদ্ধ মহেশও পৌত্রের সহিত বালকের মত গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিয়াছে। লোকে বলে

দুর্ব্বলের রোদনই সম্বল। কিন্তু, বোধ হয়, শুধু রোদনই সম্বল নয়। দুর্ব্বলের আরও একটি বল আছে যে বলের নিকট শত শত শক্তিশালী ব্যক্তির পাশবিক বলও পরাজিত হয়। স্বয়ং ভগবান দুর্ব্বলের সহায়।

দ্বিপ্রহরে জমিদার বাটীর পূজার অঙ্গন লোকে পরিপূর্ণ হইল। দলে দলে লোক বলি দেখিতে আসিল। যথাসময়ে পূজার অঙ্গন ঢাক ঢোলের শব্দে, সমবেত লোকের আনন্দকোলাহলে ও প্রাণভয়ে ভীত অজগুলির কাতর চীৎকারে ভরিয়া গেল। পাঁঠাগুলির কাতর চীৎকার শুনিলে প্রাণ আকুল হইয়া উঠে। জানিনা মাতা জগজ্জননী স্বীয় সন্তানের রক্তপানের জন্যই ধরাতে আগমন করেন কিনা—আর সবল মানবদিগের দুর্ব্বল জীবগণের প্রতি এরূপ নিষ্ঠুরাচরণ দেখিয়া তাঁহার প্রাণে বাজে কিনা।

ক্রমে ক্রমে চল্লিশটি ছাগশিশু জগজ্জননীর শোণিত পিপাসার তৃপ্তির জন্য প্রাণদান করিল। যূপকাষ্ঠ ও খড়্গ রুধিরসিক্ত হইল, পূজার অঙ্গনে রুধির স্রোত বহিল। ছাগবলি অন্তে মহিষ বলি আরম্ভ হইল। এবারে স্বয়ং জমিদার খড়্গ হস্তে বলির অঙ্গনে আসিলেন। তাহার আঁট-সাঁট কাপড় পরা, কোমরে রক্তবর্ণ গামোছা জড়ান। ললাটে, বক্ষে, বাহুতে রক্তচন্দনের ছাপ। জমিদারকে দেখিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলী জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। জমিদারের একটি অষ্টম বৎসর বয়স্ক পুত্র চাকরের স্কন্ধে চড়িয়া বলি দেখিতেছিল। সে কি জানি কি ভাবিয়া চাকরের স্কন্ধ হইতে নামিয়া ভিড় ঠেলিয়া বলির স্থানের দিকে চলিল। উপস্থিত লোকেরা জমিদারের পুত্রকে দেখিয়া পথ ছাড়িয়া দিল। বালক যাইয়া যূপকাষ্ঠের সম্মুখে দাঁড়াইল। খুব নিকটে দাঁড়াইয়া বলি দেখিবে ইহাই তাহার ইচ্ছা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পুরোহিত একটি একটি করিয়া মহিষ উৎসর্গ করিয়া দিতে লাগিলেন, আর জমিদার শাণিত খড়্গাঘাতে তাহাদিগকে দ্বিখণ্ডিত করিতে লাগিল। রুধিরে সকলের দেহ রঞ্জিত হইল। বালক বড়ই উৎসাহের সহিত বলি দেখিতে লাগিল। বাল্যকাল হইতেই নির্ম্মমতার ভিতর সে লালিত, কাজেই জীবের কষ্ট দেখিয়াও তাহার কোমল-হৃদয়ে সমবেদনা জাগিয়া উঠে না।

ক্রমে ক্রমে সাতটী মহিষ বলির পর দুলালের মহিষ যথার্থ আনীত হইল। মহিষটা পূর্ব্বেই আপনার অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিল। যূপকাষ্ঠে বদ্ধ করিবার সময় সে বিস্তর ধস্তাধস্তি করিল। প্রায় দশ পনর জন লোকে বহুক্ষণ চেষ্টার পর তাহাকে বশে আনিল। তখন মহিষটার চক্ষু দুটি জলে ভরিয়া গেল, কিন্তু পশুর দুঃখে কয়জনের প্রাণ গেল? ভীষণ নাদে ঢাক বাজিয়া উঠিল, জমিদার উদ্যত খড়্গহস্তে মহিষের সম্মুখে আসিলেন। পুরোহিত মন্ত্র পড়িয়া উৎসর্গ করিয়া দিলেন। জমিদার দুই হস্ত ধৃত খড়্গ আকাশের দিকে তুলিলেন, এবং তৎপর বিদ্যুৎগতিতে তাহা মহিষের গ্রীবা লক্ষ্য করিয়া নামাইলেন। সকলে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। কিন্তু সহসা এইরূপ কোলাহলে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত আগত বুঝিতে পারিয়া মহিষটা একবার বাঁচিবার শেষ চেষ্টা করিল। সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করিয়া, পদচতুষ্টয় সাহায্যে সে উঠিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিল। তাহার পদপ্রহারে নিকটবর্ত্তী লোকেরা (যাহারা মহিষটা চাপিয়া ধরিয়াছিল) বহুদূরে ছিটকাইয়া পড়িল, জমিদার পুত্র উল্টাইয়া মহিষের ঘাড়ের উপর যাইয়া পড়িল। এই সমস্ত কাণ্ড মুহূর্ত্তের ভিতর ঘটিল। তারপর যাহা ঘটিল তাহাতে সকলে হাহাকার করিয়া ছুটিয়া আসিল; কিন্তু তখন জমিদারের খড়্গ যূপকাষ্ঠ-সংলগ্ন মৃত্তিকা ভিতরে প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল, আর তাহার দুই পার্শ্বে দুটি ছিন্ন শির পড়িয়া গড়াইতেছিল,—একটি মহিষের আর অন্যটি জমিদার পুত্রের !!! মানব ও মহিষের শোণিত বলির অঙ্গন রঞ্জিত করিয়া বহিতেছিল। সমবেত লোকগুলি ভীষণ আর্ত্তনাদ সহ যূপকাষ্ঠ সন্নিধানে ছুটিয়া আসিল, জমিদার মূর্চ্ছিত হইয়া মৃত্তিকাতলে পড়িয়া গেলেন। আনন্দ, কোলাহল, হট্টগোল মুহূর্ত্তের ভিতর থামিয়া গেল, চতুর্দ্দিকে বিপুল জনসঙ্ঘ হাহাকার করিয়া ছুটিতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

দুলাল সমস্ত দিন অনাহারে কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাটাইয়াছিল। দুলালের মাতা, পিতামহ তাহাকে কিছুতেই সুস্থ করিতে পারিতেছিলেন না। অবশেষে বৃদ্ধ তাহাকে ভুলাইবার জন্য সন্ধ্যার সময় আরতি দেখাইতে লইয়া গেল। কিন্তু জমিদার বাটী যাইয়া তাহারা বিস্মিত হইল। দেখিল পূজার দালান প্রতিমা-শূন্য, নাটমন্দির অন্ধকার, কোথাও লোক সমাগমের কোলাহল ও বাদ্যভাণ্ড রোল নাই। কেবল অন্দরের দিক হইতে রমণীকণ্ঠ নিঃসৃত করুণ বিলাপ-ধ্বনি সহ সন্ধ্যাসমীরণ আকুল ভাবে ছুটিয়া আসিতেছে।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু।

ভারতমহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। (মনু)

The woman's cause is man's : they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free ;
If she be small, slight-natured miserable,
How shall men grow ? (TENNYSON.)

বঙ্গানুবাদ :—স্ত্রী-পুরুষের উন্নতি অবনতি একসূত্রে গ্রথিত। নারী অনুন্নত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে পুরুষ কখনই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। (ব্রিটিশ রাজকবি লর্ড টেনিসন)

"I will be as harsh as truth, and as uncompromising as Justice ; I am in earnest——I will not excuse, I will not retreat a single inch——and I will be heard." (WILLIAM LLOYD GARRISON.)

মর্ম্মানুবাদ :—আমি সত্যের ন্যায় কঠোর ও ন্যায়ের মত অনমনীয় হইব। আমি বুদ্ধিমান, আমি কিছুতেই কোনরূপ সঙ্কুচিত হইব না ; আমি নিশ্চিত জানি, তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। (লয়েড গ্যারিসন)

১২শ ভাগ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩। | ২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

ভারতীয় স্ত্রী-বিশ্ববিদ্যালয়

ভারতমহিলার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে আমরা ভারতে স্বতন্ত্র স্ত্রী-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আসিতেছি। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য ভাব মিশাইয়া জাপানের স্ত্রী-বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে আমাদের দেশে স্ত্রী-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা না করিলে দেশের কল্যাণ সুদূরপরাহত। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার প্রতি আমাদের দেশের লোক উদাসীন, এদিকে তাহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। সুখের বিষয়, সম্প্রতি পুনা হিন্দু বিধবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত অধ্যাপক কার্ভে মহোদয় ভারতীয় স্ত্রী-বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে মনোযোগী হইয়া তাহার আয়োজন করিতেছেন। সমস্ত ভারতবর্ষের নারীদিগের জন্য একটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রস্তাব আমাদের নিকট সমীচীন মনে হয় না। স্ত্রী-বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দান করিতে হইবে, ইংরেজী শিক্ষার অবশ্যই ব্যবস্থা থাকিবে। ইংরেজী ভাষার সাহায্যে স্ত্রী-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের আমরা ঘোর বিরোধী। মাতৃভাষায় শিক্ষা দিতে গেলেই প্রাদেশিক ভাষার সাহায্য লইতে হইবে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ভাষা। সুতরাং প্রত্যেক প্রদেশের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সুতরাং অধ্যাপক কার্ভের চেষ্টা—সমগ্র ভারতের জন্য স্ত্রী-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা—সফল হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। তথাপি আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি তাঁহার চেষ্টা অন্ততঃ বিহারপ্রদেশের পক্ষেও সফল হউক,—ক্রমে সমস্ত প্রদেশেরই চক্ষু খুলিবে।

বৈশাখী পূর্ণিমা

বৈশাখী পূর্ণিমা মহাত্মা বুদ্ধের জন্ম, সিদ্ধিলাভ ও তিরোধানের দিন। তাঁহার মহা সাধনার ফলে তাঁহার জন্মভূমি এই ভারতবর্ষ ধন্য হইয়াছে। বুদ্ধদেবের জীবন ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে বাদ দিলে ভারতবর্ষের ইতিহাস নিতান্ত দরিদ্র হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষে বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম

আজ নিতান্ত ম্লান, কিন্তু দেশকে জাগিতে হইলে বুদ্ধের আত্মনির্ভর-মন্ত্র ভাল করিয়া আবার সাধন করিতেই হইবে। ভারতবাসী বুদ্ধের জন্মদিন এখন আর প্রায় স্মরণ করে না, বুদ্ধের গুণ স্বীকার করিতে চায় না। ইহা আমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে সুলক্ষণ নহে। দেশে কত সভা সমিতি হয়, কত নগণ্য লোকের জন্মোৎসব, মৃত্যু সাংবাৎসরিক সম্পন্ন হয়, কিন্তু কলিকাতায় কয়েকটী বৌদ্ধের মধ্যে ছাড়া বুদ্ধের জন্মোৎসবের কোন সাড়া দেশময় পাওয়া যায় না। সভা সমিতিতে বুদ্ধদেবের জীবনী আলোচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তদপেক্ষাও অধিক বাঞ্ছনীয়, হিন্দুগৃহে শিবরাত্রির মত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সাত্বিক ভাবে বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব ও তিরোধান দিনে বুদ্ধদেবের জীবন চিন্তা। তাহাতে আমাদের চরিত্রে পবিত্রতা ও ত্যাগ, শক্তি ও নির্ভর বাড়িবে, আমাদের জাতীয় জীবনে বলাধান হইবে। আমরা দেশের সাহিত্যিকগণকে এই বিষয়ে আলোনার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

কুমারী ষ্টেড

ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত "রিভিউ অব রিভিউস" পত্রিকার নাম শিক্ষিতসমাজে সুপরিচিত। এই পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক বিশ্ববিখ্যাত উইলিয়ম ষ্টেড ১৯১২ খৃষ্টাব্দে টিটানিক জাহাজের সহিত জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। ষ্টেড মানুষের মত মানুষ ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতে সমগ্র সভ্যজগতে শোকের তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর রিভিউ অব রিভিউসের সম্পাদনভার তাঁহার পুত্র আলফ্রেড ষ্টেড গ্রহণ করেন। সম্প্রতি গত ফেব্রুয়ারী মাস হইতে স্বর্গগত ষ্টেডের কন্যা কুমারী এষ্টেল ষ্টেড এই জগদ্বিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদন ভার গ্রহণ করিয়াছেন। কুমারী ষ্টেডের সম্পাদকতায় রিভিউসের তিন সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার দক্ষতার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি পিতার উপযুক্ত শিষ্যা; পিতার উচ্চ হৃদয় ও গভীর জ্ঞানের উত্তরাধিকারিণী। পিতৃ-পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই তিনি পত্রিকা সম্পাদন করিতেছেন। তাঁহার পিতার তিনি এক বিস্তৃত জীবন-চরিত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ও পিতৃভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। মহাত্মা ষ্টেড ভারতবর্ষের বন্ধু ছিলেন, কুমারী ষ্টেডও রিভিউসে সহৃদয়তার সহিত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন।

আমরা সাদরে এই নবীনা সম্পাদিকাকে অভিনন্দন করিতেছি।

ফ্রান্সের দশা

গত ফ্রাঙ্কোপ্রুসিয়ান যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয়ে কবিবর হেমচন্দ্র দুঃখে গাহিয়াছিলেন :—

তোরো তরে কাঁদি আয় ফরাসী-জননি,
কোমল কুসুম-আভা প্রফুল্ল-বদনি!
এত দিনে বুঝি গতি, ফিরিল কালের গতি,
হলে বুঝি দশাহীন ভারত যেমনি!
সভ্যজাতি মাঝে তুমি সভ্যতার খনি!
হলো যবে মহীতলে রোগ দগ্ধ কালানলে,
তুমিই উজ্জল করে আছিলে ধরণী,
বীরমাতা প্রভাময়ী শুচির যৌবনী।
ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার ছিলে, কতই যে প্রসবিলে,
শিল্প, নীতি, নৃত্যগীত, চকিত অবনী;
তোরো তরে কাঁদি আয় ফরাসী-জননি!
বুঝি বা পড়িলে এবে কালের হিল্লোলে,
পদ্মের মৃণাল যথা তরঙ্গের কোলে।"

পরাজিত হইয়াও ফ্রান্স তখন সামলাইয়া লইয়াছিল। পদ্মের মৃণালের মত তরঙ্গে ডুবিয়াও ফ্রান্স পুনরায় মাথা তুলিয়াছিল। আমরা আশা করি, বর্ত্তমান আঘাতও ফ্রান্স সহিতে পারিবে, মিত্রশক্তির সাহায্যে এই জীবন-মরণ যুদ্ধে ফ্রান্স জয়লাভ করিবে। কিন্তু হায়! এ জয়েও যে নিদারুণ বেদনা! ফ্রান্সের যে ক্ষতি এই যুদ্ধে হইতেছে, তাহার পূরণ কত দিনে হইবে কে জানে! ভগবান্, তোমার অভিপ্রায় কি তুমিই জান! পৃথিবী যে এত পুত্রশোকাতুরা জননীর হাহাকার, এত বিধবার দীর্ঘনিশ্বাস আর সহিতে পারিতেছে না। আমরা বসুমতী হইতে ফ্রান্সের অবস্থা নিম্নে সংকলন করিয়া দিলাম।

ফরাসী সেনাপতি কাষ্টেলন বলিয়াছিলেন,—Rather than accept slavery at German hands, the French race will die upon the battle field,"—জার্ম্মাণ জাতির নিকট গোলামী গ্রহণ অপেক্ষা, জার্ম্মাণ জাতির পরা-

হীন হওয়া অপেক্ষা, মহারণপ্রাঙ্গনে সমগ্র ফরাসী জাতি আত্ম-বিসর্জ্জন করিবে। ফরাসী স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মরিতে ভয় পায় না, মরিতে পশ্চাৎপদ হইবে না। এই যুদ্ধের আঠার মাস পরে, ভারদুনের মহাযুদ্ধের শেষে ফরাসী জাতির অবস্থা কেমন হইয়াছে তাহা ভাবিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। ইংলিশম্যানের পত্রলেখক বিলাত হইতে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, "It is said that about one-fifth of the wives of France are now widows and that about a third of the mothers of France mourn a son to-day" অর্থাৎ ফ্রান্সের যত নারী বিবাহিতা তাহাদের একপঞ্চমাংশ, অথবা ষোল আনার মধ্যে প্রায় তিন আনার কিছু অধিক ফরাসী পত্নী বিধবা হইয়াছেন এবং ফ্রান্সের জননীদিগের মধ্যে এক তৃতীয় অংশ অথবা ষোল আনার পাঁচ আনার অধিক ফরাসী জননী আজ পুত্র-শোকাতুরা। ফ্রান্সের লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে চারি কোটি, ইহার মধ্যে বালক, বালিকা, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, কুমারী যুবতী এবং অবিবাহিত যুবক বাদ দিলে মোটের উপর এক কোটি নর-নারী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ; এই এক কোটি গৃহস্থের এক পঞ্চম অংশ অর্থাৎ কুড়িলক্ষ বিবাহিতা নারী এই যুদ্ধের জন্য বিধবা হইয়াছে; ফ্রান্সে এক কোটি জননী আছে যদি ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে ত্রিশলক্ষের অধিক সংখ্যক ফরাসী জননী আজ পুত্র-শোকাতুরা। মোটের উপর বলিতে হয়, ফ্রান্স এই দেড় বৎসরের অতি ভীষণ যুদ্ধে প্রায় ত্রিশ-লক্ষ সমর্থ ও যোগ্য সন্তানকে বলিদান দিয়া এখনও স্বীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছে। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এমন ভয়ানক নরবলি পৃথিবীর আর কোন সভ্যজাতি ইউরোপের ঐতিহাসিক কালের মধ্যে করিয়াছে কি না সন্দেহ। এমন স্বার্থত্যাগ, এমন ভীষণ নরবলি গত হাজার বৎসরের মধ্যে ইউরোপ দেখে নাই। একা ফ্রান্স যাহা করিল, একা ফরাসী জাতি যাহা দেখাইল, তাহাও সভ্যজগত পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই। কেবলই কি এইটুকু! One French woman out of three in mourning! the national life suspended, the savings of half a century thrown into the melting pot—ফ্রান্সের প্রতি তিনটি নারীর মধ্যে একটি শোক চিহ্ন ধারণ করিয়া আছেন, জাতির জীবন, ব্যবসায়-বাণিজ্য, কাজ-কর্ম্ম, আম-দানী রপ্তানী, আমোদ প্রমোদ, নাচতামাসা, আদান-প্রদান সবই বন্ধ। ফ্রান্সের সকলেই হয় যুদ্ধ করিতেছে, নহে ত যুদ্ধের উপকরণ সংগ্রহ করিতেছে, নহে ত তোপখানার কাজ করিতেছে; ফরাসী নরনারীর অন্য চিন্তা নাই, অন্য সাধনা নাই; তাহার উপর পঞ্চাশ বৎসরের সঞ্চয়—সঞ্চয়ী ফরাসী জাতির প্রত্যেক নর বা নারীর পঞ্চাশ বৎসরের সঞ্চিত সর্ব্বস্ব এই যুদ্ধের ব্যয় সঙ্কুলান জন্য গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে।

এ সবেও ফ্রান্সের কেহই নৈরাশ্যে অবসন্ন হয় নাই। যুদ্ধের কথা উঠিলেই ফরাসী নরনারীমাত্রেই বলিয়া থাকে, "ভয় কি, আমরা জিতিব, জার্ম্মাণজাতির পরাজয় সাধন করিবই। যদি না জিতিতে পারি, তবে মরিব!" হাসিমুখে এই কথা প্রত্যেক ফরাসী বলিতেছে; মরণে তাহাদের ভয় নাই; মরণটা যেন তাহাদের মধ্যে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রে কাহারও মরণ সমাচার আসিলে আর কেহ রোদন করে না, সবাই বলে, "সে ফ্রান্সের জন্য গিয়াছে—সে ত মরে নাই।" ফ্রান্সের সমরসচিব প্রত্যেকবার যত সৈন্য চাহিতেছেন, তত সৈন্য পিপীলিকাশ্রেণীর মতন ফ্রান্সের প্রত্যেক গ্রাম হইতে বাহির হইতেছে। এখন ফ্রান্সের সর্ব্বত্র চাস-বাসের কার্য্য নারী ও বালকগণেই চালাইতেছে। কদাচিৎ দুই চারিটি বৃদ্ধ ইহাদের কৃষিকার্য্যে সহায়তা করিতেছে। অথচ ফ্রান্সের ক্ষেত্রের প্রতি নেত্রপাত করিলে কেহ বুঝিতে পারিবে না যে, ফ্রান্সে যুদ্ধ চলিতেছে। ফ্রান্সের পূর্ব্বাংশের এক তৃতীয় অংশ শত্রু-কবলিত। ফ্রান্সের পুরুষগণ ত যুদ্ধ কার্য্যে সদা ব্যস্ত, ফরাসী নারী সংসাররক্ষায়, গৃহস্থালী বজায় করিতে সদা ব্যস্ত; ফ্রান্সে শোকার্ত্তের আর্ত্তনাদ নাই; পুত্রহীনা জননীর রোদনধ্বনি নাই, আছে কেবল ধীর, স্থিরভাবে কর্ম্মপ্রবাহ। এ দৃশ্য অদ্ভুত—অপূর্ব্ব—অসাধারণ; বেলজি-য়াম বিধ্বস্ত, সার্ব্বিয়া লোকশূন্য, পুরুষশূন্য, কিন্তু এই দুই দেশে ফ্রান্সের মতন অপূর্ব্ব কর্ম্মপরায়ণতা, অদ্ভুত কর্ম্ম-সন্ন্যাস দেখা যায় নাই, কেহ দেখিতে পায় নাই। ফরাসী-জাতি কেবল কাজ করিয়া যাইতেছে, আর নীরবে মরিতেছে। ফ্রান্সে হৈ চৈ নাই, গোলযোগ নাই, বিতণ্ডা

নাই, দলাদলি আড়াআড়ি নাই,—আছে কেবল কর্ম্ম। এই কুড়ি মাসের মধ্যে ফরাসীজাতি সর্ব্বত্র ত্রুটিবিচ্যুতি সামলাইতেছে, তোপ কামান গোলাগুলি ও যেদিন বন্দুকের সরবরাহে প্রায় জার্ম্মাণীর সমকক্ষ হইয়াছে। ভারদুনের যুদ্ধে ফরাসী জাতির অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা, অসাধারণ বীরত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে; জার্ম্মাণ সেনানায়কগণ কখনও স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই যে, তিন হাজার তোপ হইতে অনবরত গোলাবৃষ্টি ছয় সপ্তাহকাল ফরাসী সৈন্য সহিয়া থাকিতে পারিবে।

অথচ ফরাসীজাতি তাহাই সহ্য করিয়া, সেই দুর্ব্বার আক্রমণ, অনিবার্য্য গোলাবর্ষণ—যে গোলাবৃষ্টির মুখে পর্ব্বত কন্দর সব এক হইয়া গিয়াছে, তাহা সহ্য করিয়া, জার্ম্মাণ সেনার অপ্রতিহত আক্রমণ অনেকটা ব্যর্থ করিয়াছে। ভারদুন যুদ্ধের পরিণাম দেখিয়া সভ্য জগত আজ বিস্ময়ে অবাক হইয়াছে। জার্ম্মাণ সেনানায়কগণের যে চালের মুখে রুসবাহিনীকে গালিসিয়া ছাড়িয়া দূরে পলাইতে হইয়াছিল, সেই চাল ফ্রান্সের কাছে খাটিল না, ভারদুনের সম্মুখে প্রত্যেক গজ জমির জন্য জার্ম্মাণগণকে প্রাণপণ করিতে হইয়াছে; এখনও যুদ্ধ চলিতেছে, এখনও জমি লইয়া কাড়াকাড়ি চলিতেছে। ফরাসী জাতির এই অপূর্ব্ব বীরত্ব, এই অসাধারণ আত্মত্যাগ ও কর্ম্মসন্ন্যাস আজ জগতের আদর্শ হইয়াছে, সবাই অবাক হইয়া ফরাসীজাতির এই অপূর্ব্ব বীরত্ব দেখিতেছে। ফ্রান্সের কোন নগরে সে নাচতামাসা এবং আমোদ-প্রমোদের উল্লাসতরঙ্গ নাই, কিন্তু কোন কিছু বন্ধ হয় নাই।—থিয়েটার, বায়স্কোপ, নাচ গান সবই চলিতেছে, আমোদ-আহ্লাদ চলিতেছে, পরন্তু সংযতভাবে সব চলিতেছে। ফরাসীর সহিত আর কোন জাতির তুলনা হয় না। ফরাসী জাতি চরিত্রের এতটা বৈভব যে প্রকাশ করিতে পারিবে, ইহা ইউরোপের কেহই অনুমানেও ভাবিতে পারে নাই। ফ্রান্সের অবস্থা বলিতে হইলে এই কথাই বলিতে হয়; ইহারই পুনরাবৃত্তি করিতে হয়:—

"In the mighty fires of war this Grand olde race has become purified. It has lost its sense of self and selfishness. It is one, it is absolutely united. It is determined."

এই মহাসমরের ভীষণ অনলে পুরাতন ফরাসী জাতি যেন অগ্নিসংস্কৃত ও পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে। এই ফরাসী জাতি স্বার্থ ও স্বার্থপরতা ভুলিয়াছে; চারি কোটী ফরাসী যেন এক—এক প্রাণ ও এক মন হইয়াছে—সম্মিলিত ও সংবদ্ধ হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, সমগ্র ফরাসী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও একনিষ্ঠ।

স্বর্গীয় দেশনায়ক সুব্রহ্মণ্য আয়ার

গত ১৮ই এপ্রিল মান্দ্রাজ প্রদেশের সুবিখ্যাত দেশনায়ক সুব্রহ্মণ্য আয়ার মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতবর্ষ একজন খাঁটি সেবক হারাইল।

ইংরাজী শিক্ষার রসাস্বাদন করিয়া সর্ব্বপ্রথমে যাঁহাদের মনে স্বদেশ সেবার মহোচ্চ ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল সুব্রহ্মণ্য আয়ার তাঁহাদের অন্যতম। তেলাং, তায়াবজি, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ফেরোজসা মেটা প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় দেশসেবকগণের সহিত মহাত্মা সুব্রহ্মণ্য একশ্রেণীভুক্ত। সর্ব্বপ্রকার প্রতিকূলতার মধ্যে ইঁহারা সমস্ত ভারতবাসীকে ঐক্যসূত্রে বাঁধিয়া দিয়া জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। সুতরাং মিঃ সুব্রহ্মণ্যের মৃত্যুতে একমাত্র মান্দ্রাজের নহে, সমস্ত ভারতবর্ষের মহা অনিষ্ট হইল।

মিঃ সুব্রহ্মণ্য মান্দ্রাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বদেশ সেবক। এক কথায় বলিতে গেলে তাঁহারই প্রযত্নে সমস্ত মান্দ্রাজ প্রদেশের মধ্যে রাজনীতি চর্চ্চার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল। দক্ষিণ ভারতের ইংরাজী ও প্রাদেশিক ভাষার সংবাদপত্রসমূহের তিনিই জন্মদাতা। "হিন্দু" "মান্দ্রাজ ষ্টাণ্ডার্ড" (বর্ত্তমান "নিউ ইণ্ডিয়া"); "ইণ্ডিয়ান সোসাল রিফরমার" "ইউনাইটেড্ ইণ্ডিয়া" তামিল ভাষার দৈনিকপত্র "স্বদেশ মিত্রম্" প্রভৃতি উৎকৃষ্ট পত্রিকা সমূহের তিনিই স্থাপয়িতা। "মহাজন সভা" "শিল্প সমিতি" "জাতীয় ধনভাণ্ডার" প্রভৃতি মান্দ্রাজের কল্যাণকর সমস্ত অনুষ্ঠানের তিনি প্রবর্ত্তক। ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির প্রতিষ্ঠাতাগণের তিনি অন্যতম। সুব্রহ্মণ্যের মত উৎসাহী স্বদেশ-সেবক অতি বিরল।

রাগ না করাই ভাল

এডুকেশন গেজেটে একজন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন:—

একজনের ওজনের কোন-জিনিস হাতে করিয়া কতুইটি একটি টেবিলের উপর রাখিয়া ঐ জিনসটীকে টেবিলের উপর

হইতে আপনার কাঁধ পর্য্যন্ত তোল। ইহাতে যে পরিশ্রম হইবে তোমার হৃৎপিণ্ড প্রতি স্পন্দনে ততখানি পরিশ্রম করিতেছে। এই রকম ৬০।৭০ বার জিনিষটিকে উঠাও ও নামাও এবং দেখ কতক্ষণ পর্য্যন্ত এই পরিশ্রম তুমি সহজে করিতে পার। তোমার হৃৎপিণ্ড কিন্তু প্রতিমিনিটে এই পরিশ্রমটি তোমার জন্মের সময় হইতে মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অবিরত (মোটামুটি ৬০।৭০ বৎসর) করিতেছে ও করিবে। সে কখনও ঘুমায় না এবং এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্রাম লয় না। হৃৎপিণ্ড বিশ্রাম করিলেই মৃত্যু।

সবল ও সুস্থকায় লোকের হৃৎপিণ্ড প্রায় কখনই কোনও রূপে ক্লান্ত হয় না। যদি রক্তহীনতা কিম্বা মানসিক অশান্তি থাকে তাহা হইলেই হৃৎপিণ্ড বিশেষ দুর্ব্বল হইয়া যাইতে পারে। হঠাৎ ক্রোধ কিম্বা দুঃখের জন্য হৃৎপিণ্ডের কাজ কাহার কাহার একেবারেই বন্ধ হইয়াছে এমনও ঘটিয়াছে। লোকে ক্রুদ্ধ হইলে দেখা গিয়াছে তাহার হৃৎপিণ্ড এক মিনিটে ৭৬ সের উঠান নামানের কাজের (যাহা সাধারণ) পরিবর্ত্তে ১৯২ সের উঠান নামানের কাজ করে। অর্থাৎ রাগ হইলেই লোকের হৃৎপিণ্ডের (উপর) বেশী কাজ দেওয়া হয়। ইহা পরিণতবয়স্ক লোকের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর।

দৌড়াইয়া ট্রেণ ধরা কিম্বা শীঘ্র শীঘ্র সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠা, এই প্রকার কাজে হৃৎপিণ্ডের উপর বিশেষ জোর পড়ে, বয়স্ক কিম্বা অসুস্থ লোকের পক্ষে বিপদজনক হইতে পারে।

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে সবল ও সুস্থকায় লোক দৌড়াইয়া রেলগাড়ী ধরার পর তাহার হৃৎপিণ্ড মিনিটে ৭৬ সের উঠান নামানের কাজ করার পরিবর্ত্তে মিনিটে ১৮০ সের উঠান নামানের কাজ করিতেছিল।

লক্ষ্মী বউ

(১)

"দাদা! ও দাদা! তুমি আজ এমন উদ্বিগ্ন হয়ে বসে আছ কেন? ইস্কুল থেকে এসেছ প্রায় এক ঘণ্টা হ'ল, এখনও একটু জল খাওনি!" বলিতে বলিতে সোণামুখী নরেন্দ্রের বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করিল। নরেন্দ্র নিতান্ত অন্যমনস্ক ছিল, সোণামুখীর কথা তাহার কর্ণে পৌঁছায় নাই, তাই সোণামুখী কোন প্রত্যুত্তর না পাইয়া আরও ব্যস্ত হইল এবং নরেন্দ্রের পিছনে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নরেন্দ্রনাথ ইহার কিছুই জানিতে পারিল না, হঠাৎ সোণামুখীর দৃষ্টি নরেন্দ্রের সম্মুখস্থিত টেবিলের উপর একখানি পত্রে পতিত হইল এবং তাহা পড়িবার জন্য সে বিশেষ চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার বিস্তার তীক্ষ্ণদৃষ্টি তত দূর পৌঁছাইতে পারিল না, দু একটী শব্দ পড়িয়াই পশ্চাৎপদ হইল; আর সোণামুখীর হৃদয়ে বিষম কৌতূহলের সঞ্চার করিয়া দিল। সোণামুখী কৌতূহলপরবশ হইয়া পত্রখানি হাতে লইল এবং পত্রে কি লেখা আছে তাহা বলিবার জন্য নরেন্দ্রকে বারবার অনুরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু নরেন্দ্র তাহার কোন উত্তর দিল না। কেবল মাত্র বলিল, "সোণা, অদৃষ্ট বড় মন্দ, কপালে যে কি লেখা আছে তাহা বলা যায় না।" সোণামুখী হতাশের দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল, নরেন্দ্রনাথ আর সেইদিন বেড়াইতে বাহির হইল না, যেখানে বসিয়াছিল সেখানেই বসিয়া রহিল।

আজ চারি বৎসর হইল নরেন্দ্রনাথের পিতৃবিয়োগ হইয়াছে। নরেন্দ্রনাথ অতি কষ্টে এণ্ট্রেন্স ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়া অবশেষে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ হয়। কিন্তু আর পড়িবার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে না পারিয়া এবং সংসার পরিচালনের ভার বহন করিতে হইবে দেখিয়া নরেন্দ্রনাথকে বিদ্যামন্দির হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া অর্থোপার্জ্জনে মনোনিবেশ করিতে হইল। গ্রামে একটী উচ্চ ইংরেজী স্কুল আছে, নরেন্দ্র তাহাতে মাসিক ২০৲ টাকা বেতনে একটী চাকরী পাইল। পিতা রামচন্দ্র দত্ত নরেন্দ্রনাথের গৃহ শূন্য রাখিয়া যান নাই। তাঁহার গৃহে ষোড়শবর্ষীয়া এক বালিকা পুত্রবধূরূপে বিরাজিত ছিল। কন্যা সোণামুখীরও বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু অচিরে বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হইয়া পিতৃগৃহ আলোকিত করিতেছে! তাই পিতার মৃত্যুর পরে নরেন্দ্রনাথকে মাতা ভগ্নী স্ত্রী এবং আর দুইটী কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিতে হইল এবং তাহাদের ভরণ পোষণের জন্য আত্মোন্নতির সমস্ত আশা ভরসা বিসর্জ্জন দিয়া কেবল মাত্র অর্থোপার্জ্জনেই সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে হইল! আজ মহাজন রমেশ মণ্ডল

হইতে এক পত্র আসিয়াছে, তাহার সমস্ত টাকা যদি এক সপ্তাহের মধ্যে পরিশোধ করা না হয় তবে সে নালিশ করিবে। তাই আজ নরেন্দ্রনাথ এইরূপ বিষণ্ণ বদনে বসিয়া রহিয়াছিল এবং কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিল না।

(২)

আজ রমেশ মণ্ডলের টাকার মেয়াদ গত হইতেছে। অথচ নরেন্দ্রনাথ তাহার ঋণ শোধের কোন উপায় করিতে পারিল না। বিশেষতঃ তাহার পিতার পরম শত্রু সুরেশচন্দ্র (সম্পর্কে খুড়া) রমেশ মণ্ডলের সঙ্গে যোগ দিয়া নরেন্দ্রনাথকে ভিটাছাড়া করিবার ব্যবস্থা করিতেছিল। তাই আজ সকালে নরেন্দ্রনাথ গ্রামের মহাজন হরিশ লোধের নিকট হইতে আবার টাকা কর্জ্জের চেষ্টায় চলিয়াছে। কিছু দূর যাইতে না যাইতে হরিশ লোধের সঙ্গে পথেই তাহার দেখা হইল। নরেন্দ্রনাথের অভিপ্রায় অবগত হইয়া লোধ মহাশয় কোন প্রত্যুত্তর করিলেন না। খাতককে টাকা দিতে পারিলেই মহাজনের লাভ, কিন্তু আজ হরিশ লোধ কেন বিমুখ হইতেছেন! কারণ আর কিছুই নহে; নরেন্দ্রনাথের এমন কোন পৈতৃক সম্পত্তি নাই যাহা দ্বারা তাহার টাকা পরিশোধ হইতে পারে। কেবলমাত্র এক বাড়ী, তাহাও তাহার নিজের নহে, অন্যের, থাকিবার স্থান পাইয়াছে মাত্র। নরেন্দ্রনাথ অনেক কাকুতি মিনতি করিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। হরিশ লোধ কিছুতেই টাকা দিতে স্বীকার করিলেন না।

(৩)

নরেন্দ্রনাথের স্ত্রী অপরাজিতা রান্নাঘরে বসিয়া স্বামীর জন্য নানাখাদ্য রন্ধন করিতেছে এবং মাঝে মাঝে গিয়া পাক প্রণালীর কর্দ্দটাও উল্টাইতেছে; আর উপকরণের অভাবে যাহা পাক করা যাইতেছে না মনে মনে তাহার এক তালিকা প্রস্তুত করিয়া স্বামীর নিকট পেশ করিবার মতলব আঁটিতেছে। এমন সময়ে নরেন্দ্রনাথ বিষণ্ণ বদনে রান্না ঘরে প্রবেশ করিল। অপরাজিতা নরেন্দ্রনাথকে বিষণ্ণ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে! হরিশ লোধের নিকট কি টাকা পাওয়া যায় নাই!"

নরেন্দ্রনাথ উত্তর করিল,—"না।"

অপ। কেন! মাহাজনের খাতককে টাকা দিতে পারিলেই ত লাভ, তুমি পাইলে না কেন?

নরেন্দ্র। আমার বাড়ী ঘর নাই; তাই তিনি ভাবিয়াছেন, আমি যদি টাকা না দেই তবে অন্য কোন উপায়ে টাকা উঠিবার আশা নাই, এইজন্য তিনি টাকা দিতে অস্বীকার করিতেছেন।

নরেন্দ্রনাথের মুখে অপরাজিতা এই সকল কথা শুনিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, "তবে এখন কি ঠিক করিয়াছ?"

অপরাজিতার কথা শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ বলিল, "আর কয়েক দিন তাহার নিকট সময় চাহিব, এবং সুরেশ কাকাকেও ইহার জন্য অনুরোধ করিব।"

অপ। যদি তাঁহারা তোমার অনুরোধ না রাখেন, তবে?

নরেন্দ্র। তবে, অদৃষ্টে যা আছে তাহাই হইবে!

অপ। এখন শুধু অদৃষ্টের দোহাই দিলে ত চলিবে না? মহাজনের টাকা ত পরিশোধ করিতেই হইবে, নতুবা যে ভিটা-ছাড়া হইতে বসিয়াছ। কেন তুমি টাকা কর্জ্জ করিয়াছিলে? তা না হইলে ত এখন এত ভাবিতে হইত না!

নরেন্দ্রনাথ আবেগপূর্ণ হৃদয়ে বলিল, "পরি! আজ তোমার মুখ হইতে এক নূতন কথা শুনিলাম। এখন তুমি আমায় জিজ্ঞাসা করিতেছ, কেন টাকা কর্জ্জ করিয়াছিলাম? আমার জন্য করি নাই। আমার ভোগ বিলাসের জন্য নহে। তোমাদের ভরণ পোষণের জন্য টাকা কর্জ্জ করিয়াছি, আর আজ তোমাদের জন্যই এত ভাবিতেছি, আমার নিজের আর কি বল!"

অপ। আমাদের জন্য টাকা কর্জ্জ করিয়াছ বুঝিলাম, আমাদিগকে ভরণপোষণ করিতে হইতেছে বলিয়া আজ তোমার এই দুর্দ্দশা! কেমন, তা নয় কি?

নরেন্দ্র। হাঁ! তা ত বটেই!

অপ। তবে তুমি আমাদিগকেই এই টাকার জন্য দায়ী করিতেছ?

নরেন্দ্রনাথের কথা অপরাজিতার প্রাণে বিঁধিল; স্ত্রীকে ভরণপোষণ করিবার জন্যই স্বামীর এই দুর্দ্দশা, স্বামীর নিজ মুখে এ কথা শুনিলে কোন্ স্ত্রীর মনে না ব্যথা লাগে! কিন্তু নরেন্দ্রনাথের চিত্ত আজ বড়

বিক্ষুব্ধ, সে অতশত না ভাবিয়াই বলিল, "দায়ী করিতেছি না, তবে তোমাদের জন্যই যে আজ এত দুর্ভাবনা তা ঠিক !"

অপরাজিতা বলিল, "পুরুষের যে নিজ নিজ পরিবারের ভরণপোষণ করিতে হয় এবং তাহার জন্য যে পরিবারের অন্য কেহ দায়ী নহে, ইহাই ত আমরা জানি।"

পারিবারিক দুরবস্থা দেখিয়া কিছুদিন যাবৎ নরেন্দ্রনাথের মনে একটা মতলব খেলিতেছিল, স্ত্রীর নিকট তাহা প্রকাশ করিবার এই সুযোগ সে ছাড়িতে পারিল না। সে বলিল, "তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করিতে চাই না পরি! কিন্তু নিজেই একবার ভাবিয়া দেখ, দুর্ভাবনায় আমার ত প্রাণ ওষ্ঠাগত, তুমি পাকপ্রণালী দেখিয়া আমার জন্য ষোড়শোপচারে রন্ধনে ব্যস্ত! স্বামীর বিপদে স্ত্রীর এমন উদাসীনতা কেমন স্বাভাবিক বল ত? মনে রাখিও, পরিবারের ছোট বড় সকলেই পরিবারের সুখ দুঃখের জন্য দায়ী। আমার শক্তি সাধ্যে যাহা কুলায় আমি ত তাহা করিতেছি। আজ যদি তোমাদেরও কিছু রোজগার করিবার ক্ষমতা থাকিত তবে ভাবিয়া দেখ আমাদের পরিবারের কেমন সুখ শান্তি হইত! যদি আমার মত তোমাদেরও এবিষয়ে দায়িত্বজ্ঞান থাকিত তবে কি আজ আমায় এমন করিয়া ঘুরিতে হইত! তোমরা ভাব যে তোমাদের রান্না, আর খাওয়ান এই দুই ভিন্ন অন্য কার্য্য নাই।"

অপ। তবে কি তোমাদের মত আমাদিগকে কোট-পেণ্টুলান্ পরিয়া চাকরী করিতে বল? আমাদের এমন কি গুণ আছে যে আমরা চাকরী পাইব? আর চাকরী পাইলেই বা আমায় শাশুড়ী যাইতে দিবেন কেন?

নরেন্দ্র। হাঁ! তা যাইতে না দিতে পারেন সত্য: আজ তোমাকে অসূর্য্যম্পশ্যা বলিয়া তিনি ভাবিতেছেন। কিন্তু কাল যখন মহাজন আমাদের সামান্য যাহা কিছু আছে তাহাও লইয়া যাইবে তখন যে গাছতলায় থাকিয়া আমাদের দিন কাটাইতে হইবে! সেই সময় মান অপমান কোথায় থাকিবে? ইহা অপেক্ষা তোমরা প্রত্যেকে যদি কিছু কিছু মাসিক সাহায্য করিতে পার তবে আমাদের কোন অভাব থাকে না, আর তোমাদিগকেও এত কষ্ট পাইতে হয় না।

অপ। তবে আমাদিগকে কি করিতে বল?

নরেন্দ্র। কেন? গ্রামে বালিকাবিদ্যালয় আছে, তুমি জান। যদি মায় মত হয় তবে আমি কোন রকমে তোমাকে শিক্ষয়িত্রীর পদটা লইয়া দিতে পারি। বিশেষতঃ এখন গবর্ণমেণ্ট স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারের জন্য খুব চেষ্টা করিতেছেন।

অপ। আমি ত এত লেখা পড়া জানি না যে স্কুলে পড়াইতে পারি!

নরেন্দ্র। কেন! তুমি ত বেশ লেখা পড়া জান! আমি না হয় তোমাকে বাড়ীতে দুয়ারো পড়াইব, এবং স্কুলে কি ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে তাহা শিখাইয়া দিব।

(৪)

অপরাজিতা স্বামীর প্রস্তাবে স্বীকৃত হইল। আজ নরেন্দ্রনাথের বুকের বোঝা নামিয়া গেল। যথাসময়ে সোণামুখী ও অপরাজিতা গ্রামের বিদ্যালয়ে চাকরী পাইল। গবর্ণমেণ্ট সেই বিদ্যালয়ে মাসিক ১০৲ টাকা সাহায্য দিলেন। সোণামুখী ও অপরাজিতার কঠোর পরিশ্রমে বিদ্যালয়ের উন্নতি হইতে লাগিল। গ্রামের অন্যান্য ভদ্রলোকেরা এই বিদ্যালয়ের উন্নতি দেখিয়া যথেষ্ট সাহায্য করিতে লাগিলেন এবং সকলের সমবেত চেষ্টায় বিদ্যালয়ে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়ারও বন্দোবস্ত হইল। অপরাজিতাও ইতিপূর্ব্বে স্বামীর নিকট হইতে কিছু কিছু ইংরেজি শিখিয়াছিল, তাই স্কুলে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন হইলেও অন্য শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন হইল না, অপরাজিতা নিজেই সে ভার গ্রহণ করিল।

আজ প্রায় তিন বৎসর হইল অপরাজিতা ও সোণামুখী গ্রামের বালিকা বিদ্যালয়ে চাকরী পাইয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই গবর্ণমেণ্ট তাহাদের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া স্কুলে মাসিক ২০৲ টাকা সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। নরেন্দ্রনাথের অবস্থা এখন একটু সচ্ছল হইয়াছে। তাহার পরিবার ভরণপোষণের জন্য আর এখন ভাবিতে হয় না। সোণামুখী ও অপরাজিতা মাসিক যাহা পায় তাহার দ্বারা সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। নরেন্দ্রনাথ ভাবিয়াছিল, তাহার অবশিষ্ট জীবন খুব সুখেই কাটাইতে পারিবে। এই অল্পদিনের

মধ্যেই তাহার সমস্ত ঋণ পরিশোধ হইল, কিছু টাকাও হাতে হইল। কিন্তু এক নূতন অভাবনীয় বিপদ উপস্থিত হইল। সুরেশচন্দ্র নরেন্দ্রনাথের এই সুখ স্বচ্ছন্দতায় অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হইয়াছিল এবং তাহাকে অপমানিত, বিপন্ন এবং দেশ-ছাড়া করিবার জন্য নানা রকম ফন্দি আঁটিতেছিল। তাই সে নরেন্দ্রনাথের ভূতপূর্ব্ব মহাজনের সহিত একত্র হইয়া এক জাল তমসুক তৈরী করিয়া নরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করিল। সুরেশচন্দ্রের বুদ্ধিকৌশলে নরেন্দ্রনাথ ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিল না। আদালত বিবাদিকে হাজির না পাইয়া ঐ তমসুকের সমস্ত টাকা নরেন্দ্রের বিরুদ্ধে ডিক্রি দিল। ডিক্রি পাওয়ার কিছুদিন পরে রমেশ মণ্ডল ও সুরেশচন্দ্র আদালত হইতে এক গ্রেপ্তারী পরোয়ানা লইয়া একদিন দুপুর বেলা আসিয়া নরেন্দ্রনাথকে ধরিয়া লইয়া গেল। গ্রামের সকল লোক ইহার কারণ খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু কেহই প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে পারিল না। এই দুঃসংবাদ অপরাজিতা ও সোণামুখীর নিকট পৌছাইতে বেশী বিলম্ব হইল না; কিন্তু সেই দিন ইন্‌স্‌পেক্টর্‌স স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তাই স্বামীর এই বিপদবার্ত্তা পাইয়াও সে তাহার কোন প্রতিকার করিতে পারিল না,—আর সে কুলবধূ, কি-ই বা করিবে?

স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টর্‌স্ স্কুলের কল সন্তোষজনক বলিয়া পরিদর্শন বহিতে লিখিয়া গেলেন এবং স্কুলের সাহায্য আরো পাঁচ টাকা বাড়াইয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। অপরাজিতার আজ এই সব কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। তাহার মন বড়ই চঞ্চল। ইন্‌স্‌পেক্টর্‌স্ মহোদয়া তাঁহাকে খুব ভালবাসিতেন। তিনি তাহার এরূপ বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অপরাজিতা হৃদয়ের ভাব গোপন করিবেন ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু পারিলেন না, অশ্রুপূর্ণ লোচনে সমস্ত বলিয়া ফেলিলেন। ইন্‌স্‌পেক্টর্‌স্ এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ অপরাজিতা ও সোণামুখীকে লইয়া সহরে চলিয়া গেলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। অপরাজিতা ও সোণামুখীকে সহরে তাহাদের এক আত্মীয়ের বাড়ীতে রাখিয়া ইন্‌স্‌পেক্টর্‌স্ রাত্রির মত বিদায় হইলেন এবং পরদিন তাঁহাদের সহিত দেখা করিবেন বলিয়া গেলেন। পরদিন ইন্‌স্‌পেক্টর্‌স্ বলিলেন, "তোমাদের কোন ভয় নাই। এখানকার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব আমার ভগ্নীপতি, আমি গতকল্য তাঁহার সহিত এই বিষয় আলাপ করিয়াছিলাম এবং নরেন্দ্রনাথের অব্যাহতির কথাও বলিয়াছি।" তারপর রমেশ মণ্ডল ও সুরেশচন্দ্রের বিরুদ্ধে জাল তমসুক প্রস্তুত করিবার অপরাধে ফৌজদারীতে নালিশ উপস্থিত করিবার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া ইন্‌স্‌পেক্টর্‌স্ চলিয়া গেলেন।

(৫)

ফৌজদারী আদালতে রমেশ মণ্ডল ও সুরেশচন্দ্রের বিরুদ্ধে নালিশ করা হইল। কিন্তু কে কি করিতেছে, কি জন্য কি হইতেছে, নরেন্দ্রনাথ তাহার কারণ জানিতে পারিল না। যথাসময়ে আসামীর উপর আদালতে হাজির হইবার সমন জারী হইল। আজ বিচারের দিন। আসামী সুরেশচন্দ্র ও রমেশ মণ্ডল মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে আনীত হইল। বিচারে তাহাদের কাগজ জাল বলিয়া প্রমাণিত হইল, মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাদিগকে পাঁচ বৎসর করিয়া কারাবাসের আজ্ঞা দিলেন, আর নরেন্দ্রনাথ অব্যাহতি পাইল। এই সংবাদ দেশের সর্ব্বত্রই প্রচার হইয়া পড়িল এবং সকলেই অপরাজিতা ও সোণামুখীর গুণের প্রশংসা করিতে লাগিল এবং তাহাদের কৌশলেই যে আজ নরেন্দ্রনাথ খালাস পাইল সকলেই একবাক্যে একথা স্বীকার করিল। আজ নরেন্দ্রনাথের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ। না জানি কি আনন্দস্রোত তাহার হৃদয়মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে। যাহাকে দেখিতেছে তাহাকেই বলিতেছে, "পরিবারের সকলেরই কর্ত্তব্যজ্ঞান থাকা উচিত, একে অন্যের যতদূর সম্ভব সাহায্য করা উচিত।"

আমরা এই ঘটনার পর নরেন্দ্রনাথের মাতাকে বলিতে শুনিয়াছি, "আমার বউ 'লক্ষ্মী বউ', যদি ঘরের কোণে বসিয়া থাকিত, না জানি আমার কি সর্ব্বনাশ হইত!"

শ্রীমতী মুক্তকেশী গুহ।
হুনহরা, ভাটিখাইন পোঃ, চট্টগ্রাম।

নরক ও স্বর্গ

একদিন ঘোর অন্ধকার রাত্রে আমি নিজ শয্যায় শয়ন করিয়া কিছুতেই ঘুমাইতে পারিতেছিলাম না। কখনও বা রাজপথে পুলিস প্রহরীর পদশব্দ, কখনও বা আমোদ প্রমোদের স্থান হইতে প্রত্যাগত ব্যক্তিগণের শকটধ্বনি এবং সর্ব্বশেষে আমারই বাতায়ন নিম্নে কোন স্ত্রীলোকের উচ্চ হাস্যধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছিল।

অনেকক্ষণ পরে নিদ্রাকর্ষণ হইবা মাত্র এই রজনীর অন্ধকারে আমি একটি স্বপ্ন দেখিলাম।

দেখিলাম, যেন পরমেশ্বর আমার আত্মাকে নরকদর্শন করাইতে লইয়া গেলেন। নরক স্থানটি দেখিতে সুন্দরই লাগিল, সেখানকার হ্রদের জল স্বচ্ছ ও সুনীল।

আমি পরমেশ্বরকে বলিলাম, "এই স্থানটি আমার ভাল লাগিতেছে।"

পরমেশ্বর বলিলেন, "ভাল লাগিতেছে!"

সেস্থানে নানা জাতীয় পক্ষী সুমিষ্টস্বরে গান করিতেছিল; হ্রদের তীরস্থ স্থানগুলি তৃণাবৃত ও বৃক্ষরাজিপূর্ণ। কিয়দ্দূরে বৃক্ষতলে নানা মনোহর বর্ণের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া পরম সুন্দরী রমণীগণ বিচরণ করিতেছিল। তাহারা সকলেই উন্নতদেহা, লাবণ্যময়ী ও স্বর্ণোজ্জ্বল-কুন্তলা। তাহাদের বহির্লম্বিত আচ্ছাদন তৃণদলের উপর লুণ্ঠিত হইতেছিল। তাহারা বৃক্ষশ্রেণী মধ্যে ইতস্ততঃ যাতায়াত করিতেছিল; মস্তকের উপর শাখায় শাখায় বৃহদাকার, গলিতসুবর্ণ-বর্ণ নাস্পাতি ফলের মত সুপক্ক ফলসকল শোভা পাইতেছিল।

আমি ফলগুলি দেখিয়া বলিলাম, "কি সুন্দর ফল, আমরা বৃক্ষতলে যাইয়া একটা ফল আস্বাদন—" পরমেশ্বর বলিলেন, "অপেক্ষা কর।"

অনতিবিলম্বে একজন অপূর্ব্ব-সুন্দরী রমণী সেইস্থানে উপনীত হইল; সে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক যখন দেখিল কেহ কোথায়ও নাই, তখন একটা শাখা আনত করিয়া, শাখাস্থিত ফলটিকে ধীরে চুম্বন করিয়া নিঃশব্দে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরেই অপর একজন সুন্দরী ও সুসজ্জিত রমণী সেইস্থানে আসিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া কাহাকেও কোথায়ও না দেখিতে পাইয়া বৃক্ষশাখা নিম্নে আকর্ষণ পূর্ব্বক ফলটির অঙ্কিত স্থানে স্বীয় ওষ্ঠ দ্বারা স্পর্শ করিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিল।

এইরূপে আরও অনেক রমণী নিঃশব্দে বৃক্ষতলে আসিয়া একই কার্য্য সাধিয়া তৃণদলের উপর দিয়া ধীরপদে চলিয়া গেল।

আমি পরমেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহারা কি করিতেছে?"

পরমেশ্বর বলিলেন, "ফল বিষাক্ত করিতেছে।"

আমি বলিলাম, "কি প্রকারে?"

তিনি বলিলেন, "তাহারা প্রথমতঃ ওষ্ঠদ্বয় দ্বারা ফলটাকে বৃত করিয়া সম্মুখের দন্তদ্বারা তাহাতে অতি ক্ষুদ্র একটি ছিদ্র করে এবং সেই ছিদ্রপথে তাহাদের জিহ্বানিম্নস্থ বিষ ঢালিয়া দেয়; তৎপরে সেই ছিদ্রটি তাহাদের ওষ্ঠদ্বারা পুনরায় বন্ধ করিয়া দেয়, কেননা তাহা হইলে ফলটি বিষাক্ত হইয়াছে কিনা অপরের তাহা নির্দ্ধারণ করিবার আর উপায় থাকে না। কার্য্য সমাধা হইবার পর তাহারা অন্যত্র প্রস্থান করে।

আমি বলিলাম, "ইহাদের এইরূপ করিবার উদ্দেশ্য কি?"

ঈশ্বর বলিলেন, "অপরে না ভোগ করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যেই এইরূপ করে।"

আমি ঈশ্বরকে বলিলাম, "সমস্ত ফলেই এইরূপ বিষ ঢালিয়া রাখিলে, কেহই ত তাহা ভোগ করিতে সাহস করে না। ইহাতে তাহাদের কি লাভ হয়?"

পরমেশ্বর বলিলেন, "কিছুই না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাহাদের কি আশঙ্কা হয় না যে, যে স্থানে একজন দংশন করিয়াছে সেই স্থানে অন্য দংশনকারীও দংশন করিতে পারে?"

পরমেশ্বর বলিলেন, "আশঙ্কা ত করেই। নরকে সকলেই সকলের ভয়ে ভীত।"

পরমেশ্বর আমাকে ইহা হইতে আর একটা দূরতর স্থানে লইয়া গেলেন, সেস্থানে হ্রদের জল পূর্ব্বের ন্যায় সুনীল নহে।

সেই স্থানের দক্ষিণাংশে বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে কতকগুলি

পুরুষ কার্য্যনিযুক্ত ছিল। আমি পরমেশ্বরকে বলিলাম, "আমারও ইহাদের সহিত কাজ করিতে ইচ্ছা হইতেছে, নরকের দুর্গাগুলি যখন এমন শ্যামল, তখন তুমি নিশ্চয়ই উহার।"

পরমেশ্বর বলিলেন, "ইহারা যে উদ্যানের কার্য্যে প্রবৃত্ত আছে, তাহাতে কিছুই উৎপন্ন হয় না।"

আমরা দণ্ডায়মান থাকিয়া দেখিতে লাগিলাম। আমি লতাগুল্মের মধ্যে তাহাদিগকে মৃত্তিকা খনন করিতে দেখিলাম, কিন্তু সেস্থানে তাহারা কিছুই রোপণ করিল না। গহ্বর-মুখ অল্প মৃত্তিকা ও শুষ্ক তৃণাদি দ্বারা পূর্ণ করিয়া কিয়দ্দূরে যাইয়া লতাগুল্মের পশ্চাতে বসিয়া অলক্ষিতে তাহারা কি দেখিতে লাগিল। আমি ইহাও লক্ষ্য করিলাম যে প্রত্যেকেই চলিবার সময়, অতি সাবধানে পাদবিক্ষেপের পূর্ব্বে চক্ষুদ্বারা পরীক্ষা করিয়া তৎপরে অতি সন্তর্পণে পা ফেলিতেছিল। আমি ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহারা কি করিতেছে?"

তিনি বলিলেন, "অন্যের পতনের জন্য গুপ্ত গহ্বর খনন করিতেছে।"

আমি বলিলাম, "কেন ইহারা এরূপ করে?"

পরমেশ্বর বলিলেন, "ইহারা মনে করে, যে তাহাদের কোন ভ্রাতার পতনে বুঝি ইহাদের উত্থান হইবে।"

আমি বলিলাম, "একজনের পতনে কি প্রকারে অপরের উত্থান হইবে?"

পরমেশ্বর বলিলেন, "তাহা হয় না।"

অতঃপর আমি লতাগুল্মের পশ্চাৎ হইতে দেখিতে পাইলাম, তাহাদের চক্ষু অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলিতেছে। আমি পরমেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহাদের মস্তিষ্ক প্রকৃতিস্থ আছে ত?"

ঈশ্বর বলিলেন, "ইহারা সকলেই বিকৃত-মস্তিষ্ক; নরকে অবিকৃত মস্তিষ্ক কেহই নাই।"

আমি পরমেশ্বরকে বলিলাম, "আমার ভ্রান্তিবোধ হইতেছে।"

পরমেশ্বর বলিলেন, "তুমি নরকের ত এখনও কিছুই দেখ নাই।"

আমি বলিলাম, "যেটুকু দেখিয়াছি তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছে, আমার বেশী আর কিছু দেখিবার ইচ্ছা নাই। আমারও মনে ভীতির সঞ্চার হইয়াছে। এই সংকীর্ণ পথটুকু দিয়াও আমার চলিতে ভয় হইতেছে, কি জানি কোন্ স্থানে কে গুপ্ত গহ্বর খনন করিয়া রাখিয়া দিয়াছে! কোনও ফল দেখিয়া অন্যমনস্কভাবে তাহা স্পর্শ করিতে যাইয়া সশঙ্কিত ভাবে অর্দ্ধোত্থিত হস্ত স্বস্থানে ফিরাইয়া লইতেছি। আমার সমগ্র নরকরাজ্য দর্শনের বাসনা একেবারেই নাই।"

পরমেশ্বর বলিলেন, "তুমি কোথায় যাইতে চাও?" আমি বলিলাম, "পৃথিবীতে, আমার স্বস্থানে। পৃথিবী এই স্থান অপেক্ষা শতগুণে ভাল।"

পরমেশ্বর আমার কথা শুনিয়া হাসিলেন। কেন তিনি হাসিলেন আমি বুঝিতে পারিলাম না।

তৎপরে তিনি বলিলেন, "আইস, তোমাকে আমি স্বর্গ-রাজ্য দর্শন করাইয়া দিব।"

* * * *

আমি অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় দেখিলাম, চতুর্দ্দিক নীরব, নিঃস্তব্ধ ও অন্ধকারাবৃত; রাজপথে শকটের শব্দ মাত্রও নাই; বাতায়ননিম্নে স্ত্রীলোকের হাস্যশব্দ থামিয়া গিয়াছে; পুলিস প্রহরীর পদধ্বনিও শ্রুতিগোচর হইতেছিল না। অন্ধকারে আমার বোধ হইতে লাগিল যেন কাহার বিশাল হস্ত, আমার হৃদ্‌যন্ত্রের উপর স্থাপিত থাকিয়া তাহা পেষণ করিতেছে। আমি নিঃশ্বাস ফেলিতে প্রয়াস পাইলাম এবং ক্রমাগত পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলাম; তাহার পর আবার নিদ্রিত হইয়া স্বপ্ন দেখিলাম :—

পরমেশ্বর আমাকে পৃথিবীর প্রান্তদেশে লইয়া গেলেন; ইহাই তাহার শেষ সীমা। আমি নিম্নে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক অতলস্পর্শ একটা গহ্বর দেখিতে পাইলাম। অচিরেই তাহার উপর দুইটি ঊর্দ্ধগামী সেতু দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইল।

আমি পরমেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহা ব্যতীত অপর পারে গমনার্থ আর কোন পথ নাই?"

পরমেশ্বর বলিলেন, "আরও একটা পথ আছে, সেটা দূরে অবস্থিত এবং একেবারে সরলভাবে দণ্ডায়মান বলিয়া অধিকতর দুরারোহ।"

আমি ঈশ্বরকে সেতুগুলির নাম জিজ্ঞাসা করিলাম।

তিনি বলিলেন, "নামের কি কোন আবশ্যকতা আছে? নাম দিতে চাহিলে "শিব", "সত্য" ও "সুন্দর" এই তিন নামে ইহাদিগকে অভিহিত করা যাইতে পারে, কিন্তু নাম জানিয়া তোমার বুঝিবার সাহায্য হইল কি?"

আমি পরমেশ্বরকে বলিলাম, "তৃতীয় পথটি কোথায়? আমি ত দেখিতে পাইতেছি না!"

"তিনি বলিলেন, আরুহুমান পথিকেরা মাত্র সেপথ দেখিতে পায়।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তিনটি পথ কি একই স্বর্গরাজ্যে গিয়াছে?"

তিনি বলিলেন, "স্বর্গরাজ্য একই; তবে কোন কোন অংশ উচ্চতর, কোন অংশ নিম্নতর; যাহারা উচ্চতর স্বর্গে বাস করে তাহারা ইচ্ছা হইলে নিম্নে কখনও কখনও বিশ্রামার্থে আসিতে পারে, কিন্তু নিম্নতর স্থানের অধিবাসীদিগের উচ্চতর স্থানে আরোহণ করিবার সামর্থ্য নাই। কিন্তু তাহা হইলেও সমগ্র স্বর্গরাজ্য একই দিব্যালোকে উদ্ভাসিত।"

আমাদিগের নিকটস্থিত প্রশস্ততর পথে অসংখ্য মানবপদচিহ্ন দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "পরিদৃশ্যমান দুইটি পথের মধ্যে এইটিই কেন বহুল পদচিহ্নযুক্ত?"

পরমেশ্বর বলিলেন, "এই পথটা একেবারে সরল না হইয়া ক্রম-উন্নত হওয়াতে ইহাই সহজগম্য এবং এই পথই প্রথমস্বর্গে লইয়া যায়।"

আমি এইস্থানে কতকগুলি প্রত্যাবর্ত্তনপর পদচিহ্নও দেখিতে পাইয়া পরমেশ্বরকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "স্বর্গরাজ্যে যে একবার প্রবেশ করিয়াছে, সে আর কখনও তাহা পরিত্যাগ করে না; কিন্তু কেহ কেহ অর্দ্ধপথ যাইয়া, স্বর্গরাজ্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া ফিরিয়া আইসে।"

আমি বলিলাম, "স্বর্গরাজ্যবাসী কেহই কি পুনরায় স্বীয় আবাসে ফিরিয়া আইসে নাই?"

পরমেশ্বর বলিলেন, "না। একবার যে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে, সে চিরকালই স্বর্গরাজ্যে থাকিয়া যায়।" অতঃপর পরমেশ্বর আমাকে হস্তধারণপূর্ব্বক লইয়া চলিলেন। আমরা যখন একটা সুবিশাল দ্বারের নিকট উপনীত হইলাম, (একটা দ্বার এইজন্য বলিতেছি, যে স্বর্গরাজ্যের একাধিক দ্বার বিদ্যমান এবং সমুদয় দ্বারই চিরদিন চির-অনাবৃত) দ্বার দেশের উভয় পার্শ্বস্থ স্তম্ভদ্বয়ের দীর্ঘতা প্রযুক্ত আমরা উপরিস্থিত কোন দৃশ্যই দেখিতে পাইলাম না। স্তম্ভদ্বয়ের মধ্যস্থিত পথ এত প্রশস্ত যে আমার অনুমান হইতে লাগিল সে সমগ্র নরক রাজ্য উহার মধ্যে অনায়াসে প্রবেশ করাইতে পারা যায়।

আমি পরমেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "স্বর্গ ও নরক এই উভয়ের মধ্যে কোন্ রাজ্য অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর?" পরমেশ্বর বলিলেন, "প্রস্থে উভয়ের আয়তনই এক, কিন্তু গভীরতায় স্বর্গই শ্রেষ্ঠ। স্বর্গরাজ্য সমস্ত নরককে আপনাতে নিমজ্জিত করিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু নরক তাহা পারে না।"

অতঃপর আমরা দ্বার অতিক্রম পূর্ব্বক এক নিঃশব্দ বিশাল রাজ্যে উপনীত হইলাম। মৃদুপ্রভ ও নির্ম্মল আলোকস্নাত পর্ব্বতশ্রেণী চতুর্দ্দিকেই বিদ্যমান। আলোকের উৎপত্তিস্থান অন্বেষণ পূর্ব্বক দেখিলাম, গিরিরাজি ও প্রস্তরগুলি হইতেই আলোকরশ্মি বিকীর্ণ হইতেছে। আমি পরমেশ্বরকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম বটে, কিন্তু তিনি কিছুই বলিলেন না। আমার স্বর্গকল্পনা অনুরূপ ছিল বলিয়া আমি বিস্ময়বিমুগ্ধ নেত্রে চতুর্দ্দিক দেখিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে রাত্রির অবসানে সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কাল হইতে আমাদের পৃথিবীতে যেমন উষার আলোক ক্রমশঃই উজ্জ্বলতর হয়, সেই প্রকার পূর্ব্বের স্নিগ্ধ, মৃদুপ্রভ আলোকও ক্রমশঃই উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল এবং আমি পরমেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "স্বর্গে সূর্য্যোদয় হইতেছে কি?" তিনি বলিলেন, "না। আমরা স্বর্গের অধিবাসীগণের সম্মুখীন হইতেছি।"

আমরা যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, আলোক ততই উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল। অবশেষে আমরা মধ্যাহ্ন কালীন প্রখর সূর্য্যালোকের ন্যায় আলোকের সন্নিহিত হইলাম। সেস্থানের গিরিরাজি প্রস্ফুটিত পুষ্পশোভিত ও পথপার্শ্বস্থ পুষ্পভারাবনত বৃক্ষশ্রেণীযুক্ত; স্রোতস্বিনীর কুলু কুলুধ্বনি ও কলকণ্ঠ পক্ষীর সুললিত গীতধ্বনি সর্ব্বত্রই বিদ্যমান, কিন্তু কোন পক্ষীই দৃষ্টিগোচর হইল না।

আমি পরমেশ্বরকে বলিলাম, "কলকণ্ঠ পক্ষীর গীতধ্বনি শুনিতেছি বটে, কিন্তু পক্ষী ত দেখিতেছি না ?"

তিনি বলিলেন, "তুমি স্বর্গবাসীদের পরস্পরের আহ্বান-বাণী শ্রবণ করিতেছ।"

আমি তাহাদের সন্নিহিত হইয়া দেখিলাম যে তাহারা ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে এবং তাহাদের দেহ হইতে এক দিব্য জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছে।

আমি পরমেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাহারা কোন পরিচ্ছদ পরিধান করে না কেন ?"

পরমেশ্বর বলিলেন, "তাহাদের শরীরের সর্ব্বাংশ হইতেই আলোক বিনির্গত হয় সেইজন্য আলোক প্রদানের নিমিত্ত তাহাদের শরীর অনাবৃত রাখিতে হয়।"

আমি পরমেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাহারা কি কাজ করিতেছে ?"

তিনি বলিলেন, "উদ্ভিদপদার্থসমূহের বৃদ্ধির জন্য আলোক বিকীরণ করিতেছে।"

আমি আরও দেখিলাম যে কয়েকজন একত্রে, কেহ কেহ বা সম্পূর্ণ একাকী কার্য্য করিতেছে কিন্তু অধিকাংশেরই এক একটি কর্ম্মসঙ্গী সঙ্গে রহিয়াছে। কোথায়ও বা দুই ব্যক্তিই পুরুষ, কোথায়ও দুই ব্যক্তিই রমণী, কিন্তু সচরাচর একটি পুরুষ ও একটি রমণী একসঙ্গে এই কার্য্যে নিযুক্ত। আমি পরমেশ্বরকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম।

পরমেশ্বর বলিলেন, "পুরুষ এবং রমণী উভয়ের প্রদত্ত রশ্মি দ্বারা যে আলোকের সৃষ্টি হয় তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট আলোক। অনেক উদ্ভিদ্-জীবনের পক্ষে এই আলোক বিশেষ প্রয়োজনীয়। কিন্তু তাহা হইলেও স্বর্গে একাধিক জাতীয় উদ্ভিদ্ বর্ত্তমান এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতির পক্ষে বিভিন্ন জাতীয় আলোকের প্রয়োজন।"

ইহাদের মধ্যস্থিত একব্যক্তি আমার নিকট দ্রুতপদে আসিয়া উপস্থিত হইল ; আমার তাহাকে দর্শনমাত্র বোধ হইতে লাগিল, শৈশবে আমরা পৃথিবীতে একত্রে শৈশবক্রীড়া করিয়াছি এবং আমরা একই দিনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। আমি পরমেশ্বরকে আমার এই ভাব জ্ঞাপন করাতে তিনি বলিলেন, "স্বর্গে, প্রত্যেকেই পরস্পরের সন্নিহিত হইলে, এই প্রকার অনুভব করে।"

যিনি আমার নিকটবর্ত্তী হইলেন, তিনি আমার হস্তধারণপূর্ব্বক আমাকে জ্যোতিপুঞ্জের মধ্য দিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। বৃক্ষশ্রেণীর শীতলতায় উপস্থিত হইয়া তিনি উচ্চস্বরে গান করিতে লাগিলেন, সহকর্ম্মিণী তাঁহার সঙ্গীত দ্বারা তাঁহার কথার প্রত্যুত্তর দিয়া, সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার কর্ম্মসঙ্গীটি স্ত্রীলোক ; তিনি আমায় তাঁহাকে দেখাইলেন। "ইহাকে পানীয় জল দিতে হইবে" এই বলিয়া স্ত্রীলোকটী স্বীয় করতলে শীতলবারি ধারণ পূর্ব্বক আমার তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন। নরকে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াও আমি জলপান করিতে সাহস করি নাই। তাঁহারা উভয়ে ফল সংগ্রহ করিয়া আমাকে খাইতে দিলেন এবং বলিলেন, "এই ফলটী বর্দ্ধিত ও সুপক্ক করিবার নিমিত্ত আমরা উভয়ে দীর্ঘকাল ইহার উপর কিরণ বিকীর্ণ করিয়াছি।" আমাকে সেই ফলটি ভক্ষণ করিতে দেখিয়া তাঁহাদের উভয়ের মুখে আনন্দের হাসি দেখা দিল।

পুরুষাকৃতি ব্যক্তিটি বলিলেন, "এই মানব শ্রান্ত হইয়াছে, বিশ্রামার্থে ইহার নিদ্রার প্রয়োজন।" আমি শ্রান্ত হইলেও নরকে নিদ্রা যাইতে সাহস করি নাই। তিনি সঙ্গিনীর জানুদ্বয়ের উপর আমার মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক, তাঁহার কুন্তলরাশি আমার দেহোপরি বিস্তারিত করিয়া দিলেন। আমি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়াও যেন কলকণ্ঠ পক্ষীগণের আহ্বানধ্বনি শুনিতে লাগিলাম। আমি জাগ্রত হইয়া দেখিলাম যেন মধুর উষা আগতপ্রায়।

পুরুষটি আমার হস্তধারণপূর্ব্বক আমাকে গিরিসমূহ মধ্যস্থিত একটা নিভৃত স্থানে লইয়া গেলেন। সেই স্থানের মৃত্তিকা অত্যন্ত কঠিন হইলেও তাহার মধ্য দিয়া ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র বৃক্ষ সকল অঙ্কুরিত হইতেছিল, সম্মুখেই ক্ষুদ্র একটি স্রোতস্বতী। তিনি বলিলেন, "আমরা এই স্থানে নূতন একটি উদ্যান রচনা করিতেছি, এখনও কেহ ইহার কথা জানে না। আমরা উভয়ে প্রতিদিন এইস্থানে কিরণজাল বিস্তার করি ; আমাদের কিরণদ্বারাই মৃত্তিকা বিদীর্ণ হইয়া এই স্রোতস্বতীর আবির্ভাব হইয়াছে, বৃক্ষ অঙ্কুরিত ও পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে।" এই বলিয়া তিনি সেই গিরি আরোহণ পূর্ব্বক ক্ষুদ্র দুইটি পুষ্প চয়ন করিয়া আমার হস্তে প্রদান করিলেন। আমি দুই হস্তে কুসুমদ্বয় ধারণ করিবা মাত্র,

আমার হস্ত হইতেও জ্যোতি নির্গত হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "এই উদ্যান শেষ হইলে সকলের যাথার্থে ইহা দান করিব।" এই বলিয়া তিনি সঙ্গিনীর সহিত নিজ কার্য্যে চলিয়া গেলেন, আমিও আমার পূর্ব্বের প্রশস্ত পথ অভিমুখে অগ্রসর হইলাম। জ্যোতিপুঞ্জের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে অপূর্ব্ব সঙ্গীতধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। সঙ্গীতধ্বনির নিকটস্থ হইয়া দেখিলাম মুদ্রিতচক্ষু একব্যক্তি গান করিতেছে ও বহুসংখ্যক লোক তাহার চতুষ্পার্শ্বে দণ্ডায়মান; তাহার নিমীলিত চক্ষু হইতে যে অপূর্ব্ব প্রভা বিনির্গত হইতেছিল, তত্তুল্য অত্যুজ্জ্বল কিছুই আমি এপর্য্যন্ত দেখি নাই। আমি পার্শ্বস্থ একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই ব্যক্তি কে?" সে বলিল, "আমাদের সুকণ্ঠ গায়ক পক্ষী।" আমি বলিলাম, "ইহার নিমীলিত নেত্রে এইরূপ জ্যোতির সঞ্চার কিরূপে হইল?"

সে বলিল, "দৃষ্টিশক্তিবিহীন হইয়া এই ব্যক্তি দেখিতে পাইত না বলিয়া সস্নেহ চুম্বনে আমরা তাহার মুদ্রিত চক্ষুদ্বয়ও জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলিয়াছি।"

ক্রমে আরও অনেকে আসিয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। আমি আরও কতকদূর যাইয়া সুখহাস্তরবে প্রতিধ্বনিত আলোকপরিব্যাপ্ত বৃক্ষসমূহের নিম্নে একদল লোক দেখিতে পাইলাম। নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলাম যে তাহারা হস্তপদ বিহীন একব্যক্তিকে স্কন্ধে লইয়া চলিয়াছে। অঙ্গহীন স্থান সমূহ হইতে যে প্রখর কিরণধারা নিঃসৃত হইতেছিল তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করাও আমার পক্ষে দুরূহ বোধ হইতেছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই ব্যক্তি কে?"

পার্শ্বস্থ একজন বলিল, "আমাদের এই ভ্রাতাটি একবার পড়িয়া গিয়া হস্তপদবিহীন হয়; সেই অবধি সে নিজে কিছুই করিতে পারে না, কিন্তু আমরা তাহার অঙ্গহীন স্থান সমূহ অনবরত চুম্বন পূর্ব্বক এমন জ্যোতির্ম্ময় করিয়াছি, যে এই স্বর্গে এমন উজ্জ্বল আর কিছুই নাই। যে সমস্ত পদার্থের বৃদ্ধির জন্য অত্যধিক উত্তাপের প্রয়োজন আমরা ইহাকে সেই পদার্থ-সমূহের সম্মুখে স্থাপন করি। আমাদের কাহারও ইহাকে অধিকক্ষণ রাখিবার সাধ্য নাই, কেননা সকলেরই ইহার উপর অধিকার আছে, এ ব্যক্তি সর্ব্ব-সাধারণের সম্পত্তি।"

আমি পরমেশ্বরকে বলিলাম, "স্বর্গ ত বড় বিস্ময়কর স্থান! অন্ধতা এবং অঙ্গহীনতাকে আমরা অত্যন্ত দুর্ভাগ্য-জনক বলিয়াই জানিতাম, কিন্তু এই স্থানে দেখিতেছি সকলই বিপরীত, আমরা যাহা দুর্ভাগ্য মনে করি তাহা এই স্থানে সৌভাগ্য বলিয়া পরিগণিত হয়।"

পরমেশ্বর বলিলেন, "তোমার কি বিশ্বাস ছিল যে প্রীতি স্থাপনের জন্য হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রয়োজন? প্রীতি কি দেহীর দেহ ভেদ করিয়া অন্তরস্থিত আত্মাতেই স্থাপিত হয় না?"

তৎপরে আমি উভয়পার্শ্বে তালবৃক্ষ-শোভিত পথ দিয়া যাইতে যাইতে পরমেশ্বরকে বলিলাম, "আমি আশৈশব স্বর্গরাজ্য সম্বন্ধে কত কল্পনা করিয়াছি, ইহার জন্য কত ব্যাকুল রোদন করিয়াছি, এখন একবার যখন এখানে আসিয়াছি, তখন আর পৃথিবীতে ফিরিব না। আমিও এইস্থানে অবস্থান করিয়া কিরণদান করিব।"

এই বলিয়া আমার পরিধেয় বস্ত্রাদি খুলিয়া ফেলিতে আরম্ভ করিলাম, মনে করিলাম, আমার দেহ হইতেও কিরণমালা বিনির্গত হইবে, কিন্তু তাহা হইল না দেখিয়া পরমেশ্বরকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম।

পরমেশ্বর বলিলেন, "তোমার হৃদয়ে কি বিন্দুমাত্র দূষিত রক্ত নাই, তুমি কি কাহারও সম্বন্ধে কোন অশুভ-কামনা পোষণ কর না?"

আমি বলিলাম, "হাঁ—"আমি ভাবিলাম, এই সুযোগে পরমেশ্বরকে আমার অনেক কালের বক্তব্য অভিযোগগুলি প্রকাশ করিয়া বলি। আমি বলিলাম, "আমার মানব ভ্রাতা যে আমাকে কত উৎপীড়ন করিয়াছে, আমার প্রতি কত অবিচার করিয়াছে, বলা যায় না, কিন্তু আমি সর্ব্বদাই তাহার সঙ্গে উদারতাপূর্ণ ও সাধু ব্যবহার করিয়াছি। কিন্তু তাহারা"—বলিতে বলিতে দেখিলাম যে আমার হস্তস্থিত পুষ্পগুলি আমার প্রতি-বাক্য উচ্চারণের সহিত ক্রমশঃ শুষ্কতর হইতেছে, সুতরাং আমি নীরব হইলাম।

পরমেশ্বর আমাকে তাঁহার সহিত উচ্চতর পথে অগ্রসর হইতে বলায় আমি আমার পরিচ্ছদ শরীরের চতুর্দ্দিকে বেষ্টনপূর্ব্বক তাঁহার অনুসরণ করিলাম।

পর্ব্বতসমূহ উচ্চতর ও একেবারে খাড়া হইতে আরম্ভ করিল; অবশেষে আমরা অভ্রভেদী এক পর্ব্বতপৃষ্ঠে

উপস্থিত হইলাম। সে স্থানে কার্য্যে নিযুক্ত অনেক মনুষ্য দেখিলাম। তাহারা তীক্ষ্ণাগ্র যন্ত্র দ্বারা ভূমি বিদ্ধ করিতেছে। আমি দেখিলাম তাহারা প্রাণপণে পরিশ্রম করিতেছে। কেহ কেহ একত্র হইয়া কার্য্য করিলেও অধিকাংশ লোক পৃথক্‌ভাবেই কার্য্য করিতেছিল, তাহাদের ললাটদেশ হইতে ঘর্ম্মবিন্দু ভূতলে পড়িতেছিল ও কষ্টসাধ্য পরিশ্রমে হস্তের মাংসপেশীগুলি স্ফীত হইয়া উঠিতেছিল। আমি বলিলাম, "স্বর্গে আবার কাহাকেও এইরূপ পরিশ্রম করিতে দেখিব, ইহা আমার চিন্তার অগোচর ছিল।" ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই উদ্যানে, যেস্থানে সকলে সঙ্গীত করিতেছিল ও পরস্পরকে প্রীতিদান করিতেছিল তাহার কথা স্মরণ হইবামাত্র বিস্মিত ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলাম যে ইহারা কেন সেইরূপ সুখের স্থান পরিত্যাগ করিয়া এই লতাগুল্ম-বিহীন প্রস্তরাবৃত পর্ব্বতপৃষ্ঠ কর্ম্মক্ষেত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছে। আমি উহাদের ললাটোত্থিত জ্যোতিঃ দেখিতে লাগিলাম এবং ইহাও দেখিলাম যে, ভূমিতে যে ঘর্ম্মবিন্দুগুলি পতিত হইতেছিল তাহা হইতেও জ্যোতি নিঃসৃত হইতেছে।

আমি পরমেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলাম তাহারা কি পদার্থ অন্বেষণ করিতেছে?

পরমেশ্বর আমার চক্ষুদ্বয় স্পর্শ করিবামাত্র আমি দিব্যদৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া দেখিলাম, তাহারা যে ক্ষুদ্র প্রস্তরগুলি সংগ্রহ করিতেছিল, সেগুলি এত উজ্জ্বল যে আমার চর্ম্মচক্ষে তাহা পূর্ব্বে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না; আমি আরও লক্ষ্য করিলাম যে প্রস্তরসমূহোত্থিত আলোক ও অন্বেষণকারী-দিগের ললাটনিঃসৃত আলোক একই প্রকারের। কোন ব্যক্তি প্রস্তর পাইবামাত্র তাহার নিকটস্থ সঙ্গীকে দিতেছে, সে আবার তাহার পার্শ্ববর্ত্তীকে দিতেছে, এইরূপে সেটা হস্ত হইতে হস্তান্তরে প্রেরিত হইতেছিল, কেহই উহা নিজে রাখিতেছিল না। বৃহৎ কোন প্রস্তর দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র সকলের মিলিত জয়ধ্বনিতে আকাশ কম্পিত হইতেছিল, এইরূপে প্রত্যেকে একই কার্য্যে প্রবৃত্ত ছিল।

আমি পরমেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহারা এই প্রস্তরগুলি লইয়া কি করিতেছে?" পরমেশ্বর আমার পার্থিব দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর করিবার উদ্দেশে নয়নদ্বয় স্পর্শ করিলেন, আমি দিব্যদৃষ্টিমান্ হইয়া আমারই পার্শ্বদেশে এক সুবৃহৎ মুকুট দর্শন করিলাম, মুকুটের আলোকে চতুর্দ্দিক দেদীপ্যমান।

পরমেশ্বর বলিলেন, "আহৃত প্রত্যেকটি প্রস্তর এই মুকুটে সন্নিবেশিত হইবে।"

মুকুটের শিল্পচাতুর্য্য অবর্ণনীয়, ইহা এক অত্যাশ্চর্য্য ও অভিনব আদর্শে গঠিত হইতেছিল। সমগ্র মুকুটমধ্যে একই আদর্শ, অথচ ইহার প্রত্যেক অঙ্গে বিভিন্ন কারুকার্য্য।

আমি ঈশ্বরকে বলিলাম, "কোন্ অংশে, কোন্ প্রস্তরখানি সন্নিবেশিত করিলে সমগ্র মুকুটখানির কারুকার্য্যের সামঞ্জস্য থাকিবে তাহা এতগুলি বিভিন্ন হস্ত কি প্রকারে বুঝিতে পারে?"

পরমেশ্বর বলিলেন, "ইহাদের ললাটস্থ আলোকে সমগ্র মুকুটটির প্রতিকৃতি ইহাদের চক্ষের সম্মুখে অনুক্ষণই প্রকাশমান থাকে।

আমি বলিলাম, "ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ নানাজাতীয় অসংখ্য প্রস্তরখণ্ডের সন্নিবেশে এই মুকুটটি রচিত হইলেও এবং পরস্পর পরস্পর গাত্রে সংলগ্নীকৃত হইলেও কোথায়ও একটুও সংযোগচিহ্ন ত দেখিতেছি না; সমস্ত মুকুট যেন এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড খোদন পূর্ব্বক নির্ম্মিত হইয়াছে, বোধ হইতেছে।"

পরমেশ্বর বলিলেন, "প্রস্তরখণ্ডগুলির জীবনীশক্তি আছে, তাহারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে।"

আমি বলিলাম, "এই শ্রমসাধ্য কার্য্য ইহারা কেন করে, ইহাতে ইহাদের কি লাভ?"

পরমেশ্বর বলিলেন, "ইহাদের সম্মুখস্থ আদর্শকে দিন দিন বর্দ্ধিতকলেবর দেখিয়া ইহারা সুখী হয়।"

আমি বলিলাম, "প্রথমপ্রাপ্ত প্রস্তরগুলি পশ্চাদ্গ্রথিত প্রস্তর দ্বারা আচ্ছন্ন হইতেছে, আবার এইগুলিও পরবর্ত্তী ভবিষ্যতে উদ্ধৃত প্রস্তরখণ্ড দ্বারা আচ্ছন্ন হইবে ত?"

পরমেশ্বর বলিলেন, "প্রচ্ছন্নভাবে থাকিবে বটে, কিন্তু অন্তর্হিত হইবে না, এই মুকুটেই সেগুলি বর্ত্তমান থাকিয়া কিরণদান করিবে।" পুঞ্জীকৃত আলোকরশ্মি সমবেত হইয়া, একই পূর্ণ আলোক সৃষ্টি করে। প্রথম না থাকিলে শেষ কোথা হইতে আসিবে? আদি হইতেই অন্তের উৎপত্তি হইয়া থাকে।"

আমি পরমেশ্বরকে বলিলাম, "এই মুকুট কবে পরিসমাপ্ত হইবে!"

পরমেশ্বর বলিলেন, "ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত কর।"

আমি ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক মস্তকোপরি বিশাল পর্ব্বতদেহ বিদ্যমান দেখিলাম, শৃঙ্গ বহুদূরে দৃষ্টির অতীত স্থানে সংস্থিত ছিল, মেঘের অভ্যন্তরে কোথায় যে তাহার শেষ সীমা তাহা নিরূপণ করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য।

পরমেশ্বর আর কিছুই বলিলেন না। আমিও পুনর্ব্বার মুকুটের প্রতি দৃষ্টিস্থাপন করিলাম। সহসা আমার প্রাণে এক অদম্য আকাঙ্ক্ষার উৎপত্তি হইল:—মৃত্যু কর্ত্তৃক অপহৃত শিশুর জন্য মাতার গভীর ব্যাকুলতার ন্যায়, বন্ধুর জন্য বন্ধুর একাগ্র দর্শন-লালসার ন্যায়, আসন্নমৃত্যু জনের গতপ্রায় জীবন ধরিয়া রাখিবার আকাঙ্ক্ষার ন্যায়, প্রেমের প্রথম বসন্তের জাগরণ কালে তরুণ আত্মার প্রেমতৃষ্ণার ন্যায়, অথবা এই সকল হইতে শতগুণে প্রবলতর এক আকাঙ্ক্ষা আমার হৃদয়কে দগ্ধ করিতে লাগিল। আমি পরমেশ্বরকে বলিলাম, "আমি ইহাদের সহিত একত্র হইয়া ইহাদের কার্য্যে সাহায্য করিতে চেষ্টা করিব; আমিও এই আশ্চর্য্য অভিনব আদর্শের মুকুটে রত্নখণ্ড বসাইব; আমার হস্তকেও ইহার পরিসমাপ্তি কার্য্যে নিযুক্ত করিব। আমি যদি এই কার্য্যে সম্পূর্ণ অকৃতকার্য্যও হই, বৎসরের পর বৎসর অতীত হইলে পরও যদি আমার হস্ত একখণ্ড রত্ন অন্বেষণ করিয়া না পায়, তথাপি আমি এই শ্রমশীল, অভিনব কার্য্যে প্রবৃত্ত আত্মাদিগের নৈকট্য-নিবন্ধন আপনাকে কৃতার্থ মনে করিব। এই স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক নূতন বৃহদায়তন রত্নখণ্ড আহরণ মাত্র তাহাদের উল্লাসধ্বনির সহিত নিজ কণ্ঠ মিলাইয়া জয়ধ্বনি করিব; মুকুট দিন দিন বর্দ্ধিতকলেবর হইতেছে দেখিয়া আমিও সুখী হইব।"

মুকুটদর্শনেচ্ছা আমাকে এমনই ব্যাকুল করিল যে আমার বোধ হইতে লাগিল যে আমারও ললাট হইতে মুক্তপ্রভা নির্গত হইতেছে।

পরমেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "উল্লাসোত্থিত সঙ্গীতধ্বনি শ্রবণ করিতেছ?"

আমি বলিলাম, "আপাততঃ দর্শনেন্দ্রিয় ব্যতীত আমার অন্য সকল ইন্দ্রিয়ই মৃতভাব ধারণ করিয়াছে, আমার কিছুই শ্রবণগোচর হইতেছে না। নেত্রদ্বয় একান্তভাবে মুকুট দর্শনেই নিযুক্ত রহিয়াছে।"

বাস্তবিক ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা আমার বাক্‌শক্তিকেও অবশ করিয়া দিল; নিম্নতর স্বর্গ ও সেস্থানের সঙ্গীতধ্বনির কথা স্মৃতি হইতে যেন তিরোহিত হইয়া গেল; আমি দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া স্বীয় দেহোপরি যে সকল বস্ত্র ছিল তাহা ভূমিতে নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহাদের একটা বিশাল স্তূপ ভূমিতল হইতে উত্তোলিত করিতে প্রাণপণ প্রয়াস পাইলাম কিন্তু উত্তোলন দূরের কথা একটু নড়াইতেও সক্ষম হইলাম না।

পরমেশ্বর বলিলেন, "উহা উত্তোলন করিবার উপযুক্ত শক্তির সঞ্চার তোমার ত হয় নাই, তুমি কি প্রকারে কৃতকার্য্য হইবে? তোমার নিজ পরিচ্ছদ পরিধান কর।"

আমি অগত্যা পরিচ্ছদ তুলিয়া লইয়া পরমেশ্বরের আজ্ঞা অনুসারে তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম। বারংবার পশ্চাতে ফিরিয়া আমি সেই দেদীপ্যমান মুকুটের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিলাম।

উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থানে আমরা আরোহণ করিতে লাগিলাম, বায়ু লঘুতর হইতে লাগিল। শুষ্ক পর্ব্বতপৃষ্ঠে উদ্ভিদের চিহ্নমাত্র নাই; অনাবৃত নিস্তব্ধতা সর্ব্বত্র বিদ্যমান, আমার শ্বাস প্রক্রিয়া কষ্টকর হইয়া আসিল; অঙ্গুলিপ্রান্ত রক্তরঞ্জিত হইল; আমি পরমেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহাও কি স্বর্গ?"

তিনি বলিলেন, "ইহাই উচ্চতম স্বর্গ।" আমরা আরও ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতে লাগিলাম। আমি পরমেশ্বরকে বলিলাম, "আমি এই উচ্চ স্থানের বায়ুতে ত আর নিঃশ্বাস লইতে পারিতেছি না!" পরমেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, নির্দ্দোষ বিশুদ্ধ বায়ু বলিয়া কি?"

আমার মস্তক বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল; অঙ্গুলিপ্রান্তস্থিত চর্ম্ম বিদীর্ণ হইয়া রক্তপাত হইতে লাগিল। অবশেষে আমরা নির্জ্জন এক পর্ব্বতশীর্ষে উপনীত হইলাম। সেখানে জীবিত পদার্থের চিহ্ন মাত্রও ছিল না। কেবল সুদূরে, এক পর্ব্বতশিখরে এক ব্যক্তিকে দণ্ডায়মান দেখিলাম। সে পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোক তাহা বোধগম্য হইতেছিল না। আকৃতিতে নারী বলিয়া অনুমিত হইলেও ইহার অঙ্গ

প্রভাতাদি পুরুষের ন্যায় সুদৃঢ়, বিশাল ও শক্তিশালী। আমি পরমেশ্বরকে বলিলাম, "এ ব্যক্তি পুরুষ না নারী?"

পরমেশ্বর বলিলেন, "নিম্নতম স্বর্গে স্ত্রী ও পুরুষগত পার্থক্য বিশেষভাবে অনুভূত হয়। উচ্চতর স্বর্গে ক্রমশঃ সে পার্থক্য লোপ পাইতে থাকে; উচ্চতম স্বর্গে এই পার্থক্য একেবারেই রহিত হয়।"

আমি এই মানবাকৃতিকে প্রাণপণ শক্তিতে বিশেষ কোন কার্য্যে নিযুক্ত দেখিলাম, কিন্তু কার্য্য যে কি তাহা আমার দৃষ্টিগোচর হইল না।

আমি পরমেশ্বরকে বলিলাম, "এই ব্যক্তি এই স্থানে কি প্রকারে উপস্থিত হইল?"

পরমেশ্বর বলিলেন, "স্বীয় রক্তে আর্দ্রীকৃত দুরারোহ সোপানাবলি দ্বারা। এই আত্মা নিম্নতম নরক হইতে এক এক পদ করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। দিনের পর দিন যতই অতিবাহিত হইতে লাগিল, নরক পশ্চাতে সরিতে লাগিল বটে, কিন্তু স্বর্গের পথ যেন তাহাতে নিকটতর হইল না। কতকাল স্বর্গ ও নরকের মধ্যস্থিত ব্যবধান পথে অতিবাহিত হইল। অবশেষে দুই রাজ্যের মধ্যস্থিত শূন্যে একাকী দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় স্বর্গরাজ্যে আগমনে সক্ষম হইল। এই স্থানে এই বিপদসঙ্কুল পথে প্রত্যেক পদক্ষেপের ভীষণ সংগ্রামে ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি ক্রমশঃ বিপুল হইতে বিপুলতর আয়তন প্রাপ্ত হইল এবং পুরাতন গাত্র-বস্ত্রগুলি শরীর হইতে খণ্ড খণ্ড হইয়া খসিয়া পড়িল। স্বর্গের প্রতি একাগ্রনেত্রে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে চক্ষু হইতে অবিরল জলধারা পতিত হইতে লাগিল। ইহার প্রত্যেক পাদনিক্ষেপের স্থান রুধিরসিক্ত হইয়াছে। অবশেষে দুঃসহ কষ্টসাধনের ফলে এইস্থানে উপস্থিত হইয়াছে।" নিম্নতর স্বর্গের কথা আমার স্মৃতিপটে উদয় হইল। সেখানে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক সঙ্গীতধ্বনি করিতেছিল; উদ্যানে ও পর্ব্বতপৃষ্ঠে সকলে একত্র কার্য্য করিতেছিল, কিন্তু এব্যক্তি কাহারও সাহায্য ও সহানুভূতি পায় নাই। ইহার অবস্থা মনে করিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম।

আমি বলিলাম, "এই স্থানের মহাশূন্যতা ও নির্জ্জনতা প্রাণে আতঙ্ক আনিয়া দেয়।"

পরমেশ্বর বলিলেন, "এখন ত আর ইহাকে একাকী থাকিতে হয় না।"

আমি বলিলাম, "এত কষ্টসাধনের ফলস্বরূপ ইহার কি পুরস্কার লাভ হইয়াছে? আমি ত কোন প্রতিদানই দেখিতেছি না।"

ঈশ্বর আমার নেত্রদ্বয় স্পর্শ করিলেন; আমি স্বর্গ ও নরক রাজ্য এক সঙ্গে দর্শন করিবার শক্তি পাইলাম। পরমেশ্বর বলিলেন, "নির্জ্জন ও অত্যুচ্চ পর্ব্বতশিখরের উপর যেস্থানে সে এক্ষণে দণ্ডায়মান, সেখান হইতে সকলই দ্রষ্টব্য।"

উদ্যানের প্রত্যেক আলোক-কণা সুস্পষ্টভাবে তাহার নিকট প্রতীয়মান; পুষ্পের জীবন সঞ্চার ও স্রোতস্বিনীবক্ষে আলোকের লীলা তাহার দৃষ্টিবহির্ভূত নহে; পর্ব্বতপৃষ্ঠে কর্ম্মরত আত্মাদিগের উল্লাসধ্বনি একটিও তাহার অশ্রুত থাকে না। মুকুটের ক্রমবিকাশ ও তাহার দিব্যজ্যোতি ইহার চক্ষুর অগোচর নহে; সমগ্র সৃষ্টিও ইহার দৃষ্টির অন্তর্গত। ক্রমোন্নত, অপরের অজ্ঞাত পথগুলিও ইহার অদৃশ্য নহে। ইহার কিছুই অবিদিত নাই। নরকও ইহার নিকট ঘৃণ্য নহে; সে জানে, নরকরূপ বীজ-বপনক্ষেত্র হইতে স্বর্গের উৎপত্তি। তরুলতা প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ পদার্থের পুষ্টিসাধনের জন্য শিকড়গুলি যেমন মৃত্তিকাগর্ভ হইতে রস আকর্ষণ পূর্ব্বক বৃক্ষের শাখা প্রশাখা সর্ব্বত্রই প্রেরণ করে, নরক সম্বন্ধেও সেই একই প্রণালী। আমি দেখিলাম, বিশালদেহ এই মানব স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইল এবং তাহার মুখের অপূর্ব্ব জ্যোতি হস্তস্থিত কার্য্যের উপর নিপতিত হইল।

আমি পরমেশ্বরকে বলিলাম, "এই ব্যক্তি কি কার্য্য করিতেছে?"

পরমেশ্বর বলিলেন, "বাদন কার্য্য। মহাসঙ্গীত রচনা কার্য্য।"

তিনি আমার কর্ণদ্বয় স্পর্শ করিবামাত্র আমার শ্রবণেন্দ্রিয় সেই অভূতপূর্ব্ব, চিত্তমুগ্ধকর, অবর্ণনীয় বাদ্যধ্বনি শ্রবণে সমর্থ হইল। অনেকক্ষণ শ্রবণের পর আমি অস্ফুটস্বরে বলিলাম, "ইহাই স্বর্গ বটে।"

আমার চক্ষু হইতে অনবরত অশ্রুপাত হইতেছিল।

পরমেশ্বর বলিলেন, "তুমি রোদন করিতেছ কেন?" আমি আনন্দাতিশয্যে উত্তরদানে অসমর্থ হইলাম।

এই সময়ে কার্পা হইতে ক্ষণকালের জন্য বিরত হইয়া সে মুখখানি উর্দ্ধে উত্তোলন করিবামাত্র তাহা হইতে নিঃসৃত জ্যোতি আমার দেহে পতিত হইল। ক্রমশঃ জ্যোতি উজ্জ্বল হইতে এত উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল, যে সকল পদার্থই যেন এক গভীর আলোক-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া গেল, কোন পদার্থের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রহিল না, সবই একাকার ধারণ করিল। পরমেশ্বর, পর্ব্বতশিখরস্থ ব্যক্তি ও আমি সকলের অস্তিত্বই এই জ্যোতিতে বিলীন হইয়া গেল এবং আমরা সকলেই যেন ইহার অংশবিশেষ হইয়া পড়িলাম। আমি বলিয়া উঠিলাম, "পরমেশ্বর, আপনি কোথায়?" উত্তর পাইলাম না। কেবল শুনিলাম এক অনির্ব্বচনীয় মহাবাদ্য—দেখিলাম এক অপূর্ব্ব আলোক। কিয়ৎক্ষণ পরে এই আলোকরাশি সহসা অন্তর্হিত হইল, আমিও আবার সমস্ত পদার্থই সুস্পষ্ট দেখিতে সক্ষম হইলাম। দেখিলাম, সেই আমি আমার পুরাতন, জীর্ণ, ধূসরবর্ণের পরিচ্ছদ পরিহিত হইয়া রহিয়াছি; এবং পরমেশ্বর ও সেই মানব যথাস্থানে অবস্থান করিতেছেন।

আমি এই ব্যক্তির পার্শ্বে গিয়া একত্রে বাজনা বাজাইব, সাহস করিয়া এমন কথা বলিতে পারিলাম না। আমি জানিতাম যে, আমাদের উভয়ের মধ্যে অনেক দূরত্ব; দণ্ডায়মান অবস্থায় আমি তাহার জানুদেশও স্পর্শ করিতে অক্ষম সুতরাং তাঁহার মহাবাদনযন্ত্র স্পর্শ করিবারও আমার শক্তি নাই, কিন্তু আমি মনে ভাবিলাম, যে স্থানে দণ্ডায়মান আছি সেই স্থান হইতেই তাঁহার সুবিশাল বাদ্যযন্ত্রের সহিত সুর মিলাইয়া গান গাহিব. কিন্তু আমি অনেক চেষ্টায়ও কণ্ঠ হইতে স্বাভাবিক স্বর নির্গত করিতে পারিলাম না। আমার ক্ষীণ ভগ্ন স্বর কাঁপিয়া কাঁপিয়া থামিয়া গেল।

তৎপর পরমেশ্বর স্বীয় অঙ্গুলী সঙ্কেতে আমাকে স্বর্গরাজ্য পরিত্যাগ করিতে বলিলেন।

আমি পরমেশ্বরকে বলিলাম, "আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক এইস্থানে থাকিবার অনুমতি প্রদান করুন। আমি জানি, পর্ব্বতোপরি অবস্থান পূর্ব্বক গান গাহিবার উপযুক্ত নহত্ব আমার নাই; পার্শ্বে থাকিয়া ইহার পরিশ্রম লাঘব করিবার শক্তিও আমার নাই, উজ্জ্বানে থাকিয়া আলোকপ্রদানের অথবা প্রীতি দ্বারা অপূর্ণতাকে দিব্যজ্যোতিতে পরিণত করিবার শক্তিও আমার নাই, সেইজন্য শুদ্ধ এই দ্বারপার্শ্বে অবস্থান করিবার অধিকার আমাকে দান করুন। আমি আনতজানু হইয়া সকল ধূলা আবর্জ্জনারাশি পথ হইতে অপসৃত করিব; মুক্তিপ্রাপ্ত আত্মাদের স্বর্গরাজ্য প্রবেশের দৃশ্য দেখিব; তাহাদের মুখনিঃসৃত অপূর্ব্ব জ্যোতি দেখিয়া ধন্য হইব, উজ্জ্বান হইতে প্রতিধ্বনিত গীতধ্বনি শ্রবণ করিব; পর্ব্বতপৃষ্ঠস্থ ব্যক্তিগণের সানন্দ উল্লাস ধ্বনি—"

পরমেশ্বর বলিলেন, "অসম্ভব; সম্পূর্ণ অসম্ভব। ইহাও কি কখনও হইতে পারে?"

এই বলিয়া আবার অঙ্গুলী নির্দ্দেশে আমাকে সে রাজ্য পরিত্যাগ করিতে বলিলেন।

আমি পুনরায় বলিলাম, "স্বর্গে বাস করিবার যদি আমি নিতান্তই অনুপযুক্ত হই, তবে আমাকে নরকরাজ্যে বাস করিবার অনুমতি দান করুন। সেস্থানে আমি পতিত নরনারীর হস্ত নিজহস্তে স্থাপন পূর্ব্বক, পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিব এবং ক্রমোন্নতি প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গের অভিমুখে অগ্রসর হইব।"

পরমেশ্বর তথাপিও অবিচলিতভাবে পূর্ব্ববৎ ইঙ্গিতে স্বর্গ পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন।

আমি তখন ভূমিতে গড়াগড়ি দিয়া রোদন করিতে করিতে বলিলাম, "আমার আবাসভূমি পৃথিবী এত ক্ষুদ্র, এত অকিঞ্চিৎকর! কাহাকেও স্বর্গের শোভা সৌন্দর্য্য দর্শন করাইয়া আবার পৃথিবীতে প্রেরণ করা কি যুক্তি-সঙ্গত?"

পরমেশ্বর তাঁহার হস্ত সস্নেহে আমার পৃষ্ঠে স্থাপন পূর্ব্বক বলিলেন, "যাও, পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন কর। তুমি যাহা অন্বেষণ করিতেছ তাহা পৃথিবীতেই পাইবে।"

আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। রজনীর নিস্তব্ধতা ও অন্ধকারের তখন অবসান হইয়াছে। আমার ক্ষুদ্র বাতায়নের ভিতর দিয়া নূতন দিবসের আলোক দেখা যাইতেছিল। আমি পুনর্ব্বার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া প্রাচীর অভিমুখে মুখ ফিরাইয়া শুইলাম। আমার আর এই নীরস ও বিষাদময় জগতে থাকিতে ভাল লাগিতেছিল না।

গৃহনিস্বন রাজপথে শতশত নরনারী যাতায়াত করিতেছিল; তাহাদের পদশব্দ সুস্পষ্টভাবে আমার শ্রুতিগোচর হইতেছিল। পুরুষেরা কর্ম্মস্থানে, ভৃত্যেরা দৌত্যকার্য্যে, বালকেরা বিদ্যালয়ে, শ্রান্ত শিক্ষকেরা ধীরগমনে, চলচ্ছক্তি-পরায়ণ নরনারী রাত্রিজাগরণ বশতঃ শ্রান্তপদে, চিত্রকরেরা ত্বরিত ও অধীরপদে, পণ্যদ্রব্য বিক্রেতারা ক্রেতার নিকট হইতে বিক্রয়ার্থ দ্রব্য লইয়া যাইবার আদেশের জন্য, শিশুরা খাদ্যসংগ্রহের জন্য—এই প্রকারে বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন প্রয়োজনে রাজপথগামী জনপ্রবাহের পদধ্বনি আমার শ্রুতিগোচর হইতেছিল।

রাজপথের প্রান্তদেশে, সংকীর্ণ গলির সম্মুখে একটা ভগ্ন বাদ্যযন্ত্র কে বাজাইবার প্রয়াস পাইতেছিল। ভগ্নযন্ত্রটা বেসুর হইয়া থামিয়া যাইতেছিল, আবার পরমুহূর্ত্তেই বাজিয়া উঠিতেছিল। আমাকে এই ভগ্নবীণার ভগ্নস্বর, মানবকণ্ঠ-নিঃসৃত গীতধ্বনির কথা স্মরণ করাইতেছিল। শুনিতে শুনিতে আমার হৃৎপিণ্ড প্রায় স্পন্দনরহিত ও শীতলতা প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হইল; আমি পুনরায় নিদ্রিত হইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু ব্যর্থপ্রয়াস হইয়া জনস্রোতের পদধ্বনিই শুনিতে লাগিলাম। সহসা পদধ্বনিগুলি যেন উচ্চক্রন্দনে বলিতে লাগিল, "আমরা অন্বেষণ করিতেছি", "অন্বেষণ করিতেছি।" রাজপথপ্রান্তস্থ ভগ্ন বাদ্যযন্ত্রও যেন দীর্ঘ-নিশ্বাসের সহিত বলিতে লাগিল "সুন্দর", "সুন্দর" "সুন্দর।"

আমার মৃতপ্রায় হৃদয়তন্ত্রীও প্রত্যেক স্পন্দনের সহিত একতানে বলিয়া উঠিল, "প্রেম"—"সত্য"—"সুন্দর"—"সুন্দর"—সুন্দর।"

ইহা ত স্বর্গেরই সেই মহা সঙ্গীত, যে সঙ্গীতের সঙ্গে আমি আমার ক্ষুদ্র, অকিঞ্চিৎকর সুর মিলাইতে পারি নাই।

আমি ইহার পর সম্পূর্ণ জাগ্রতভাবে শয্যার উপর উঠিয়া বসিলাম। সূর্য্যকিরণ ক্ষুদ্র বাতায়ন ভেদ করিয়া আমার মলিন শয্যাবস্ত্রের উপর পতিত হইতেছিল, আমি তাহা দেখিয়া আনন্দে হাস্য করিলাম।

পূর্ব্বে দীর্ঘদিবস সম্মুখে রহিয়াছে ভাবিয়া নিরাশায় ও ভয়ে কাতর হইতেছিলাম, এক্ষণে সেই দীর্ঘদিবসের কথা স্মরণ করিয়া আনন্দিত হইলাম। স্বপ্নে পরমেশ্বর বলিয়াছিলেন, "তুমি যাহা অন্বেষণ করিতেছ তাহা পৃথিবীতেই পাইবে।"*

* কুমারী সাবিত্রী সেন এম, বি, কর্ত্তৃক ইংরেজী হইতে অনুবাদিত।

কৃত্তিবাস *

ব্যাস, বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস।—সামান্য প্রণিধান সহকারে দৃষ্টি করিলেই যেমন উপলব্ধ হয় যে, সংস্কৃত অনার্য্য কাব্যাবলীর অধিকাংশের উপরেই ব্যাস বা বাল্মীকির প্রভাব সুপরিস্ফুট, কেহ মহর্ষি ব্যাস-বিরচিত কবিতা-কুঞ্জের পথিক, কেহ বা রত্নাকরের নানারত্ন-সমুদ্ভাসিত কবিতা-মন্দিরের যাত্রী; এক-ভাবে না এক-ভাবে যেমন ব্যাস-বাল্মীকি এই উভয়ের একতরের কার্য্যের আদর্শ, পরবর্ত্তী অনার্য্য কবিকুলের কাব্যাবলীর উপজীব্য, তদ্রূপ, বাঙ্গালার মহাকবি কৃত্তিবাসের প্রভাব,—তাঁহার ভাষার প্রভাব, ভাবের প্রভাব, রচনাভঙ্গির প্রভাব, তৎপরবর্ত্তী বঙ্গীয় কবিকুলের উপর সম্যক্‌রূপে সুপরিস্ফুট। কৃত্তিবাসের পরবর্ত্তী কবিবৃন্দ, যে সমুদয় সুরভিকুসুমে বীণাপাণির পাদপূজা করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই তদীয় কবিতারূপী কল্পনাকানন হইতে সংগৃহীত। এই হিসাবে, সংস্কৃত কাব্যাবলীর সহিত ব্যাস-বাল্মীকির যে সম্বন্ধ, বঙ্গভাষার কাব্যাবলীর সহিত কৃত্তিবাসেরও সেই-ই সম্বন্ধ।

কালিদাস ও কৃত্তিবাস।—আদিকবি বাল্মীকির রামায়ণের পর কালিদাস আবার সেই রামচরিতেরই পুনর্বর্ণন করিলেন। রামায়ণ শ্লোকবদ্ধ মহাকাব্য, কালিদাসের রঘুবংশও শ্লোকবদ্ধ মহাকাব্য। কালিদাসের আবির্ভাবের বহুপূর্ব্ব হইতে রামায়ণ ভারতের সকল সমাজে কীর্ত্তিত, গীত, অধীত ও ভক্তিপূর্ব্বক শ্রুত হইত। তথাপি কালিদাসের রঘুবংশ ভারতের বিদ্বদ্‌বৃন্দ সাদরে গ্রহণ করিলেন। ইহার হেতু কি? একান্ত সুপরিচিত, সর্ব্বদা শ্রুত বৃত্তান্তের পুনঃ পঠন-পাঠনে এই যে আগ্রহ, এত যে আদর, তাহার একমাত্র কারণ কালিদাসের প্রাঞ্জল ভাষা ও ভাবের সুস্পষ্টতা। যদি ভাষা এত সুন্দরী এবং সম্পত্তিশালিনী না হইত, তাহা হইলে, কেবল ভাবের তরঙ্গলীলায় বা কল্পনার ক্রীড়ায় কালিদাসের কাব্য সুধী-সমাজের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিত না। কল্পনাবিষয়ে বাল্মীকির সহিত কালিদাসের তুলনা করিতে প্রয়াস পাওয়া বৃথা। তবুও যে,

* ফুলিয়াগ্রামে কৃত্তিবাস স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন উপলক্ষে সভাপতি অধ্যাপক আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গত ২০শে চৈত্র পঠিত।

কালিদাস এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাহার প্রধান কারণ তাঁহার সুমধুর ভাষা। কালিদাস ব্যতীত আরও অনেকে রামায়ণ উপজীব্য করিয়া কাব্যাদি বিরচন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থ জনসমাজে রঘুবংশাদির ন্যায় আদৃত হয় নাই। এই আদর-অনাদরের একমাত্র নিদান, ভাষাগত প্রাঞ্জলতার উৎকর্ষাপকর্ষ এবং ভাবের সুস্পষ্টতা। কালিদাস এমন মনোহারিণী ভাষায় তদীয় কাব্যাবলী নির্ম্মাণ করিয়াছেন যে, যে কোন সময়ে, যে কোন সমাজের লোকেই তাহা পাঠ করুক না কেন, বিমুগ্ধ হইবে। সংস্কৃত সাহিত্যে এই ভাষাগত উৎকর্ষের জন্য যেমন কালিদাসের শ্রেষ্ঠতা, বঙ্গীয় সাহিত্যেও তেমনি ভাষাগত উৎকর্ষের নিমিত্ত কৃত্তিবাসের শ্রেষ্ঠতা। যে ভাষা সম্প্রদায় বিশেষের জন্য উপনিবদ্ধ, অর্থাৎ কেবল শিক্ষিত বা কেবল অশিক্ষিতদিগের জন্য যে ভাষা ব্যবহৃত, ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ, ইহার একতরের উদ্দেশে যে ভাষা গ্রথিত, তাহা কদাচ স্থায়ী বা সকল-জনসম্মত উৎকৃষ্ট ভাষা হইতে পারে না। তাদৃশী ভাষায় নিবদ্ধ গ্রন্থাদি কখনও কালজয়ী হইতে পারে না। তাহাকে প্রকৃত ভাষা বলা যায় না। তাদৃশী ভাষায় বিরচিত গ্রন্থাদি কালের তরঙ্গে দেখিতে দেখিতে ভাসিয়া যায়। অল্পকাল মধ্যেই তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

যে ভাষা কোনও সম্প্রদায় বিশেষে সীমাবদ্ধ নহে, সকল সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে, সমাজ-দেহের প্রত্যেক শিরা ধমনী কৈশিকায় যে ভাষা প্রবেশ করিতে পারে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকে যে ভাষাকে "আমার" বলিয়া গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করেন, শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী নির্ধন, পণ্ডিত অপণ্ডিত, সকলে সমানভাবে যে ভাষাকে আদর করিয়া লয়েন, তাহাই যথার্থ ভাষা। কালিদাস যেমন তাদৃশী সর্ব্বভোগামিনী সর্ব্বতোব্যাপিনী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়াই তদীয় কাব্য, সকল সম্প্রদায়ে, সকল সময়ে সকলের প্রিয় পদার্থ, মহাকবি কৃত্তিবাসও তদীয় অন্যান্য রামায়ণ কাব্য সেইরূপ সর্ব্বকালানুযায়িনী সর্ব্বতোগামিনী ও সর্ব্বতোব্যাপিনী ভাষায় রচনা করিয়াছেন বলিয়া, তদীয় রামায়ণ, এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যে সমুদয় কাব্যের ভাষা প্রাঞ্জল নহে, বা ভাবও সুস্পষ্ট নহে, সেই কাব্যাদির প্রভাব সমাজে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। ভাষা ও ভাব উভয় সম্পদে সম্পন্ন বলিয়াই কৃত্তিবাসের রামায়ণ কালজয়ী হইয়া রহিয়াছে। সংস্কৃতে কালিদাস এবং বঙ্গভাষায় কৃত্তিবাস এই দুই জন একই কারণে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

কৃত্তিবাস ও অন্যান্য রামায়ণকারগণ।—কৃত্তিবাসের পর আরও অনেক কবিযশঃপ্রার্থী ব্যক্তি রামায়ণ রচনাপূর্ব্বক বঙ্গসাহিত্যের অঙ্গ পরিপুষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সকলের দ্বারাই যে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে একথা নিঃসঙ্কোচে বলা কঠিন।

এপর্য্যন্ত যত দূর জানা গিয়াছে, তাহাতে কৃত্তিবাসই সর্ব্বপ্রথম বঙ্গভাষায় রাম-চরিত নিবদ্ধ করেন। তাহার পরে আরও চতুর্দ্দশ ব্যক্তি রামায়ণী কথার পুস্তক রচনা করিয়াছেন বলিয়া নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। কালে হয় ত, আরও অনেক পাওয়া যাইবে। এ প্রসঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আর সেই সঙ্গে বঙ্গভাষার ইতিহাস-লেখক অক্লান্তকর্ম্মা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ও সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। এতদুভয়ের সমবেত চেষ্টার ফলেই আমরা আজ কৃত্তিবাসকে প্রকৃত ভাবে চিনিবার অবসর পাইয়াছি। কৃত্তিবাসের রামায়ণে যে প্রকার পাঠ-বৈষম্য ঘটিয়াছে, তাহাতে প্রকৃত কৃত্তিবাসের সম্পূর্ণ পরিচয় এখনও দুর্লভ। তবুও যতটা পাওয়া যাইতেছে, তজ্জন্য, সাহিত্যপরিষদ্ এবং দীনেশ বাবু বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

কৃত্তিবাস এবং তৎপরবর্ত্তী অনেকে একই রামায়ণ অবলম্বনে কাব্য নির্ম্মাণ করিলেন, কিন্তু কৃত্তিবাসের কাব্য আবাল বৃদ্ধ বনিতার প্রিয়, সকল সমাজের আদরণীয় হইল, ইহার প্রকৃত কারণ কি?

কৃত্তিবাস মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণ মাত্র অবলম্বন করিয়াই কাব্য লিখেন নাই। আমাদের দেশে কথকতায়, যাত্রায়, গোষ্ঠীবন্ধনে, সর্ব্বত্রই নানা ভাবে ও নানা আকারে রামবিষয়ক বৃত্তান্ত বহুকাল হইতে, কৃত্তিবাসের বহু পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছিল। ফলতঃ লোকমুখে স্ত্রীপুরুষ সমাজে রামসীতার কথা কীর্ত্তিত হইত, এখনও হইতেছে। কৃত্তিবাস তদীয় গ্রন্থরচনায় এই লোকপরম্পরাগত গাথার অনেকটা অনুসরণ করিয়াছিলেন। কেবল অনুবাদে মহর্ষিচিত্রিত আলেখ্যাবলীর পুনশ্চিত্রণেই যদি কৃত্তিবাস রত থাকিতেন,

তাহা হইলে, তদীয় কাব্য এত প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিত না। তাঁহার পরবর্ত্তী রামায়ণ লেখকগণের অনেকের গ্রন্থে কৃত্তিবাসোচিত মৌলিকতা নাই। অধিকাংশ স্থানই অনুবাদ মাত্রে পর্য্যবসিত। কোনও রামায়ণকার স্বকীয় কল্পনার চঞ্চল বৈদ্যুতী প্রভায় গ্রন্থের ক্বচিৎ ভাস্বর করিয়াছেন, সত্য, কিন্তু পরক্ষণেই আবার কল্পনাসাম্যদোষে গ্রন্থের শ্রীহানি ঘটিয়াছে। এই স্থলে কবিচন্দ্রের নাম উল্লেখ্য। কবিচন্দ্র স্বীয় রামায়ণে অঙ্গদ রায়বার নামে যে অধ্যায় লিখিয়াছিলেন, যাহা আজ কৃত্তিবাসের বলিয়া বঙ্গের অধিকাংশ গৃহে আদৃত, সেই অধ্যায়টি বাস্তবিকই অনেকটা কবিত্বপূর্ণ। কিন্তু সেই অনুপাতে কবিচন্দ্রের গ্রন্থের অপরাংশ সমূহ গ্রহণ করা যায় না। সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত অনেকে যেমন দু'একটি মনোহারিণী কবিতা রচনা করিয়া থাকেন, প্রাচীন কালেও করিতেন; যে কবিতাগুলি "উহট" আখ্যায় জন-সমাজে প্রচারিত, কিন্তু ঐ উহট-কর্ত্তাদের কোনও বিশিষ্ট এবং উল্লেখযোগ্য কবিতাগ্রন্থ পাওয়া যায় না, চঞ্চল কল্পনার ক্ষণিক অনুগ্রহে মাত্র দু'চারিটি হৃদয়াকর্ষণী কবিতাতেই তাঁহাদের কবির পরিসমাপ্ত, তদ্রূপ অন্যান্য রামায়ণকারগণের অনেকেরই দুই একটি, বা কাহারও দু'চারিটি রসভাবপূর্ণ অধ্যায় রচনার পরই কবিত্বের পর্য্যবসান ঘটিয়াছে। সমগ্র গ্রন্থে কবিতার উচ্ছলিত তরঙ্গলীলা একমাত্র কৃত্তিবাসেই পরিদৃষ্ট হয়।

কৃত্তিবাস জানিতেন যে, যাঁহাদের জন্য তিনি কাব্য লিখিয়াছেন, তাঁহারা কি চান্, কতটুকু বা কতটা তাঁহাদের অভিলষিত? কিরূপ আলেখ্যে তাঁহাদের নয়ন রঞ্জন হইবে? কবিত্বের সার্থকতার এই মূলমন্ত্রে তিনি দীক্ষিত হইয়া তবে কাব্য লিখিতে বসিয়াছিলেন, সর্ব্বদা এই মন্ত্রের স্মরণপূর্ব্বক কাব্য লিখিয়াছেন, তাই তাঁহার কাব্য এত জমিয়াছে। এই জন্যই কেবল বাল্মীকির আদর্শই তাঁহার উপজীব্য ছিল না, তিনি প্রয়োজনমত, অন্যান্য পুরাণ, উপপুরাণ প্রভৃতিরও সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। কালিকাপুরাণ, অধ্যাত্মরামায়ণ, অদ্ভুতরামায়ণ প্রভৃতি হইতেও তিনি আদর্শ সঙ্কলন করিয়াছেন।

অনেক কাব্য কবির সমসাময়িক সমাজের রুচি এবং ছায়ার অনুসরণে নির্ম্মিত হওয়ায়, সেই নিয়মিত সমাজে এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে সেই কাব্য আদৃত হইয়া থাকে, কিন্তু পরবর্ত্তী ও পরিবর্ত্তিত সমাজে তাহার আদর ক্রমেই কমিয়া যায়। যে কবির কাব্য, যত অধিক পরিমাণে এইরূপ সাময়িক ভাবে পরিপূর্ণ, সে কবির কাব্য, ততই অল্পকালস্থায়ী। অন্যান্য অনুবাদকগণের রামায়ণের অপ্রসিদ্ধির ইহাও অন্যতম কারণ। তাঁহাদের রামায়ণের যে যে অধ্যায়গুলি এই প্রকার কোন বিশেষভাবে লিখিত নহে, অর্থাৎ সাধারণ ভাবে, সকল সময়ের অনুগত করিয়া লিখিত, সেই সেই অধ্যায়গুলির মর্য্যাদা এখনও একেবারে লুপ্ত হয় নাই। দৃষ্টান্তরূপে কবিচন্দ্রের "অঙ্গদ রায়বার" ও রঘুনন্দন গোস্বামীর রামরাবণের অশোকবন-বর্ণন প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ সরল ভাষা এবং সুস্পষ্ট ভাব,—এই এই দুর্লভ সম্পদে কৃত্তিবাসের কাব্য বঙ্গসাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অতি সরল কথায়, সকলের বোধগম্য ভাষায়, তিনি তাঁহার হৃদয়ের ভাব অতি স্পষ্টরূপে সাধারণের সম্মুখে প্রকাশ করিতে পারিতেন। ভাষার দীনতায় বা ভাবের জড়তায় তাঁহার কাব্য কুত্রাপি দুষ্ট হয় নাই। তিনি যখন যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহার কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কোনরূপ অসম্পূর্ণতা রাখেন নাই। যে কবি, যত অধিক পরিমাণে প্রাঞ্জলভাষায় মনের ভাবরাশি, তদীয় সমাজের সমক্ষে অতি সুস্পষ্টরূপে তুলিয়া ধরিতে পারিবেন, সেই কবি তত অধিক আদৃত হইবেন। কৃত্তিবাস সেইটি অতি উত্তমরূপে পারিতেন বলিয়াই, তাঁহার "রামায়ণ" অপরাপর "রামায়ণ" অপেক্ষা ভাবুকসমাজে, অথবা, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল সমাজেই এত প্রিয় হইয়াছে।

দয়া, দাক্ষিণ্য সমবেদনা, স্নেহ, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি স্বর্গীয় সম্পদে মানব দেবতা হয়, আবার এইগুলির অভাবে মানব দানব হইয়া থাকে। কৃত্তিবাস এই মহনীয় গুণাবলীর এমন সুস্পষ্টভাবে বর্ণন করিয়াছেন, যে, পাঠকালে, হৃদয় অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে আপ্লুত হয়। মহাকবি ভবভূতি যেমন তাঁহার উত্তরচরিতের নিরবদ্য ও নয়নরঞ্জন চিত্রগুলির আদর্শ কালিদাসের কাব্যাবলী হইতে গ্রহণ করিয়া, পরে, সেই আদর্শের উপর নৈপুণ্য সহকারে বর্ণসংযোগ করিয়া আনন্দময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যে মূর্ত্তির গরিমায় সংস্কৃত সাহিত্য গৌরবিত হইয়াছে, কৃত্তিবাসও সেইরূপ মহর্ষিকৃত

আদর্শের উপর সতর্ক হস্তে বর্ণসংযোগপূর্ব্বক, তৎ তৎ চিত্রাবলী বঙ্গীয় সমাজের অনুগত ভাবে উপস্থিত করিয়াছেন, অলঙ্কারের গুরু ভারে, বা ভাষার আড়ম্বরে তদীয় কবিতাসুন্দরী ক্লিষ্ট হন নাই। তাঁহার কবিতা সর্ব্বত্র একভাবে, ভাগীরথীর প্রবাহের ন্যায় তর তর করিয়া চলিয়া গিয়াছে, আবিলতায় সে কবিতার প্রবাহ ক্লিষ্ট হয় নাই, বা ভাবের জড়তায় সে কবিতার অমর্য্যাদা ঘটে নাই। অন্যান্য কবি অপেক্ষা তদীয় প্রাধান্যের এইটিই মুখ্য কারণ। ভাষার প্রাঞ্জলতা এবং ভাবের সুস্পষ্টতার সহিত তাঁহার আশ্চর্য্য চিত্রনৈপুণ্যের সম্মিলনে তদীয় কাব্য ত্রিবেণীসঙ্গমের ন্যায় পবিত্র ও সর্ব্বজনসেব্য হইয়াছে।

কৃত্তিবাসের রামায়ণে প্রক্ষেপ।—কৃত্তিবাসের রামায়ণ রচনার প্রায় এক শত বৎসর পরে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হন। চৈতন্যের আবির্ভাবের এবং তদীয় প্রেম-বন্যায় বঙ্গদেশ প্লাবিত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের হস্তলিখিত কোন কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুস্তক এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। যদি কখনও পাওয়া যায়, তবে তখন কৃত্তিবাসের প্রক্ষিপ্ত অংশগুলির সমাধানের উপায় অনেকটা সহজ হইবে। চৈতন্যের আবির্ভাবের পর বঙ্গদেশে যে ভক্তির স্রোত, প্রেমের "বাণ" বহিয়াছিল, পরবর্ত্তী কালের রামায়ণ-সমূহে তাহার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান। যে সময়ে যে ভাব দেশের মধ্যে মাথা তুলিয়া দেশটাকে বিভোর করিয়া ফেলে, সেই সময়ের জাতীয় সাহিত্যাদিতেও সেই ভাবের প্রভাব প্রবিষ্ট হইয়া, তাবৎ সাহিত্যকে 'তদ্ভাবভাবিত' করিয়া তোলে। তাই পরবর্ত্তী কালের কৃত্তিবাসে আমরা কি বীর কি করুণ, সকল রসেই নদীয়ার ভক্তির তরঙ্গের উচ্ছ্বাস দেখিতে পাই। লিপিকারগণ, সুবিধা পাইলেই রামের স্থলে শ্যাম করিয়াছেন। পরিবর্ত্তিত কৃত্তিবাসের অনেক অনাবশ্যক স্থলে অতর্কিত বৈষ্ণবী দীনতার পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাই। কৃত্তিবাসের স্বকপোলকল্পিত বীরবাহু, পরবর্ত্তী কালের বৈষ্ণব লিপিকারগণের কৃপায়, দীনাতিদীন বৈষ্ণব সেবকগণের ন্যায়, করযুগল জুড়িয়া ধরণীতে লুটায়। তুলসীতলার মৃত্তিকায় অঙ্গরাগ করিয়া বৈষ্ণব যেমন "শ্রীবাসের আঙ্গনায়" মহাপ্রভুর ভক্তগণকে প্রণাম করেন, সেইরূপ রাক্ষসগণও কপিগণকে গল-লগ্নবাসে প্রণাম করে। এইরূপ অনেক স্থলেই বৈষ্ণবীয় কোমলতার ও দীনতার চরম দেখিতে পাই। এ সমস্তই চৈতন্যের পূর্ণ প্রকটের পর, কৃত্তিবাসে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এইরূপ সংক্রামক রোগের পরিচয় আমরা অন্যত্রও দেখিতে পাই। অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থের দুই একটি স্থলের ঈষৎ পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক, কোথাও বা প্রমাণ-সূত্রটিকে বদলাইয়া, সমগ্র গ্রন্থখানিকে "হিন্দু" করিয়া তোলা হইয়াছে। কৃত্তিবাসে পাঠবৈষম্যের ইহাই একমাত্র কারণ নহে। বহুকাল পূর্ব্বের হস্তলিখিত যে সকল পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার সহিত বর্ত্তমান কৃত্তিবাসের ত মিল নাই-ই, এমন কি ১৮০৩ খৃঃ অব্দে শ্রীরামপুরের মিশনারিগণের দ্বারা প্রথম যে "কৃত্তিবাস" মুদ্রিত হয়, তাহার সহিতও বর্ত্তমান কৃত্তিবাসের অনেক স্থলে আদৌ মিল নাই। মিশনারিদের পুস্তকে যেখানে আছে—"পাকল চক্ষে রামের পানে চাহিলেক বালি।

দন্ত কড়মড়ায় বীর রামেরে পাড়ে গালি॥"—

সেই স্থানে—পরবর্ত্তী কালের সংশোধিত বটতলার সংস্করণে আছে,

রক্তনেত্রে শ্রীরামের পানে চাহে বালি।

দন্ত কড়মড় করে, দেয় গালাগালি॥

পরবর্ত্তী কালে ভাষার পরিমার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার আদিকবি কৃত্তিবাসও "পরিমার্জ্জিত" হইয়াছেন!! কবির কাব্য পরিষ্কৃত করিতে যাইয়া, সংশোধকগণ আবর্জ্জনারাশির দ্বারা কৃত্তিবাসকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন! এই ব্যাপারের মূলে আর একটি সত্যও নিহিত আছে। আমাদের দেশে, যখন যে কোনও নূতন জিনিষের আবির্ভাব হইয়াছে, আমরা তাহাকে, ধীরে ধীরে পুরাতনের সহিত মিশাইয়া নিজেদের ছাঁচে ঢালাই করিয়া "আপন" করিয়া লইয়াছি। আমাদের এই adaptability (আপনার মত করিয়া লইবার ক্ষমতা) আছে বলিয়াই আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের সাহিত্য এখনও টিকিয়া আছে। নবীন নানাবিধ ভঙ্গিরাগবিভূষিতা শ্রুতিমোহিনী বঙ্গভাষার যেমন আবির্ভাব হইল, অমনি আমরা আমাদের প্রাচীন, দুর্ব্বোধ্য শব্দসঙ্কুল ভাষাকে তাহার অনুগত করিয়া লইলাম, তাই আমরা প্রাচীন—

"অমিয় সায়রে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল" ইহার স্থলে

"অমিয় সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল হলো" করিয়া ফেলিলাম। প্রতিমার মূল পল্লবের কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন করিলাম না বটে, কিন্তু একটু নূতন ভঙ্গিতে বর্ণ যোজনা করিয়া, প্রাচীনাকে নবীনা করিয়া তুলিলাম। ইহাতে প্রাচীনার অঙ্গহানি ঘটিল। এইরূপে মূল কৃত্তিবাসের অর্দ্ধ-সংস্কৃত, অর্দ্ধ-হিন্দু অনেক শব্দ পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে ক্রমে বর্ত্তমান বাঙ্গালায় আসিয়া দাঁড়াইল। তাই প্রাচীন কৃত্তিবাসের "মুক্তি" "তিলক" "করা" "পুষ্প" "পাকল" প্রভৃতি অধুনা অপ্রচলিত শত শত শব্দের পরিত্যাগ সাধিত হইল। ইহা কালের নিরঙ্কুশ বিধান। ইহার উপর মানুষের কর্ত্তৃত্ব তত অধিক নাই। যাহা গ্রাহ্য, কাল তাহার গ্রহণ করিবে। যাহা বর্জ্জনীয়, কাল তাহার বর্জ্জন করিবে।

শাক্ত এবং বৈষ্ণব—এই দুই সম্প্রদায়ের লিপিকারগণের কলাপে কৃত্তিবাসের অনেক স্থলে যেমন শাক্তপ্রভাব পরিদৃষ্ট হয়, তেমনই বৈষ্ণবপ্রভাবও পরিদৃষ্ট হয়। ইহা ছাড়া, অন্যান্য পুরাণ উপপুরাণ প্রভৃতি হইতে অনেক মনোরম অংশও লিপিকারগণ বাছিয়া আনিয়া কৃত্তিবাসে জুড়িয়া দিয়াছেন। অনেকে অনেক নূতন কবিতার প্রণয়ন করিয়া কৃত্তিবাসের গ্রন্থে পূরিয়া দিয়া, স্ব স্ব আত্মাভিমানের পূজা করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কৃত্তিবাস হইতে শত শত স্থল উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, ঐতিহাসিকের সে কার্য্য হইতে আমি বিরত হওয়াই সঙ্গত মনে করি।

কৃত্তিবাসের কল্পনা তাহার গন্তব্য পথ।—রামায়ণী কথার আশ্রয়ে কালিদাস ভবভূতি রঘুবংশ উত্তরচরিত প্রভৃতির রচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু যেখানে যেরূপ প্রয়োজন, তাঁহারা নূতন মূর্ত্তিও গঠন করিয়াছেন। কবিরা কল্পনার বৈদ্যুতিক শক্তিতে শক্তিমান্। সেই সতত চঞ্চলা শক্তি কদাচ কোন নির্দ্দিষ্ট পথে, কোন পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট রেখা বাহিয়া চলিতে পারে না, জানেও না। তাই কবিকৃত সৃষ্টিতে, অনেক স্থলে মূল আদর্শেরও পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই। কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবিগণ তাই মহর্ষিমুখ পথ কল্পনার যৌক্তা অম্লবিস্তর ছাড়িয়া, অন্য পথেও গিয়াছেন। কৃত্তিবাসও সেইরূপ অনেক স্বকল্পিত আলেখ্যের অঙ্কনপূর্ব্বক, তদীয় গ্রন্থ সুচারুতর করিয়াছেন। সর্ব্বত্রই বাল্মীকির অনুসরণ করেন নাই। বীরবাহু তরণীসেন প্রভৃতির সৃষ্টি তাঁহার আত্মকল্পনার চরম উৎকর্ষ খ্যাপন করিতেছে। কবিগণ কাহারও অঙ্গুলিসঙ্কেতে চলেন না। কল্পনা কাহারও দাসীত্ব করিতে জানে না। কল্পনা কখনও কবিকে মেঘের উপর লইয়া গিয়া সৌদামিনীর বিলাসচঞ্চলা মূর্ত্তি প্রদর্শন করে, কখনও আবার তুষারমণ্ডিত কমলের কেশরের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া কবিকে কত নিভৃত সৌন্দর্য্য দেখায়। উন্মাদিনী চঞ্চলার ন্যায় কবির উন্মাদিনী কল্পনা কাহারও অঙ্গুলিসঙ্কেতে পরিচালিত বা ভ্রূকম্পনে বিকম্পিত হয় না। সে আপনার ভাবেই আপনি বিভোর হইয়া ছুটে, পরের ভাবে ভুলে না। কৃত্তিবাসের স্বৈরচারিণী কল্পনা কোনও নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রহে নাই। কোথাও প্রাচীন পথে, কোথাও বা নূতন পথে যেখানে যেমন ইচ্ছা, সে কল্পনা চলিয়া গিয়াছে। তরণীসেন বীরবাহু প্রভৃতির সৃষ্টি এই নূতন পথে যাত্রারই ফল।

কবির পরিচয়।—আনুমানিক ১৩০৬শক ১৩৮৫ খৃঃ অব্দের মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গের প্রতিগৃহে যে দিন বীণাপাণির চরণকমল অর্চ্চিত হইতেছিল, "সকলবিভবসিদ্ধৈ পাতু বাগ্‌দেবতা নঃ" বলিয়া যেদিন ভক্তি-গদগদকণ্ঠে স্তব করিতে করিতে হিন্দু তাহার চিরপ্রার্থিত দেবতার চরণে মস্তক স্থাপন করিতেছিল, সেই শুভ ক্ষণেই যাঁহার জন্ম, তাঁহার জীবন যে সেই বাগ্‌দেবতার অনুগ্রহে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হইবে তাহাতে আর কথা কি?

৭৩২ খৃঃ অব্দে আদিশূর কনোজ হইতে যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণকে এ দেশে আনয়ন করেন, তাঁহাদের অন্যতম ভরদ্বাজ-গোত্রীয় শ্রীহর্ষ হইতে সপ্তদশ পুরুষ অধস্তন নরসিংহ ওঝা বেদাদুজ রাজার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। এই বেদাদুজ সম্ভবতঃ পূর্ব্ববঙ্গের স্বর্ণগ্রামের রাজা ছিলেন। আন্দাজ ১২৪৮ অব্দে এই নরসিংহ অরাজক স্বর্ণগ্রাম পরিত্যাগপূর্ব্বক গঙ্গাতীরে বাস করিবার সঙ্কল্পে ফুলিয়ায় আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। ফুলিয়ার তখন বড় স্পর্দ্ধার দিন। কৃত্তিবাস নিজেই স্বীয় বংশ পরিচয়ের সময়ে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বে

এখানে "মালঞ্চ" ছিল, নানাবিধ ফুলের বাগান ছিল, তাই ইহার নাম হয়—"ফুলিয়া"। এই ফুলিয়ার দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে বীচিমালিনী ভাগীরথী রজতধারায় প্রবাহিত ছিলেন। প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য্যের ইহা লীলা-নিকেতন ছিল। মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ নরসিংহ তাঁহার তদানীন্তন পদোচিত বিভবাদির সহিত এই মনোহর স্থানে আসিয়া একেবারে জুড়িয়া বসিলেন। কৃত্তিবাসের ভাষায়

"ফুলিয়া চাপিয়া হইল তাঁহার বসতি।
ধন ধান্যে পুত্র পৌত্রে বাড়য় সন্ততি॥"

ফুলিয়া "চাপিয়া" তাঁহার বসতি হইল। এই নরসিংহের পরমদয়ালু পুত্র গর্ভেশ্বর কৃত্তিবাসের প্রপিতামহ। গর্ভেশ্বরের পুত্র মুরারি ওঝা, কৃত্তিবাসের পিতামহ এক অতি প্রধান কবি ছিলেন। তাঁহার কোন গ্রন্থাদির পরিচয় পাই না সত্য কিন্তু কবি কৃত্তিবাস স্বয়ং তাঁহাকে ব্যাস মার্কণ্ডেয়াদির সহিত তুলনা করিয়াছেন।

এই মুরারি ওঝার পৌত্র কৃত্তিবাসের নিজের উক্তিতেই দেখিতে পাই, বাল্যে প্রথমতঃ চতুষ্পাঠীতে বিদ্যাভ্যাস করেন। এই চতুষ্পাঠীর শিক্ষাই তদীয় সংস্কৃত রামায়ণ পাঠের সোপান। পাঠ সমাপ্তির পর, তদানীন্তন প্রথা অনুসারে তিনি গৌড়েশ্বরের সভায় আত্মপরিচয়ার্থ উপস্থিত হন। রাজা তাঁহার গুণগ্রামের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে রামায়ণ রচনা করিতে আদেশ করেন। "তথাস্তু" বলিয়া কৃত্তিবাস যখন সগর্ব্বে বাহির হইলেন, তখন সকলে "ধন্য ধন্য" বলিয়া কবির অভ্যর্থনা করিলেন।

"সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত।
মুনিমধ্যে বাখানি' বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস গুণী"

বলিয়া সহস্র মুখে কৃত্তিবাসের প্রশস্তি সঙ্গীত উচ্চারিত হইল। কৃত্তিবাস স্বয়ং এই প্রসঙ্গে অনেক কথা বলিয়াছেন, আত্মবংশের বিশিষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি যে কত বড় বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় আমি আর বিশেষ কি বলিব! এখনও "ফুলিয়ার মুখটি" বলিয়া আমরা তাঁহারই বংশের স্পর্দ্ধা করি। রাঢ়ীয় শ্রেণীর প্রধান এবং মুখ্য বংশ "ফুলিয়ার মুখটি"—কৃত্তিবাসেরই অনুবৃত্তি মাত্র।

মাঘেন্দ্রক্ষণে রাজা কৃত্তিবাসকে রামায়ণ রচনার আদেশ করিয়াছিলেন। বঙ্গভাষার অরুণ-রাগ-রঞ্জিতা উষার প্রথম আলোকচ্ছটা কৃত্তিবাসের মস্তকে প্রথম স্বর্ণকিরীট পরাইয়া দিয়াছিল,—বঙ্গভূমি, বঙ্গভাষা ও সেই সঙ্গে বাঙ্গালী জাতি ধন্য হইয়াছে। পল্লী-প্রান্তরের স্নিগ্ধ বটচ্ছায়ায়, জন-পদ-বধূর গোষ্ঠীবন্ধনে, বর্ষীয়সী ললনাদিগের বিশ্রামকক্ষে, কৃত্তিবাসের বিরচিত গাথা গীত ও ভক্তিপূর্ব্বক শ্রুত হইতেছে। ভাষায় যাহার সম্যক্ অধিকার নাই, সেই প্রাকৃত ব্যক্তিও প্রেমভরে রামায়ণ গান করিয়া আত্মহারা হইতেছে, আর সেই সঙ্গে, নিরক্ষর সরল কৃষক সাশ্রুনয়নে ও তন্ময়-হৃদয়ে সে গান শুনিয়া আপনাকে ভুলিয়া যাইতেছে। এখনও একাদশীর অপরাহ্নে ধূসর-বসন বিধবারা সমবেত হইয়া, কোন ললিতকণ্ঠ বালকের দ্বারা রামায়ণ পড়াইয়া শুনিতেছেন, তাঁহাদের উপবাসক্লিষ্ট হৃদয়ের ভক্তির রস উচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছে। মনোহর কল্পনা, মধুর ভাব, অনুপম সৃষ্টিকৌশলে, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্‌রূপে পরিগণিত। কৃত্তিবাসের পর, আজ পর্য্যন্ত যত ব্যক্তি বঙ্গবাণীর পদ পূজা করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই পূজার উপকরণ—ফুল, ফল, পল্লব,—কৃত্তি-বাসের ঐ রামায়ণরূপী কল্পকানন হইতে চয়িত ও সংগৃহীত। কৃত্তিবাস ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার পর পাঁচশত বৎসরেরও অধিক কাল অতীত হইয়াছে বটে, কিন্তু আজও প্রতিক্ষণে তাঁহার নাম বঙ্গের গৃহে গৃহে, বিপণির পণ্যকুটীরে, চাষার আশার কৃষিক্ষেত্রে সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত হইতেছে। আজ আর

"দক্ষিণে পশ্চিমে যা'র গঙ্গা তরঙ্গিণী"

সে "ফুলিয়া" নাই, সে "ফুলিয়ায়" কৃত্তিবাসের সেই "চাপিয়া বসতি"র চিহ্নও নাই, কিন্তু সেই "ফুলিয়া পণ্ডিতের" মোহন বাঁশরীর ঝঙ্কার এখনও বাঙ্গালীর "কাণের ভিতর দিয়া মরমে" প্রবেশ করিতেছে, বাঙ্গালীকে উন্মত্ত করিয়া, বিভোর করিয়া রাখিয়াছে।

কৃত্তিবাসের এই সার্ব্বভৌম প্রসিদ্ধির অপর কতিপয় কারণও পরিদৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষের মৃত্তিকা বড়ই কোমল, বড়ই উর্ব্বর। রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, কর্ণ, ভীষ্ম, দধীচি, শিবি, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, অরুন্ধতী, লোপামুদ্রা, ঔশীনরী প্রভৃতি এই ভারতবর্ষেরই চিত্র। যাহার

প্রাণে প্রেম, নয়নে ভক্তির অশ্রু, ভারতবাসীরা তাহাকে হৃদয় পাতিয়া গ্রহণ করে, প্রাণ দিয়া পূজা করে। কৃত্তিবাস এ রহস্য বুঝিতেন। তিনি আরও বুঝিতেন যে, নিশীথে নিস্তব্ধ রজনীর সৌম্যমূর্ত্তি যাহার চিত্তকে অভিভূত, বা অনুভূতির বিমলকর ধৌত করিতে না পারে, সে কদাচ ঐ নৈশ নীরবতার মাধুর্য্য অপরকে বুঝাইতে পারে না; সায়ংকালের শ্যামায়মানা বনভূমির প্রাঞ্জল মূর্ত্তি যাহার প্রাণে আকুলতা জন্মাইতে অসমর্থ, সে কখনও সান্ধ্য সুষমার পবিত্র আলেখ্য অঙ্কন করিতে পারে না। সকল পদার্থেরই অনুভূতি চাই। সমস্ত বিষয়েই মগ্ন হওয়া চাই, প্রাণ অকৃপণভাবে ঢালিয়া দেওয়া চাই, অন্যথা সিদ্ধিলাভ সুদূর-পরাহত। কৃত্তিবাস অকৃপণভাবে, আত্মপ্রাণ কবিতাদেবীর পাদপদ্মে ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার হাতে আর কিছুই ছিল না, সমস্তই ঐ চরণে অঞ্জলি দিয়াছিলেন, তাই তদীয় কবিতার কুত্রাপি কোনরূপ বাধা দেখিতে পাই না। সর্ব্বত্রই সমান এবং প্রতিহত গতি। অসম্ভব হইলেও মনে হয়, যেন, এক সময়ে, এক স্থানে বসিয়া, অন্য-চিন্তা-বিমুক্ত হইয়া, মহাকবি, তাঁহার সাধের রামায়ণ গান গাহিয়াছেন। তিনি নিজে সে গানে মজিতে পারিয়াছিলেন, তাই তাঁহার শ্রোতৃবর্গ মজিয়াছে, ও আত্মবিস্মৃত হইয়া, তাই তাঁহার সেবা করিয়াছে, আচন্দ্র-দিবাকর করিবেও।

তুমি যখন অভ্রভেদী, শুভ্রতুষারশীর্ষ, হিমাচলের পাদদেশে বসিবে, বিধাতার কৃপায়, তখন যদি তোমার হৃদয়ে, কোন প্রশান্ত ছবির ছায়াপাত হয়, কোন বিরাট শক্তির স্পন্দন অনুভূত হয়, তবেই তুমি ঐ বিরাট হিমাচলের প্রশান্ত মূর্ত্তির কিয়দংশ হয় ত, তোমার কল্পনা-দর্পণের সাহায্যে অন্যকে প্রদর্শন করিতে পার, অন্যথা, তোমার সাধ্য কি যে তুমি হিমাচলের ঐ গভীরমাধুর্য্যের বর্ণন করিবে। তুমি যে স্থানে, যে সময়ে, যে অবস্থায় বর্ত্তমান, যদি সেই স্থানের, সেই সময়ের, সেই অবস্থার সহিত, নিজেকে মিশাইতে না পার, "তদ্ভাব-ভাবিত" করিতে না পার, তবে কদাচ, তদ্দেশীয় ও তৎকালীন ভাবের স্ফুরণ তোমার দ্বারা সম্ভব হইবে না। তোমার দ্বারা তদ্দেশবাসীগণের হৃদয় কদাচ বিমোহিত হইতে পারে না। দীপকরাগের সময়ে তুমি যেহাগ পূরবীতে আলাপ করিলে, তাহা কখনও জমিতে পারে না। সে আলাপে শ্রুতির সুখ হয় না, বরং পীড়াই জন্মে। ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের ধর্ম্মপ্রাণ অধিবাসীরা কি চায়, কি ভালবাসে এ তত্ত্ব মহাকবি কৃত্তিবাস বুঝিতেন। এ দেশের লোকের হৃদয় কি উপাদানে গঠিত, কোন উপকরণ তাহাতে অধিক, তাহা কৃত্তিবাস জানিতেন, তাই তাঁহার দেশবাসীগণের হৃদয়ের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, তিনি তদীয় কল্পনার মোহন বীণায় ঝঙ্কার করিয়াছিলেন। তাই সে ঝঙ্কার বসন্তের পিকঝঙ্কারের ন্যায়, বঙ্গবাসীদিগকে বিমুগ্ধ, একেবারে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল। এই হিসাবেও সংস্কৃতে কালিদাস ও বাঙ্গালায় কৃত্তিবাস একই মন্ত্রে দীক্ষিত, একই পথের যাত্রী। তোমার পাঠকগণ কি চান, কতটুকু চান, তোমার বীণার কোন্ তার স্পর্শ করিলে, তাহার ধ্বনি তোমার পাঠকের হৃদয়ে অনুরণিত হইবে, তাহার কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিবে,—এ জ্ঞান যদি তোমার না থাকে, তবে তুমি যত বড় শক্তিশালী লেখকই হও না কেন, যত বড় কাব্যবিদ্যাবিশারদই হও না কেন, তোমার লেখায় বা তোমার অঙ্কিত আলেখ্যে, তোমার সামাজিক বর্ণের বা তোমার দর্শকবৃন্দের পরিতৃপ্তি হইবে না। তোমার সে লেখায় বা সে চিত্রে, স্বদীয় দেশবাসী সহৃদয়বর্গের হৃদয় আকৃষ্ট ও বিমোহিত হইবে না। যে সমুদয় লেখকের এই জ্ঞান আছে, তাঁহাদের লেখাই কালজয়ী হয়, থাকিয়া যায়; আর যাঁহাদের এই জ্ঞান নাই, তাঁহাদের লেখা ছিন্ন তুষারের ন্যায় অতি অল্পকাল মধ্যেই কোথায় মিলাইয়া যায়। আর্য্য রামায়ণ অবলম্বন পূর্ব্বক অন্য অনেক কবি বঙ্গভাষায় রামায়ণ রচনা করিয়াছেন, কিন্তু কৃত্তিবাসের রামায়ণ তন্মধ্যে যে এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, প্রায় পাঁচ শত বৎসরেরও অধিক কাল সমানভাবে বা উত্তরোত্তর ক্রমেই অধিকতরভাবে, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, স্ত্রী-পুরুষ, ইতর-ভদ্র সকল সমাজেই পূজিত হইতেছে, ইহার কারণ হইল পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান। কৃত্তিবাসের ঐ জ্ঞান প্রচুর পরিমাণে ছিল। যে দেশে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই দেশের অধিবাসীরা কি ভালবাসে, কি চায়, তাহা তিনি জানিতেন এবং তিনিও তাহাই চাহিতেন ও ভালবাসিতেন। তাই, তিনি যদি কখনও সামান্য একটু গুণ্ গুণ্ স্বরবিলাস

করিয়াছেন, অমনি সেই গুণ গুণ ধ্বনি শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াই যেন, তদীয় দেশবাসীদিগের হৃদয় বিমোহিত করিয়া তুলিয়াছে। দিবাবসানে সাগরগামিনী তটিনীর প্রাণের আকুল গীতিকা, কুলকুল ধ্বনিতে যেমন শ্রান্ত পথিকের চিত্তে একটা জড়তা, একটা তন্দ্রা আনিয়া দেয়, পথিক একপদে তাঁহার কর্ম্মবহুল দীর্ঘ দিবসের সমস্ত ক্লেশ ভুলিয়া যান, কেমন একটা ঘুমের ঘোরে তাঁহার নয়ন নিমীলিত হইয়া আসে, সেইরূপ, প্রেমিক কবি কৃত্তিবাসের মোহিনী বীণার ঝঙ্কারেও বঙ্গবাসীর হৃদয় বিমোহিত আনন্দালস হইয়া রহিয়াছে। কবে কোন্ দিন, কত শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, তমসার তীরে "মা নিষাদ" বলিয়া বাল্মীকি গান ধরিয়াছিলেন, আর আজও যেন সেই গানের ধ্বনির বিরাম হয় নাই। সে স্বরলহরী যেন বাতাসে এখনও ভাসিয়া বেড়াইয়া, ভারতবাসীদের প্রাণে কেমন একটা তন্দ্রা জন্মাইয়া দিতেছে, সেইরূপ কবে কোন্ দিন, কোন্ শুভমুহূর্ত্তে পতিতোদ্ধারিণীর তীরে বসিয়া, তাঁহারই কুল কুল গীতির সুরে সুর মিশাইয়া ফুলিয়ার পণ্ডিত তান ধরিয়াছিলেন, আজ সে ফুলিয়া নাই, সে ভাগীরথীও দূরে সরিয়া গিয়াছেন,—কিন্তু সেই স্বপ্নময়, আবেশময় তানের এখনও যেন লয় হয় নাই। সে রাম, সে অযোধ্যা, কিছুই নাই, তবুও সে রামের কথা, রামের স্মৃতি যেমন ভারতের নরনারীর প্রাণে প্রাণে গাঁথা রহিয়াছে, আজীবন থাকিবেও, তদ্রূপ আজ সে ফুলিয়া নাই, সে জাহ্নবী নাই, সে কৃত্তিবাস নাই, কিন্তু কৃত্তিবাসের কথা, কৃত্তিবাসের স্মৃতি বঙ্গবাসী কদাচ বিস্মৃত হইবে না। রামসীতার পাদস্পর্শে অযোধ্যা চিরকালের মত তীর্থ হইয়া রহিয়াছে, কৃত্তিবাসের পাদস্পর্শে ফুলিয়া বঙ্গের সাহিত্য-সাম্রাজ্যের প্রধান তীর্থ হইয়া রহিয়াছে। ফুলিয়ার মুখটী, শুধু ফুলিয়ার নহে, বাঙ্গালার গৌরব স্থান, পরমস্পর্দ্ধার ভাজন হইয়াছেন। জন্ম জন্মান্তরে কৃত্তিবাস কত তপস্যা করিয়াছিলেন, তাঁহার সে তপস্যার ফলে তিনি ত অমর হইয়াছেনই, তাঁহার মাতৃভাষাকেও অমরী করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্যের স্বর্ণমন্দিরের তিনিই ভিত্তি-স্থাপন করিয়াছেন। যে দেশে এবং যে জাতিতে কৃত্তিবাসের ন্যায় কবি আবির্ভূত হন, সে দেশ ধন্য, সে জাতি বরেণ্য। কৃত্তিবাস বাঙ্গালী জাতিকে বড় করিয়া দিয়াছেন; তিনি যে সঙ্গীত ধরিয়াছিলেন, আজ এই পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া যিনি যতটুকু পারেন, সেই সঙ্গীতের "তান প্রধান" করিতেছেন। তাঁহার সাধনার ফলে, তাঁহার স্বজাতির জাতীয়-সাহিত্য ধীরে ধীরে পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে। বাঙ্গালীর যতই চক্ষু ফুটিতেছে, ততই তাহারা তাঁহার আদর করিতে শিখিতেছে।

সমবেত ভদ্রমণ্ডলী এবং বন্ধুবর সতীশচন্দ্র, আপনারা মহাকবি কৃত্তিবাসের জন্মস্থানে অদ্য এই যে মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছেন,—পূজ্য মহাপুরুষের পূজার অনুষ্ঠান করিয়াছেন, এজন্য সমগ্র বাঙ্গালী জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। যে সমুন্নতবংশের কৃত্তিবাস অলঙ্কার ছিলেন, সেই ফুলিয়ার মুখটীর একজন কবিতারসবঞ্চিত অভাজনকে আপনাদের অনুকম্পার উৎসবে আহ্বান করিয়াছেন বলিয়া আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। যে কুলে আমার জন্ম, সেই কুলের একজন প্রধান পুরুষের এবং বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান মহাকবির স্মৃতিবাসরে আমি উপস্থিত হইবার সুযোগ পাইয়াছি বলিয়া নিজেকেও ধন্য ও কৃতকৃতার্থ মনে করিতেছি।

এস কৃত্তিবাস, তোমার বড় সাধের ফুলিয়ায় একবার ফিরিয়া এস, এই দেখ, তোমার উদ্দেশে, কত শত ভক্ত আজ সজলনেত্রে ফুলিয়ায় উপস্থিত, তুমি তাঁহাদিগের সারস্বত-ভাণ্ডারে যে অমূল্য রত্ন দিয়া গিয়াছ, সেই রত্নের গৌরবে তাঁহারা আজ গৌরবিত, কৃত্তিবাসের স্বজাতি বলিয়া আদৃত। এস কবি, আবার আসিয়া

"পবন নন্দন হনু, লঙ্ঘি ভীমবলে
সাগর, ঢালিলা যথা রাঘবের কাণে
সীতার বারতা-রূপ সঙ্গীত লহরী;
তেমতি, যশস্বি, তুমি সুবঙ্গ মণ্ডলে
গাও গো রামের নাম সুমধুর তানে,
কবি-পিতা বাল্মীকিকে তপে তুষ্ট করি।"

শ্রীশ্রীশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

মধ্যবয়সের বিপদ

পঞ্চাশ, ষাট্ বৎসর পূর্ব্বে এদেশের ভদ্রলোকদের যে পরমায়ু ছিল, আজকাল আর তেমন দেখা যায় না। এখন ৫০ বৎসরে পড়িতে না পড়িতেই অনেককেই ভবলীলা সাঙ্গ করিতে হয়। দেশে পূর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে, সাধারণ-স্বাস্থ্যের প্রতি লোকসাধারণ ও গভর্ণমেণ্ট, উভয়েরই দৃষ্টি পড়িয়াছে; তথাপি লোকের পরমায়ু বৃদ্ধি না হইয়া কেন যে হ্রাস হইতেছে, তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত।

মধ্যবয়সে মৃত্যুসংখ্যা প্রায় সকল শ্রেণীর মধ্যেই বৃদ্ধি পাইয়াছে, তবে ইহা ভদ্র ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যতটা বাড়িয়াছে এমন আর কাহারও মধ্যে নহে। এই শেষোক্ত শ্রেণীর পরমায়ুহ্রাসের কারণ কি,—অদ্য আমরা কেবল তাহারই আলোচনা করিব, অন্য শ্রেণীর সম্বন্ধে কোন কথাই বলিব না। দেশে শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রেণীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাদের জীবনের বিশেষত্ব এই যে শরীর ও মন উভয়ের প্রয়োগ ভিন্ন ইহাদের কার্য্য চলিতে পারে না। ব্যবসায়ী, কর্ম্মচারী, আইন ও চিকিৎসা-ব্যবসায়ী, ও শিক্ষক প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইঁহাদের কায ভিন্ন ভিন্ন হইলেও কাযের ধারাটা কিন্তু একই। শরীর মন উভয়ের প্রয়োগ ভিন্ন ইঁহাদের কায চলিবার যো নাই। পল্লীগ্রাম অপেক্ষা সহরেই ইঁহাদিগকে অধিক পরিমাণে থাকিতে দেখা যায়। ইঁহাদের জীবনের একটা প্রধান বিশেষত্ব এই যে ইঁহাদের দায়িত্বজ্ঞানও যেমন বেশী, দায়িত্বের পরিমাণও তেমনই অধিক। একথা খুবই সত্য যে, দায়িত্ব ছাড়া মানুষ মানুষ হয় না। একটা মুটেরও দায়িত্ব আছে; কিন্তু সে দায়িত্ব তাহার নিজের ও তাহার পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ভদ্র ও শিক্ষিত লোকের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক দায়িত্বই ত খুব বেশী; তাহার উপর, তাঁহার আরও কত রকমের দায়িত্ব আছে। কাযের সময় কায করিলাম, তার পর নিশ্চিন্তমনে কালযাপন করিলাম,—আজিকার এই কঠিন প্রতিযোগিতার দিনে তাহার একেবারেই সম্ভাবনা নাই। নিজেকে খাড়া রাখিবার জন্য নিয়ত মতলব আঁটিতে হয়, উপায় চিন্তা করিতে হয়, এবং বিধিব্যবস্থা স্থির করিয়া রাখিবার প্রয়োজন হয়। শ্রম করিলেই ক্লান্তি দেখা দেয়। যাহাকে শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ শ্রম করিতে হয়, তাহার ক্লান্তির পরিমাণও অপরের অপেক্ষা অনেক বেশী। ইহার উপর যদি দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ে করিয়া বেড়াইতে হয়—নিজের কাযের জন্য অপরের কাছে জবাবদিহি করিতে হয়, তাহা হইলে কাযের ভারটা বাস্তবিকই দুর্ব্বহ হইয়া দাঁড়ায়। দুর্ভাগ্যক্রমে শিক্ষিত ও ভদ্রলোকদিগকে এইরূপ গুরুভার স্কন্ধে করিয়াই জীবন কাটাইতে হয়। ইঁহারা কায করেন, শুধু নিজের জন্য নহে, আরও দশ জনের জন্যেও বটে।

ব্যবসায় ও চাকুরী এই দু'টিই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রধান অবলম্বন। এখনকার দিনে ব্যবসায়েও দায়িত্ব যে খুবই বেশী, তাহা বলাই বাহুল্য। গ্রাম্য-দোকানদার আর সহরের ব্যবসায়ী—ইহাদের দু'জনের দায়িত্বের মধ্যে কতটা প্রভেদ, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। দালাল, সুপারইন্‌টেন্‌ডেণ্ট, ম্যানেজার, সম্পাদক, মিউনিসিপাল-কমিশনার প্রভৃতিকে অল্পবিস্তর পরিমাণে পরেরই কায করিতে হয়। ইঁহারা সকলেই ধর্ম্মতঃ ও ন্যায়তঃ তাঁহাদের কৃত কার্য্যের জন্য অপরের কাছে দায়ী। যাঁহারা সরকারী বা বেসরকারী অফিসাদিতে কর্ম্ম করেন, তাঁহাদিগকেও কাযের জন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বিশেষরকম জবাবদিহি করিতে হয়। ডাক্তারী, ওকালতী, শিক্ষকতা, প্রভৃতির পনেরো আনা কাজই তো পরের জন্য। ডাক্তারকে রোগীদের তুষ্ট রাখিতে হয়। উকিলকে মক্কেলদের খুসী রাখিতে হয়; তাহা না হইলে ইঁহাদের ব্যবসায় চলে না। এরূপ একটা দায়িত্বের ভাব মনের মধ্যে নিয়ত পরিপোষণ করিতে থাকায়, ইঁহাদের স্নায়ুর উপর বিশেষ একটা চাপ পড়ে। সেই জন্য ইহাদের মধ্যে স্নায়ুদৌর্ব্বল্য দেখা দিয়া থাকে। উকিল ডাক্তার প্রভৃতি স্বাধীন-ব্যবসায়ীদের দায়িত্বের পরিমাণ দিনদিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে একজন নামজাদা উকিলের যতটা দায়িত্ব ছিল, এখন যে তাহা খুবই বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইনি হয় ত বড় বড় সওদাগরের legal-adviser (আইন-সংক্রান্ত পরামর্শদাতা), ইঁহাকে হয়ত বড় বড় সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে হয়। এ সকলের উপর তিনি হয় ত কাউন্‌সিলের মেম্বর, মিউনিসিপালিটির কমিশনার এবং আরও

বিবিধ দেশহিতকর ও লোকহিতকর কার্য্যের পরিচালক। এতগুলি দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে গেলে শরীরের উপর যে একটা বিষম চাপ পড়িবে, ইহা বিচিত্র কি? উকিলের মত ডাক্তারেরও দায়িত্ব দিনদিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে লোকে তাঁহার কাছে যতটা আশা করিত, এখন তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী আশা করিয়া থাকে। তিনিও তাঁহার উকিল বন্ধুটির মত বিবিধ দেশহিতকর কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট। দেশের এই সব স্বনামধন্য পুরুষদের যেন মরিবারও অবসর নাই।

শিক্ষিত লোকদের কায-কর্ম্মের আর একটা বিশেষত্ব এই যে, ইঁহাদের রহিয়া রহিয়া ধীরেসুস্থে কায করিবার যো নাই। বর্ত্তমান সময়টাকে ব্যস্ততার যুগ বলিলে কিছু অসঙ্গত বলা হয় না। এখন কাযের পরিমাণ বাড়িয়াছে, কিন্তু কাজ করিবার সময় সেই পূর্ব্বের মত আছে। সেকালে লোকদের যেমন অবসর ছিল, এখন আর তাহা কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। এ সময় রহিয়া রহিয়া কায করিতে গেলে, অনেক কাযই অসমাপ্ত থাকিয়া যায়। এই যে ব্যস্ততা, ইহা শৈশব হইতেই আরম্ভ হয়। সেকালে লোক পাঠশালায় অধ্যয়ন করিত। তখন বালকেরা দিবসের অধিকাংশ সময়ই নিশ্চিন্তমনে খেলা-ধূলা দৌড়ঝাঁপ করিয়া কটাইয়া দিত; লেখাপড়ায় অতি অল্প সময়ই দিতে হইত। এখন ১০।১৫ বৎসরের মধ্যে বালকদিগকে এত বিষয় এবং এত বেশী পরিমাণে শিখিতে হয়, এতগুলি পরীক্ষা দিতে হয়, যে খেলা-ধূলা ও স্বাধীনভাবে নিশ্চিন্ত মনে বিচরণ করা তাহাদের পক্ষে একেবারে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন বাড়ীতেও লেখা-পড়া, স্কুলেও লেখা-পড়া। এইরূপ ব্যস্ততার মধ্যে ছাত্রজীবন অতিবাহিত করিয়া, বালক বড় হইয়া যেমন সংসারে প্রবেশ করে, তখন তাহার স্কন্ধে এত বেশী কাযের চাপ আসিয়া পড়ে যে, ব্যস্ততা ও ক্ষিপ্রতার সহিত না করিলে, তাহা অসম্পূর্ণ ই থাকিয়া যায়।

বর্ত্তমানকালে লোকসাধারণের পল্লীগ্রাম ত্যাগ করিয়া নগরে বাস করার দিকে কেমন একটা বিজাতীয় ঝোঁক পড়িয়া গিয়াছে। এই কারণে নগরের লোকসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। নগরের জনাকীর্ণতা স্বাস্থ্যহানির অন্যতম কারণ। অবশ্য যে সকল ব্যক্তি বৎসরের মধ্যে কয়েকমাস সহরের বাহিরে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করেন, নগরের জনাকীর্ণতা তাঁহাদের তত অনিষ্ট করিতে পারে না। কিন্তু এরূপ সুবিধা নগরবাসী কয়জনের আছে? নগরের কোলাহল, ব্যস্ততা, ডাকহাঁক, গাড়ীর গড়গড়ানি, ট্রামের ঝন্‌ঝনানি, মোটরের শনশনানি, স্নায়ুমণ্ডলকে (nervous system) অকারণ উত্তেজিত ও অবসন্ন করিয়া থাকে। যদিও ইহার কুফল সঙ্গসঙ্গ টের পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু জীবনের যে সময় ভাটা আরম্ভ হয়, সে সময় ইহা ভাল করিয়াই টের পাওয়া যায়। সুখর নগরী, স্নায়ুর যে যে উত্তেজনা ও অবসাদ ঘটায়, পল্লীগ্রামের সরল শ্যামলতা ও মধুর নীরবতাই তাহার অপনোদন করিতে সমর্থ।

আয়ুষ্ক্ষয়ের চতুর্থ কারণ—সর্ব্বদা বসিয়া বসিয়া কায অভ্যাস। ইহাতে অঙ্গাদির ভালরূপ পরিচালনা হয় না।

অস্বাস্থ্যকরভাবে জীবনযাপন এবং আহারবিহারাদি সম্বন্ধে অমিতাচার অকাল-মৃত্যুর পঞ্চম কারণ। অতিরিক্ত তাম্রকূট সেবন ও সুরাপান বশতঃ শিক্ষিতসম্প্রদায়ের অনেকের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে দেখা যায়। ব্যভিচার ও আহারাদির দোষেও অনেকের স্বাস্থ্যহানি হইয়া থাকে।

তাহা হইলে দেখা গেল—শিক্ষিত সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্যহানি ও আয়ুষ্ক্ষয়ের কারণ প্রধানতঃ পাঁচটি—(১) দায়িত্বের আধিক্য (excessive burden of responsibility); (২) টানাটানি ও ব্যস্ততার সঙ্গে কায করা (high tension of labour); (৩) জনাকীর্ণতা (over-crowding); (৪) বসিয়া বসিয়া কায করার অভ্যাস (sedentary habits); (৫) অমিতাচার (erroneous methods of life)। এই সমস্ত কারণে যে সকল রোগের আক্রমণ সম্ভব, সেগুলি সংক্ষেপতঃ এই—স্নায়বীয়-দৌর্ব্বল্য (nervous break-down); কিড্‌নী রোগ (kidney disease), যকৃৎ ও পাকযন্ত্রাদির রোগ; মধুমেহ (diabetes); ধমনী-সমূহের রোগ (arterial degeneration); এগুলি দেখা দিবার পূর্ব্বে কতকগুলি পূর্ব্বলক্ষণ প্রকাশ পায়। ৪০।৪২ বৎসরের পর সকলেরই জীবনে কতকগুলি বিপদের সম্ভাবনা আছে। এগুলি যে অবশ্যম্ভাবী, সে কথা অবশ্য বলা যায় না; তবে ইহারা যে খুব সাধারণ, তাহা অস্বীকার করা যায় না। মানুষের জীবনের এক এক যুগের জন্য এক এক

প্রকার বিশেষ বিশেষ বিপদ আছে। শৈশব, যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্য এই চারি অবস্থাতে মানুষের জীবনে বিশেষ বিশেষ বিপদ থাকিতে দেখা যায়। প্রৌঢ় বা মধ্যবয়সের বিপদগুলি কি, তাহা জানিয়া সকলেরই সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য। মধ্য বয়সে উপস্থিত হইয়া—দেখিতে যুবার ন্যায় আছি এবং যুবার ন্যায় শক্তি-সামর্থ্য আছে, অতএব আমার আর ভাবনা কিসের?—এরূপ মনে করা অনুচিত। শরীরের অবস্থা যেমনি থাক্, মধ্যবয়সে নিজেকে সেই বয়সেরই লোক মনে করা কর্ত্তব্য।

এ সময় জীবনের স্রোত উল্টাদিকে বহিতে আরম্ভ করে। এখন আর বৃদ্ধির সময় নয়—ক্ষয়ের ও অবনতির সময়। অবশ্য সকলেরই যে ঠিক একই বয়সে ইহা দেখা দেয়, তাহা নহে; ব্যক্তিগত ও বংশগত বিশেষত্ব অনুসারে কাহারও দু'দিন আগে, কাহারও বা দু'দিন পরে, ইহা দেখা দিতে পারে। বাল্য ও যৌবন যে ভাবে অতিবাহিত করা যায়, তাহারই উপরও ইহা অনেক পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তি খুব দায়িত্বপূর্ণ, উদ্বেগময় এবং অত্যন্ত কর্ম্মঠ জীবন অতিবাহিত করেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেরই ৫০ বৎসর বয়সে শরীরের কোন না কোন যন্ত্রে একটু না একটু দৌর্ব্বল্য ও ক্ষয়ের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। হয় ত উহা এত সামান্য যে, ধর্ত্তব্যই নয়। তথাপি ইহা যে ক্ষয় সে কথা ভুলিলে চলিবে কেন? বিধাতা মানুষকে এমনভাবে নির্ম্মাণ করেন নাই যে, তাহার সকল ইন্দ্রিয়, সকল যন্ত্র, সমান সবল ও সমান সুপটু। এক যায়গায় না এক যায়গায়, কিছু না কিছু দুর্ব্বলতা আছে। এ দুর্ব্বলতা জীবন বীমার সময় ধরা পড়ে। কাহারও মূত্রে একটু-আধটু (albumen) এলবুমেন, বা শর্করা আছে—কাহারও হৃৎপিণ্ডে একটা অস্বাভাবিক শব্দ শুনা যায়, কাহারও বা নাড়ী ঠিক স্বাভাবিক নয়। অবশ্য এ সকল ব্যক্তি জীবন বীমার উপযুক্ত নয় বলিয়াই স্থিরীকৃত হয় বটে; তথাপি সাবধান হইয়া চলিতে পারিলে, ইহাদিগকে এ সকল সত্ত্বেও দীর্ঘকাল সুস্থভাবে বাঁচিয়া থাকিতে দেখা যায়। স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, (nervous break-down) আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেও কতকগুলি পূর্ব্বলক্ষণ প্রকাশ পায়। হয় ত যে ব্যক্তির প্রগাঢ় নিদ্রা হইত, তাহার অনিদ্রা দেখা দেয়; মেজাজ খিট্‌খিটে হয়; বেশীক্ষণ পরিশ্রম করিবার শক্তি থাকে না; কাযের খুঁটিনাটি দেখিবার ক্ষমতা থাকে না; মনঃসংযোগের অভাব হয়; বিষয়কর্ম্মে কোন একটা জটিল প্রশ্ন উঠিলে পূর্ব্বের মত সহজে অবলীলাক্রমে তাহার সমাধান করিতে ইচ্ছা হয় না। মধ্যবয়সে স্বাস্থ্যনাশ যে বর্ত্তমান সভ্যতার অনিবার্য্য ফল, এ কথা মনে করা অন্যায়। এমন অনেকের নাম করিতে পারা যায়, যাঁহারা খুব কর্ম্মঠ, দায়িত্বপূর্ণ জীবন অতিবাহন করিয়াও সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। সকল বিষয়ে মিতাচার, গুরুভোজন পরিহার, নির্দ্ধারিত সময়ে নিয়মিতভাবে কার্য্যসম্পাদন করা, প্রচুর নিদ্রা, উপযুক্ত পরিমাণ ব্যায়াম বা অঙ্গচালনা এবং প্রভূত বিশ্রাম, দীর্ঘায়ুলাভ ও স্বাস্থ্যরক্ষার মূলমন্ত্র বলিয়া জানিতে হইবে। যে ব্যক্তি এ সকল নিয়ম পালন করেন, তাঁহার জীবন সম্পূর্ণ নিরাপদ, বর্ত্তমান সভ্যতা তাঁহার কোনই অনিষ্ট করিতে পারে না। (ভারতবর্ষ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচি।

শ্যামনগরের জমিদার

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

হরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা

যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের টেলিগ্রামে শ্যামনগরের সকল অবস্থা জ্ঞাত হইয়া আমরা কি যে করিব তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। কৃষ্ণপদের মনের অবস্থা যে কিরূপ হইল তাহা আর কি বলিব। আমরা এই সকল বিষয় আমাদের পূর্ব্বপরিচিত জজসাহেব ও মিষ্টার মরিশকে জানাইয়া এ সম্বন্ধে এখন আমাদের যে কি কর্ত্তব্য তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের উপদেশ লইলাম। এই কয় বৎসরের মধ্যে মিঃ মরিশ ব্যারিষ্টারীতে অনেক উন্নতিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার পসার প্রতিপত্তি খুব বাড়িয়া গিয়াছে। তিনি পার্লেমেণ্টের মেম্বর নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এখন পার্লেমেণ্টে লিবারেল বা উদারনৈতিক দলের প্রাধান্য। মিঃ মরিশ লিবারেল দলভুক্ত। তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রীর সহিত মিঃ মরিশের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। সেই সময়ে কয়েক জন অবসরপ্রাপ্ত সিবিলিয়ান্ পার্লেমেণ্টের মেম্বর নির্ব্বাচিত

হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন তাঁহাদের কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা যত্নশীল ছিলেন। বৃদ্ধ জজসাহেবের পরামর্শ অনুসারে আমরা মিঃ মরিশ ও পূর্ব্বোক্ত মিশিনারিদিগের দ্বারা পার্লেমেণ্টে এই সকল বিষয়ের বিতর্ক উপস্থিত করাইবার চেষ্টা করিলাম। তাঁহারা আনন্দের সহিত এই বিষয় লইয়া পার্লেমেণ্টে মহা আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। ইতিপূর্ব্বে পার্লেমেণ্টে ভারতবর্ষ বিষয়ক কোন কথার তেমন আলোচনা হইত না। এইবার সেই চিরন্তন প্রথার অন্যথা হইল। সেক্রেটারী অব ষ্টেট্ ফর ইণ্ডিয়া, মিঃ মরিশ ও তাঁহার সহযোগীদিগের ভারতবর্ষ বিষয়ক প্রশ্নের মালায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। বিনয়চন্দ্র ও আমি বিলাতে থাকিয়া এই বিষয়ের আন্দোলন যাহাতে থামিয়া না যায় তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে বদ্ধপরিকর হইলাম। কৃষ্ণপদ ও রমানাথ একজন পাচক ব্রাহ্মণ ও দুইজন ভৃত্য সঙ্গে করিয়া অবিলম্বে দেশে ফিরিয়া যাইবেন স্থির হইল। তদনুসারে কৃষ্ণপদ ও রমানাথ পাচক ও ভৃত্যসহ "ডেস্‌ডেমনা" নামক একটী সুবৃহৎ জাহাজে ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এই বিষয় লইয়া কত দিন বিলাতে থাকিতে হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই বিবেচনা করিয়া বিনয়চন্দ্র ও আমি, দুইজনেই অতঃপর আর্থোপার্জ্জনের উপায় দেখিতে লাগিলাম।

(২)

বিনয়চন্দ্র কিছুদিন বিলাতে ব্যারিষ্টারী করিবেন স্থির করিয়া মিঃ মরিশের জুনিয়ার হইলেন। এই সময়ে এক পুস্তকপ্রকাশক সম্প্রদায় ভারতবর্ষের পুরাণাদির ইংরেজী অনুবাদ বাহির করিবার আয়োজন করিলেন। বিনয়চন্দ্র এই পুরাণ অনুবাদ কার্য্যের কিয়দংশের ভার লইলেন। তিনি সমগ্র রামায়ণ ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া দিতে চাহিলেন। প্রকাশক সম্প্রদায় ইহার পারিশ্রমিক স্বরূপে বিনয়চন্দ্রকে চারি শত পাউণ্ড দিতে চাহিলেন এবং অগ্রিম একশত পাউণ্ড দিলেন। স্থির হইল যে অনুবাদ শেষ হইবার পূর্ব্বে আর একশত পাউণ্ড ও অনুবাদ শেষ হইলে বক্রী দুইশত পাউণ্ড দিবেন। বিনয়চন্দ্র রামায়ণের অনুবাদ কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। সৌভাগ্য ক্রমে বিলাতের একটী বিজ্ঞানাগারে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য দুইশত পাউণ্ড বৃত্তিতে এক বৎসরের জন্য আমাকে নিযুক্ত করা হইল।

কৃষ্ণপদদিগের যাত্রা করিবার কয়েক দিবস পরে জানিলাম যে তাঁহারা যে জাহাজে যাওনা হইয়াছেন সেই জাহাজ ত্রিপোলী বন্দরে আটক পড়িয়াছে। ত্রিপোলী বন্দরের কর্ত্তৃপক্ষেরা "ডেস্‌ডেমনা" জাহাজের আরোহীদিগের মধ্যে কেহ কেহ বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়াছেন সন্দেহ করিয়া দুইমাসের জন্য জাহাজ আটক করিলেন। সেই দুইমাস অতীত হইবার পর "ডেস্‌ডেমনা" জাহাজকে ত্রিপোলী বন্দর হইতে ছাড়িয়া দেওয়ার সংবাদও পাইলাম। মনে করিলাম, এইবার কৃষ্ণপদেরা নির্ব্বিঘ্নে বাটীতে পৌঁছিতে পারিবে। কিন্তু মানুষ যতই চেষ্টা করুক না কেন, ভবিষ্যৎ দুর্ঘটনার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। "ডেস্‌ডেমনা" ত্রিপোলী বন্দর ছাড়িবার কয়েক দিবস পরে, একদিন প্রাতঃকালে দৈনিক সংবাদপত্রের টেলিগ্রাম পাঠ করিয়া জানিলাম যে "ডেস্‌ডেমনা" জাহাজ ডুবিয়া গিয়াছে। তাহার আরোহিদিগের মধ্যে কেহই রক্ষা পায় নাই। কেমন করিয়া ডুবিল, কোথায় ডুবিল সে সম্বন্ধে কোনই সংবাদ সেদিন পাওয়া গেল না। তারপর দুই তিন দিবস ধরিয়া ডেস্‌ডেমনা ধ্বংস হওয়া সম্বন্ধে নানারূপ সংবাদ বাহির হইতে লাগিল। কোন সংবাদপত্রে বাহির হইল, তুষার পর্ব্বতে লাগিয়া "ডেস্‌ডেমনা" ডুবিয়াছে, অর্দ্ধেকের বেশী আরোহী বাঁচিয়াছেন। কোন সংবাদপত্রে লিখিল, আর একটী জাহাজে লাগিয়া ডেস্‌ডেমনার বিপদ ঘটিয়াছে, একটী আরোহীও রক্ষা পায় নাই। আরোহীদিগের মধ্যে কত জন মরিল কত জন রক্ষা পাইল এই বিষয় লইয়াই যা কিছু প্রভেদ ঘটিল। ডেস্‌ডেমনা ধ্বংস হওয়া সম্বন্ধে কোন সন্দেহ রহিল না। কৃষ্ণপদের বিপদের উপর এই আকস্মিক বিপদের কথা শুনিয়া আমরা যারপর নাই মর্ম্মাহত হইয়া দুশ্চিন্তায় কালযাপন করিতে লাগিলাম। এইরূপে আরও এক বৎসর কাটিয়া গেল।

যোগেশচন্দ্রের পত্রে দেশের সংবাদ পাইতাম। তাহাতে জানিলাম যে বিষ্ণুবাবু তখনও নির্ব্বাসনে রহিয়াছেন, তাঁহার বিষয় সম্পত্তি সম্বন্ধে নানারূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে। ডেস্‌ডেমনা জাহাজ নষ্ট হইবার সংবাদ কিছুদিন পর্য্যন্ত

কৃষ্ণপদের বাড়ীর কাহাকেও জানান হয় নাই। রামকমল বিদ্যালঙ্কার অবশ্য সে কথা জানিয়াছিলেন এবং তাঁর পরামর্শ অনুসারেই এই দুর্ঘটনার বিষয় কৃষ্ণপদের মাতা, শাশুড়ী ও স্ত্রী প্রভৃতির নিকট গোপন রাখা হইয়াছিল। কিন্তু বিষ্ণুপদ বাবুর পরম হিতৈষী বিশ্বনাথ রায় বাহাদুর এরূপ মিথ্যাচারের প্রশ্রয় দিতে পারিলেন না। তিনি একদিন আত্মীয়তা দেখাইতে গিয়া কথায় কথায় "ডেস্‌ডেমনা" জাহাজ নষ্ট হওয়া ও সেই সঙ্গে কৃষ্ণপদদিগের নিরুদ্দেশের কথা কৃষ্ণপদের শাশুড়ীকে জানাইয়া আসিলেন। তবে এমন আশা দিলেন যে জাহাজ ডুবী হইলেও অনেক আরোহী রক্ষা পাইয়া থাকে। কৃষ্ণপদের সম্বন্ধে এখনও হতাশ হইবার কারণ নাই। ভগবান্ অবশ্যই মুখ তুলিয়া চাহিবেন। ইত্যাদি।

কৃষ্ণপদের মাতা রায় বাহাদুরের এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না। তিনি রামকমল বিদ্যালঙ্কারকে ডাকিয়া এ সম্বন্ধে প্রকৃত ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার মুখে প্রকৃত কথা শুনিয়া বিষ্ণু বাবুর পরিবার মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। শুধু কৃষ্ণপদের বালিকা কন্যা সাগরিকা কিছু বুঝিতে পারিল না।

বিষ্ণুপদ বাবুর নির্ব্বাসনের বিরুদ্ধে বিলাতের আন্দোলন আমরা প্রবল ভাবেই চালাইতে লাগিলাম। সংবাদপত্রে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ বাহির হইতে লাগিল, পার্লেমেণ্টে প্রশ্নের পর প্রশ্নে ষ্টেট্ সেক্রেটরী ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। একদিন মিঃ মরিশ সেক্রেটরী অব ষ্টেট ফর ইণ্ডিয়াকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাংলা প্রদেশের প্রসিদ্ধ জমিদার বাবু বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়কে ও তাঁহার প্রথম শ্রেণীর কালেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপককে বিনা বিচারে নির্ব্বাসিত করিবার কারণ কি এবং কোন্ আইন অনুসারে এরূপ করা হইয়াছে? সেক্রেটরী অব ষ্টেট ফর ইণ্ডিয়া কি জানেন, যে পূর্ব্বকথিত জমিদারের ন্যায় দানশীল, বিদ্যোৎসাহী, সাধারণের হিতকর কার্য্যে অর্থব্যয়ে মুক্তহস্ত, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি বাংলা প্রদেশে আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁর রাজভক্তিও সর্ব্বজনবিদিত।" সেক্রেটরী অব্ ষ্টেট ফর ইণ্ডিয়া উত্তর দিলেন, "জমিদার বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়ের বিনা-বিচারে নির্ব্বাসনের সংবাদ ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি ও বড়লাট বাহাদুরের নিকট হইতে আমি পাইয়াছি। এইরূপ নির্ব্বাসন বেআইনি নহে। এসম্বন্ধে একটী রেগুলেশন আছে। কি নিমিত্ত এইরূপ আদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহার সবিশেষ বিবরণ জানাইবার জন্য বড়লাট বাহাদুরকে জানান হইয়াছে। তাঁহার উত্তর পাইলেই তাহা সকলে জানিতে পারিবেন।

মিঃ মরিশ বলিলেন,—"সেক্রেটরী অব ষ্টেট যে রেগুলেশনের উল্লেখ করিলেন, তাহা বহুকালের। ইতিপূর্ব্বে কখনও ঐ রেগুলেশনের বিধান অনুসারে কার্য্য হইয়াছে এরূপ জানা যায় না। ঐ বিধান রহিত হওয়া কর্ত্তব্য। সেক্রেটরী অব ষ্টেট্ উক্ত বিধান রহিত করিবার জন্য ভারতবর্ষের বড়লাটকে অনুরোধ করিতে প্রস্তুত আছেন কি না?"

সেক্রেটরী অব ষ্টেট্ ফর ইণ্ডিয়া বলিলেন,—"সেযোক্ত প্রশ্নের উত্তর এখন আমি দিতে প্রস্তুত নাই। তবে এ কথা বলিতে পারি যে এই বিষয়ের তদন্ত করা যাইবে।

হেন্‌রি ষ্টিফেনের কথা।

(১)

আমি ইংলণ্ডের একজন প্রসিদ্ধ গোয়েন্দা। আমি সরকারের নিয়মিত বেতনভুক্ কর্ম্মচারী নহি। তবে কোন জটিল বিষয়ের উদ্ধার সরকারি গোয়েন্দার দ্বারা ঘটিয়া না উঠিলে প্রচুর পারিশ্রমিকে আমাকে তাহাতে নিযুক্ত করা হইয়া থাকে। বেসরকারী তদন্তের ভারও আমি উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইলে লইয়া থাকি। এক একটা তদন্তের জন্য আমি যে পারিশ্রমিক লইয়া থাকি তাহা প্রথম শ্রেণীর ব্যারিষ্টার ও চিকিৎসকদিগেরও ঈর্ষার উদ্রেক করিয়া থাকে। লোকের বিশ্বাস এইরূপ যে আমি কোন বিষয়ের তদন্তের ভার লইলে কার্য্য উদ্ধার হইবেই হইবে।

এবার আমাকে ভারতবর্ষে আসিতে হইয়াছে। সেক্রেটরী অব ষ্টেট ফর ইণ্ডিয়া ইন্ কাউন্সিল্ ভারতবর্ষের মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের অনুরোধ ক্রমে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অশান্তির বিষয়, বিশেষতঃ বাংলা প্রদেশে সরলপুর জেলার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়ের রাজ-বিদ্রোহ সূচক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার বিষয় তদন্ত করিবার জন্য আমাকে

ভারতবর্ষে পাঠাইয়াছেন। অতি গোপনে এই কার্য্য হইয়াছে। ভারতবর্ষের বড়লাট বাহাদুর ব্যতীত আর কেহই এ কথা জানিতেন না।

(২)

আমাকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিবার কারণ এই যে, আমি কলিকাতায় জন্ম গ্রহণ করি। জীবনের প্রায় বাইশ বৎসর কলিকাতায় যাপন করি। আমার পিতা ধনশালী ব্যক্তি ছিলেন। নানা বিষয়ে তাঁর বিস্তৃত কারবার ছিল। প্রাসাদতুল্য বাটীতে ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে আমি লালিত হইতাম। আমার যখন কুড়ি বৎসর বয়স সেই সময় ভারতবর্ষের দুইটী বিখ্যাত ব্যাঙ্ক ফেল হইয়া যায়। সেই দুই ব্যাঙ্কে পিতার যথাসর্ব্বস্ব গচ্ছিত ছিল। ব্যাঙ্ক ফেল হইবার সঙ্গে সঙ্গে পিতাও কপর্দ্দকশূন্য হইলেন। তাঁর দেনাই প্রায় একলক্ষ টাকা বাহির হইল। এই দুর্ঘটনায় পিতা এরূপ মর্ম্মাহত ও ভগ্নোৎসাহ হইলেন যে কয়েকদিন নির্জ্জন বাসে কাটাইয়া একদিন আত্মহত্যা করিয়া সকল যন্ত্রণার হাত এড়াইলেন। পিতার শোচনীয় মৃত্যুর তিন দিবস পরে মাতাও হৃদ্‌রোগে প্রাণত্যাগ করিলেন। আমার জ্যেষ্ঠা এক ভগিনী ছিলেন। আসামের এক চা বাগানের মালিকের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তা'ছাড়া আমাদের আর কেহ ছিল না। আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী তখন তাঁহার স্বামীর নিকট আসামে ছিলেন। ভগিনীপতির সহিত আমার সদ্ভাব ছিল না। চা-করদিগকে আমি ঘৃণা করিতাম।

পিতামাতার মৃত্যুর পর কোন রকমে তাঁহাদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার ব্যয় নির্ব্বাহ করিলাম। তারপর কি করিয়া প্রতিদিনের আহার জুটিবে এরূপ সম্বল মাত্র রহিল না। আমরা যে প্রাসাদতুল্য বাটীতে বাস করিতাম সেটী ভাড়াটিয়া বাড়ী, মাসিক দুইশত টাকা হিসাবে ভাড়া লাগিত। সেই বাড়ীর এক বৎসরের ভাড়া বাকী পড়িয়াছিল। পিতামাতার মৃত্যুর কয়েকদিবস পরেই সেই বাড়ীর মালীক আমাকে সেই বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে বলিলেন। আমি একাকী, তাহাতে নিঃস্ব। অতবড় বাড়ীতে আমার প্রয়োজন কি! বিনা বাক্যব্যয়ে পথে দাঁড়াইলাম। হাতে একটী পয়সা মাত্র সম্বল রহিল না। পরিহিত পরিচ্ছদ মাত্র সম্বল করিয়া পথে দাঁড়াইলাম। কোথায় যাইব, কি করিব, পথে দাঁড়াইয়া আকাশ পাতাল তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। পথে দাঁড়াইয়া ওরূপ ভাবে আকাশ পানে চাহিয়া থাকিলে লোকে পাগল ঠাওরাইবে মনে করিয়া ইডেন উদ্যানে গিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। ভাবনার আর অন্ত নাই। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এক ভাবেই বসিয়া ভাবিতেছি। ততক্ষণ পর্য্যন্ত এক বিন্দু জলও মুখে দেই নাই। সন্ধ্যার সময় কত লোক ইডেন উদ্যানে আসিয়া কত রকম গল্প ও কত হাসি তামাসা করিতেছে, মনের সুখে চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছে। তালে তালে বাদ্য বাজিতেছে। কিন্তু সেই জনকোলাহলের মধ্যে আমি একাকী।

বসিয়া থাকিতে থাকিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছি বলিতে পারি না। এক ব্যক্তির স্পর্শে আমার ঘুম ভাঙ্গিল। চমকিত হইয়া চক্ষু মেলিয়া দেখি মিষ্টার ম্যাকিন্‌টস্ আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। মিঃ ম্যাকিন্‌টস্ কলিকাতার একজন বিখ্যাত সদাগর। তাঁকে ক্রোরপতি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না! ইনি আমার পিতার অন্তরঙ্গ বন্ধু। কয়েক মাস হইল বিলাত গিয়াছিলেন। মিঃ ম্যাকিন্‌টস্ সস্নেহে আমার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে আমার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া বলিলেন, "হ্যারি, আমি আজ বেলা দশটার সময় এখানে আসিয়াছি। তোমার বিপদের কথা শুনিবামাত্র তোমাদের বাড়ীতে যাই। সেখানে গিয়া শুনিলাম, তুমি সেখান হইতে কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে চলিয়া গিয়াছ। তোমার অনুসন্ধানে চারিদিকে লোক পাঠাইয়াছি। আমি নিজেও তোমাকে খুঁজিতে খুঁজিতে এখানে আসিয়া তোমাকে এই ভাবে ঘুমাইতে দেখিলাম। তোমার মুখ অত শুকনো দেখাইতেছে কেন, সারাদিন কিছুই খাওয়া হয় নাই বুঝি! এখন আর কোন কথা নয়। এসো আমার সঙ্গে এখন। আমার সঙ্গে আমার গাড়ী আছে।" এই বলিয়া আমাকে কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া মিঃ ম্যাকিন্‌টস্ আমার হাত ধরিয়া হড়্‌হড়্ করিয়া টানিয়া লইয়া তাঁর গাড়ীতে উঠাইলেন। আমাদের দুইজনকে লইয়া গাড়ী তাঁর বাড়ীর দিকে ছুটিল। সেখানে পৌঁছিবামাত্র মিঃ ম্যাকিন্‌টস্ আমার পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করাইলেন এবং নানাবিধ উপাদেয় দ্রব্য আমাকে আহার করিতে দিলেন। আমার মন ও শরীর তখন এত খারাপ যে আমি

ভাল করিয়া খাইতে পারিলাম না। সে রাত্রির মত আমাকে বিশ্রাম করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া মিঃ ম্যাকিন্‌টস্ চলিয়া গেলেন। আমি আমার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে গিয়া শয়ন করিয়া পুনরায় চিন্তাস্রোতে গা ঢালিয়া দিলাম।

মিঃ ম্যাকিন্‌টস্ আমাকে তাঁর বিস্তৃত কারবারের অন্যতম পরিদর্শক নিযুক্ত করিলেন। আপাততঃ আমার বেতন হইল মাসিক দুইশত টাকা। এক মাসের বেতন অগ্রিম পাইলাম। মিঃ ম্যাকিন্‌টস্ ভরসা দিলেন যে "যদি তুমি সন্তোষজনক রূপে কাজ কর, তাহা হইলে তোমার বেতন শীঘ্রই বৃদ্ধি করিয়া দিব, এবং তোমাকে আমার কারবারের অংশীদার করিয়া লইব।" আমি একটী মাঝারি গোছের হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

(৪)

এই কার্য্যে দুই বৎসর কাটাইলাম। কার্য্য দ্বারা মিঃ ম্যাকিন্‌টসের সন্তোষ বিধান করিতে পারিলাম না। কি জানি কেন, সদাগরি কার্য্যের উপর আমার কেমন বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল। কাজে মোটেই মন লাগিত না। একদিন আমাদের আফিস হইতে কতকগুলি প্রয়োজনীয় দলিল চুরি যায়। যেদিন চুরি হয় সেদিন আমি কলিকাতায় ছিলাম না। কার্য্য-উপলক্ষে বাঁকীপুরে গিয়াছিলাম। চুরির নয় দিবস পর কলিকাতা আসিয়া চুরির কথা শুনিতে পাই।

এই চুরির তদন্ত উপলক্ষে কলিকাতার পুলিশের সহিত আমি কিছুদিন ঘুরিয়াছিলাম। তদন্তের সময় অযাচিতভাবে পুলিশকে দুএকটা উপদেশও দিয়াছিলাম। প্রথম প্রথম পুলিশ আমার কথায় কাণ দেয় নাই। অবশেষে আমার নিতান্ত জিদ্ দেখিয়া আমার প্রস্তাবিত প্রণালী অবলম্বন করিয়া তদন্ত আরম্ভ করায় চোর ধরা পড়িল। চোরের নিকট চোরাই মাল পাওয়া গেল। তাহার সহকারীরাও ধরা পড়িল। পুলিশের বড় সাহেব চোরধরা বিদ্যায় আমার অশিক্ষিত পটুতা দেখিয়া আমাকে তাঁর আফিসে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন যে, "তুমি যদি পুলিশে চাকরী গ্রহণ কর, তাহা হইলে ভবিষ্যতে খুব উন্নতি করিতে পারিবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কালে তুমি একজন শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা হইতে পারিবে। তুমি যদি ইচ্ছা কর আমি তোমাকে এখনই মাসিক তিন শত টাকা বেতনে ডিটেক্‌টিব্ ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত করিতে প্রস্তুত আছি। সদাগরি কাজে থাকিলে ডিটেকটিব্‌গিরিতে তোমার যে এমন সুন্দর বুদ্ধি আছে তাহা মাঠে-মারা যাইবে। আমি মিঃ ম্যাকিন্‌টস্‌কেও এ সম্বন্ধে বলিব।" পুলিশের বড় সাহেবের কথা আমার মনে লাগিল। আমি তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। কেবল মাত্র মিঃ ম্যাকিন্‌টসের সম্মতির অপেক্ষা রহিল। তিনি অসময়ে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, তাঁর অনভিমতে কোন কার্য্য করিতে পারিব না। সুখের বিষয় মিঃ ম্যাকিন্‌টস্ আপত্তি করিলেন না। আমি ডিটেকটিব বিভাগে নিযুক্ত হইলাম। এই বিভাগে কিছুদিন কার্য্য করিবার পর বুঝিলাম, এইবার আমার মনের মত কার্য্য পাইয়াছি। এই কার্য্যে আমার কৃতিত্ব দেখাইবার সুযোগ পাইব।

কলিকাতায় দুই বৎসর কার্য্য করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের প্রশংসা লাভ করিলাম। কর্ত্তৃপক্ষ আমার কার্য্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের ডিটেকটিব বিভাগের কার্য্য-প্রণালী শিক্ষা করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত বৃত্তি দিয়া আমাকে ইংলণ্ডে পাঠাইলেন। ভারতবর্ষে অবস্থান কালে আমি বাংলা ও হিন্দি অতি সুন্দর রূপে শিখিয়াছিলাম। আমি এমন সুন্দর বাংলা বলিতে পারিতাম যে আমার উচ্চারণ শুনিয়া কেহই বলিতে পারিত না যে একজন ইংরেজ এইরূপ বাংলা উচ্চারণ করিতেছে। ইংরেজেরা সচরাচর 'ত' উচ্চারণ করিতে পারেন না। আমার উচ্চারণের সেরূপ কোন ত্রুটী ছিল না। কলিকাতায় জন্ম ও তাহার পর বাইশ তেইশ বৎসর পর্য্যন্ত তথায় বাস করিয়া সেখানকার লোকদিগের সহিত সর্ব্বদা মিলা মিশা করায় বোধ হয় আমার বাংলা উচ্চারণ দুরস্ত হইয়া থাকিবে। ছদ্ম বেশ ধারণে আমি অসাধারণ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলাম।

ইংলণ্ডে গিয়া এক বৎসর কাটাইবার পর সেখানকার গোয়েন্দা বিভাগে মোটা বেতনে নিযুক্ত হই। তিন বৎসর সরকারী কার্য্য করিবার পর তাহা ছাড়িয়া দিয়া স্বাধীন ভাবে ব্যবসায় চালাইতেছি। এখন আমার বয়ঃক্রম ৩৫।৩৬ বৎসর। (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত।

ভারত মহিলা

নত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। (মনু)

The woman's cause is man's : they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free :
If she be small, slight-natured miserable,
How shall men grow ? (TENNYSON.)

মহানুবাদ :—স্ত্রী-পুরুষের উন্নতি অবনতি একসূত্রে গ্রথিত। নারী অবজ্ঞাগ্রস্তা পতিতা থাকিলে পুরুষ কখনই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। (ব্রিটিশ মহাকবি লর্ড টেনিসন)

"I will be as harsh as truth, and as uncompromising as Justice ; I am in earnest——I will not equivocate, I will not retreat a single inch———and I will be heard." (WILLIAM LLOYD GARRISON.)

মর্মানুবাদ :—আমি সত্যের ন্যায় কঠোর ও ন্যায়ের মত অবনমনীয় হইব। আমি বুঝিয়াছি, আমি কিছুতেই সঙ্কুচিত হইব না। আমি নিশ্চিত জানি, তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। (মহাত্মা গ্যারিসন)

১২শ ভাগ | আষাঢ়, ১৩২৩। | ৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

মহাকালী পাঠশালা

মাতাজি মহারাণি নাম্নী মহারাষ্ট্র সন্ন্যাসিনী কলিকাতার হিন্দু বালিকাদিগকে হিন্দু-ধর্ম্মানুমোদিত বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্য মহাকালী পাঠশালার প্রতিষ্ঠা করেন। মাতাজির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল, তিনি আমাদিগকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। তিনি অতি তেজস্বিনী ও শক্তিশালিনী নারী ছিলেন। মারাঠী মহিলা হইয়াও প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া তিনি বাঙ্গালী মেয়েদের জন্য এই প্রকাণ্ড বিদ্যালয়টী প্রতিষ্ঠা করিয়া জীবিত কাল পর্য্যন্ত সুন্দর রূপ ইহার পরিচালন করিয়া গিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, ক্রমেই অর্থাভাবে পাঠশালাটীর অবস্থা খারাপ হইতেছে। ময়মনসিংহেও একটী মহাকালী পাঠশালা আছে। জনৈক ধনাঢ্য মহিলা এই বিদ্যালয়ের জন্য একখানি সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, এই বিদ্যালয়টীর অবস্থাও আশানুরূপ নহে। হিন্দু সমাজে অর্থশালী লোকের অভাব নাই, চেষ্টা করিলেই প্রচুর অর্থ সংগ্রহ হইতে পারে, কিন্তু আমাদের মনে হয়, পাঠশালার শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যেই এমন কিছু গলদ আছে যে জন্য এই পাঠশালাগুলির উদ্দেশ্য সফল হইতেছে না। পাঠশালার অবলম্বিত শিক্ষাপ্রণালী বর্ত্তমান জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্ক-বিরহিত, প্রধানতঃ গোঁড়ামি শিক্ষা দেওয়াই যেন এগুলির উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান যুগে এইরূপ শিক্ষাপ্রণালী কার্য্যকরী হইতে পারে না। মুখে যিনি যতই গোঁড়ামির দোহাই দিন্ না কেন, কার্য্যতঃ নিজ গৃহের বালিকাদিগকে এরূপ শিক্ষা দিয়া অতি অল্প অভিভাবকই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন।

বোর্ডিং স্কুলে রন্ধন ও গৃহস্থালি শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিতে পারে, কিন্তু মহাকালী পাঠশালা বোর্ডিং স্কুল নহে। এই স্কুলে আবার প্রচলিত গৃহস্থালি শিক্ষার ব্যবস্থা কেন ? ইহা

কি একটা বাহিরের ঠাট নয়? মায়ের কাছে যে সকল বালিকা বাস করে, স্কুলে শিক্ষকের নিকট আসিয়া তাহাদের গৃহস্থালি শিক্ষা করা ও তাদের মা-দের অপমান করা মাত্র। আর স্কুলে শিবপূজা শিক্ষা ইত্যাদিও আজকালকার দিনে চলিবে না। গৃহে যদি ধর্ম্ম না দেখে তবে স্কুলের পোষাকী ধর্ম্মের মূল্য থাকিবে কিরূপে?

আমরা বলি, পাঠশালার কর্তৃপক্ষগণ বাজে কাজে বালিকাদের মূল্যবান সময় বৃথা নষ্ট হইতে না দিয়া তাহাদিগকে ভাল করিয়া সাহিত্য-জ্ঞান শিক্ষা দিন, মোটামুটি গণিত শিক্ষা দিন, বাংলা ভাষায় ভাল ভাল বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক যাহা আছে তাহা শিক্ষা দিন, ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠে তাহাদের অনুরাগ বৃদ্ধি করুন, উপযুক্ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করুন, তাহা হইলে এই পাঠশালা দ্বারা দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। এমন কি, আমরা যে স্ত্রী-বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা সর্ব্বদাই আলোচনা করিতেছি,—এই পাঠশালা হইতেই কালে তাহার সূচনা হইতে পারে। কলিকাতার শিক্ষিত হিন্দুদিগের মধ্যে কি এমন কেহ নাই যাঁহারা এই বিষয়টী ভাল করিয়া ধরিতে পারেন, এবং সময়ের উপযোগী করিয়া মহাকালী পাঠশালাটী গড়িয়া তুলিতে পারেন? মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া একজন তপস্বিনী যে কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন উপযুক্ত পরিচালকের অভাবে তাহা কি নষ্ট হইয়া যাইবে?

কুচবিহার সুনীতি কলেজ

কুচবিহারের ভূতপূর্ব্ব মহারাণী, বর্ত্তমান রাজমাতা শ্রীমতী সুনীতি দেবীর নামে কুচবিহারে বালিকাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত একটী বিদ্যালয় আছে। এই বিদ্যালয়দ্বারা কুচবিহারে স্ত্রীশিক্ষার বেশ উন্নতি হইতেছে। গত ২রা মে রাজপ্রাসাদসংলগ্ন সুসজ্জিত দরবার হলে এই সুনীতি কলেজের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ উৎসাহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। রাজমাতা শ্রীমতী মহারাণী সুনীতি দেবী, মহারাজকুমার ভিক্টর নারায়ণ ও তাঁহার নব পরিণীতা সহধর্ম্মিণী ভারতমহিলার লেখিকা শ্রীমতী নিরুপমা দেবী, কুমার বতীন্দ্র নারায়ণ, শ্রীযুক্ত দেওয়ান বাহাদুর ও মহারাজ ভূপ বাহাদুরের সেক্রেটারি মহোদয় প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণ সভার শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। পারিতোষিক দ্রব্যজাতের মধ্যে সুবর্ণ পদক, কর্ণভূষণ, শাড়ী, পুস্তক আদি মূল্যবান দ্রব্য ছিল। প্রায় দুই শত ছাত্রী নানাবিধ পুরস্কারে পুরস্কৃত হইয়াছে। বালিকাদের উদ্বোধন সংগীত আবৃত্তি প্রভৃতিতে উপস্থিত সভ্য-মাত্রেই প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। মাননীয়া মহারাজ-মাতা বালিকাদিগকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া একটী নাতিদীর্ঘ সারগর্ভ হৃদয়-গ্রাহী বক্তৃতা করেন। উহাতে তিনি কুচবিহারাধীশ্বরী বর্ত্তমান মহারাণী ইন্দিরা দেবীর বিবিধ গুণগ্রামের এবং বালিকাদিগের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি সম্পন্ন অনুরাগ প্রভৃতির কীর্ত্তন করিয়া কলেজের জীবন শিরের শ্রীবৃদ্ধির জন্য বিদুষী মহারাণীর একটী শেলাই কল উপহার দিবার ইচ্ছা বিজ্ঞাপিত করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত দেওয়ান বাহাদুর, শ্রীশ্রীমতী মহারাণী মহোদয়া ও মহারাজমাতা প্রভৃতির ধন্যবাদ করিলে সভার কার্য্য শেষ হয়। কুচবিহারের বিদ্যোৎসাহী মহারাজকুমার ভিক্টর নারায়ণ এখন হইতে উক্ত কলেজের সম্পাদকের কার্য্য গ্রহণ করায় বিদ্যালয়ের সর্ব্বতোমুখী উন্নতির আশা করা যায়। তাঁহার বিদুষী সহধর্ম্মিণীর নিকট তিনি এ বিষয় প্রচুর সাহায্য পাইবেন, আমরা নিঃসন্দেহে একথা বলিতে পারি।

সেবা ও ঔদ্ধত্য

সেবার ন্যায় পবিত্র কার্য্য আর কিছু নাই। বঙ্গদেশে যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে সেবার প্রবৃত্তি দিন দিন বাড়িতেছে দেখিয়া আমরা পরম আনন্দ লাভ করিতেছি। দুর্ভিক্ষে, জল প্লাবনে, তীর্থে, মেলায়, আর্ত্তের শুশ্রূষায় দিন দিন যুবকদিগের অনুরাগ বাড়িতেছে। যুবক-হৃদয়ের উৎসাহের অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করিয়া শ্রদ্ধা, বিনয় ও ত্যাগের ভাবে তাহাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে দেশের ও জাতির অমূল্য সম্পদ লাভ হয়। শিক্ষিত, উন্নতমনা যুবকদের ত কথাই নাই, এমন অনেক "বয়ে যাওয়া" "বকাটে" ছেলে দেশে আছে যাহাদের অন্তরে অনেক সদ্‌গুণ ও আশ্চর্য্য কর্ম্মশক্তি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে;—উপযুক্ত নায়কের হাতে পড়িলে ইহাদের সেই প্রচ্ছন্ন শক্তি ফুটিতে পারে, তাহা লোকসেবায় লাগিতে পারে। কিন্তু সেরূপ নায়ক কোথায়? গত মাঘ মাসের "মর্য্যাদা" নামক হিন্দি কাগজের সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিত হইয়াছে :—

"দিন দিন যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে সেবার ভাব বৃদ্ধি হইতেছে দেখিলে আনন্দ হয়। কিন্তু দুঃখের কথা, অনেকে কেবল নামের জন্যই সেবা-ধর্ম্মের অনুসরণ করেন। ইঁহাদের ইচ্ছানুকূল ব্যক্তিদের যথের ঢাক না পিটিলে, ইঁহারা মনে করেন, ইঁহাদের অপমান করা হইল। সুনাম অর্জ্জন কে না চায়! যাঁহারা কেবল নামের জন্যই পরের সেবা করেন, তাঁহাদেরও সাহায্য আমরা চাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে, ইঁহারা দুর্ব্বলতা বশতঃ এক পবিত্র আদর্শ কলুষিত করিতেছেন এবং ইঁহাদের 'সেবক' হইতে এখনও বহু তপস্যার প্রয়োজন।" ('ভারত-বর্ষের' অনুবাদ)

মর্য্যাদা-সম্পাদকের উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে অনেকেই সাক্ষ্য দিবেন। গত বৎসর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জলপ্লাবনের সময় রামকৃষ্ণ মিশনের অনেক যুবকের ঔদ্ধত্যের কথা আমরা লোকমুখে শুনিয়া ও সংবাদ পত্রে পড়িয়া মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম। সে দিন হিতবাদী পত্রিকায় এম্বুলেন্স্ কোরের কয়েকটী যুবকের অভদ্র ব্যবহারের কথা পাঠ করিয়া প্রাণে আঘাত পাইয়াছি। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়,হায়! ইহারা পবিত্র সেবা-ধর্ম্মে ব্রতী হইয়াও সেবার মর্য্যাদা বুঝিল না,—সেবাকে কলঙ্কিত করিতেছে! সেবাব্রতে অনুরাগী যুবকদিগকে সেবার প্রণালী ও সেবার মহত্ব বুঝাইয়া প্রকৃত পথে চালাইতে পারেন, এমন নেতা কি কেহ নাই! যুবকদিগকে সেবার পথে আহ্বান করিয়া সেবাতত্ত্ব শিক্ষা না দিলে যে তাহাদের এবং দেশের মহা অনিষ্টই সাধিত হইবে! আমরা রামকৃষ্ণ মিশনের ও অন্যান্য সেবক-সম্প্রদায়ের নেতৃগণের নিকট বিনীত ভাবে নিবেদন করি,—তাঁহারা যাহাদিগকে সেবা কার্য্যে নিয়োজিত করেন, তাহাদিগের অন্তরে শ্রদ্ধা, বিনয় ও ত্যাগের ভাব বদ্ধমূল করিয়া দিবার উপায় অবলম্বন করুন। দীন ও আর্ত্তদিগের সেবা করিয়া তাহারা যে দীন ও আর্ত্তের দেহাশ্রিত ভগবদাত্মারই সেবা করিতেছে, এবং এই সেবা দ্বারা যে নিজেরাই ধন্য ও কৃতার্থ হইতেছে তাহা তাহারা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করুক। এখন হইতে নেতৃগণ সাবধান না হইলে ভবিষ্যতে সামলাইবার পথ পাওয়া যাইবে না। তাচ্ছিল্য ভরে প্রদত্ত দানের অর্দ্ধদ্বারা ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধা দূর হয়, কিন্তু দাতার অধোগতি হয়, একথা যেমন সত্য; উদ্ধত, অহঙ্কারী, নামযশপ্রার্থী সেবকের সেবা দ্বারা আর্ত্তের উপকার হয় বটে কিন্তু সেবকের অধোগতি হয়, দেশের অমঙ্গল হয়—একথাও তেমনি সত্য।

মহাযুদ্ধে রুস

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রুসিয়া, ইতালি, অষ্ট্রীয়া ও জার্ম্মাণী—এই ছয়টী রাজ্য ইউরোপে প্রধান, এজন্য ইহাদিগকে ইউরোপের ষড়শক্তি বলে। এই ষড়শক্তির মধ্যে অষ্ট্রীয়া ও জার্ম্মাণী একদিকে এবং অবশিষ্ট চারি শক্তি মিলিত হইয়া অন্যদিকে যুদ্ধ করিতেছে। ফ্রান্স ও রুসই এই যুদ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। আমরা মহাযুদ্ধে ফ্রান্সের অবস্থা এবং ফ্রান্স কিরূপ বীরত্বের পরিচয় দিতেছে, গত সংখ্যায় তাহা লিখিয়াছি, রুস কি করিতেছে, তাহার বিবরণ এবার বসুমতী হইতে সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

ট্রসেনবার্গের যুদ্ধের পর হইতে এক বৎসরকাল সমান-ভাবে রুসবাহিনী যেরূপ কষ্ট, পরাজয় ও উপদ্রব সহ্য করিয়াছে, বর্ত্তমানকালে অন্ততঃ গত দুই শত বৎসরের মধ্যে ইয়োরোপের কোন জাতিই তেমন অসুবিধা ভোগ করে নাই। ইয়োরোপ তো কোন্ ছার, পৃথিবীর কোনও সভ্য-জাতি এ কষ্ট, এ পরাজয় সহ্য করিয়া সজীব ও সতেজ থাকিতে পারে না। ট্রসেনবার্গের যুদ্ধে রুস হারিলেন, হারিয়া পূর্ব্ব প্রুসিয়া ছাড়িয়া পোলাণ্ড ও কোরল্যাণ্ডের মধ্যে সরিয়া যাইতে হইল। এই পশ্চাদ্ধাবন—এই প্রত্যা-বর্ত্তনে রুসের প্রায় তিন চারি লক্ষ সৈন্য নষ্ট হয়। বহু তোপ বন্দুক গোলাগুলি শত্রু-হস্তগত হয়। এই সময়ে বিশ্বাসঘাতকের প্রভাব রুসে খুব হইয়াছিল। জার্ম্মাণির বেতনভোগী উচ্চপদস্থ রুস কর্ম্মচারিগণ ষড়যন্ত্র করিয়া উত্তর রুসস্থিত বড় বড় তোপখানা ও অন্যান্য কলকারখানা উড়া-ইয়া দেয়। ক্রনষ্টাট, পেট্রোগ্রাড, প্রভৃতি স্থানের বিরাট তোপখানা নষ্ট হইয়া যায়। সহসা তোপ বন্দুক গোলাগুলির সরবরাহ বন্ধ হয়। এই সময় রুস ডেনিসিস্ বা প্রেমসিল দখল করিয়া কার্পেথিয়ান পর্ব্বতমালার ডুকলাগিরিসঙ্কট অধিকার করিবার উদ্যোগী হইয়াছিল। যদি তোপ, গোলাগুলি, বন্দুকের সরবরাহ অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত থাকিত, তাহা হইলে রুস সেনা ডুকলাগিরিসঙ্কট ভেদ করিয়া, অষ্ট্রী-য়ার রাজধানী ভিয়েনা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারিত। অন্ততঃ হাঙ্গেরী প্রদেশটা দখল করিত, কিন্তু এই সময়ই গোলাগুলি সরবরাহ কমিয়া গেল, স্বাধীনতাপ্রিয় হাঙ্গেরিয়ান জাতি স্বদেশ ও স্বজাতির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য উন্মত্ত

হইয়া উঠিল। তাহারা জাপান সেনানায়কগণের অধীনতা স্বীকার করিল। জাপান সেনাপতি ম্যাকেন্‌সন বিরাট বাহিনী লইয়া, প্রায় পাঁচ হাজার বড় বড় তোপ লইয়া, রুস সৈন্যের উপর আসিয়া পড়িলেন। সে বেগ রুস সেনাপতি সহ্য করিতে পারিল না, একে একে প্রেমসিল, লেম্বার্গ প্রভৃতি দুর্গ রুসের হস্ত হইতে চ্যুত হইল। রুস বাহিনীকে গ্যালেসিয়া ছাড়িয়া পূর্ব্বদিকে অনেকটা হটিয়া যাইতে হইল। উত্তরে ও দক্ষিণে এই ভাবে রুস সৈন্যকে কোণঠেসা করিয়া সেনাপতি ম্যাকেন্‌সন ও হিণ্ডেনবার্গ পোলাণ্ড ও কোরল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারসর উপর আসিয়া পড়িলেন। নিরস্ত্র রুসসেনা সে চাপ সহিতে পারিল না। পোল্যাণ্ড ছাড়িয়া রুসসেনাকে মধ্যরুসিয়ার জলা দেশে যাইয়া আশ্রয় লইতে হইল। উত্তরে রিগা পর্য্যন্ত জার্ম্মাণী জল স্থলে আক্রমণ করিলেন। এই সকল কার্য্য সিদ্ধ করিতে ১৯১৬ সালের শীতকাল আসিয়া পড়িল। উভয় পক্ষই ট্রেঞ্চ খুঁড়িয়া মাটীর তলায় আশ্রয় লইলেন। ইত্যবসরে মার্কিণ, ইংরাজ ও ফরাসী ইঞ্জিনিয়ারগণ রুসে যাইয়া বিধ্বস্ত কারখানা সকল নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিলেন। তাহা ছাড়া আর ৪।৫টী বড় বড় তোপখানা তৈয়ার হইল। উত্তরে একটারিণা বন্দর পর্য্যন্ত প্রায় দুই শত মাইল লম্বা ডবল রেলপথ তৈয়ার হইয়া গেল। দক্ষিণে ওডেসা পর্য্যন্তও রেলপথ ও খাল নূতন করিয়া ও বড় করিয়া গড়িয়া তোলা হইল। প্রায় ত্রিশ-কোটী টাকা ব্যয়ে এই সকল কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া তোলা হইয়াছিল। লড়ায়ের পূর্ব্বে শান্তির সময়ে যাহা দুই বৎসরে শেষ হইত না, আট মাসে এই সকল কার্য্য সম্পূর্ণ হইল দেখিয়া, পৃথিবীশুদ্ধ লোক বিস্ময়ে অবাক্ হইল ও ইঞ্জিনীয়ারদের চাতুরী ও যোগ্যতা দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইল।

যতদিন তোপখানা তৈয়ার হয় নাই, তত দিন ইংলণ্ড, মার্কিণ ও জাপান হইতে গোলাগুলি তোপ বন্দুক তৈয়ার করিয়া আনিয়া রুস লড়াই করিতেছিল। মার্কিণ ও জাপানের মাল প্রশান্তসাগরের পশ্চিম তটস্থ ভ্লাডিভষ্টক বন্দরে সংগৃহীত হইয়া বিরাট সাইবিরীয় রেলপথে সাত দিনে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া পৌঁছিত। ইংলণ্ডের মাল জাহাজে করিয়া আর্কটীক মহাসাগর ভেদ করিয়া বরফের বিস্তারকে কাটিতে কাটিতে নিজের পথ করিয়া একটেরিণা বা আর্কে-জেলে পাঠান হইত। এই অসাধ্য সাধন করিয়া, যেন পৃথিবী ছানিয়া তোপ বন্দুক সংগ্রহ করিয়া, রুস একা জার্ম্মাণীর বেগ সহ্য করিতেছিল। এই সময় রুসের অত্যন্ত লোকক্ষয় ঘটে। এ সকলই অনুষ্ঠানের কথা, তবে ইহা ঠিক যে রুসকে ১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্য্যন্ত অনেক কষ্ট, অনেক উপদ্রব সহিতে হইয়াছে। যে বাহিনী লইয়া রুস মহারণ-প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহার বার আনা এই যুদ্ধেই নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু রুস দমিবার পাত্র নহেন, নূতন করিয়া প্রায় ৬০ লক্ষ সৈন্য গড়িয়া তুলিলেন। তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদসকল সবই ইংলণ্ড মার্কিণ ও জাপান হইতে তৈয়ার হইয়া আসিল, রুসের সকল কারখানাতেই তোপ গোলাগুলি বন্দুক তৈয়ার হইতে লাগিল। একনিষ্ঠ সাধকের মত রুসের অসংখ্য প্রজা যুদ্ধে জয়ী হইবার জন্য দৃঢ় পণ করিয়া নিশিদিন পরিশ্রম করিতে লাগিল। রুস পুরাতন সেনাপতিগণকে বদ্‌লাইয়া প্রবীণ কুরোপাটকিনকে ইয়োরোপের দিকে সকল যুদ্ধের ভার দিলেন। গ্রাণ্ডডিউক নিকোলাসকে তুর্কীর দম্ভ-দর্প চূর্ণ করিবার জন্য ককেসাসে পাঠাইয়া দিলেন।

এমন আয়োজন, এমন একনিষ্ঠ সাধনা, পৃথিবীর আর কোন জাতি দেখাইতে পারে নাই। আজ যেন রুস নবজীবনে সঞ্জীবিত। পোলাণ্ড হারাইয়াছেন, কোরল্যাণ্ডের অর্দ্ধাংশ শত্রুকরতলগত, গ্যালিসিয়ার সূচাগ্র ভূমিও রুসের নাই, কিন্তু এ লজ্জায় রুস মুহ্যমান নহে। প্রত্যেক রুসীয় যুবকের মুখে এই এক বুলী, "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন" হয় এ যুদ্ধে জয়ী হইব, নয় মরিব। কোথায় কালামুখ কসাক্, তাতার, সাইবীরীয়, কোথায় কুর্দ্দ আর্ম্মেণীয়, দক্ষিণ রুসের নানা জাতি—এই সকল জাতির—সকল ধর্ম্মের সমন্বয়—বৌদ্ধ মুসলমান খৃষ্টানের সমবায়ে আজ ৬০ লক্ষ রুসবাহিনী নূতন তৈয়ার হইয়াছে। এই ৬০ লক্ষ বীর মরণ পণ করিয়া যুদ্ধে ব্রতী হইয়াছে। এ দৃঢ় সংকল্পের ফল আছেই, ইহার ফলে রুস জয়ী হইবেই। রুস জাতির মধ্যে আর সে বিলাস নাই, ধনী নির্ধনের মধ্যে বিদ্বেষের ভাব নাই, উচ্চ-নীচের মধ্যে বৈষম্য নাই, পণ্ডিত মূর্খের বিচার নাই; রুসের আবালবৃদ্ধবনিতা আজ এক ধর্ম্মে দীক্ষিত, এক কর্ম্মে ব্রতী। সত্যই রুস কামিনী রণচণ্ডী বেশে যুদ্ধ করিতেছে। প্রায়

এক লক্ষ রুস রমণী আজ সৈনিকপদে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারা টেঁকে থাকিয়া যথারীতি পুরুষের মত যুদ্ধ করিতেছে। এমন ভাবে নরনারীর সম্মিলন ঘটিলে একধর্ম্মে নরনারী প্রমত্ত হইয়া উঠিলে, এককর্ম্মে নরনারী দৃঢ়ব্রত হইলে, তাহার ফল অনিবার্য্য। সেই অনিবার্য্য ফল দেখিবার জন্য আজ সমগ্র জগত বিস্ময়ে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া আছে। এই আগষ্টের মধ্যেই রুস একটা চাল চলিবেই।

রুসের চাল যে কি হইবে তাহা এখনও কেহ ভাবিয়া স্থির করিতে পারে নাই। কেহ বলিতেছেন যে আর্ডেকন ও নোবিজন্স দখল করিয়া, রুস বাগদাদ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবেন এবং এসিয়া মাইনরে জার্ম্মাণ প্রভাব একেবারে চূর্ণ করিয়া দিবেন। তাহা হইলে কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলের পথে জার্ম্মাণি অস্ত্র সরবরাহ করিতে পারিবে না। অন্য আর একদল বলিতেছে, রুস নিশ্চয়ই আবার গ্যালিসিয়া আক্রমণ করিবে, এবং পাছে রুমানিয়া জার্ম্মাণির হস্তগত হয়, সে জন্য দানিয়ুব নদীর অপর পার পর্য্যন্ত দখল করিয়া বসিবে। অপর একদল বলিতেছেন, যে তাহা নহে, রুস পেট্রোগ্রাড রক্ষা করিবার জন্য—রিগার পথে জার্ম্মাণিকে আক্রমণ করিবে। রীগার ক্ষেত্রেই জার্ম্মাণী ও রুসে একটা হেস্তনেস্ত এইবারেই হইবে। এই সকল আনুমানিক কথার উপর লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে রুসের বাহাদুরী দেখিয়া জগত চমকিত হইয়াছে, একটা কিছু উৎকট কীর্ত্তি যে রুস করিবে এ প্রত্যাশা অভিজ্ঞমাত্রেই করিতেছেন। এ যুদ্ধে এখন পর্য্যন্ত বড় জাতিদের মধ্যে রুস ও ফরাসী জাতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। কিন্তু এত ক্ষতিসত্ত্বেও উভয় জাতি অদম্য উৎসাহে লড়াই করিতেছে। এইটুকুই ইহাদের বিশিষ্টতা, এইটুকুর জন্যই আজ জগতের প্রশংসা ইহারা লাভ করিতেছেন।

লেডি-হার্ডিঞ্জ মেডিকেল কলেজ

দীল্লিতে মেয়েদের জন্য যে লেডি-হার্ডিঞ্জ মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার কর্ত্তৃপক্ষ নিয়ম করিয়াছেন, এই কলেজ হইতে এম, বি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে আই, এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরে মেয়েদিগকে কলেজে ভর্ত্তি হইতে হইবে। আই, এস-সি পরীক্ষায় আজ পর্য্যন্ত কোন বালিকা উত্তীর্ণ হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। কারণ এই পরীক্ষার পাঠ্য বিজ্ঞান-শাস্ত্র অধ্যয়নের কোন ব্যবস্থা কোন মেয়ে-কলেজে নাই। তারপর যাহারা আই, এ, পরীক্ষা পাশ করিয়াছে তাহাদিগকে মেডিকেল কলেজের এম, বি, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হইলে দুই বৎসর ঐ মেডিকেল কলেজে বিজ্ঞান শিখিয়া লইতে হইবে। দেশে স্ত্রীশিক্ষার যে অবস্থা তাহাতে এই কলেজে কয়টী মেয়ে পড়িবার জন্য আসিবে, আমরা জানি না। এত অর্থব্যয় করিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল, এখন যদি যথেষ্টসংখ্যক বালিকা এই কলেজে ভর্ত্তি না হয় তবে যে সমস্তই পণ্ড হইবে! আমরা আশা করি, স্বর্গীয়া লেডি-হার্ডিঞ্জের উদ্দেশ্য যাহাতে সিদ্ধ হয়, এ দেশে সুশিক্ষিত স্ত্রী-চিকিৎসকের সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি পায় কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ সেই ব্যবস্থা করিবেন।

যুদ্ধের পরে

যুদ্ধের অবসান যে কবে হইবে কিছুই বুঝিতে পারা যাইতেছে না। মিলিত পক্ষ কোন বিশিষ্ট যুদ্ধে জয়লাভ না করিলে জার্ম্মাণী নরম হইবে না, সন্ধিও হইবে না; নরহত্যা যে ভাবে চলিতেছে সেই ভাবেই বোধ হয় চলিতে থাকিবে। কিন্তু যুদ্ধের পর শিল্প বাণিজ্য ও পৃথিবীর সভ্যতার অবস্থা কিরূপ হইবে এখনই সে সম্বন্ধে নানা-কল্পনা চলিতেছে। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বণিকগণ বলিতেছেন, এত দিন জার্ম্মাণী পৃথিবীর বাণিজ্য প্রায় এক চেটিয়া করিয়াছিল, যুদ্ধের পর জার্ম্মাণীর এই বাণিজ্য-প্রাধান্য কাড়িয়া লইতে হইবে। অথচ সংবাদপত্রে দেখিতেছি, জার্ম্মাণী এখন বিবিধ শিল্প দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া পুঞ্জীকৃত করিতেছে এবং যুদ্ধের পর অতি সুলভ মূল্যে তাহা পৃথিবীময় ছড়াইয়া দিবে। অথচ এদিকে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের কলকারখানা যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত করিতেই দিবানিশি ব্যতিব্যস্ত, শিল্প দ্রব্য খুব কমই প্রস্তুত করিতে পারিতেছে। যুদ্ধের সুযোগে জাপান ভারতের বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়া ফেলিয়াছে বলিলেও চলে। সুতরাং, যুদ্ধের পর পৃথিবীর ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা কিরূপ হইবে, এখন বলা কঠিন। কিন্তু মানব চরিত্রে ও সমাজে যুদ্ধের পর যে উন্নতি হইবে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এখনই সে সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন। ইংলণ্ডের একজন সুপণ্ডিত ধর্ম্মযাজক বলিয়াছেন :—

পৃথিবীর ইতিবৃত্তে অচিরে নব পর্য্যায় আরম্ভ হইবে : আমরা সেই নূতন ও পুরাতনের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আছি। পৃথিবী এখন যেমন আছে তেমন কখনই থাকিবে না। যাহা সুদৃঢ় নহে প্রলয়ের ঝড়ে তাহা উড়িয়া যাইবে, যাহা সুদৃঢ় তাহা পূর্ব্ববৎ রহিয়া যাইবে। পুরাতন যখন হঠাৎ সরিয়া পড়িবে এবং নূতনের যখন আবির্ভাব হইবে তখন অতি ভীষণ পরিবর্ত্তন ঘটিবে। যদিও এখনও জয়ডঙ্কা বাজিয়া উঠে নাই, তথাপি পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে, যাঁহারা জ্ঞান-দৃষ্টিদ্বারা সময়ের চিহ্ন পাঠ করিতে জানেন, পরিবর্ত্তন তাঁহাদের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইয়াছে।

সকল বিষয়েই পরিবর্ত্তন হইবে। সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপে বাস করি বলিয়া আমরা নিরাপদ, এই বোধ থাকিবে না; কর্ম্মক্ষেত্রে নারী এতদিন যে আসনে ছিলেন এখন আর তাঁহাকে এত ক্ষুদ্র আসনে রাখা যাইবে না।

যাহারা অত্যুচ্চ ও অতি মহৎ আদর্শের প্রেরণায় সাম্রাজ্যের আহ্বানে এক্ষণে যুদ্ধক্ষেত্রের পরিখা মধ্যে বাস করিতেছেন সেই আসন্ন পরিবর্ত্তনের যুগে উক্ত ৩০ লক্ষ বীর স্বগৃহে ফিরিয়া সভ্যজনোচিত জীবন যাপন করিবেন।

শান্তি-কপোত যখন তাহার ধবল পক্ষ পৃথিবীর উপর প্রসারিত করিবে, তখন ধর্ম্মমন্দির নরনারীর উপর আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে ঐক্যদান করিবে।

ইংলণ্ডের অবিবাহিতা নারী

সঞ্জীবনী বলেন :—ভীষণ যুদ্ধে লোকক্ষয় হইতেছে বলিয়া একদল সমালোচক বলিতেছেন যে ইংলণ্ডের বিবাহযোগ্যা বহুসংখ্যক নারী অবিবাহিতা রহিয়াছেন। "টাইমস অব ইণ্ডিয়া" পত্রিকা এই প্রশ্নের আলোচনা করিয়া নিম্নলিখিত তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন।

১৯১৪ সালে ইংলণ্ডের জনসংখ্যা হাজার করা ২৩৮ বৃদ্ধি হইয়াছিল। উক্ত বৎসর বালিকা অপেক্ষা বালক ১৬ হাজার অধিক জন্মিলেও সমগ্র জনসংখ্যায় স্ত্রী-সংখ্যাই অতিরিক্ত ছিল। ইংলণ্ডে পুরুষ হইতে স্ত্রীর সংখ্যা যে অধিক ইহা সত্য। সুতরাং সমালোচকেরা যখন বলেন যে, পুরুষের অভাবে স্ত্রীলোকদিগের বিবাহ হইতেছে না, আপাতদৃষ্টিতে তাহা সত্য বলিয়া মনে হইতে পারে। আদমসুমারীতে দেখা যায়, পুরুষ হইতে স্ত্রী সংখ্যায় ১১ লক্ষ ৭৯ হাজার অধিক।

কিন্তু এই অতিরিক্ত স্ত্রীলোকদের মধ্যে ৬ লক্ষ ১০ হাজারের বয়স ৪০-এর অধিক। ইংলণ্ডে বিপত্নীক হইতে বিধবার সংখ্যা ৭ লক্ষ ৪৯ হাজার বেশী। সাধারণতঃ নারীরা দীর্ঘজীবী বলিয়া এই অসামঞ্জস্য ঘটিয়াছে। কিন্তু এই অসামঞ্জস্য সত্ত্বেও ইহা দেখা যাইতেছে যে এখনো ইংলণ্ডে বিবাহ-যোগ্যা পুরুষের সংখ্যাই অতিরিক্ত। ২০ হইতে ৩৫ বৎসর বয়সই ইংলণ্ডে বিবাহ-যোগ্য বয়স বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে। উক্ত বয়সের পুরুষসংখ্যা নারীর সংখ্যা হইতে অধিক বলিয়া সমালোচকদিগের উক্তি সত্য বলিয়া মনে হয় না।

মাতৃত্ব লাভের উপযুক্ত বয়সের বহুসংখ্যক বিবাহযোগ্যা নারী অবিবাহিত রহিয়াছে ইহা সত্য, কিন্তু ইহার কারণ পুরুষের অভাব নহে, কারণ স্বতন্ত্র।

"নারীর জীবিকা" নামক গ্রন্থের প্রণেতা এবং সুপ্রসিদ্ধা শ্রীমতী কলকুল বলেন, এখনকার বালিকারা যতখানি আরামে জীবনযাপন করিতে চাহেন পুরুষদিগের অর্থদ্বারা তাহার সংকুলন হয় না বলিয়া পুরুষেরা বিবাহ করিতে ভরসা পায় না। দ্বিতীয়তঃ নারীরা অনেকেই গৃহস্থালী কাজকর্ম্মের বাধ্যবাধকতার মধ্যে যাইতে চাহেন না। বিবাহযোগ্যা নারীর সংখ্যা বৃদ্ধির ইহাই প্রকৃত কারণ।

বঙ্গদেশের শিক্ষিতা মহিলাদিগের মধ্যেও এইরূপ আরাম-প্রিয়তা কোন কোন স্থলে দেখা যাইতেছে বলিয়া কেহ কেহ অভিযোগ করিতেছেন। যদি ইহা সত্য হয় তবে নিতান্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। যাহারা অবিবাহিতা থাকিয়া পরসেবার জন্য ত্যাগের সাক্ষাৎ মূর্ত্তিরূপে সমাজের বক্ষে বিচরণ করেন, তাঁহাদের দ্বারা দেশ ও সমাজ উন্নত হয়। কিন্তু যাহারা আরাম ও বিলাসিতার জন্য অথবা অহঙ্কার বশতঃ স্ত্রী ও মাতার গৌরবাস্পদ কর্ত্তব্য স্কন্ধে লইতে ভীত হয় তাহারা স্বার্থপরতার জীবন্ত মূর্ত্তি। পাশ্চাত্য দেশের এই পাপ এদেশে যেন না আসে ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করি।

সর্পাঘাতের চিকিৎসা

সাপের কামড়ে বৎসর বৎসর এদেশে হাজার হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, কিন্তু সর্পাঘাতের কোন চিকিৎসা আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। সিংহলের

একখানি সংবাদ পত্রে সংপ্রতি প্রকাশিত হইয়াছে,—যে সর্প-দষ্ট ব্যক্তিকে কলাগাছের রস পান করাইলে রোগী আরোগ্য লাভ করে। কলম্বো সহরে নাকি বহু চিকিৎসা-ব্যবসায়ীর সম্মুখে একটী কুকুরকে একটা গোখরা সর্পদ্বারা পুনঃ পুনঃ দংশন করান হয়। কুকুর যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে করিতে অল্পক্ষণ মধ্যেই বিষে অবসন্ন হইয়া পড়ে। তখন কলাগাছ কাটিয়া তাহা হইতে রস নির্গত করিয়া সেই তাজা রস এক পেয়ালা পরিমাণে কুকুরটীকে পান করান হয়। কুকুরটী অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই বল লাভ করিয়া হাটিয়া বেড়াইতে সক্ষম হয়। আমাদের পাঠক-পাঠিকাগণ নিকটে কোন সর্পাঘাতের সংবাদ পাইলে এই সহজলভ্য ঔষধটী প্রয়োগ করিয়া দেখিতে পারেন।

ভারতীয় আর্য্যগণের আদিম নিবাস

কাশ্মীর রাজ্যের প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধান বিভাগের ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর্য্যগণের ভারতাগমনের পূর্ব্ববর্ত্তী বাসস্থান সম্বন্ধে যে সমুদয় গবেষণা এবং নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটী নামক প্রত্নতত্ত্বালোচনী সভার ৭ই এপ্রিল তারিখের বিশেষ অধিবেশনে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন :—ভারতবর্ষের অধিবাসিগণের পূর্ব্বপুরুষকে আর্য্যজাতি বলে। তাঁহারা অস্তদেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। এই আর্য্যজাতি হইতে বেবিলোনিয়ান, ইজিপ্সিয়ান্, এসিয়ান্ এবং হিব্রুগণের উৎপত্তি হইয়াছে। পোণ্টাস্ এবং আর্ম্মেনিয়াতে আর্য্যগণ বাস করিতেন। চীনাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এবং উল্লিখিত জাতিগণের পূর্ব্বপুরুষেরা দুই পরস্পর-সংসৃষ্ট প্রদেশে পাশা-পাশি বাস করিতেন।

পোণ্টাস্, আর্ম্মেনিয়া ও এসিয়ামাইনরের বিভিন্ন স্থান হইতে আর্য্যেরা ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। বেদ এবং অপরাপর ঐতিহাসিক ও প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে যে-সমুদয় স্থানের নাম পাওয়া যায়, তাহা ঐ সকল দেশের কোন কোন স্থানের সহিত ঠিক ঠিক মিলিয়া গিয়াছে। আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং অন্যান্য ঔপনিবেশিকগণ অনেকস্থলেই আদিম বাসভূমির নানাস্থানের নামের দ্বারাই তাঁহাদের নূতন দেশের নানাস্থানের নামকরণ করিয়া থাকেন। সেইরূপ আর্য্যগণও যখন ভারতবর্ষে আসিলেন, তখন তাঁহাদের পরিত্যক্ত মাতৃভূমির স্থান-সমূহের নামের দ্বারাই ভারতের নানাস্থানের নামকরণ করিলেন। ঠিক এই কারণেই বেদ এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে যে-সমুদয় স্থানের নাম এবং তাহাদের বর্ণনা পাওয়া যায়, অবিকল সেইরূপ দেশ ভারতবর্ষের কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

বেদ রচিত হইবার সুদীর্ঘ কাল পরে, কেবল তাহাই নহে ;—মহাভারতের যুদ্ধ এবং রামায়ণের ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের বহুকাল পরে আর্য্যগণ ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস, হস্তিনা বর্ত্তমান মীরাটের সন্নিহিত কোনো স্থানে ছিল, এবং প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থের বর্ত্তমান নাম দিল্লী। ভারতবর্ষের লোকের বিশ্বাস, অযোধ্যা হস্তিনা ইন্দ্রপ্রস্থ প্রভৃতি স্থান-সমূহেই মহাভারত, রামায়ণাদি বর্ণিত কাহিনী-সকল ঘটিয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে হিন্দুগণ যাভা ও বালিদ্বীপে হিন্দু-উপনিবেশ স্থাপন করিবার কালেও পুরাতন নামের দ্বারাই নূতন দেশের স্থানসমূহের নাম রাখিয়াছিলেন এবং তদ্দেশবাসিগণের দৃঢ় বিশ্বাস যে, মহাভারত ও রামায়ণের ইতিহাস-লীলা তাহাদের দেশেই অভিনীত হইয়াছিল। ভারতবাসীদের ন্যায় তাহারাও এবিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

যুদ্ধের অর্দ্ধাব্দের অল্প দিন পূর্ব্বে ভারতে আর্য্যসমাগম হইয়াছিল এবং এই সময়ের পূর্ব্বে ভারতে আর্য্যগণের অবস্থিতির কি পুরাতত্ত্ব, কি শিলালিপিসংক্রান্ত কোনরূপ প্রমাণই পাওয়া যায় না। বৌদ্ধযুগে ভারতবাসিগণ পশ্চিম এসিয়ার অধিবাসীদিগের নামের মতন নাম গ্রহণ করিতেন। আড়ারকালাম নামে একজন ঋষি ছিলেন। অথচ ঠিক এই নামেরই একজন প্রাচীন বেবিলোনিয়ান রাজার বিবরণ পাওয়া গিয়াছে।

জগদীশবাবু বলেন, বেঘোজ কুই (Beghoz kui) নামক স্থানে অনেক বৈদিক দেবতার নামাঙ্কোদিত শিলাখণ্ড পাওয়া গিয়াছে। ঐ সকল শিলাখণ্ডে ক্রিভি বা পাকাশগণের উল্লেখ আছে এবং ওরান্তেস (Orantes) নদীতীরে যে প্রদেশ এখনও হস্তিনা নামে পরিচিত তাহাই মহাভারতোক্ত হস্তিনা।

ফিনিসিয়ানেরা এবং ক্রিভি ও পকাশগণ একবংশ-সম্ভূত।

কাশীগণ এবং কেসাইটীগণ এক জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কেসানেরা কাশীদের ঘনিষ্ট আত্মীয়; কোশীয়গণ আবার কলাইটুদের আত্মীয়; এদিকে আবার কোশীয়গণের সহিত কাশীদের আত্মীয়তা আছে।

আফ্‌গান ও কাশ্মীরীদের সহিত হিব্রুদের আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে; এবং তাহারা যে একই বংশজাত সে-বিষয়েও সন্দেহ নাই। এই আফগান ও কাশ্মীরীগণ কৃষ্ণসাগর ও কর্ম প্রদেশ হইতে আসিয়াছে।

বাঙালীদের কতক কৃষ্ণসাগর এবং কর্ম প্রদেশ হইতে আসিয়াছে; আর কতক সমুদ্র পার হইয়া আসিয়াছে এবং খুব সম্ভবতঃ তাহারা ফিনিশিয়ানদের ভ্রাতৃভাই।

যে সমুদয় জাতি ককেসিয়ার, পারশ্যের উত্তর-পশ্চিমে এবং এসিয়াটিক তুরস্কে বাস করিত, ভারতবর্ষের গুর্জর ও আভীরগণ তাহাদের বংশজাত।

ভারতের দ্রাবিড়গণ কোলচিস এবং তন্নিকটবর্তী দেশ-সমূহ হইতে এ দেশে আসিয়াছে।

বেদে যে দাসদের কথা লিখিত আছে, তাহারা আর্য্যদের ন্যায় অন্তদেশের লোক এবং তাহাদের বাসস্থান ককেসিয়ায় ও এসিয়ামাইনরে ছিল। ইহাদের মধ্যে অনাস নামে এক সম্প্রদায়ের কথা পাওয়া যায়; এতাবৎকাল নাসিকাহীন লোক বলিয়াই তাঁহাদিগকে ঠিক করা হইয়াছিল। কিন্তু খুব সম্ভব, বেবিলোনিয়াতে যে অনাসদের কথা আছে, ইহারা তাহাদের হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন এবং ইহাদের এইরূপ নামকরণ হইবার কারণ এই যে, আর্য্যেনীয়ার উত্তরে অনাস নামক স্থানে উহাদের কোন উপনিবেশ ছিল।

সুমেরিয়ান্ ভাষা যে উপাদানে গঠিত, বেদের ভাষা এবং আর্য্যভাষাসমূহও সেই সমুদয় উপাদানেই গঠিত হইয়াছে।

বেদবর্ণিত ভৌগোলিক বৃত্তান্তের একটী উদাহরণ এই যে, রাজা সুদাসকে পৈজবনী বলা হইয়াছে। তিনি "পিজবনে" (Pizvon) রাজত্ব করিতেন। এই পিজবন ইউফ্রেটিস নদীতীরে অবস্থিত।

তুর্বস, শিনু, কবশ, পুরু, সঞ্জয়, অজ ও যক্ষ প্রভৃতি জাতিরা এই পিজবনের উত্তরে বাস করিতেন।

মথুরা, ইরাবতী, অযোধ্যা, লঙ্কা, হস্তিনা, কাশী এই সকলও ঐ দেশেই ছিল।

সোমসুম, হরিকথি, চমুর, বিপাস-অভিকিয়, ক্রুম, কুভ প্রভৃতি বেদে উল্লিখিত স্থান কৃষ্ণ-সমুদ্রের তীরবর্তী প্রদেশে পাওয়া যাইতেছে। ভারতে এই সকল নামের কোন স্থান নাই।

জগদীশ বাবু বলেন, রামের মিত্র গুহক চণ্ডাল চেদ্দিরা (Chaldea) বংশসম্ভূত।

জগদীশবাবু তাঁহার মত প্রমাণিত করিতে পারিলে প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে মহা পরিবর্ত্তন ঘটিবে।

সন্ন্যাসিনী

সেণ্ট্ টেরেসা তপস্বিনী। তিনি ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। একটি ইংরাজমহিলা তাঁহার সুবৃহৎ জীবনচরিত রচনা করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের মধ্যে একটি সন্ন্যাসিনীর অপূর্ব্বকাহিনী বর্ণিত আছে। উহা অতীব চিত্তাকর্ষক। পড়িলে সকলেরই উপকার হইবার সম্ভাবনা। সেজন্য সেই বিদেশিনীর জীবনের বিচিত্র ঘটনা লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

সন্ন্যাসিনীর নাম ক্যাটালিনা-ডি কার্ডোনা। তিনি ইটালীর অন্তর্গত এরাগণ প্রদেশের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার প্রচুর ধনসম্পদ ছিল। তাই তিনি কন্যার সুশিক্ষার জন্য কয়েকজন শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শিক্ষকেরা বালিকার শিক্ষার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যর্থচেষ্টা! বালিকা একটুকু লেখাপড়া শিখিতে পারিলেন না। তাহার পরে বালিকার বয়স একটু বেশি হইল। তখন তিনি অন্তরে ঈশ্বরের আবির্ভাব অনুভব করিলেন। সূর্য্যালোকে যেমন পদ্মটি দলে দলে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, তেমনি ঈশ্বরের নির্ম্মল আলোকে তাঁহার চিত্তশতদল বিকশিত হইয়া উঠিল। তিনি স্পষ্টই অনুভব করিলেন, ঈশ্বরের আবির্ভাবেই তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে একটি শক্তির উৎস খুলিয়া গেল। বালিকা তখন অতি সহজেই উৎকৃষ্টরূপে লেখাপড়া শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনায় বালিকার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। তাঁহার সুকুমার হৃদয় ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় ঈশ্বরের চরণতলে

নত হইয়া পড়িল। তিনি বলিলেন—"হে আমার প্রভু, তুমি আমাকে অত্যন্ত ভালবাস। আমার প্রতি তোমার আশ্চর্য্য দয়া। তোমার করুণায় এই অন্তরে অনুপম জ্যোতি বিকশিত হইয়া উঠিল। হে প্রভু, এখন কি আমি তোমাকে ভাল না বাসিয়া আর কিছুতে তৃপ্তিলাভ করিতে পারি, আমি সংকল্প করিতেছি, তোমাকেই ভালবাসিব, তোমাকেই হৃদয় অর্পণ করিব;—আমি চিরকুমারী থাকিব। আমার হৃদয়ের সমস্ত শক্তি তোমার সেবাতেই অর্পিত হইবে।"

বালিকা বড় মানুষের ঘরের বড় আদরের মেয়ে। তাঁহার মনের সংকল্প যতই পবিত্র, যতই উন্নত হউক না কেন, সংসারাসক্ত আত্মীয় স্বজন উহাকে বালিকাসুলভ খেয়াল ভিন্ন আর কি মনে করিতে পারেন? তাঁহাদের ইচ্ছা, বালিকার খুব মস্তবড় ধনীর গৃহে বিবাহ হইবে, তিনি ধনৈশ্বর্য্যের মধ্যে বাস করিবেন; দিবারাত্রি হৃদয়ের পেয়ালা ভরিয়া সুখ পান করিয়া সংসারের নেশায় মাতিয়া উঠিবেন। ঈশ্বরের প্রেমে যে গভীর আনন্দ, তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণে যে অপূর্ব্ব তৃপ্তি, তাঁহার সেবায় যে অনির্ব্বচনীয় সুখ;—আত্মীয়স্বজনেরা তাহার কল্পনাও করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বালিকার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাঁহার বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ইচ্ছার উপরেও যে আর একজনের ইচ্ছা আছে, তিনিই যে সকলের চেয়ে বড় অভিভাবক, সে কথা কাহারই বা মস্তিষ্কে প্রবেশ করিবে? কেই বা বালিকার সংকল্পের কথা ভাবিয়া দেখিবে? কেহই তাহা ভাবিয়া দেখিল না, বালিকার মর্ম্মস্থানে যে বিষাদ, তাহাও কাহারো চোখে পড়িল না। অভিভাবকেরা নেপলসের এক বড় ঘরের ছেলের সঙ্গেই বালিকার বিবাহ ঠিক্ করিলেন। বিবাহের আয়োজন-উদ্যোগ সবই হইতে লাগিল। আর একদিন পরেই বিবাহ। বাড়ীর লোকের মনে আনন্দ আর ধরে না; কিন্তু যাঁহার বিবাহ, তাঁহার মুখে হাসি নাই, মনে সুখ নাই; চোখে শুধুই অশ্রু, মনে কেবলই বিষাদ! বালিকা আপনার মর্ম্মবেদনা আর কাহাকে জানাইবেন? তিনি শুধুই ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে, যাহা হইবার নয়, তাহাই হইল, যাহা স্বপ্নের অতীত তাহাই সত্য হইয়া দাঁড়াইল। যে পাত্রের সঙ্গে বালিকার বিবাহ ঠিক্ হইয়াছিল, তিনি কালের আহ্বানে ইহাৎ পরলোকে প্রস্থান করিলেন।

এই আকস্মিক ঘটনায় বালিকার আত্মীয় স্বজন বিষাদে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন কিন্তু বালিকা ঐশীশক্তির আশ্চর্য্য ক্রিয়া দর্শন করিলেন। বিশ্বাসে ও ভক্তিতে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহার অন্তর্যামী দেবতা অন্তরের ব্যথা জানিতে পারিয়াই যে তাঁহাকে ধর্ম্মপথে রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্কল্প ভঙ্গ হইতে দেন নাই;—সে বিষয়ে বালিকার আর কোনই সংশয় রহিল না। এখন তিনি তাঁহার আত্মার সমস্ত শক্তির দ্বারা পূর্ব্বের সেই কুমারীব্রতকে ধারণ করিলেন। আর কেহই তাঁহাকে সঙ্কল্প হইতে টলাইতে পারিল না।

তাহার পরে ইটালীর রাজপরিবারের একটি যুবক বিদ্রোহের অপরাধে অপরাধী হইয়া নির্ব্বাসিত হইলেন। ঐ যুবকের পত্নী প্রিন্সেস্ সেলেরনোর প্রতিও কঠোর দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হইল। রাজার আদেশে তাঁহাকে স্পেন দেশের একটি সহরে গমন করিয়া অন্তরীণ অবস্থায় দিন যাপন করিতে হইবে। তিনি যখন স্পেনদেশে যাত্রা করিলেন, তখন কুমারীব্রতধারিণী কার্ডোনো তাঁহার সঙ্গিনী হইলেন। তাঁহারা ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনদেশের একটি সহরে পৌঁছিয়া, সেখানেই বাস করিতে লাগিলেন।

কয়েক বৎসর পরেই রাজপরিবারের নির্ব্বাসিতা রমণীর মৃত্যু হইল। তখন ব্রতধারিণী কার্ডোনা স্পেনের রাজপরিবারের একটি সম্ভ্রান্ত লোকের গৃহে আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন। এই সম্ভ্রান্ত লোকটি রাজার অতিশয় প্রিয়পাত্র। তাঁহার গৃহে কার্ডোনার সঙ্গে রাজকুমারদিগের আলাপ পরিচয় হইয়া গেল। রাজকুমারেরা তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতে লাগিলেন। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও ধনৈশ্বর্য্য তাঁহার হৃদয়ের উপর মায়াবিস্তার করিতে পারিল না। পাছে বা কোন প্রলোভন তাঁহার চিত্তকে অধিকার করিয়া বসে, ধনরত্ন দেখিতে দেখিতে উহার প্রতি একটুকু আসক্তি জন্মে, সেই ভয়েই তিনি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলেন। তৎসঙ্গে তাঁহার ধ্যান ধারণাও আরম্ভ হইল। ধর্ম্মশীলা নারী কৃচ্ছ্রসাধনের জন্য সপ্তাহের মধ্যে চারি দিন উপবাস করিতেন। আর কয়েক দিন শুধুই ফল মূল সিদ্ধ করিয়া

খাইতেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে অতি সামান্য দামের মোটা বস্ত্র দেখা যাইত। তিনি শুভ্র কোমল শয্যা ত্যাগ করিয়া অতিশয় শক্ত বিছানায় শয়ন করিতেন।

সাধিকা নারীর মনের তেজ, সঙ্কল্পের বল, বৈরাগ্যের কঠোরতা ও অন্তরের পবিত্রতা এবং তাঁহার জীবন্ত ধর্ম্মভাব দর্শন করিয়া, স্পেনের দুই রাজকুমার তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি করিতে লাগিলেন। দুই রাজকুমারের মধ্যে এক রাজপুত্র ব্রতধারিণীর উন্নত জীবন দর্শন করিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। এমন কি, তিনি তাঁহাকে মাতৃসম্বোধন করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার এই ভক্তির মধ্যে কোনরূপ স্বার্থ বা কৃত্রিম ভাব কেহই লক্ষ্য করিতে পারে নাই। অনেক দিন পরে রাজকুমার এই ধর্ম্মপরায়ণা নারীর অনুরোধেই ঘোর শত্রুর উপরও অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করিলেন।

কিন্তু রাজকুমারের ভক্তি, রাজপরিবারের লোকদিগের যত্ন আদর—কিছুতেই রমণীর মন বাঁধা পড়িল না। ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তির মনোরম অট্টালিকা আর তাঁহার ভাল লাগিল না। চতুর্দ্দিকের ভোগবিলাস, অসার আমোদ প্রমোদ, কপটতা, মিথ্যাচরণ ও অধর্ম্ম তাঁহার হৃদয়কে ব্যথিত করিয়া তুলিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, রত্নপূর্ণ অট্টালিকার মধ্যে পাপ প্রলোভন ও হিংসাবিদ্বেষই অনেক বেশি। এখানে ঈশ্বর কোথায়? ধর্ম্ম কোথায়? আত্মার তৃপ্তি কোথায়? এই সময় তাঁহার অন্তরস্থিত দেবতা তাঁহাকে প্রলোভনপূর্ণ প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া, গিরিগুহায় লুক্কায়িত হইতে আদেশ প্রদান করিলেন।

(২)

ধর্ম্মশীলা কার্ডোনা প্রিন্স অব এবলীর পরিবারের লোকদিগের সহিত একটি নূতন সহরে গমন করিলেন। সেখানে একজন ঈশ্বরভক্ত ধর্ম্মযাজকের সঙ্গে তাঁহার আলাপ হইল। কার্ডোনা একদিন সেই যাজকের নিকট আপনার হৃদয়ের বাসনা ব্যক্ত করিলেন এবং কহিলেন :—

"সংসারের কোন বস্তুতেই আমার আত্মা তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। আমার চিত্ত স্বর্গের প্রভুর জন্যই উন্মনা হইয়া উঠিয়াছে। প্রভু যেন মধুরস্বরে আমাকে আহ্বান করিতেছেন। আমি একটি নির্জ্জনস্থানে আত্মগোপন করিয়া ঈশ্বরের ধ্যানে ডুবিয়া যাইতে চাই।"

ধর্ম্মযাজক ভাবিতে লাগিলেন, ঈশ্বরের জন্য এই নারীর কি আশ্চর্য্য ব্যাকুলতা! যিশু বলিয়াছেন, যাহারা ধর্ম্মের জন্য তৃষিত, তাহারাই ধন্য; কারণ তাহারাই ঈশ্বরকে দর্শন করিবে। অতএব, এই রমণী যে ঈশ্বরকে লাভ করিবেন, সে বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ নাই। ধর্ম্মযাজক কার্ডোনাকে বেশি কিছু বলিলেন না, তিনি তাঁহার হস্তে একটি সন্ন্যাসিনীর পরিচ্ছদ অর্পণ করিলেন।

একদিন যখন ভাল করিয়া রাত্রি প্রভাত হয় নাই, সবেমাত্র আকাশে প্রভাতের পূর্ব্বাভাস দেখা যাইতেছে, দুই একটি পাখীর সুমিষ্ট সঙ্গীত প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে, আর উদ্যানের এক জাতীয় পুষ্পের সুগন্ধ বায়ুহিল্লোলে ছড়াইয়া পড়িতেছে; সেই সময় কার্ডোনা প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া রাজপথে বাহির হইয়া পড়িলেন। কয়েক জন ধর্ম্মযাজক একটি নির্জ্জন স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহারই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। রমণী তাঁহাদের সঙ্গেই মিলিত হইলেন। তাঁহারা সকলেই অন্য একটি নির্জ্জন স্থানে গমন করিলেন। সেখানে কার্ডোনার মস্তকের গুচ্ছ গুচ্ছ কেশরাশি কর্ত্তন করা হইল, সন্ন্যাসিনীর পরিচ্ছদ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে শোভা পাইতে লাগিল; উপাসনান্তে তিনি সন্ন্যাসিনী হইলেন।

সন্ন্যাসিনী লা-রোজ নামক স্থানের প্রান্তদেশে উপস্থিত হইয়া অনুভব করিলেন, যেন তাঁহার প্রভু পরমেশ্বর তাঁহাকে বলিতেছেন, এইটিই সাধনের অতি উৎকৃষ্ট স্থান। এখানেই তুমি বাস কর এবং এখানেই তোমার সাধন আরম্ভ হউক। সন্ন্যাসিনী তখনই একটী গিরিগুহায় লুক্কায়িত হইলেন। সেই গুহার মধ্যেই তাঁহার তপস্যা আরম্ভ হইল। তৎকালে তাঁহার বয়স চেতাল্লিশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল।

জনশূন্য নির্জ্জন স্থান, কোথাও মানুষের সাড়াশব্দ নাই। চোখ মেলিয়া চাহিলে, ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশ, নিম্নে পর্ব্বত, প্রান্তর ও অরণ্যই দেখিতে পাওয়া যায়। সন্ন্যাসিনী এইস্থানে একাকিনী গিরিগুহায় বাস করিয়া যে কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন তাহা স্মরণ করিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। একদিন নয়, দুদিন নয়, ক্রমাগত আট বৎসর সন্ন্যাসিনীর সহিত লোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয় নাই। তিনি নিরন্তর ধ্যানে মগ্ন থাকিয়া কৃচ্ছ্রসাধনই

করিয়াছেন। তাঁহার যে একটা দেহ আছে, তিনি যেন সে কথা ভুলিয়াই যাইতেন। তাই আত্মার স্পৃহনীয় সামগ্রী বিশ্বাস, পবিত্রতা ও প্রেম লাভ করিবার জন্যই অনবরত চেষ্টা করিতেন! ঈশ্বর দয়া করিয়া তাঁহাকে প্রচুর প্রেমার বিতরণ করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসিনীর চিত্ত উহাতেই তৃপ্তিলাভ করিত। তিনি তাঁহার কয়েকখানা হাড়ের উপর কোন-রকমে দেহটা খাড়া রাখিবার জন্য গুহার সম্মুখস্থ বৃক্ষের ফলমূল ভক্ষণ করিতেন। তাহা ছাড়া আর কোন খাদ্য সামগ্রীই আহার করিতেন না। উহা পাইবারও সম্ভাবনা ছিল না।

এইরূপ কথিত আছে যে, সন্ন্যাসিনীর প্রেমে বনের পশুপক্ষীও তাঁহার বশ হইয়াছিল। ঐ সকল প্রাণী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া আনন্দে নৃত্য করিত।

অনেক দিন পরে সন্ন্যাসিনীর কথা আশ্চর্য্য কাহিনী হইয়া দাঁড়াইল। মানুষ কোথাও কোন সন্ন্যাসিনীকে দেখিতে পাইত না, অথচ বলাবলি করিত, এই দেশে এক শক্তিশালিনী সন্ন্যাসিনী আছেন, তিনি যিশুখ্রীষ্টের অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী; তিনি সাধনের চরম অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছেন।

যে দুই একটি ধর্ম্মযাজকের সঙ্গে সন্ন্যাসিনীর একটু পরিচয় ছিল, তাঁহারা অন্যত্র গমন করিয়াছেন। নূতন ধর্ম্মযাজকদিগের মধ্যে একটি ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। সন্ন্যাসিনীর কাহিনী তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া নানা স্থানে সন্ন্যাসিনীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মযাজক ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন সেই সন্ন্যাসিনীর গুহার সম্মুখেই উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তপস্বিনী তখন সেই গুহার মধ্যে ছিলেন না; তিনি গুহার বাহিরে একটি নির্ঝরিণীর নিকটে বসিয়া তাহার করুণ সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে ঈশ্বরের মধুর ভাবের মধ্যে ডুবিয়া যাইতেছিলেন। তাই ধর্ম্মযাজক সন্ন্যাসিনীকে দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু তাঁহার গুহার মধ্যে তাঁহার কয়েকখানি চিঠি পাইয়া উহা পড়িতে লাগিলেন। একখানি চিঠির লেখক স্বয়ং স্পেনের রাজকুমার। তিনি তপস্বিনীকে মাতৃসম্বোধন করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। ধর্ম্মযাজকের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, তবে কি এই সন্ন্যাসিনী রাজপরিবার-সংশ্লিষ্ট কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে? রাজকুমার যাহাকে "মা" বলিয়া চিঠি লিখিয়াছেন, তিনি ত যে-সে স্ত্রীলোক অথবা যেমন-তেমন সন্ন্যাসিনী নহেন। ধর্ম্মযাজকের কৌতূহল আরো বর্দ্ধিত হইল। তিনি অনেক চেষ্টা করিয়া সন্ন্যাসিনীর দর্শন পাইলেন। তাঁহার দিব্যমূর্ত্তি দর্শন করিয়া এবং তাঁহার ভক্তিরসাত্মক বাক্য শুনিয়া ধর্ম্মযাজক আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন।

এই সময়ে ঈশ্বরের সঙ্গে সন্ন্যাসিনীর আত্মার গভীর যোগ স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি ঈশ্বরের প্রেমে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। জীবন্তধর্ম্ম তাঁহার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। তপস্বিনীর আত্মা এই পৃথিবীর মলিন ভাব হইতে এতই ঊর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছিল যে, সংসারের কোন রকম হিংসা, বিদ্বেষ ও পাপ প্রলোভন তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করিতেও পারিত না। উদার প্রেমে তাঁহার অন্তর পূর্ণ হইয়াছিল। সর্ব্বজীবের প্রতি তাঁহার মমতা দেখা যাইত। তিনি পশুপক্ষীদিগকেও অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তপস্বিনীর আশ্চর্য্য জীবনের কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। ধনী, দরিদ্র, জ্ঞানী ও মূর্খ—নানাশ্রেণীর পুরুষ ও স্ত্রীলোক সন্ন্যাসিনীকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা এক এক দিন সন্ন্যাসিনীর গুহার কাছে ভিড় করিয়া দাঁড়াইতেন। তাঁহার মুখের একটি কথা শুনিলে এবং তাঁহার একটু আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে পারিলে, লোকেরা আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিত। ক্রমশঃই লোকের ভিড় বাড়িতে লাগিল। তখন রাজপুরুষেরা শান্তি-রক্ষার জন্য গুহার নিকটে পুলিশ নিযুক্ত করিলেন।

সন্ন্যাসিনীর মনের একান্ত বাসনা ছিল, তিনি নরনারীর কল্যাণের জন্য একটি আশ্রম স্থাপন করিবেন। একজন সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি একবার গুহা হইতে বাহির হউন এবং প্যাট্রেনা সহরে চলুন, তাহা হইলেই লোকেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আপনার আশ্রম নির্ম্মাণের জন্য প্রচুর অর্থ দান করিবে।" সন্ন্যাসিনী সেই সম্ভ্রান্ত লোকটির অনুরোধে প্যাট্রেনা সহরে যাইতে সম্মত হইলেন। তাঁহার সহরে যাওয়ার সংবাদ যেন বাতাসের মুখে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। তিনি যেদিন সহরে প্রবেশ করিবেন, সেদিন বিস্তর সম্ভ্রান্ত

লোক অশ্বারোহণ করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য রাজপথে বাহির হইলেন। সাধারণ লোকের ত কথাই ছিল না; সেদিন তাহারা শিপড়ার সারির মত দল বাঁধিয়া রাস্তায় বাহির হইল। সকলেই সন্ন্যাসিনীকে রাণীর মত অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিলেন।

স্পেনের রাজা ফিলিপ স্বয়ং এই সন্ন্যাসিনীকে রাজ-প্রাসাদে আহ্বান করিয়াছিলেন। তপস্বিনী তাঁহার সম্মুখে যাওয়া মাত্র, বিস্তর লোক তাঁহার জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসিনীই হউন, আর যিনিই হউন, রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেই তৎকালের রীতি অনুসারে তাঁহার সাম্নে দাঁড়াইয়া বিশেষরূপে সম্মান প্রকাশ করিতে হইত। কিন্তু সন্ন্যাসিনী কার্ডোনা রাজার সম্মুখে মস্তক নত ত করিলেনই না, বরং তাঁহাকে "পুত্র" সম্বোধন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। ইহাতে রাজা একটুকুও অসন্তুষ্ট হন নাই; সন্ন্যাসিনীর প্রতি তাঁহার এমনই ভক্তি ছিল।

একবার সন্ন্যাসিনী পোপের প্রতিনিধির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। প্রতিনিধি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, আমার মস্তকেই আশীর্ব্বাদ বর্ষণ! সন্ন্যাসিনীর স্পর্দ্ধা ত দেখিতেছি কম নয়! তিনি মনের রাগ চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। তাই সন্ন্যাসিনীর সঙ্গীদিগকে কহিলেন—"এই রমণী কি একজন বিশপ? ইনি কেন স্থানে অ-স্থানে আশীর্ব্বাদ বিতরণ করেন?"

কিন্তু প্রতিনিধি যখন সন্ন্যাসিনীর আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় পাইলেন, তখন তাঁহার আর ক্রোধ রহিল না; তিনি শ্রদ্ধায় মস্তক নত করিয়া সন্ন্যাসিনীকে কহিলেন—"আপনি আমাদের সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিবেন।"

১৫৭৭ সালে এই সন্ন্যাসিনী দেহত্যাগ করিয়া পরলোক প্রস্থান করিলেন। তপস্বিনীর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই সেণ্ট টেরেসা তাঁহার গুহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন—"হায়, সেই পুণ্যশীলা তপস্বিনীকে দর্শন করিবার জন্য আমার চিত্ত কতই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তিনি আজ আর ইহলোকে নাই। বুঝিবা আমি তাঁহাকে দর্শন করিবারও উপযুক্ত নই, সেই জন্যই ইহসংসারে তাঁহার সঙ্গে আমার দেখা-শুনা ও আলাপ পরিচয় হইল না।"

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

ভগ্ন দেবালয়ে

আমি বহুতীর্থ পর্য্যটনের পর একটি জীর্ণ ও ভগ্নাবশিষ্ট দেবমন্দির সন্নিকটে উপস্থিত হইলাম। সমুদ্রের জল মন্দিরের পাদদেশ ধৌত করিতেছিল। আমার মনে হইল, যেন সমুদ্র দিবস রজনী অনুক্ষণই স্বীয় বারিরাশি দ্বারা মন্দিরস্থিত দেবতার চরণে অর্ঘ্য প্রদান করিতেছে।

জীর্ণ মন্দিরের কেবল চারিটি প্রাচীরই দণ্ডায়মান ছিল, কিন্তু বৃষ্টিধারা স্বীয় চিহ্ন স্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে তাহাতেও শত ছিদ্র করিয়া রাখিয়াছে। ছাদ কালের প্রকোপে ভগ্ন ও ধূলিসাৎ হওয়াতে সুনীল আকাশ উপরে সুস্পষ্ট পরিদৃষ্ট হইতেছিল; দেবমূর্ত্তিটিই কেবল অক্ষত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল।

এই অন্তরীপ বক্ষে এই মন্দির ব্যতীত কোন লোকালয়ই ছিল না। এই দেবালয় সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী প্রচলিত ছিল। কেহ কেহ বলে, ইহা নিকটস্থ দ্বীপের এক সন্ন্যাসিনী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দ্বীপে কোন সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইলে পীড়িত ব্যক্তিগণকে এই স্থানে আনিয়া তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করা হইত। কেহ কেহ আবার বলে, যে এই পথ দিয়া যে সকল ভিক্ষু ও সন্ন্যাসী যাতায়াত করিতেন তাঁহাদিগের কিছু কাল এই খানে সাধন ভজন করিবার জন্য ইহা নির্ম্মিত হয়। পূর্ব্ব ইতিহাস যাহাই হউক, বর্ত্তমান সময়ে কোন উপাসক এই মন্দিরে উপাসনার জন্য আইসে না এবং রোগীর পরিচর্য্যাও এখানে আর হয় না।

মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে স্থিত এক প্রাচীন পথদ্বারা এই ক্ষুদ্র অন্তরীপস্থিত দেবালয়টি দ্বীপের সহিত সংযুক্ত ছিল। মেঘশূন্য পরিষ্কার দিনে একাকী বসিয়া এই পথ সম্বন্ধীয় কিম্বদন্তীও মনে পড়িয়া গেল। এক সময়ে এই পথই রণবিজয়ী সৈন্যদলের পদভরে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, কিন্তু আজ ইহা সম্পূর্ণ নীরব ও নিঃশব্দ। পদধ্বনির মধ্যে কদাচিৎ কোন কৃষক-বালিকার অথবা অন্য কার্য্যে অক্ষমা লঘুভার কাষ্ঠ আহরণে প্রবৃত্তা কোন বৃদ্ধার অথবা বন্যবৃক্ষ কর্ত্তনান্তর কাষ্ঠভার-স্কন্ধ কোন বলিষ্ঠ পুরুষের পদশব্দ কখন কখন এই পথে শ্রুত হয়। কিন্তু পথ দিয়া গেলেও কেহই আর মন্দিরে প্রবেশ করে না,

ইহা বহুকাল হইতেই জনমানবের পদচিহ্ন বিবর্জ্জিত হইয়া অন্তরীপ বক্ষে দুইটি উপসাগরের মধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক স্বীয় পাদমূলে সমুদ্র গর্জ্জনই শ্রবণ করিয়া আসিতেছে।

শীত ঋতুতে মধ্যাহ্নকালে যখন প্রখর সূর্য্যের কিরণে ইষ্টকনির্ম্মিত পথটি বিশেষ উত্তপ্ত হইয়াছিল ঠিক সেই সময়ে একদিন আমি এই স্থানে উপস্থিত হইলাম। পথশ্রমে ক্লিষ্টদেহ আমার পক্ষে মন্দির আরোহণের পথটা একটু দুর্গম মনে হইল। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া আমি ভগ্ন বাতায়ন সম্মুখে দাঁড়াইয়া উপসাগরের দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। সুদূরে নীল জলরাশির পরপারস্থিত সহর ও গ্রামগুলিকে পশ্চাৎস্থিত পর্ব্বতগাত্রের সাদা ও লাল এক একটা বিন্দুর ন্যায় বোধ হইতেছিল; নীল গিরি-শ্রেণীকে কখনও বা অভ্রভেদীরূপে, কখনও বা আকাশ হইতে পৃথক ভাবে এবং কখনও অস্পষ্টরূপে সমুদ্র জলে প্রতিফলিত দেখা যাইতেছিল। পর্ব্বতশ্রেণী যেন নানা রূপ সঙ্কেতে আমাকে নিকটে আহ্বান করিতেছিল, কিন্তু তাহাদের ও আমার মধ্যস্থিত ব্যবধান কোন সেতু দ্বারা লঙ্ঘনীয় নহে, কাজেই আমি নিশ্চেষ্ট ভাবে সেইখানেই দাঁড়াইয়া থাকিলাম,কিন্তু তাহাদের ব্যাকুল আহ্বান আমাকে ব্যথিত করিয়া তুলিতেছিল বলিয়া আমি তাহাদের দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইলাম। আমি অতঃপর দেবালয় মধ্যে প্রবেশ করিয়া মনোযোগ সহকারে দেবমূর্ত্তি ও ভগ্ন প্রাচীরের ক্ষোদন কার্য্যগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রবেশ পথের একখানা প্রস্তরখণ্ডের উপর উপবেশন করিলাম। এই স্থান হইতে ক্ষুদ্র উপসাগর-বক্ষে বৃক্ষরাশি পরিবেষ্টিত শ্বেতবর্ণের গৃহগুলি দেখা যাইতে-ছিল; উপসাগরের জল প্রতিমুহূর্ত্তেই আঘাত ও প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইয়া তীরপ্রান্তে শুভ্র ফেনরেখার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। জানুদ্বয়ের উপর হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক আমি এই স্থানেই বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। আমার শরীর শ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল কিন্তু সূর্য্যের প্রখর কিরণ অথবা উত্তপ্ত ইষ্টকোত্থিত গ্রীষ্মাতিশয্যই এই শ্রান্তির একমাত্র কারণ ছিল না। এই শ্রান্তির ভাব অনেকদিন হইতে আমি বহন করিতেছিলাম।

শ্রান্তি বশতঃ আমি নিম্ন মস্তক জানুদ্বয়ের উপর ন্যস্ত করিয়া প্রায় দুইশত হস্ত নিম্নস্থিত সমুদ্রজলের পর্ব্বতপৃষ্ঠে আঘাতজনিত শব্দ-মিশ্রিত বায়ুর, বৃক্ষ শ্রেণীর ও মন্দিরের ভগ্ন স্থান সমূহের ছিদ্র দিয়া বাতায়নের শব্দ শ্রবণ করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলাম। নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম, এক ব্যক্তি পরমেশ্বরকে আহ্বান করিবা মাত্র পরমেশ্বর তাহার সাহায্যার্থে একজন স্বর্গীয় দূতকে ভূতলে প্রেরণ করিলেন। স্বর্গীয় দূত পরমেশ্বরের সমীপে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক নিবেদন করিল, "আমি এ ব্যক্তিকে কোন মতেই সাহায্য করিতে পারিলাম না।" পরমেশ্বর বলিলেন, "কেন, ইহার কি হইয়াছে?"

দূত বলিল,"সে অনবরতই এই বলিয়া বিলাপ করিতেছে, যে কে তাহার অপকার করিয়াছে, কিন্তু সে তাহাকে ক্ষমা করিতে চাহিলেও কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিতেছে না।" পরমেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ব্যক্তির সাহায্যার্থে তুমি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলে?"

দূত বলিল, "সকল উপায় অবলম্বন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। প্রথমতঃ আমি তাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বলিলাম—দেখ সকলেই যখন এই ব্যক্তির (যাহাকে তুমি ক্ষমা করিতে পারিতেছ না) নিন্দাবাদ করিবে, তুমি তাহার প্রশংসা করিও; গোপনে, তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার সাহায্য করিবে; তোমার মহার্ঘ কোন পদার্থ থাকিলে তাহার সহিত একত্রে তাহা উপভোগ করিবে; কাহারও সহিত এইরূপ ব্যবহার করিলে কালে তাহাকে আপন ভাবিয়া ক্ষমা করিতে সমর্থ হইবে।" সেও "তাহাই করিব" বলিল, কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে বিলীন হইয়া যাইতে যাইতে আমি আবার তাহার বিলাপধ্বনি শুনিতে পাইলাম। সে বলিতেছিল, "আমি সবই ত করিলাম কিন্তু কিছুই হইল না। আমার হৃদয়ের রক্ত তাহার সহিত সমান অংশে ভাগ করিয়া লইলেও কি বেদনার একটুও উপশম হয়? আমি ক্ষমা করিতে যে পারিতেছি না, আমি যে ক্ষমা করিতে নিতান্তই অক্ষম। প্রভু পরমেশ্বর, কি প্রকারে আমি ক্ষমা করিতে শিখিব?" আমি বলিলাম, "শোন, তোমার নিজের অতীত জীবন ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা কর। শৈশব কাল হইতে কখন কি দোষ করিয়াছ ভাবিয়া দেখ, সকল ক্ষুদ্রতা অসরলতার কথা মনে করিতে চেষ্টা কর। নিজের সমস্ত

ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতা ও অসম্পূর্ণতা ভাল করিয়া পরীক্ষা কর, এবং এই আত্মপরীক্ষার আলোকে পৃথিবীর আর সকলকে দেখিলেই বুঝিবে যে মানবপ্রকৃতি সর্ব্বত্রই এক এবং সকল মানবই স্ব স্ব অপূর্ণতা দ্বারা ভ্রাতৃত্ব সূত্রে আবদ্ধ। তুমি নিজে কি এমনই নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক যে তোমার অপর কাহাকেও ঘৃণা করিবার অধিকার আছে?" সে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বলিল, "হাঁ তুমি সত্য কথাই বলিয়াছ। আমারও ত কত সময়ে পদস্খলন হইয়াছে সুতরাং আমারও ক্ষমা করা কর্ত্তব্য। যাও, এইবারে তোমার কথা আমার শ্রবণে সন্তোষ আনিয়া দিয়াছে, আমি বাস্তবিকই তাহাকে ক্ষমা করিলাম।" এই বলিয়া শান্তি-পূর্ণ হৃদয়ে সুকৃতকর হইয়া নিজ শয্যায় শয়ন করিল। আমিও তাহার সকল কষ্টের অবসান হইল মনে করিলাম। কিন্তু সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অভিপ্রায়ে পক্ষদ্বয় বিস্তার করিতে না করিতেই আবার শুনিলাম, সে বলিতেছে, "আমি ক্ষমা করিতে পরিতেছি না, কিছুতেই পারিতেছি না, হা প্রভো, হা পরমেশ্বর, আমি যে ক্ষমা করিতে পারিতেছি না, কাহাকেও ঘৃণার চক্ষে দেখা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ, কিন্তু আমি ত ক্ষমা করিতে পারিতেছি না, কিছুতেই পারিতেছি না।" আমি অন্ধকারে নীরবে তাহার গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া তাহার কথা শুনিতে লাগিলাম; সে বলিতে লাগিল, "আমি এত পাপ করি নাই, এই প্রকার পাপ কখনও করি নাই। কোন মানবদেহে এতটুকু আঘাত করিলেও আমি তৎক্ষণাৎই নতজানু হইয়া আমার ওষ্ঠদ্বয় দ্বারা ক্ষতস্থান চুম্বন করিয়া তাহা আরোগ্য করিয়া দিয়াছি। আমাকে ঘৃণা করিয়া কোন আত্মা নরকগামী হয় এই আকাঙ্ক্ষা কখনও আমার হৃদয়ে উদয় হয় নাই। যখন কেহ ভ্রমবশতঃ ভাবিয়াছে, যে আমি তাহাদের অপকার চেষ্টা করিয়াছি আমি আমাকে পদদলন করিয়া চলিয়া যাইবার জন্য তাহাদের চরণাগ্রে এই অভিপ্রায়ে নিজ বক্ষ পাতিয়া রাখিয়াছি যে আমার নতভাব দেখিয়া তাহারা আমাকে ঘৃণার পরিবর্ত্তে ক্ষমা করিতে পারিবে এবং ক্ষমা করিতে সমর্থ হইয়া স্বর্গলাভের অধিকারী হইবে। কিন্তু তাহারা ত আমার আত্মা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, তাহাদের ত একবারও মনে হয় না যে আমার ঘৃণ্য হইয়া তাহারা আমাকেই অধোগামী করিতেছে! তাহারা ত ক্ষমার উপযুক্ত হইবার কোন চেষ্টাই করিতেছে না।"

আমি তাহাকে বলিলাম, "দেখ, তুমি সন্তুষ্টচিত্তে অবস্থান কর। ক্ষমা না করিতে পার ত করিও না। যে ব্যক্তি তোমার অপকার করিতেছে মনে করিতেছ তাহার কথা ও তাহার অপকারের কথা একেবারেই বিস্মৃত হইয়া নিজের কাজ করিয়া যাও, পরলোকে হয়ত—"

সে অধীর ভাবে বলিয়া উঠিল, "তুমি এস্থান হইতে চলিয়া যাও, তোমার বুঝিবারই শক্তি নাই। পরলোকে কি হয় না হয় তাহা দিয়া আমার কি প্রয়োজন? আমার যে ইহজগতেই মুক্তি নাই—আমার প্রত্যেক মুহূর্ত্তে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে। সূর্য্যের উজ্জ্বল কিরণও আমার চক্ষে আলোক প্রকাশ করে না, আমার কণ্ঠ ধূলি-রাশি পরিপূর্ণ, আমার চক্ষে বালুকা। যাও, আমার সম্মুখ হইতে দূরে যাও—তোমার আমাকে বুঝিবার ক্ষমতা নাই। হায়, হায় মৃত্যুর পূর্ব্বে একবারও যদি পৃথিবীকে আবার সুন্দর দেখিতে পাইতাম! হা প্রভো, হা পরমেশ্বর, সকলকে প্রীতিদান না করিয়া কি প্রকারে এ জগতে বাঁচিয়া থাকিব? কাহাকেও ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া এই পৃথিবীতে জীবনধারণ করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। হা পরমেশ্বর! পরমেশ্বর! পরমেশ্বর!"

"তাহাকে এই প্রকারে রোরুদ্যমান দেখিয়া আমি এস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি।"

পরমেশ্বর বলিলেন, "এই ব্যক্তির আত্মাকে পরিত্রাণ দান করিতে হইবে।"

স্বর্গীয় দূত জিজ্ঞাসা করিল, "কি প্রকারে?"

পরমেশ্বর বলিলেন, "পুনরায় মর্ত্ত্যে গমন করিয়া তাহার উদ্ধার সাধন কর।"

স্বর্গীয় দূত জিজ্ঞাসা করিল, "আমি আর কি উপায় গ্রহণ করিব?"

পরমেশ্বর ঈষৎ নত হইয়া স্বর্গীয় দূতের কর্ণে কি কথা বলিলেন, দূত ত্বরিৎ গমনে পৃথিবীতে উপনীত হইল।

আমি অর্দ্ধ-জাগ্রত ভাবে দেখিলাম, যে আমি দেবালয় সম্মুখস্থ প্রস্তর খণ্ডের উপর তখনও উপবিষ্ট রহিয়াছি কিন্তু

এত শ্রান্তিভারাক্রান্ত বোধ হইতেছিল যে আমি আর উঠিলাম না। বৃক্ষ শ্রেণীর ও ভগ্ন বাতায়নের মধ্য দিয়া বায়ু সঞ্চালনের শব্দ পুনরায় কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া আমাকে নিদ্রাভিভূত করিল, এবং আমি পুনরায় স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম।

স্বর্গীয় দূত মর্ত্ত্যে আগমন করিয়া পীড়িত-হৃদয় ব্যক্তিটির হস্ত ধারণ করতঃ তাহাকে একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া গেল। দূত যে তাহাকে কোথায় লইয়া যাইতেছে ও সেখানে যে কি দেখাইবে সে সম্বন্ধে এই ব্যক্তিটির কোনই ধারণা ছিল না। নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইবার পর দূত তাহার চক্ষুদ্বয় নিজের পক্ষপুট দ্বারা কিয়ৎক্ষণের জন্য আবৃত করিয়া রাখিল। পক্ষ অপসারণ করিবা মাত্র সে ব্যক্তি পৃথিবীর কতকগুলি ঘটনা সম্মুখে দেখিতে পাইল। পরমেশ্বর সেই স্বর্গীয় দূতকে কোন মানব বিশেষের আত্মাকে শরীররূপ আচ্ছাদন হইতে পৃথক করিয়া তাহার দৃষ্টির সম্মুখে রাখিয়া দিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন। তাহারা সেই আত্মাকে তাহাদের সম্মুখে সম্পূর্ণ অনাবৃতভাবে (সেই মানব-আত্মার বাহ্যিক আকৃতি ও আকৃতিগত দোষ অথবা গুণ, বর্ণ, বয়স, স্ত্রী অথবা পুরুষ ইত্যাদি যে সকল বিশেষত্ব দ্বারা আমরা পৃথিবীতে এক ব্যক্তি হইতে অপরকে চিনিতে পারি সে সকল বিবর্জ্জিত রূপে)—আমরা প্রত্যেকে অন্তশ্চক্ষু দ্বারা নিজ আত্মাকে যেরূপ দেখিতে পাই সেইরূপ—দেখিতে লাগিল।

তাহারা ইহার অতীত জীবন, প্রথমতঃ ইহার শিশির-সিক্ত পুষ্পের ন্যায় বাল্য জীবন দেখিতে পাইল; তাহার পর কৈশোরে শিশিরবিন্দুগুলি দ্রব হইল এবং এই জীবাত্মার ক্ষুদ্র মুখের পরিমাণে অনেকগুণে বৃহৎ এক পানীয়াধার হইতে জল পান করিবার ব্যর্থ প্রয়াস এবং ভূমিতে জল পতন দেখিতে পাইল; ইহারা তাহার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও আকাঙ্ক্ষার অপূর্ণতা দেখিল; ইহারা তাহার বুদ্ধির অথবা মানসিক শক্তির অল্পতা—যাহাকে আমরা এই পৃথিবীতে পাপ এবং আলোক বিকীর্ণকারী সর্ব্বদর্শী আত্মদৃষ্টি—যাহাকে আমরা পুণ্য অথবা ধর্ম্ম নামে অভিহিত করি, তাহাও দেখিল। তাহারা ইহার ক্ষমতা অথবা প্রভুত্বের কালে "আমি সর্ব্ব-শক্তিমান" বলিয়া আস্ফালন এবং ইহার দুর্ব্বলতার অথবা ক্ষমতার অবসানে ভূমিশয্যায় ধূলিমুষ্টি অবলম্বন পূর্ব্বক লুণ্ঠন—এই দুই অবস্থাই দেখিতে পাইল। তাহারা এই মানবাত্মার কতদূর উন্নত অবস্থা সম্ভবপর ছিল এবং তাহা এখন কিরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাও সমকালরূপে উপলব্ধি করিল। পীড়িত মানব মস্তক নত করিল দেখিয়া স্বর্গীয় দূত জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে?"

মানব বলিল, "ইহাই আমি—ইহা আমারই আত্মা।" সে আনতদেহ হইয়া এই আত্মাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে যাইতেছিল কিন্তু স্বর্গীয় দূত তাহাকে বাধা দিয়া পুনরায় তাহার চক্ষু আবৃত করিল।

পরমেশ্বর তাঁহার দূতকে অপর একটি মানবাত্মাকেও নিরাবরণ করিবার অধিকার দান করিয়াছিলেন, অর্থাৎ মানবাত্মার বাহ্যিক আকৃতি ও প্রকৃতি, সময়, স্থান ও অন্যান্য বিষয়ক বিশেষত্ব—যাহাদ্বারা ব্যক্তিগত পার্থক্যের সৃষ্টি হয় এবং প্রত্যেক জীবন অন্যান্য জীবন হইতে বিভিন্ন হইয়া থাকে—সেই সকল গুণ অপসরণ করিবার ক্ষমতা দিয়াছিলেন। পরমেশ্বরের দূত পুনরায় তাহার চক্ষুর আবরণ খুলিয়া দিল এবং সে দেখিতে লাগিল—সম্মুখেই একটি ক্ষুদ্র জীবাত্মা; জলবিম্বের প্রতিবিম্বের ন্যায় পরিদৃশ্যমান জগতের যতটুকু সম্ভব ইহাতে সে প্রতিফলিত দেখিতে পাইল। সুদূর-সংস্থাপিত তারকার গতিবিধি, অদৃশ্য ভূগর্ভপ্রোথিত স্ফটিকের উৎপত্তি-প্রণালী, ডিম্ব মধ্যে জীবনের প্রথম অঙ্কুর নির্গমন-প্রথা, নবজাত শিশুর হস্ত প্রসারণ প্রক্রিয়ার হেতু, বৃক্ষপত্রের সরল ও সতেজ ভাবে থাকিবার কারণ, সূর্য্য-কিরণ-উদ্ভাসিত সমুদ্রবক্ষে জীবাণুকণার বাস ও গতি বিধি এবং দুরারোহ পর্ব্বতের প্রস্তরখণ্ড মধ্যেও উদ্ভিদ্-জীবন-সঞ্চার-ক্রিয়া সকলই এই জীবাত্মার মধ্যে প্রতিফলিত দেখিয়া মানব বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া থাকিল।

পরমেশ্বরের দূত তাহাকে স্পর্শ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখিতেছ?"

মানব নতমস্তকে কম্পিত কলেবরে বলিল, "ইহাই পরমেশ্বর,—পরমাত্মা।" দূত পুনরায় তাহার চক্ষু আবৃত করিল; চক্ষুর আবরণ অপসৃত হইবামাত্র সে এক ব্যক্তিকে কিয়দ্দূরে চলিয়া যাইতে দেখিতে পাইল। চক্ষু আবৃত করিবার পর পরমেশ্বরের দূত যে ব্যক্তির আত্মাকে আবরণমুক্ত করিয়াছিল পুনরায় তাহাকে তাহার শারীরিক আকৃতি ও

প্রকৃতি দান করিয়াছিল, কাজেই সে তাহাকে চিনিতে পারিল। দূত জিজ্ঞাসা করিল, "ইহাকে চিনিতে পারিলে কি?"

মানব, "হাঁ চিনি" বলিয়া আবার একাগ্রভাবে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

দূত বলিল, "তুমি উহাকে ক্ষমা করিতে পারিলে কি?" মানব কেবল এই মাত্র বলিল, "আমার ভাইটি কি সুন্দর!" পরমেশ্বরের দূত স্বীয় পক্ষদ্বয় নিজের মুখ আলোক হইতে সরাইয়া লইয়া মানবের চক্ষের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া যাহা দেখিল তাহাতে সন্তুষ্ট হইল এবং সহাস্যমুখে পরমেশ্বরের সমীপে চলিয়া গেল। কিন্তু মানবদ্বয় একত্রে এই পৃথিবীতে বাস করিতে লাগিল। এমন সময় আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। নীল—সুনীল নভোমণ্ডল আমার মস্তকের উপর বিদ্যমান; নিম্নে—বহুনিম্নে সমুদ্র-তরঙ্গগুলি তীরের সহিত সংঘর্ষণে শ্বেত ফেণায় পরিণত হইতেছিল। আমি উঠিয়া দেবালয়ের ভিতর গেলাম; কিয়ৎক্ষণ পরে ইষ্টকনির্ম্মিত পথে আসিয়া দাঁড়াইলাম। বৃক্ষশ্রেণী, পত্র পুষ্প, সকলই যেন নূতন চক্ষে দেখিতে লাগিলাম। আমার বোধ হইল, যে আকাশ ও পৃথিবীকে কখনও পূর্ব্বে এত সুন্দর দেখি নাই। আমি পথ দিয়া নামিতে লাগিলাম। সেই বহুকালের পুরাতন ভ্রান্তির ভাব সম্পূর্ণই তিরোহিত হইয়াছে অনুভব করিলাম।

এক কৃষক বালককে সেই পথ দিয়া যাইতে দেখিলাম। বালকটি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত, পূর্ব্বে আর কখন দেখি নাই কিন্তু আমার, তাহার সহিত একত্রে সেই পথ অবরোহণ করিবার ও তাহার হস্ত স্পর্শ করিবার বাসনা হইতে লাগিল—কিন্তু আমার বাসনানুযায়ী কার্য্য করিলে সে নিশ্চয়ই তাহার কারণ বুঝিতে পারিত না।*

কবির তর্পণ

(মহাকবি কৃত্তিবাসের স্মৃতি-চিহ্ন-স্থাপন সভায় পঠিত)

পঞ্চশত বৎসরের ভুলি সর্ব্ব কাল-ব্যবধান
আগত তোমার দ্বারে হে কবীন্দ্র! বঙ্গের সন্তান
ভক্তি-নম্র প্রাণে লয়ে শ্রদ্ধা-পূত পূজার সম্ভার
বাণীর অঞ্জলি হেন! শ্রেষ্ঠতম দান সারদার
বঙ্গের বাল্মীকি তুমি, কৃত্তিবাস! হে কীর্ত্তিশেখর!
বাগ্দেবী-অর্চ্চনা-ক্ষণে ঘুচাইতে মুমূর্ষু অন্তর
হয়েছিল জন্ম তব। ধন্য তব পিতা বনমালী,
জননী মালিনী ধন্যা! প্রতিভার হোমানল জ্বালি'
করিলেন বিশ্ব মাঝে বঙ্গে আজি শাশ্বত-গৌরবে
পবিত্র কৃতার্থ ধন্য!

দুর্নিবার কালের আহবে
নাহি সে ভুলিয়া আজ, নাহি সেই পঞ্চগৌড়েশ্বর
গুণগ্রাহী গুণবান! তব স্নিগ্ধ দীপ্ত কণ্ঠস্বর
শুনিতেছি আজো যেন, হে ব্রহ্মতেজোদৃপ্ত কবি!
ধরার ঐশ্বর্য্য-রত্ন তব পাশে অতি তুচ্ছ সবি,
রাখনা প্রত্যাশা কিছু-শুধু এক গৌরব সম্বল!
কি মহান্ উচ্চলক্ষ্য! কি কঠোর তপস্যা নির্ম্মল!
কি অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ! হে বরেণ্য পুরুষদত্তম!
হেরিতেছি আজো যেন তব ওই সৌম্য মনোরম
সুগন্ধ চন্দনলিপ্ত অভিষিক্ত প্রশস্ত ললাট
উন্নত সুগৌর তনু, জয়-ধ্বজা সুন্দর বিরাট
বীণাপাণি অম্বিকার! কালজয়ী তুমি মৃত্যুঞ্জয়
হে অমর! হে পূজার্হ কবি!

পূর্ণ করি সারা বঙ্গালয়
তুমি শুনাইছ নিত্য কত যুগ-যুগান্তর ধরি'
শ্রীরামের পুণ্য-গাথা, অমৃতের অনন্ত লহরী
অন্তরে উথলে যেন! বাল্মীকির কল্পতরু বনে
রুদ্র-জটা-বিলাসিনী একান্তে বহিত কল-স্বনে
সুদুর্লভ নিধি হেন, তুমি দেব, ভগীরথ সম
বাজায়ে সাধনা-শঙ্খ কি আনন্দে নিত্য নিরুপম
বিশল্যকরণী সেই সগৌরবে এনেছ আহ্বানি'
শ্যামাঙ্গনে বাঙ্গালার! বিদূরিয়া হৃদয়ের গ্লানি
বয়েছে সে সুধা-স্রোত, অতর্কিতে উঠেছে জাগিয়া
কত অভিশপ্ত প্রাণ, শুষ্কচিত্ত গিয়াছে প্লাবিয়া
পীযূষ-উচ্ছ্বাসে বুঝি!

ভক্ত তুমি হে মহান্ কবি!
পূর্ণ-মনুষ্যত্বে দীপ্ত মহর্ষির মহাদর্শ-ছবি

* কুমারী মালিনী সেন এম. বি, কর্ত্তৃক ইংরেজী হইতে অনুবাদিত।

সুনির্ম্মল ভক্তিরাগে করি তুমি সুস্নিগ্ধ কোমল
করিয়াছ বিশ্বে দান ; মধ্যাহ্নের মার্ত্তণ্ড উজ্জ্বল
ধরিয়াছে কম্ব-কান্তি, অফুরন্ত শান্তির নির্ঝর
উছলিয়া দিকে দিকে ! ধন্য তুমি, কবিকুলেশ্বর !
ধন্য মোরা তব মাঝে যুগপৎ লভিয়া অতুল
বাল্মীকি তুলসীদাসে ! অকূলেতে দেখাইতে কূল
বাণীর কচ্ছপীবীণা সুমধুর ললিত ঝঙ্কারে
ধ্বনিয়াছে করে তব, ধনী দীন সবার মাঝারে
ঘুচাইয়ে ভেদাভেদ ঘোষি' সদা চির-কল্যাণের
ধ্রুববার্ত্তা মধুময় ! অপার্থিব জ্ঞানের প্রাণের
ঘটালে মিলন তুমি !

ভাব-মুগ্ধ বঙ্গবাসীগণ

হে কবি ! তোমার তরে সত্য বটে করেনি রচন
স্মৃতির মর্ম্মর-সৌধ, বর্ষে বর্ষে বাক্য-পুষ্পাঞ্জলি
দেয় নাই অর্ঘ্য রূপে আড়ম্বরে আপনারে ছলি'
আপনি অজ্ঞাতে হায় ! সত্য তবু নিভৃতে নীরবে
তব মনঃ-সরোবরে ভূমানন্দে অবগাহি' সবে
নব শিক্ষা নব দীক্ষা তব পাশে করেছে গ্রহণ
অতর্কিতে নিশিদিন, সাজায়েছে অশ্রু-উপায়ন
তোমারি উপাস্য তরে ! তারি সাথে হে কবিপ্রধান !
স্মৃতির মন্দির তব হৃদে হৃদে শাশ্বত-মহান্
অলক্ষ্যে উঠেছে গড়ি' ! যুগে যুগে দুয়ারে তাহার
নত-শিরে মহাকাল সনাতন-মানব-আত্মার
বহি আনে পূজা-ডালি ! তা'রি শুধু এক বিন্দু লয়ে
দোলমঞ্চতলে তব ভক্তি-পূত প্রশান্ত হৃদয়ে
মিলিয়াছি মোরা আজ ! হেথা তুমি করিতে উৎসব
প্রেম-মানসের বুঝি মুক্ত করি বিচিত্র বিভব
সৃষ্টি' নব বৃন্দাবন ! ক্ষুদ্র মোরা, তুচ্ছ আয়োজন
'বিদুরের ক্ষুদ্' হেন, তব যোগ্য নহে কদাচন,
হে বাণীর বরপুত্র ! প্রতিভার প্রদীপ্ত ভাস্কর !
তবু আজি ক্ষণে ক্ষণে আশা-মুগ্ধ সকল অন্তর
তোমার এ প্রেম-রাজ্যে তুমি হর্ষে করিবে গ্রহণ
প্রবুদ্ধ বঙ্গের এই প্রাণভরা পবিত্র তর্পণ !

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

ভিখারিণী

"কে গা ?"

"ভিখারিণী।"

ভিখারিণী বসন্তকুমার বাবুর বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। মাধুরী তাড়াতাড়ি আসিয়া অঙ্গন হইতে ভিখারিণীর হাত ধরিয়া ঘরের ভিতর লইয়া গেল এবং তাহার হাত ধরিয়া স্নেহপূর্ণস্বরে কহিল, "বোন, এমন কচি বয়সে ভিখারিণী সেজেছ কেন ?"

ভিখারিণীর চেহারায় এমন কিছু ছিল, যাহাতে দৃষ্টি মাত্রই স্নেহময়ী গৃহিণী তাহাকে সাধারণ ভিখারী শ্রেণী হইতে পৃথক বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার স্নেহ-কোমল প্রশ্নে ভিখারিণী উত্তর করিল :—

"বিধাতা সাজিয়েছেন দিদি।"

"বিধাতার কি দোষ দিতে আছে বোন, তিনি যে মঙ্গলময়, তিনি কি কারও অমঙ্গল করতে পারেন ? ও কথা বলো না বোন।"

"স্ত্রীলোকের স্বামী যে কি, তা চেনবার সময় হতে না হতে আমার স্বামী কেড়ে নিলেন কেন ?"

"তাও তোমার মঙ্গলের জন্য।"

"স্বামী বর্ত্তমানেও যে নিরাশ্রয়, ভিখারিণী বিধবার মত দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে, তার পক্ষে সেটা কিরূপ মঙ্গল তা তো বুঝিতে পারি না।"

"আচ্ছা বোন, তোমাদের যখন বিবাহ হয় তখন তোমার বয়স কত ?"

"আমি তখন সাত বছরের।"

"এত অল্প বয়সে তোমার বিবাহ হয়েছিল ?"

"হিন্দুর ঘরে এ টা ত আর নূতন নয়। পিতামহ গৌরী-দানের ফল লাভের আশায় এত অল্প বয়সেই আমার বে দিয়েছিলেন। তখন আমি আমার স্বামীকে কাছে আসতে দেখলে ভয়ে পালাতুম ! তাঁকে যেন কেমন ভয় হতে। অনেকদিন পর্য্যন্ত আমার ঐ ভয় ছিল। এই [illegible] ছবছরের কথা, তখনও বাপমার আদরে আমি নিত স্ব অজ্ঞানের মত আমার কর্ত্তব্য-পথ চিনিতে শিখিনি। স্বামীর দোহাগমাখা কথায় বিরক্ত হতুম। ঐ বিষয় নিয়ে আমার পিতার সঙ্গেও তাঁর বচসা হয়েছিল। অভিমানে তিনি

একদিন আমাদের গৃহ ত্যাগ করেন। পিতামাতার আদরের মেয়ে আমি—আমি তাতে সুখী হয়েছিলুম। তারপর এক বৎসরের মধ্যে আমার ভাগ্যচক্র অন্য দিকে ঘুরে গেল—আমি পিতৃমাতৃহীন হলুম। এক স্বামী ভিন্ন সংসারে আমার আর কেউ রইলো না। তখন তাঁর কথা মনে পড়লো, তাঁকে আমার দুঃখের কথা জানালুম। কিন্তু সে আমার অরণ্যে রোদন। কোন ফল হলো না! শুনলুম আমার সঙ্গে ঘর সংসার করা কিছুতেই সম্ভবপর হবে না মনে করে তিনি আবার বে করেছেন। এখন তাঁর অভাব বেশ অনুভব করছি। কে যেন আমার অন্তরে জাগিয়ে দিয়েছে সে আমার বড় আপনার। আগে আমার এ জ্ঞান হলো না কেন? তাহলে ত এত যন্ত্রণা ভোগ করতে হতো না!"

ভিখারিণী কাঁদিতে লাগিল।

ভিখারিণীকে নানা প্রকার মিষ্ট বাক্যে সান্ত্বনা দিয়া মাধুরী জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা কোথায় আবার তোমার স্বামী বিবাহ করেছেন জানো?"

"হাঁ, সন্ধানে জেনেছি এই বউবাজারের এক ডাক্তারের মেয়েকে। শুনেছি তাঁরা বড় লোক, সে মেয়েটীও কলেজে পড়া।"

"বৌবাজারের কোন্ ডাক্তারের মেয়ে?"

"নিশি ডাক্তার—"

"ডাক্তার নিশিকান্ত মুখুজ্যের মেয়ে?"

"হাঁ।"

মাধুরী বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে কিয়ৎক্ষণ ভিখারিণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ভিখারিণীর মুখখানি বেশ। পদ্মের মত মুখখানি, পদ্মপাতার জলের মত ঢল ঢলে চোখ দুটী, পদ্মফুলে ভ্রমর-যুগলের ন্যায় কৃষ্ণ ভ্রু দুটী, কিন্তু পদ্ম যেন দিবাকর-বিরহে মলিন। ভিখারিণীও মাধুরীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ভিখারিণীর কাতর চাহনীও মধুর, মাধুরীর করুণামাখা স্নেহদৃষ্টিও মধুর। মাধুরীর দৃষ্টি ভিখারিণীর মুখের উপর থাকিলেও সে যেন কি ভাবিতেছিল। কতক্ষণ পরে বলিল, "বেলা আচ্ছা বোন, এখন অনেকটা বেলা হয়ে গেছে, এখানে স্নানাদি সেরে নিয়ে কিছু খেয়ে নাও, তারপর ভিক্ষা দেব এখন।"

অনেক অনুরোধের পর ভিখারিণী স্বীকৃতা হইল এবং তেলের বাটী লইয়া তেল মাখিতে বসিয়া গেল।

তখনও সন্ধ্যা প্রকৃতির ললাটে সিন্দূরের টিপটি জ্বল জ্বল করিতেছিল। মাধুরী ভিখারিণীর চুল বাঁধা শেষ করিয়া তাহার ছোট পাতখানি অলক্তক রঞ্জিত করিয়া দিল এবং তৎকালীন বাহ্য প্রকৃতির অনুকরণ করিয়াই বুঝি ভিখারিণীর ললাটে একটী সুন্দর সিন্দূরের টিপ কাটিয়া দিল। তারপর বেয়াজ হইতে সুন্দর জরীর কাজকরা একখানি নীলাম্বরী সাড়ী বাহির করিয়া ভিখারিণীর হস্তে দিয়া কহিল, "বোন, এই কাপড়খানি পর।"

"একি করছেন—দুঃখিনী ভিখারিণীর আর এসব কেন?"

"আমাদের অতিথি সৎকারের নিয়মই এই। বিশেষতঃ তুমি সধবা। তুমি যদি এসব না পর তাহলে যে তোমার স্বামীর অকল্যাণ হবে।"

"স্বামীর অকল্যাণ হবে? স্বামী বর্ত্তমানেও যে দীন দুঃখিনী, অনাথার ন্যায় যে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে তার স্বামীর কল্যাণ অকল্যাণে কি আসে যায় দিদি?"

"ছি ছি! ওকথা মুখে আনতে নেই বোন, স্বামীস্ত্রীর সে সম্বন্ধ নয়। জগৎপিতা কোন্ অদৃশ্য সূত্রদ্বারা যে দুটী পবিত্র আত্মাকে বেঁধে দিয়েছেন সে বন্ধন ক্রোধ বা অভিমানে ছিন্ন হবে না—হওয়া অসম্ভব। অবস্থার বিভিন্নতায় সে বন্ধন শিথিল হবে না। বিচ্ছেদ মিলন উভয় অবস্থায়ই সে পবিত্র বন্ধন অটুট অচ্ছেদ্য। নারীর কাম্য, নারীর আরাধ্য, নারীর সর্ব্বস্ব এক স্বামী। সেই স্বামীপ্রেম হইতেই ভগবৎ প্রেমের উৎপত্তি এবং বিশ্বপ্রেমেই তার পরিণতি। তা যদি না হতো তা'হলে নারী কখনও স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী স্বরূপে পূজিতা হতো না। সংসারে স্বামী স্ত্রী উভয়েরই কর্ত্তব্য আছে। উভয়েই উভয়ের অবলম্বন। একে যদি কর্ত্তব্য-পথ হতে পেছিয়ে পড়ে বা পদস্খলিত হয়, অন্যে তাকে পুনরায় নির্দ্দিষ্ট পথ দেখিয়ে দেয়। অভিমান বা ক্রোধের বশবর্ত্তী হয়ে নিজের কর্ত্তব্যে অবহেলা করোনা।"

মাধুরী—থামিল। কিয়ৎক্ষণ কি চিন্তা করিয়া পুনরায় বলিল, "তুমি লেখাপড়া জানো?"

"খুব সামান্য।"

"শিখবে?"

"শিখে কি হবে?

"কি হবে? আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার অভাবই

এইসব অনিষ্টের মূল। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে যেমন সমস্ত কুয়াশার আবরণখানি প্রকৃতির দেহ হতে আপনা আপনি দূরে অপসৃত হয়ে যায় তেমনি শিক্ষার যখন জ্ঞান-সূর্য্য উদিত হয় তখন আমাদের মনের কতকগুলো অন্ধ সংস্কার আপনা আপনি মন থেকে সরে যায়। শিক্ষায় কি না হয়? শিক্ষায় একাগ্রতা, দৃঢ়তা, কর্ত্তব্য জ্ঞান, প্রেম, শান্তি সমস্তই স্ফূর্ত্তি পায়। এতদিন যে স্বামীর উপর তীব্র অভিমান অন্তরে পোষণ ক'রে আসছ এখন তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ দারুণ অশান্তির আগুনে পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছ।"

ভিখারিণী মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় একদৃষ্টে মাধুরীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বিস্ময়ে সে এমনি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, যে সে কি করিবে বা কি করিতেছে যেন তাহা তাহার বুঝিবার শক্তি ছিল না। মাধুরীর অনুরোধে সে কাপড়খানি পরিধান করিল; পরে মাধুরী একটী ছোট মেহগনি কাষ্ঠের সুন্দর বাক্স বাহির করিল এবং ভেলভেটের বেরাটোপটী তুলিয়া বাক্সটী খুলিল। ভিখারিণী সবিস্ময়ে দেখিল, উহা বহুমূল্য অলঙ্কারে পরিপূর্ণ। ভিখারিণী নির্ব্বাক্। মাধুরী এক সেট সুন্দর অলঙ্কার তাহা হইতে বাহির করিয়া এক একখানি করিয়া ভিখারিণীকে পরাইল। তারপর মেজের টানা খুলিয়া একখানি চিঠির কাগজ বাহির করিয়া তাহাতে কি লিখিল এবং তাহা একখানি লেফাপায় বন্ধ করিয়া তাহা ভিখারিণীর হস্তে দিয়া বলিল, "বোন, তোমার দুঃখ দেখিয়া আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না, আমার যা ছিল সব তোমায় দিয়াছি, এখন তুমি একটু বসো, আমাদের পাড়ায় একটী মেয়ের বড় অসুখ, সমস্ত দিন তাকে দেখিতে যাইতে পারি নাই, এখন একবার তাকে দেখিয়া আসি। আমার স্বামী এলে এখানি তুমি তাঁকে দিও, তিনি তোমায় কিছু ভিক্ষা দিবেন। আমি এখনই আসিতেছি।" এই কথা বলিয়া মাধুরী দ্রুতপদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ভিখারিণী কতক্ষণ এই ভাবে বসিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে শয্যাপ্রান্তে জানালার দিকে বসিয়া কলিকাতার রাস্তার জনস্রোতের দিকে চাহিয়া রহিল। মনে কত ভাবনা, সে ভাবনার শেষ নাই! মাধুরীর কার্য্যকলাপ তাহার মনে এক অদ্ভুত স্বপ্নরাজ্যের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল, সে সেই কল্পনার বিপুল তন্ময়তার মধ্যে আপনাকে এমনই ভাবে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল যে বসন্তকুমার বাবু যখন সেই কক্ষে প্রবেশ করেন তাঁহার পদশব্দও সে শুনিতে পায় নাই, তারপর যখন বসন্তকুমার বাবু ধীরে ধীরে শয্যাপার্শ্বে যাইয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে হস্তার্পণ করিয়া ডাকিলেন, "মাধু"—তখন সে সবিস্ময়ে ফিরিয়া চাহিল।

বসন্তকুমার বাবুকে দেখিবামাত্র তাহার মাথাটা যেন ঘুরিয়া গেল, সমস্ত দেহ যেন ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন তার চক্ষের সম্মুখে ঘুরিতে লাগিল—বায়ুতাড়িত বেতসের ন্যায় সে কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া গেল। আর বসন্তবাবু? তিনিও নির্ব্বাক নিশ্চল। তাঁহারও মস্তিষ্কে যেন একটা তীব্র যন্ত্রণা অনুভূত হওয়ায় তিনি দুই হস্তে সবলে মাথাটাকে চাপিয়া ধরিয়া শয্যার উপর বসিয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ এই ভাবে কাটিয়া গেল। তারপর বসন্তবাবু জড়িতস্বরে বলিলেন, "তুমি—তুমি—মৃণাল? তুমি—তুমি—তুমি এখানে কেমন ক'রে এলে?"

সেই স্বর—সেই পরিচিত প্রীতিসম্ভাষণ! এ সত্য, না স্বপ্ন? ভিখারিণী ভাবিল, এ সত্য, না স্বপ্ন? চক্ষে সেই চির-আরাধ্য দেবতাকে দর্শন করিতেছে, কর্ণে তাঁর আদর-মাখা প্রীতি সম্ভাষণ ধ্বনিত, বুঝি স্বপ্নের ঘোরে একটীবার মুহূর্ত্তের জন্য তাঁর পবিত্র স্পর্শসুখও সে অনুভব করিয়াছে! তবুও যেন তার মন প্রত্যয় করিতে চায় না। তার মনে হইতেছে এ সত্য, না স্বপ্ন! ভিখারিণী দুইহস্তে একবার চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া দেখিল—সেই মূর্ত্তি!

"মিনু—মৃণাল—।"

আবার সেই স্বর! ভিখারিণী আর একবার চক্ষু মার্জ্জন করিল। দুষ্ট অশ্রু কি অবাধ্য, তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতে দিতেছে না, মনের সঙ্গে তার চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিতে দিতেছে না। ভিখারিণী পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়া অবশেষে তার মনের সহিত চক্ষু কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন করিয়া ফেলিল। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বলিল, "তুমি—তুমি—তুমি আমায় ক্ষমা করো।"—ভিখারিণীর কথা বাধিয়া গেল, আর কিছু বলিতে পারিল না, অশ্রুরাশি যন্ত্রবিগলিত ধারে কাপাল বহিয়া ঝরিল, আর কিছুই দেখিতে পাইল

না। অপ্রত্যাশিত সুখে, মোহে, বিস্ময়ে আকুল হইয়া উঠিল, আর কিছু শুনিতে পাইল না, কি যেন একটা কিসের নেশায় বিভোর হইয়া পড়িল, কিছুতেই বসিয়া থাকিতে পারিল না—শিথিল মস্তক মাতালের মত বসন্তবাবুর পায়ের উপর ঢলিয়া পড়িল।

বসন্তকুমার ধীরে ধীরে ভয়ে ভয়ে অথচ অতি সাবধানে ভিখারিণীর অবশ দেহলতা বাহুবেষ্টনী দ্বারা আপন বুকে টানিয়া লইলেন। ভিখারিণীর শিথিল মুষ্টি হইতে লেফাপা-খানি পড়িয়া গেল।

"একি? কার পত্র? এযে মাধুর হস্তাক্ষর! একি, লেফাপার উপর যে তাঁহারই নাম! বসন্তবাবু কম্পিত হস্তে লেফাপা খানি খুলিলেন—পত্রে লেখা ছিল :—

প্রিয়তম,

তোমার উপদেশ এবং তোমারই সংশিক্ষা পাইয়া আমার মনকে এবং তার প্রবৃত্তিগুলিকে ঠিক তোমারই মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছি। তুমিই আমায় শিখিয়েছ, বিপন্নকে বিপন্মুক্ত করতে, প্রার্থীকে প্রার্থিত বস্তু দান করতে, আতুরের সেবা করতে; তাতে যদি সর্ব্বস্বান্ত হতে হয়, মনে এতটুকুও দ্বিধা করতে নেই। আজ আমি তোমারই আশীর্ব্বাদে প্রার্থীকে প্রার্থিত বস্তু—আমার সর্ব্বস্ব দান করলুম। আর আমার কিছুই নেই, শুধু এই দেহ আর প্রাণ—তাও আতুরের সেবায় উৎসর্গ করতে বসেছি, আশীর্ব্বাদ কর যেন সফলকাম হই। ইতি

সেবিকা মাধু—

বসন্তকুমার বাবু পত্রখানি পড়িয়া আকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "মাধু—মাধু" সেই সঙ্গে সদর রাস্তায় একজন ফিরিওয়ালা হাঁকিল "বরফ মালাইকা"—

বসন্তকুমারবাবু উন্মত্তের ন্যায় কক্ষ হইতে বাহিরে যাইতেছিলেন, দ্বারে আসিয়া দেখিলেন সম্মুখে মাধুরী। মাধুরীর বড় দোষ, সে একটু কিছু হলেই খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠে। বসন্তকুমারের কার্য্য দেখিয়া এবারেও সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। বসন্তকুমার সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "মাধু, এ কি রকম কাণ্ড তোমার? অমন করে চিঠি লেখে?" মাধুরী এক গাল হাসিয়া বলিল, "তোমারই বা এ কিরূপ বিচার? তোমরা পুরুষজাতি এত নিষ্ঠুর? তোমারই বিবাহিতা পত্নী আজ তোমারই দ্বারে ভিখারিণীর ন্যায় ভিক্ষা করতে এসেছে—এই বুঝি পুরুষের কর্ত্তব্য জ্ঞান? তোমরা আবার লোককে কর্ত্তব্য জ্ঞানের উপদেশ দাও? দেখদেখি কেমন ওই মুখ খানি—কোন্ প্রাণে তুমি ওকে অমন ভিখারিণী সাজিয়েছ? জানো, স্ত্রীলোকের যদি কেউ শত্রু থাকে ত সে তার সতীন, তোমার উপদেশে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি আজ তোমার সেই পদদলিতা পরিত্যক্তা পরিণীতা পত্নীকে—আমার সতীনকে—আপনার বোনের মত বুকে টেনে নিয়েছি, আর তুমি আমার উপদেষ্টা, গুরু, স্বামীদেবতা হয়ে তার কি দশা করেছ বল দেখি?"

বসন্তকুমারের আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, তিনি কি মৃণালিনীকে পাইবার জন্য কম চেষ্টা করিয়াছেন? এজন্য তিনি কত উপেক্ষা, কত অপমান সহিয়াছেন, কিন্তু সকলই ব্যর্থ হইয়াছে, মৃণালিনী তাঁহার সকল আদর যত্ন পায়ে ঠেলিয়াছে, মৃণালিনীর পিতা পর্য্যন্ত জামাতাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়াছেন। উপায়ান্তর না দেখিয়াই ত তিনি মাধুরীকে বিবাহ করিয়াছেন। কিন্তু মৃণালিনী যে পথের ভিখারিণী সাজিয়াছে, তাহা ত তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন নাই! হৃদয়ের তীব্র অনুতাপের নিদর্শনস্বরূপ কয়েক বিন্দু উষ্ণ অশ্রু তাঁহার কপোল বহিয়া ঝরিয়া পড়িল। দূরে সদর-রাস্তার ফিরিওয়ালা আবার ডাকিল "বরফ"—

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়।

পূজা

জগতের প্রাণ, ওগো জগতের আলো,
যার দুঃখে ঝরে আঁখি, যারে বাসি ভালো
কৌতুকে লুকায়ে তার মরমের মাঝে
লহ কি গো পূজা মম নব নব সাজে?
তাই হোক্—তাই হোক্। হে বিশ্বদেবতা,
ঘুচাইয়া দিয়ে সব মর্ত্ত্য আবিলতা
হে শুভ্র, হে প্রাণারাম, হে সুন্দরতম!
লহ এইরূপে পূজা উপহার মম।

শ্রীসরোজবাসিনী গুপ্তা।

স্বাস্থ্য-কথা

স্বাস্থ্যের লক্ষণ

চিকিৎসা পুস্তকসমূহ রোগের কারণ, লক্ষণ এবং রোগের বর্ণনায় পূর্ণ। সাধারণতঃ লোকে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করে না, রোগ আরোগ্যের জন্যই তাঁহাদের শরণাপন্ন হয়। 'আমার স্বাস্থ্য এক্ষণে ভাল আছে; কি করিলে স্বাস্থ্য এইরূপ রাখিতে সক্ষম হইব সে বিষয়ে উপদেশ দিন'—ডাক্তার ডাকিয়া কেহ এরূপ বলে না। রোগ হইলে তাহা আরোগ্যের জন্য তবে চিকিৎসকের সন্ধান করে। এই সকল কারণে চিকিৎসকগণ রোগচর্চ্চা অপেক্ষা স্বাস্থ্যচর্চ্চায় মনোযোগ করেন না। সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষায় তাঁহাদের হিত নাই, ইহার বিপরীত অবস্থাই তাঁহাদের জীবিকা অর্জ্জনের উপায়। যদি চিকিৎসকগণকে সমাজের স্বাস্থ্যানুযায়ী দর্শনী দেওয়ার ব্যবস্থা থাকিত এবং প্রত্যেক মহামারী ও রোগের সময় তাঁহাদের প্রাপ্যের পরিমাণও কমাইয়া দেওয়া হইত, তাহা হইলে রাজকীয় স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় আইন সমূহ প্রচারের বিশেষ আবশ্যকতা থাকিত না।

সৈনিকের কাছে যেমন যুদ্ধের এবং উকীলের কাছে কলহের আদর সেইরূপ চিকিৎসকের কাছে রোগের আদর দেখা যায়। যদি ব্যবসায়ী (professionnl) শান্তি-সংস্থাপক থাকিত এবং তাহাদের কৃতকার্য্যতার অনুযায়ী সম্মান এবং অর্থ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকিত তাহা হইলে আমাদের অবস্থা অন্য রূপ হইত। সমাজের লোকের স্বাস্থ্য ভাল থাকা, কেহ রোগশূন্য থাকা কিংবা কাহারও রোগ শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্য হওয়া চিকিৎসকের পক্ষে সুবিধাজনক নহে। প্রতিদিন রোগ যত আরোগ্যের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, চিকিৎসকের আয়ের আশাও তত কমিয়া আসে।

দেহের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির অবস্থাই দেহী জীবের স্বাস্থ্য—আর সুখের অবস্থাই চৈতন্য-বিশিষ্টের স্বাস্থ্য। শারীরিক গঠন, মানসিক শক্তি এবং নৈতিক বলের উৎকর্ষই মানবের স্বাস্থ্য।

মানবের সকল শক্তি ও সৎপ্রবৃত্তির পূর্ণবিকাশই স্বাস্থ্য। শারীরিক যন্ত্রণা ও মানসিক কষ্ট হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতাই স্বাস্থ্য।

স্বাস্থ্যই সৌন্দর্য্য, শক্তি, নিষ্কলঙ্কতা, পবিত্রতা এবং সুখ।

মানবের স্বাস্থ্যই সৃষ্টিকর্ত্তার অপূর্ব্ব শক্তি ও অসীম দয়ার পূর্ণ-পরিচায়ক।

যখন শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গসমূহ পূর্ণতা প্রাপ্ত এবং কর্ম্মক্ষম হয়, তখন তাহাদের মধ্যে পূর্ণ ঐক্য বিরাজ করে। যখন মানব দেহ ও মনে ঐক্য এবং শান্তি লাভ করে, তখন বিশ্ব ও বিশ্বস্রষ্টার সহিত তাহার সম্বন্ধও মধুময় হইয়া উঠে।

দেহের প্রত্যেক ক্ষুদ্র অঙ্গ, মনের প্রত্যেক শক্তি এবং আত্মার বল, সকলেরই ঐক্যের সহিত পূর্ণ বিকাশ আবশ্যক। তবেই মানবজীবনের পূর্ণ পরিণতি লাভ হয়; তখন নর-নারীর দেহে, চরিত্রে, জীবনে, সৌন্দর্য্য, শক্তি ও আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

সৌন্দর্য্যই —স্বাস্থ্যের প্রথম লক্ষণ। স্বাস্থ্যই পূর্ণতা আনয়ন করে এবং সমাক পূর্ণতাই সৌন্দর্য্য। প্রত্যেক উদ্ভিদ্ এবং প্রত্যেক প্রাণী যখন নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহারা সুন্দর হয়। নরনারীর দেহের প্রত্যেক অঙ্গই যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত এবং সম্পূর্ণ কলঙ্কহীন হয় তখনই তাহাদের সৌন্দর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

মস্তিষ্ক-বিজ্ঞানানুযায়ী সুগঠিত মস্তকই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। দর্শন, শ্রবণ ও ঘ্রাণ কার্য্যে সম্পূর্ণ উপযোগী চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকাই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। সুগঠিত ওষ্ঠ ও সুশ্রী দন্ত-বিশিষ্ট মুখই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। স্বকার্য্য সাধনে সমাক্ উপযোগী, উন্নত, পুষ্ট বক্ষঃস্থলই সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দদায়ক। সুগঠিত পেশীযুক্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। এক কথায় বলিতে গেলে, মানবশরীরের প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের, প্রতি স্নায়ু, অস্থি, মাংস, মাংসপেশীর (বৃদ্ধি ও গঠনের) সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে, দেহের শক্তিনিচয়ের স্বাভাবিক ক্রিয়ার কোন প্রকার ব্যাঘাত না ঘটিলে, কেশাগ্র হইতে পদের নখ পর্য্যন্ত সমস্ত দেহে এক অপরূপ মহিমা বিকশিত হয়।

যাঁহারা সৌন্দর্য্যপ্রিয়, এবং যাঁহারা নিজেদের, আপন সন্তানদের ও নিজ জাতিকে সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের স্বাস্থ্য-বিধানসমূহ পালন করিতে শিক্ষা

করা উচিত। সৎ হও, তাহা হইলে তুমি সুন্দর ও সুখী হইবে। প্রকৃতিপ্রিয় ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি যেন কখনও সৌন্দর্য্যের অনাদর না করেন। সকলেরই সৌন্দর্য্যপ্রিয় হওয়া এবং সৌন্দর্য্যের প্রার্থনা, প্রশংসা ও পূজা করা উচিত।

কর্ম্মশীলতা —স্বাস্থ্যের অপর একটি লক্ষণ। প্রত্যেক সুস্থ স্নায়ুই নিজ শক্তির ব্যবহারে ইচ্ছুক, প্রত্যেক সুস্থ পেশীই সঙ্কুচিত হইতে ইচ্ছা করে, প্রত্যেক শারীরিক ও মানসিক শক্তিই নিজ ক্ষমতানুযায়ী কার্য্য করিতে ও তাহার ফলভোগ করিতে উৎসুক। প্রতি ইন্দ্রিয় ও প্রত্যেক প্রাণিদেহই এই নিয়মে কার্য্য করে। সুস্থাবস্থায় আভ্যন্তরিক গ্রন্থিসমূহ হইতে স্রাব দ্রুত হয়, ক্ষুধা প্রবল থাকে, শীঘ্র পরিপাক হয়, রক্ত সঞ্চালন ও শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়। সর্ব্বাঙ্গের দ্রুত পুষ্টি হইতে থাকে। দেহ ও মন দুইই কর্ম্মশীল। সকল মানসিক ইচ্ছাই দ্রুত উৎপন্ন হয়। দেহে ও মনে শক্তি বিদ্যুৎবৎ কার্য্য করে। মানসিক চিন্তা ও ভাব, আশা ও আনন্দ দেহকে সতেজ সবল ও কর্ম্মক্ষম করে, দেহের স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্যে মনকে আশান্বিত, প্রফুল্ল, বলীয়ান করে। দেহে ও মনে প্রবল জীবনীশক্তির স্পন্দনে মানব পূর্ণ হয়, জীবন সুখকর, সুন্দর, সার্থক হয়।

অলসতা স্বাস্থ্যহীনতার লক্ষণ। নিষ্ক্রিয় ইন্দ্রিয় মাত্রেই অসুস্থ। অলস লোক স্বাস্থ্যহীন। তাহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইলেই অলসতা দূর হইবে। প্রত্যেক স্বাস্থ্যবান মানবই কর্ম্মঠ। সম্পূর্ণ সুস্থ লোকের কখনও অলসভাব আসিবে না।

শক্তি —স্বাস্থ্যের একটি লক্ষণ। অসঙ্গত শক্তি বা আক্ষেপ-বিশিষ্ট বল কোন রোগের লক্ষণ হইতে পারে কিন্তু অটল শক্তি সুস্থ দেহেই পাওয়া যায়। প্রকৃত শক্তি এবং দৃঢ় চরিত্র-বল পাইতে হইলে, সতেজ মস্তিষ্ক, স্নায়ু ও পেশী থাকা আবশ্যক। এই সকল, সতেজ, জীবনী-শক্তি হইতেই আইসে। প্রবল আশা, উৎসাহ ও দৃঢ় ইচ্ছাপূর্ণ মানবের জীবন সতেজ এবং সতেজ জীবনই অধিকদিন স্থায়ী ও স্বাস্থ্যবান।

দুর্ব্বলতা—শারীরিক বা মানসিক, উভয়ই রোগের লক্ষণ। পুষ্টির অভাব, ক্ষয় বা বংশের দোষ বা স্বোপার্জ্জিত দোষই দুর্ব্বলতার কারণ। যদি আমাদিগকে দুর্ব্বল, নিস্তেজ, আশাহীন, উৎসাহহীন ব্যক্তিগণকে দোষ দিতে হয়, তাহা হইলে যে কারণে তাহাদের এরূপ অবস্থা হইয়াছে, সেই কারণেরই দোষ দেওয়া উচিত। দুর্ব্বলতা অস্বাস্থ্যের লক্ষণ এবং যদি উপায় থাকে তাহা হইলে চিকিৎসার দ্বারা আরোগ্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

সুখ —স্বাস্থ্যের অপর একটি লক্ষণ স্বাস্থ্য ব্যতিরেকে কখনও সম্পূর্ণ সুখ ভোগ করা সম্ভব নহে। সুস্থ-দেহে সুস্থমনের বর্ত্তমানতাই সুখের অবস্থা, সুখই চৈতন্য-বিশিষ্ট জীবের চরম লক্ষ্য। সুখ ভিন্ন সৃষ্টির আর কোন বোধগম্য কারণ নাই। স্বাস্থ্যই প্রত্যেক প্রাকৃত-জীবনের যথার্থ এবং অপরিহার্য্য সুফল। অপ্রাকৃত জীবনের কাছেই সুখের ন্যায় দুঃখও অপরিহার্য্য। সকল প্রকারের অসুখ, বেদনা, দুঃখ, অনুতাপ, প্রতিহিংসা, অশান্তি, শারীরিক বা মানসিক রোগের ফল। রোগজনিত শারীরিক যন্ত্রণা ও মানসিক দুঃখ দুইএরই ফল এক। একটি পীড়িত ইন্দ্রিয়ের এবং অপরটি আহত মনের আর্ত্তনাদ। আমরা অপর লোকের সহিত সহানুভূতির সময় দুঃখ অনুভব করি, এরূপ অনেক ভাবপ্রবণ লোক আছেন যাঁহারা এই প্রকারে শারীরিক বেদনাও অনুভব করেন। স্বাস্থ্যবান হওয়াই সুখী হইবার একমাত্র পন্থা এবং স্বাস্থ্য যখন বিশ্বজনীন তখন কেন সুখের অভাব হইবে তাহার কোন কারণ দেখা যায় না। কোথাও স্বাস্থ্য ব্যতীত সুখ এবং সুখ-ব্যতীত স্বাস্থ্য থাকিতে পারে না।

বালকদিগের পুষ্টির অভাব

সহর বা নগরের পাঠশালায় ও স্কুলে যে তরুণ সুকুমার দল পাঠ করে তাহাদের মধ্যে অনেকেই অভুক্ত, অপুষ্ট, শ্রীহীন, বলহীন, স্বাস্থ্যহীন। তাহারা কোন বিশেষ ব্যাধিগ্রস্ত নয়, কোন রোগযন্ত্রণায় কাতর নয়, তথাপি তাহারা অক্ষম অসুস্থ দুর্ব্বল। পল্লীগ্রামে পাঠশালার ছুটির পর যে বালক-দল আনন্দে কোলাহল করিয়া গৃহে ফিরিতেছে, তাহাদিগকে দেখুন, আর বৈকাল ৪টার পর সহরের স্কুল হইতে যে শিক্ষার্থীগণ বাহির হইতেছে, তাহাদিগকে দেখুন, সেই ভবিষ্যতের জাতির ও সমাজের আশা ভরসা বালক-দিগকে দেখুন, দেখিবেন, কাহারো আনন বিশুষ্ক মলিন, কাহারো দেহ অতি শুষ্ক তালপত্রসম, কাহারো আকৃতি

খর্ব্ব, বয়সোপযোগী বর্দ্ধিত হয় নাই, কত জীর্ণশীর্ণ ভগ্ন দেহ। কোথায় শক্তিমান দেহ, পরিণত আকৃতি, বালকসুলভ আনন্দ, বিপুল প্রাণের প্রবাহ?

শিশুকালে প্রকৃত পুষ্টির অভাবেই বালকদিগের এইরূপ অস্বাভাবিক বর্দ্ধন। কেহ কেহ বলেন, কোমল স্বাস্থ্য, ভগ্নস্বাস্থ্য, বা উপদংশগ্রস্ত, দন্তারোগগ্রস্ত বা মদ্যপায়ী পিতা-মাতার সন্তানগণ এরূপ দুর্ব্বল কোমল ক্ষীণপ্রাণী অপরিণত হয়। তবে অধিকাংশ নবজাত শিশুই স্বাস্থ্যসম্পন্ন থাকে, নিয়মিতরূপে যত্ন সহকারে সেবাশুশ্রূষায় লালনপালন করিলে শিশু সবলদেহ, পূর্ণ পরিণত হয়। শিশুকালে মাতাপিতার লালনপালন দোষেই তাহারা স্বাস্থ্যসুখ হারাইয়া দুর্ব্বহ দুঃসহ ভারস্বরূপ জীবন দুঃখে বহন করে। গরীবের ঘরে যাহারা জন্মায় তাহারা বস্তুতই কৃপার পাত্র। মাতা নানা গৃহস্থালী কর্ম্মের মধ্যে ৫।৬টি শিশুসন্তানের উপযুক্ত সেবা করিতে পারেন না, পিতা অস্বচ্ছলতাবশতঃ পুত্রকন্যাদিগকে পুষ্টিকর আহার সামগ্রী খাওয়াইতে পারেন না; অস্বাস্থ্যকর গৃহে অনিয়মিত জীবন যাপনে, মাতাপিতার ব্যাধি দুঃখ দারিদ্র্য-ভারে কত শত শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়, যাহারা মরে না তাহারা এরূপ অস্বাভাবিকরূপে বর্দ্ধিত হয়। গরীবের গৃহে শিশুরা মরে যন্ত্রাভাবে, আর ধনীদিগের গৃহে শিশুরা মরে অতি যত্নে। সেখানে যত্নের অন্ত নাই, ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাওয়ান, ধূলা লাগিবে বলিয়া তাহারা খেলা ছুটাছুটি করিতে পায় না; বেশী হাওয়া লাগিবে বলিয়া গৃহের দরজা জানালা বন্ধ; সে রাজার মতন বেশে সজ্জিত মণিহার শোভিত শিশুর 'খেলাধূলা আনন্দ সকলি যায় ঘুরে, বসন-ভূষণ হয় যে বিষমভার।'

শিশুপালন যে কি দায়িত্বপূর্ণ পুণ্য কর্ত্তব্য তাহা সৎ-সন্তানদের মাতারাই জানেন। দেশের বালিকা-বিদ্যালয়-গুলির কর্ত্তৃপক্ষদিগের সমীপে আমাদের বিনীত অনুরোধ এই যে, আপনারা ভবিষ্যৎ জাতির মাতৃকুলকে গড়িয়া তুলিবার ভার লইয়াছেন; তাঁহাদের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও মহত্তম কর্ত্তব্য সুসন্তানপালন; এই শিশুপালন সম্বন্ধে তাঁহারা যাহাতে অভিজ্ঞ হন তাহার ব্যবস্থা করুন।

শিশুর আহার, বিহার, বেশভূষা, নিদ্রা ইত্যাদি সকল অভ্যাসগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আহারের নির্দ্দিষ্ট সময় থাকিবে, মধ্যবর্ত্তীকালে শিশু কোন আহার গ্রহণ করিবে না। কোন কোন মাতা, আমার ছেলে খুব কম খায় বলিয়া দুঃখ করেন, কোন কোন দিন জোর করিয়া খাওয়াইয়া বালকদিগের রোগ আনয়ন করেন; তাঁহারা জানেন না এ অগ্নিমান্দ্যের কারণ শিশুর অনিয়মিত আহার।

শিশুর শয়নকাল সর্ব্বদা নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। ছয় হইতে দশ বৎসর বয়স্ক বালকের ১০।১১ ঘণ্টা এবং দশ হইতে ষোল বৎসর বয়স্ক বালকের ৮।৯ ঘণ্টা ঘুমান উচিত। শিশুকাল হইতে যদি নিয়মিতরূপে ঘুমাইবার অভ্যাস গঠিত হয় তবে স্বাস্থ্যের সমূহ মঙ্গল হয়।

রাত্রি জাগরণ ও দিবায় উত্থান খুবই মন্দ অভ্যাস। কোন কোন পরিবারে শিশুগণ ১০।১১টা রাত্রি পর্য্যন্ত জাগে। শিশুদিগের বৃদ্ধির জন্য নিদ্রার অত্যন্ত প্রয়োজন। সকাল সকাল শুইয়া উষায় জাগিলে দেহে ও মনে এক নূতন শক্তি ও আনন্দের আবির্ভাব হয়। শয়নগৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও মুক্ত হওয়া উচিত। শিশুর ক্রীড়া বেশভূষা ইত্যাদি সকল-দিকে মাতার স্নেহের ও যত্নের দৃষ্টি থাকিবে। শিশুকালে সদ্‌অভ্যাস গঠিত হইলে এবং বয়োবৃদ্ধি সহকারে পালিত হইলে শিশু সুন্দর স্বাস্থ্যবান বালক ও প্রকৃত পুরুষ হইবে।

শিশুকে যথার্থরূপে লালনপালন না করিলে, মাতা-পিতাকে পরে অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হয়, শিশুর কথা আর কি বলিব। বালকের নিত্য অসুখ, মাতাপিতার চিন্তা ও কষ্টের অবধি নাই, পুত্রটি কৃশ, দুর্ব্বল, মলিন, ক্ষীণপ্রাণ। সংক্রামক ব্যাধির করালকবলে পতিত হইবার খুবই সম্ভাবনা; হাম, বসন্ত, হুপিংকাশি, নিউমোনিয়া, যক্ষ্মারোগ ইত্যাদি দ্বারা অতি সহজেই আক্রান্ত হইতে পারে। ব্যাধির পর ব্যাধি হইতেছে, মাতাপিতা জানেন না এ শিশু অপালনের ফল। বালকের মাংসপেশী দৃঢ় নয়, শীঘ্রই শ্রান্ত হয়, ক্রীড়া করিতে চায় না, রক্তসঞ্চালন অতি মৃদু, মাঝে মাঝে শীতস্ফোট (chilblain) হয়, অগ্নিমান্দ্য হয়, 'দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন',—এ সকলই শিশু অযত্নের ফল।

উপযুক্ত খাদ্যের অভাব, অনিয়মিত ভোজন, অস্বাস্থ্যকর গৃহে ও পল্লীতে বাস এবং মাতাপিতা হইতে প্রাপ্ত ব্যাধি ও

দৌরবলা এই কয় কারণেই দেশের বহু বালক অসুস্থ, পঙ্গু, তেজহীন, স্বাস্থ্যহীন।

বালক কেন পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিতেছে না, তাহা চালিতে হইবে, তাহার ওজন লইতে হইবে, বার বার চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করাইতে হইবে এবং কারণ নির্ণয় করিয়া তাহা দূর করিতে হইবে। বঙ্গীয় পিতৃমাতৃগণের এ মহান্ কর্ত্তব্য রহিয়াছে, ভবিষ্যৎ বংশের জন্য সকল কষ্ট সহ্য করিতে হইবে, ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে, তাহা না হইলে এ ক্ষীণজীবী বাঙ্গালী চিরকাল অর্দ্ধমৃত থাকিবে।

(স্বাস্থ্য সমাচার)।

শ্যামনগরের জমিদার

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

হেনরি ষ্টিফেনের কথা

ভারতবর্ষে তদন্ত উপলক্ষে আসিয়া সর্ব্বাগ্রে একটী ভ্রমণকারী সার্কাসের দল গঠন করিলাম। আমি যে একজন গোয়েন্দা, তাহা দলের কেহই জানিতে পারিল না। সার্কাসের দল লইয়া নানা স্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে কলিকাতায় আসিলাম। তখন শীতকাল। গড়ের মাঠে কিছুদিন সার্কাসের খেলা দেখান হইল। তারপর মফস্বলে বাহির হইলাম। ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে সরলপুর জেলার সদরে উপনীত হইলাম। সেখানকার একটী খোলা মাঠে আমাদের প্রকাণ্ড তাঁবু খাটাইয়া বাজী দেখাইতে লাগিলাম। টিকিটের মূল্য খুব কম করায় প্রতিদিন ও প্রতি রাত্রে বহুসংখ্যক দর্শক জমিতে লাগিল। সরলপুরের সদরে এইরূপে এক মাস কাটাইয়া শ্যামনগরে গমন করিলাম।

ঢাক ঢোল পিটিয়া, ভেরী বাজাইয়া, বহু চিত্রশোভিত অসংখ্য বিজ্ঞাপন বিলি করিয়া শ্যামনগরে আড্ডা গাড়িলাম। সেখানকার লোকেরা জানিল, সার্কাসের দল সেখানে এক মাসের বেশী সময় অবস্থান করিবে। বৈকালে একবার ও রাত্রি ৮টার সময় একবার, এই রূপ প্রত্যহ দুইবার বাজী দেখান হইতে লাগিল। আশাতীত দর্শক জুটিল। আমার এই দলে মোটা বেতনে কতকগুলি শ্বেতাঙ্গ লোক নিযুক্ত করিয়াছিলাম। তাহারা তৎপূর্ব্বে নামজাদা সার্কাসের দলে ছিল।

এইরূপে সার্কাসের দল লইয়া ভারতবর্ষের বহুস্থান ঘুরিলাম। বাংলা দেশের, বিশেষতঃ সরলপুর জেলার বহুপল্লী ঘুরিলাম। সেই সকল স্থানেও লোকদিগের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিলাম। অতি সাবধানতার সহিত তাহাদের কার্য্যকলাপ গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিলাম।

প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে আর বাকী রহিল না। সার্কাসের দল ভাঙ্গিয়া দিলাম, তদন্তের শেষ রিপোর্ট বড় লাট বাহাদুরের নিকট দাখিল করিলাম। আমার এই গোয়েন্দাগিরির কথা আর কেহ ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিল না।

পুরুষোত্তম কপর্দ্দীর কথা

(১)

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া মহাদেব গোপাল ও আমি, আমাদের দুই জনেই, বোম্বাই নগরের একটী বেসরকারী কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছি। এই কলেজের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অর্থে আমরা বিলাত যাই, সেই সময় আমরা এইরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হই যে বিলাত হইতে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া আসিয়া আমরা আমাদের কলেজে মাসিক একশত টাকা বেতনে আট বৎসর কার্য্য করিব। তাহার পর ইচ্ছা করিলে আমরা কলেজের কার্য্য ত্যাগ করিয়া অন্য কার্য্য গ্রহণ করিতে পারিব। কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ ইচ্ছা করিলে নিরূপিত সময়ের পূর্ব্বেই আমাদিগকে কলেজের কার্য্যত্যাগের অনুমতি দিতে পারিবেন।

আমরা দেশে ফিরিয়া আসিয়া প্রাণ মন দিয়া কলেজের অধ্যাপনা কার্য্য করিতে লাগিলাম। আমাদের বোম্বাইয়ে ফিরিয়া আসিবার প্রায় একবৎসর পূর্ব্বে এই সহরে কয়েকজন বাঙ্গালী সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক একটী সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আশ্রমটীর নাম "রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম।" সন্ন্যাসী হইলেও সাধারণতঃ সন্ন্যাসী বলিলে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি, তাঁহাদের সে সমস্ত কিছুই নাই। তাঁহারা গায়ে ছাই মাখেন না, চিমটা লইয়া, মাথায় জটা বাঁধিয়া, ধুনি জ্বালাইয়া গাছ তলায় বসিয়া, গাঁজায় দম দেন না।

তাঁহারা সকলেই উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী। তাঁহাদের পোষাক পরিচ্ছদ বাঙ্গালী ভদ্রলোকের মত। কেবলমাত্র তাঁরা প্রত্যেকে একটি গেরুয়া রঙ্গের চাদর ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাই হইতেছে রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত মুখ্য সেবকগণের চিহ্ন।

বোম্বাই রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে এইরূপ চারিজন সন্ন্যাসী বাস করেন। তাঁহাদের প্রধান হইতেছেন স্বামী অভেদানন্দ। ইঁহাদের প্রত্যেকেরই শরীর সুস্থ ও সবল, এবং বয়ঃক্রম পঁচিশ হইতে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে। তাঁহাদের—

"সৌম্য সহাস তরুণ বয়ান,
করুণা-কিরণে বিকচ নয়ান,
শুভ্র ললাটে ইন্দু সমান
ভাতিছে স্নিগ্ধ শান্তি।"

তাঁহাদের সেবাশ্রমে রোগপীড়িত নিরাশ্রয়দিগকে আশ্রয় দেওয়া হইয়া থাকে। সন্ন্যাসীরা সেই সকল রোগশোক ও দারিদ্রপীড়িত ব্যক্তিদিগের চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত যেখানে রোগ, যেখানে শোক, যেখানে বিপদ, সেইখানেই সন্ন্যাসীরা নির্ভীক চিত্তে গমন করিয়া রোগীকে শুশ্রূষা, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা, এবং বিপন্নকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। যে প্লেগের ভয়ে লোকে শিহরিয়া উঠে, যে বসন্ত রোগকে লোকে যমের অধিক ভয় করে, আমাদের রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের সন্ন্যাসীরা সেই সকল রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের নিকট অকুণ্ঠিত চিত্তে গিয়া তাহাদের প্রয়োজনীয় সকল কার্য্য করিয়া দেন। তাঁহাদের এই সকল কার্য্য দেখিয়া মনে হয় যেন তাঁহাদের "জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন।" তাঁহাদের আশ্রমের সেবকদের সম্বন্ধে একটী অতি সুন্দর নিয়ম আছে। সেটী হইতেছে এইরূপ—আশ্রমের দুই শ্রেণীর সেবক আছেন—মুখ্য সেবক ও গৌণ সেবক। যাঁরা মুখ্য সেবক তাঁহাদিগকে আশ্রমে বাস করিতে হয় এবং অবিবাহিত না হইলে কেহ মুখ্য সেবক হইতে পারেন না। তবে কেহ একবার মুখ্য সেবক হইলেই যে তাঁকে চিরকাল সেইভাবে থাকিতে হইবে তেমন কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম নাই। মুখ্য সেবক ইচ্ছা করিলেই তাঁহার পদ ত্যাগ করিতে পারেন। তাহাতে নিন্দা নাই। গৌণ সেবক সকলেই হইতে পারেন। গৌণ সেবকদিগকে আশ্রমের কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য অর্থ সাহায্য করিতে হয়।

বোম্বাইয়ের রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের মুখ্য সেবক চারিজন হইলেও ইহার গৌণ সেবকের সংখ্যা খুব বেশী। বোম্বাইয়ের গণ্যমান্য লোক মাত্রই এই আশ্রমের পৃষ্ঠপোষক। তাঁহারা এই আশ্রমের সাহায্যার্থে প্রচুর অর্থ দিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত মুখ্য সেবকেরা সাধারণ লোকদিগের নিকট হইতে আশ্রমের সাহায্যের জন্য অর্থাদি সংগ্রহ করেন। আশ্রমের সাহায্যার্থে যিনি যা দেন, তা যতই কেন সামান্য হউক না, সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে, এবং আশ্রমের সাহায্যার্থে সংগৃহীত অর্থাদির আয় ব্যয় পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত লোক নিযুক্ত আছেন। আমি এই সেবাশ্রমের একজন আয়ব্যয় পরীক্ষক। সেই সূত্রে এই আশ্রমের মুখ্য সেবকদিগের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছে। আমাদের বিলাতে অবস্থান কালে কৃষ্ণপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন বাঙ্গালীর সহিত আমার আলাপ হয়, সেই আলাপ ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হয়। সেই অবধি বাঙ্গালী মাত্রকেই আমি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকি। সেই জন্য, বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠিত এই সেবাশ্রমটী আমার অত্যন্ত আদরের বস্তু।

একদিন সন্ধ্যার সময় আমি রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে বসিয়াছি সেই সময় স্বামী অভেদানন্দ আশ্রমে ছিলেন না। আশ্রমের অন্য মুখ্য সেবক তিনজন তখন ভজন গাহিতেছিলেন। আমি তাঁহাদের সেই ভজন শুনিতেছিলাম। এমন সময় একটা ঘোড়ার গাড়ীতে করিয়া একটি অচৈতন্য ব্যক্তিকে লইয়া স্বামী অভেদানন্দ আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। স্বামী অভেদানন্দের মুখে শুনিলাম যে তিনি আশ্রমে ফিরিবার সময় এক ধীবর তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে তাহার বাটীতে গিয়া এক বিপন্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করিতে বলে। স্বামীজি ধীবরের বাটীতে গিয়া এই মূর্চ্ছিত ব্যক্তিকে দেখিতে পান। ধীবর বলে, যে সে ঐ মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে সমুদ্রের তীরে কুড়াইয়া পাইয়াছে। এখন সে তাহাকে লইয়া কি করিবে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া স্বামীজিকে ডাকিয়াছে। উপযুক্ত চিকিৎসা করিলে মৃতপ্রায় ব্যক্তি বাঁচিয়া উঠিতে পারে বিবেচনা করিয়া স্বামী অভেদানন্দ তাহাকে আশ্রমে আনিয়াছেন।

মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে আশ্রমে আনিবার পরই তাহার রীতিমত শুশ্রূষার ব্যবস্থা হইল। সেই ব্যক্তিকে দেখিয়া ভদ্রবংশসম্ভূত বলিয়া বোধ হইল। আমার মনে হইল যে, যেন আমি ঐ ব্যক্তিকে কোথাও দেখিয়াছি। কিন্তু তাহার মাথা, নাক, মুখ প্রভৃতি ফুলিয়া বিকৃত হওয়ায় আমি ঠিক করিতে পারিলাম না, আমি তাঁহাকে ইতিপূর্ব্বে কোথায় দেখিয়াছি।

তিন চারি দিন অনবরত শুশ্রূষার পর সেই ব্যক্তি সংজ্ঞালাভ করিলেন। সংজ্ঞালাভ করিবার পর, আশ্রমবাসী সন্ন্যাসীদিগের সেবা ও চিকিৎসার গুণে তিনি ক্রমশঃই সুস্থ হইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার আকৃতি স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। ক্রমে তিনি বিছানায় উঠিয়া বসিতে লাগিলেন। তাঁহার শরীরের যখন এইরূপ অবস্থা সেই সময় একদিন আমি তাঁহাকে দেখিতে গেলে তিনি আমাকে ইংরেজি ভাষায় বলিলেন, "মিঃ কপর্দ্দী, ভাল আছেন ত?" আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া রোগীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "হাঁ আমি ভাল আছি। কিন্তু আমি আপনাকে চিনিতে পারিতেছি না, অথচ মনে হইতেছে, আপনাকে যেন কোথায় দেখিয়াছি। সে জন্য ক্ষমা করিবেন।"

রোগী। আমার চেহারার কি এতই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে? আমার নাম রমানাথ সেনগুপ্ত।

এই কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত বলিলাম, "বলেন কি? আপনি মিঃ সেনগুপ্ত? হাঁ, হাঁ, ঠিক হইয়াছে। এখন আপনাকে চিনিতে পারিয়াছি। কিন্তু আপনার চেহারার অতি বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আপনারা ডেসডেমনা জাহাজের আরোহী ছিলেন। ডেসডেমনা ডুবিয়া গিয়াছে, এ সংবাদ পাইয়াছি। আপনি ঈশ্বর কৃপায় রক্ষা পাইয়াছেন। আপনাকে দেখিয়া যে আমার কত আনন্দ হইল তাহা আর কি বলিব। মিঃ চাটুর্য্যের খবর কি?

সেনগুপ্ত। আমরা একসঙ্গে জাহাজডুবী হই। তারপর তাঁর যে কি হইল তাহা কেমন করিয়া বলিব?

আমি। আপনি শুনিয়া সুখী হইবেন যে আপনি যাঁহাদের যত্নে ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিতেছেন, তাঁহারা আপনার স্বপ্রদেশবাসী বাঙ্গালী।

সেনগুপ্ত। হাঁ, আমি তাহা জানিতে পারিয়াছি।

আমি। আজ আর আপনাকে বিরক্ত করিব না। আপনি বড়ই দুর্ব্বল, আমার সঙ্গে এই অল্পক্ষণ কথা কহিয়াই আপনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

এই কথা বলিয়া আমি সেস্থান ত্যাগ করিয়া স্বামী অভেদানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তাঁহাকে, মিঃ সেনগুপ্তের সহিত আমার বিলাতে আলাপের কথা বলিলাম এবং জানিতে চাহিলাম যে মিঃ সেনগুপ্তের বাটীতে তাঁহার সংবাদ দেওয়া হইয়াছে কিনা। স্বামীজি বলিলেন যে, রমানাথের বড় ভাইকে এ সংবাদ দেওয়া হইয়াছে এবং তাঁহাকে এখানে আসিতে লেখা হইয়াছে।

ইহার কয়েক দিবস পর সংবাদ পাইলাম যে রমানাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বোম্বাই সহরে আসিতে দেওয়া হয় নাই, তাঁহাকে পথিমধ্যে পুলিশে আটক করিয়া পুনরায় বাংলা দেশে ফেরত পাঠাইয়াছে। রমানাথ ও রমানাথের দাদা বাংলার প্রসিদ্ধ জমিদার ও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রকারী বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়ের দলভুক্ত লোক বলিয়া গভর্ণমেণ্ট এই সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন। তবে, যে পুলিশের কর্ম্মচারী রমানাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে মধ্য পথ হইতে ফিরাইয়া দেন তিনি রমানাথের দাদাকে আশ্বাস দেন যে বোম্বায়ের রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে রমানাথের সুচিকিৎসা হইতেছে। সেখানে তাঁহার কোন অসুবিধা ঘটিলে তাঁহাকে গবর্ণমেণ্ট হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইবে।

সুতরাং রমানাথ এইরূপ রুগ্ন অবস্থাতেও কোন আত্মীয় স্বজনের দর্শন পাইলেন না। ক্রমশঃ তিনি সুস্থ হইতে লাগিলেন। অনবরত চার পাঁচ মাসের যত্ন ও সুচিকিৎসায় রমানাথ সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে বোম্বাই ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবার অনুমতি বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট দিলেন না। তখন রমানাথ অনন্যোপায় হইয়া বোম্বাইনগরে থাকিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া দিলেন। তিনি বিলাত হইতে এম্, ডি, উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত আয়ুর্ব্বেদ-সম্মত চিকিৎসা বিদ্যায়ও তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁহাকে সহায় পাইয়া রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের চিকিৎসা বিভাগের আশাতীত উন্নতি হইল। এক বৎসরের মধ্যেই রমানাথের চিকিৎসা-খ্যাতি বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তিনি সহরের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদিগের

মধ্যে একজন বলিয়া গণ্য হইতে লাগিলেন। তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্য, অমায়িক ব্যবহার, দরিদ্রের প্রতি দয়া ও নির্লোভিতা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহাকে বোম্বাই-বাসীর প্রিয়পাত্র করিয়া তুলিল।

রসায়ন শাস্ত্রে তাঁহার অসামান্য অধিকারের পরিচয় পাইয়া বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত করিলেন। তিনি বিনা পারিশ্রমিকে এই পদ গ্রহণ করিয়া তাঁহার উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় দিলেন। তাঁহার অধ্যাপনায় ছাত্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। এইরূপে চারিমাসকাল রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপনা করার পর বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচেনসেলার রমানাথকে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিলেন যে, "গভর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় অনুসারে আপনাকে অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে অতঃপর আপনাকে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতে দেওয়া হইবে না।" রমানাথ এই পত্র পাইয়া ভাইসচেনসেলারকে লিখিলেন, "আমি আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদপ্রার্থী হই নাই, আমি বিনা পারিশ্রমিকে রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতে সম্মত হই। আপনার পত্রের লিখিত গভর্ণমেণ্টের আদেশে আমার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। কিন্তু কি জন্য গভর্ণমেণ্ট এই রূপ আদেশ দিলেন, জানিতে ইচ্ছা করি।" ভাইসচেনসেলার এই পত্রের উত্তর দিলেন না। এই ব্যাপার লইয়া বোম্বায়ে খুব হৈ চৈ হইল। ছাত্রসম্প্রদায় ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া উঠিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ অনেক কষ্টে তাহাদিগকে থামাইলেন।

এই ঘটনার এক মাস পরে ইণ্ডিয়া গেজেটে এমন একটী সংবাদ বাহির হইল, যাহা পাঠ করিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

রমানাথ সেনগুপ্তের কথা

(১)

আমাকে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য করিবার একমাস পরে ইণ্ডিয়া গেজেটে এক ইস্তাহার বাহির হইল। তাহা পাঠ করিয়া জানা গেল যে বাংলাপ্রদেশের জমিদার বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার কলেজের অধ্যাপক যোগেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিনাবিচারে নির্ব্বাসনের আদেশ গভর্ণমেণ্ট প্রত্যাহার করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্টের খরচায় অতি শীঘ্রই তাঁহাদিগকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া হইবে।

এই ইস্তাহার প্রচারিত হইবার একমাস পরে বিষ্ণুপদ বাবুর এক টেলিগ্রাম পাইলাম। তিনি আমাকে অবিলম্বে তাঁহার বাটীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছেন। এই টেলিগ্রাম পাইয়া আমি সর্ব্বপ্রথমে বোম্বাই পুলিশের কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকট জানিতে চাহিলাম যে, "এখন আমার বোম্বাই ত্যাগ করিয়া বাংলায় যাইতে আপনাদের আপত্তি আছে কি না। বাংলায় যাইবার জন্য আমি বাবু বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়ের টেলিগ্রাম পাইয়াছি। এই দেখুন সেই টেলিগ্রাম।" পুলিশের কর্ত্তা আমাকে খুব খাতির দেখাইয়া বসাইলেন এবং বলিলেন যে, "এখন আপনি যেখানে ইচ্ছা সেইখানে যাইতে পারেন। আমরা গভর্ণমেণ্টের চাকর, আমাদিগকে গভর্ণমেণ্টের আদেশে অনেক সময় অনেক অপ্রীতিকর কার্য্য করিতে হয়। সেজন্য ক্ষমা করিবেন।" তাঁহার নিকট বিদায় হইয়া বাংলায় ফিরিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম।

মনে করিয়াছিলাম তিন চারদিনের মধ্যে বোম্বায়ের কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিতে পারিব। কিন্তু তাহা পারিলাম না। হাতের রোগীদিগের উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিয়া, বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্য্য শেষ করিতে একমাস লাগিল।

যেদিন যাত্রা করিব সেইদিন বোম্বাই ষ্টেশনে আমাকে বিদায় দিবার জন্য আমার অনেক বন্ধুবান্ধবের সমাগম হইল। অনেক গরীব লোক আমাকে দেখিবার জন্য ষ্টেশনে আসিল। তাহারা আমাকে বড় ভালবাসিত। বহুদিন পরে দেশে গিয়া আত্মীয় স্বজনকে দেখিবার জন্য মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেও, এখানকার বন্ধুবান্ধবদিগকে ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে বলিয়া হৃদয় বিষাদভারাক্রান্ত হইল। সজল নেত্রে তাহাদিগের নিকট শেষ বিদায় লইয়া গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

(২)

প্রথম কলিকাতায় আসিলাম। তারপর বাড়ী গেলাম। তারপর যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ

করিলাম। কৃষ্ণপদের পিতা বিষ্ণুপদ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে সাহসী হইলাম না। কোন্ মুখে তাঁহার সম্মুখীন হইব? কৃষ্ণপদকে সঙ্গে করিয়া কত উৎসাহে, কত আনন্দে, কল্পনা-নেত্রে ভবিষ্যতের কত সুখের ছবি আঁকিতে আঁকিতে, বিলাতে গিয়াছিলাম। এখন সেই কৃষ্ণপদকে সমুদ্রে বিসর্জ্জন দিয়া আমি কেমন করিয়া তাহার পিতার সম্মুখে দাঁড়াইব? জানি, বিষ্ণুপদ বাবু মহাপ্রাণ ব্যক্তি। সাংসারিক শোকদুঃখে তিনি মুহ্যমান হন না। কিন্তু একাকী তাঁহার সম্মুখীন হইতে আমার হৃদয় এমন অবসন্ন হইতেছে কেন? হায়! আমার প্রাণের বন্ধু কৃষ্ণপদ কি বাঁচিয়া আছে? আহা! ঈশ্বর করেন, যদি সে বাঁচিয়া থাকে, যদি সে আমার মত দৈবানুগ্রহে রক্ষা পাইয়া থাকে, তাহা হইলে কি সুখের বিষয় হয়! সে যে নিশ্চয়ই মরিয়াছে তাহা কে বলিল? আমার মন বলিতেছে সে বাঁচিয়া আছে। আমার সঙ্গে আবার তার সাক্ষাৎ হইবে। কবে হইবে? কে বলিবে কবে হইবে? এইরূপ চিন্তায় আমি কৃষ্ণপদ বাবুর সহিত সাক্ষাতে বিলম্ব করিতে লাগিলাম।

(৩)

কৃষ্ণপদ বাবু বোধ হয় আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন। আমি যোগেশ বাবুর সরলপুরের বাসায় ছিলাম; তিনি সেই সংবাদ পাইয়া, পূর্ব্বে কোন খবর না দিয়া, একদিন সন্ধ্যার সময় যোগেশ বাবুর বাসায় আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এইরূপ ভাবে তাঁহার সম্মুখে পড়িয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলাম। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার পদতলে বসিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলাম।

বিষ্ণুপদ বাবু আমাকে আলিঙ্গন করিয়া, তাঁর কোলের মধ্যে আমাকে টানিয়া লইয়া সস্নেহে আমার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। কয়েক মিনিট কেহই কোন কথা কহিতে পারিলাম না। অবশেষে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বিষ্ণুপদ বাবু আমাকে বলিলেন, "রমানাথ, তোমাকে দেখিয়া বড় সুখী হইলাম। আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে তুমি ইতস্ততঃ করিতেছ কেন? ঈশ্বরের অনুগ্রহে তুমি বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছ। যদি ঈশ্বরের অনুগ্রহ হয়, আমরা কৃষ্ণপদকেও ফিরিয়া পাইতে পারি। যতদিন তাহাকে না পাওয়া যায়, অথবা তাহাকে যদি আর নাই-ই পাওয়া যায়, ততদিন আমরা আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে পারি না। আমি যে উদ্দেশ্যে তোমাদের কয়জনকে বিলাতে পাঠাইয়াছিলাম, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। তোমরা সকলেই তোমাদের নির্ব্বাচিত বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়াছ, এখন আমার সংকল্পিত বিজ্ঞান কলেজ স্থাপন ও আমার যে কলেজ ও আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় এখন আছে সে দুইটীর উন্নতি বিধান করা আমার সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে। আমি মনে করিয়াছি যে আমার সংকল্পিত কার্য্য অতি শীঘ্রই শেষ করিব। শুভকার্য্যে নানা বিঘ্ন। মানুষের শরীর অনিত্য। মরণের অবধারিত কাল নাই। হরকুমার ও বিনয়চন্দ্রকে এখানে আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করা হইয়াছে। যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, তাহার জন্য অনুশোচনা করিয়া ফল নাই। তোমরা আমার সংকল্পিত বিষয় কার্য্যে পরিণত করিতে আমার সহায় হও।" ইহার পর আমি আর কি বলিব। বিনীতভাবে বলিলাম, "আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাই শিরোধার্য্য করিয়া লইব।" সেদিন আর কোন কথা হইল না।

(৪)

যথাসময়ে হরকুমার বিলাত হইতে নির্বিঘ্নে ফিরিয়া আসিলেন। সেই সময় প্রিবিকাউন্সিলে বিষ্ণুপদ বাবুর একটি মোকদ্দমা ছিল। সেই মোকদ্দমায় বিষ্ণুপদ বাবুর পক্ষে ব্যারিষ্টার ছিলেন মিঃ মরিশ ও বিনয়চন্দ্র। মুসলমান জমিদারের যে জমিদারী রেহানী ডিক্রীজারীতে নীলাম খরিদ করা লইয়া বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত বিষ্ণুপদ বাবুর মোকদ্দমা হয় প্রিবিকাউন্সিলের ' এই মোকদ্দমা সেই জমিদারী সংক্রান্ত মোকদ্দমার আপীল। বিষ্ণুপদ বাবু এই মোকদ্দমায় সরলপুরের সবজজ আদালতে ও কলিকাতার হাইকোর্টে জয় লাভ করেন। সেইজন্য বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় প্রিবিকাউন্সিলে এই আপীল করিয়াছেন।

প্রিবিকাউন্সিলে বিষ্ণুপদ বাবুর এই মোকদ্দমার আপীলের শুনানি অতি শীঘ্র হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া বিনয়চন্দ্র হরকুমারের সহিত দেশে ফিরিতে পারিলেন না আপীলের ফলাফল দেখিয়া তিনি দেশে ফিরিবেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত

সমাজে নারীর স্থান

The hand that rocks the cradle rules the world—যে হাতখানি শিশুর দোলনায় দোল দেয় তাহাই সাম্রাজ্য শাসন করে,—ইংরেজী ভাষার একটী সর্ব্বজনবিদিত প্রবাদ বাক্য। ইহার অর্থ—নারীজাতিই রাজ্যের বর্ত্তমানের পরিচালিকা এবং ভবিষ্যতের নিয়ন্ত্রী। অন্য কথায় ইহার অর্থ—কোন জাতির নারীরা যেমন জাতিটীও তেমন। কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ গুণগুলি প্রধানতঃ তাহার অন্তর্গত নারীদিগের দ্বারাই গঠিত হয়। অন্যান্য প্রভাব নারীর প্রভাবের নিম্নে। শৈশবাবস্থায় মানুষের উপর যে প্রভাব প্রধান ভাবে কাজ করে তাহা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী প্রভাব আর কিছু নাই বলিলেই চলে। জননীর প্রভাবের অপেক্ষা মানবজীবনে আর কোন প্রভাবই শ্রেষ্ঠ নহে। একজন পণ্ডিত লোক বলিয়াছেন, কোন দেশের নারীজাতির অবস্থা যদি আমাকে বল, আমি সে দেশের অবস্থা তোমাকে বলিয়া দিতে পারি। কোন দেশের নারীগণকে যদি শুধু গৃহস্থালী কর্ম্ম নির্ব্বাহের যন্ত্র মাত্র বলিয়া মনে করা হয় তবে সে দেশের নিকট হইতে বেশী কিছু আশা করা যায় না। যে কোনও উন্নত জাতির সৌভাগ্যের মূল অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই জাতির নারীদিগের প্রভাব সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে তাহার এক প্রধান কারণ। নারীগণ যদি মূর্খ ও অশিক্ষিত হয় তাহা হইলে অন্যান্য শত সুবিধা সত্ত্বেও জাতির জড়তা অনিবার্য্য। এই কথাগুলি গোঁড়ামির কথা নহে, সমাজের গঠন ও উন্নতির বিধানগুলি যত্ন পূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ করিলেই কথাগুলির সত্যতা বুঝিতে পারা যাইবে। নারীর সাহায্য ছাড়াও কোন কোন স্থলে উন্নতি দেখা যাইতে পারে; কিন্তু কোন্ কোন্ কারণের মিলনে এই উন্নতি, আমরা যে তাহার সকলগুলিই বুঝিতে পারি তাহা নহে। জাতির অর্দ্ধাংশ উন্নত হইয়াও যদি অপর অর্দ্ধাংশ জড়তাগ্রস্ত থাকে তবে উন্নতির পথে সে জাতি কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারে না।

ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব্বে নারীগণ শুধু ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নয়, সামাজিক স্বাধীনতাও ভোগ করিত। স্ত্রীপুরুষের শারীরিক ও মানসিক শক্তির পার্থক্য অল্পই ছিল। বর্ত্তমান অসভ্যজাতিগুলির মধ্যে স্ত্রীজাতির অবস্থা দেখিলেই একথার সত্যতা বুঝিতে পারা যায়।

বিদেশীয়েরা অনেক সময় মনে করেন, ভারতের নারীগণ গৃহের দাসীরূপেই ব্যবহৃত হন। ঘর সংসারের কাজে দাসীর ন্যায় খাটিতে কিছু মাত্র দোষ বা লজ্জার কথা নাই। কিন্তু তাহারা যদি মনে করেন, ভারত-নারী ক্রীতদাসীর ন্যায়, এবং সমাজের উপর তাহাদের কিছু মাত্র প্রভাব নাই তাহা হইলে তাঁহারা নিতান্তই ভ্রান্ত। নারীর প্রভাব এদেশে কম নয়, এবং এই প্রভাব কোন কোন স্থলে সুফলও প্রসব করে।

বৈদিক যুগে ভারতের নারীগণ পুরুষের সহিত মিলিত ভাবে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন এবং এক সঙ্গে ধর্ম্মসাধন করিতেন। অনেক সুশিক্ষিতা নারী শিক্ষা ও সাধন বলে ঋষিপদবাচ্য হইয়াছিলেন, তাঁহারা স্বয়ং বেদমন্ত্র রচনা করিতেন। তখনকার দিনে নারীর স্বাধীনতার উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হইত না, সমাজে তাহাদের যে ন্যায্য স্থান ছিল তাহা হইতে তাহাদিগকে দূরে রাখিতে কেহ চেষ্টা করিত না। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে নারীর অবগুণ্ঠনের উল্লেখ আছে, কিন্তু অবরোধের উল্লেখ কোথাও নাই। চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হইতে, হিন্দু সভ্যতার উষাকালের সময় হইতে, হিন্দুনারী সমাজে অতি উন্নত স্থান অধিকার করিতেন; তাঁহারা সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইতেন, বড় বড় রাজকীয় সভায় উপস্থিত হইতেন, প্রকাশ্য ভাবে যত্রতত্র বিচরণ করিতেন; তৎকালীন জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনায় খ্যাতি অর্জ্জন করিতেন, এমন কি, রাজনৈতিক আলোচনায় ও শাসন কার্য্যেও তাঁহারা দক্ষতা প্রদর্শন করিতেন।

রামায়ণ মহাভারতে নারীর যে গৌরবময় চিত্র অঙ্কিত আছে, পৃথিবীর আর কোন সভ্যজাতির সাহিত্যে তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর চিত্র নাই। পরবর্ত্তী যুগেও ভারত-বাসীগণ জাতীয় উন্নতির পক্ষে নারীর প্রভাবের প্রয়োজন স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। অবরোধ প্রথা এবং নারীর অবনতিকর অন্যান্য প্রথার কোন উল্লেখ প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায় না। এই সকল প্রথা অল্পাধিক পরিমাণে মুসলমান বিজয়ের ফল। যাহা মুসলমান বিজয়ের ফল

ভ্রান্তিবশতঃ তাহাই অনেকে হিন্দুর প্রাচীন সামাজিক প্রথা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। সুখের বিষয়, ক্রমে ক্রমে সেই ভ্রান্তি দূর হইতেছে।

আমাদের সম্রাজ্ঞী মেরী পীরিতে-মহিলাদের অভ্যর্থনা সভায় বলিয়াছিলেন, "ভারত-নারী স্বীয় প্রভাবে গৃহের কি চমৎকার উন্নতি সাধন করিতে পারেন ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাহার সুন্দর প্রমাণ রহিয়াছে। ভারতের জননীগণ তাঁহাদের সন্তানগণের হৃদয়ে যে সকল মহৎ গুণ অনুস্যূত করিয়া দিয়াছেন, তাহার ফলে ভারতবাসীগণ যে সকল মহৎকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন তাহার বর্ণনায় ভারতবর্ষের ইতিহাসের পৃষ্ঠা সুরঞ্জিত। অবরোধের অন্তরালে ধীরে ধীরে ভারত-নারীর শক্তি ফুটিয়া উঠিতেছে দেখিয়া আমি অতি গভীর আনন্দ লাভ করিয়াছি।"

সম্রাজ্ঞীর উল্লিখিত নারীশক্তির বিকাশ অতি ধীরে ধীরে হইতেছে। এই শিথিলতার জন্য তাহারাই দায়ী—যাহাদের এই বিকাশে সাহায্য করিবার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। নারীদিগের সহায়তার অভাবে দেশ কত পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতেছে শিক্ষিতগণ যদি তাহা ভাল করিয়া চিন্তা করিতেন, তাহা হইলে এ বিষয়ে তাহাদের প্রকৃত দায়িত্ববোধ জন্মিত। ভারতবর্ষের জনসংখ্যা ত্রিশ কোটী। তাহার অর্দ্ধেক স্ত্রীলোক। জাতীয় জীবন উন্নত করিতে এই পোনর কোটী স্ত্রীলোক কিছুই করিতেছে না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। জাতীয় উন্নতি সাধনে যে স্ত্রীলোকদের ইচ্ছা নাই, তাহা নহে। তাঁহাদিগকে শিক্ষা দেও, গড়িয়া তোল, সুযোগ দেও, তাহারা পুরুষের উপযুক্ত সঙ্গিনী নিশ্চয়ই হইতে পারিবে।

প্রাচীন গ্রীকদিগের সামাজিক রীতি নীতি আলোচনা করিয়া, এবং প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যে নারীর প্রতি গ্রীকদিগের প্রচুর শ্রদ্ধার উল্লেখ করিয়া একজন বড় ইংরেজ লেখক লিখিয়াছেন, "নারীর প্রতি শ্রদ্ধা স্বাধীন জাতি সমূহের একটা বিশেষত্ব, আর নারীর প্রতি অবহেলা অসভ্যতা ও দাসত্বের চিহ্ন।" ভারতবাসী নারীগণকে শ্রদ্ধাই করিয়া থাকে। কিন্তু শ্রদ্ধা-উৎপাদক গুণ নারীতে না থাকিলে সে শ্রদ্ধা কতদিন টিকিতে পারে? পারিবারিক জীবনে সম্পর্কগুণেই স্নেহ ভালবাসার উৎপত্তি হয়; কিন্তু গৃহের বাহিরে শ্রদ্ধা উদ্রেক করিবার মত গুণ নারীতে না দেখিলে তাহাকে লোকে শ্রদ্ধা করিবে কেন? ভারতনারীকে যদি সমাজে তাহার ন্যায্য স্থান অধিকার করিতে হয় তবে তাহার আভ্যন্তরীণ শক্তির বিকাশ সাধন করিতে হইবে, এবং পারিবারিক কর্ত্তব্যের ন্যায় সামাজিক কর্ত্তব্যগুলিও যে অবশ্যকর্ত্তব্য, এই অনুভূতি লাভ করিতে হইবে।

নারীর উন্নতির প্রথম উপায় স্ত্রীশিক্ষা। তাহাদের অন্তরে জ্ঞানের আলোক প্রজ্বলিত না হইলে সমাজে তাহাদিগকে অধিক অধিকার দেওয়া বৃথা। নিজের, নিজ কর্ত্তব্যের, পারিপার্শ্বিকের ও জগতের জ্ঞান না জন্মিলে স্বাধীনতা লাভ ও স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার জন্মে না; আর স্বাধীনতা না হইলে সমাজের উন্নতি সম্ভব নহে। যে সমাজের স্ত্রীপুরুষ সকলের বা প্রায়-সকলেরই মানসিক শক্তির সুন্দর বিকাশ হইয়াছে, ও মনের বিশালতা জন্মিয়াছে সেই সমাজ উন্নত না হইয়াই পারে না। ইউরোপ ও আমেরিকার লোক যে উন্নতি সোপানে এতটা আরোহণ করিতে পারিয়াছে, তাহার কারণ শুধু তাহাদের জাতির বিবিধ সদ্‌গুণ নহে—তাহার একটা প্রধান কারণ তাহাদের স্ত্রীজাতি শিক্ষালাভ করিয়াছে। তাহাদের সভ্যতা ও সমাজে যে সকল দোষ আছে তাহার প্রধান কারণ শিক্ষাপ্রণালীর দোষ। এশিয়ার মধ্যে জাপানের দৃষ্টান্ত আমাদের অনেকটা আদর্শ স্থল। জাপানের উন্নতির এক প্রধান কারণ স্ত্রীপুরুষের শিক্ষা। শিক্ষালাভের উপযুক্ত-বয়স্ক প্রত্যেক বালিকাকেই স্কুলে যাইতে হয়। শুধু তাই নয়, সাধারণ শিক্ষার পর প্রত্যেক বালক বালিকাকেই নিজ নিজ বিশেষত্ব অনুসারে জীবন-সংগ্রামের উপযোগী শিক্ষা দেওয়া হয়। স্ত্রীস্বাধীনতা বলিতে আমরা অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার হইতে নারীদিগের মুক্তি লাভই বুঝিয়া থাকি।

আমাদের শাসক সম্প্রদায় বলেন, পুরুষদিগকে শিক্ষা দিয়া এদেশের শিক্ষা ও নীতির যতটা উন্নতি হইয়াছে নারীদিগকে শিক্ষা দিলে তদপেক্ষা অধিক উন্নতি হইত।

কিন্তু নারীর পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা উপযোগী কিনা এবিষয়ে মত-পার্থক্য আছে। ভারতীয় সমাজ যে ভাবে গঠিত এই অবস্থায়, এবং ভারত-নারীর স্বাস্থ্য যেরূপ তাহাতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নারীকে দেওয়া উচিত কিনা

এবিষয়ে মতদ্বৈধ দেখা যাইতেছে। এবিষয়ের মীমাংসা সহজ নহে। প্রত্যেক বালককে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা দেওয়া উচিত কিনা—এই প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। বালক অথবা বালিকা কিরূপ শিক্ষালাভ করিবে তাহা প্রধানতঃ তাহার মানসিক শক্তি, মনের গতি, তাহার আদর্শ আকাঙ্ক্ষা, সামাজিক অবস্থা ও আর্থিক সঙ্গতির উপর নির্ভর করে। যদি কোন বালিকার মানসিক শক্তি থাকে, স্বাস্থ্য থাকে, তাহার পিতামাতার আর্থিক সচ্ছলতা থাকে তবে তাহার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের পথে আমি কোন বাধা দেখি না। এরূপ উচ্চশিক্ষাকে কেহ দোষাবহ বলিতে পারেন না। জ্ঞানই—শক্তি ও আনন্দের উৎস। সুবিধা পাইলে উচ্চশিক্ষিতা মহিলা দেশের নারী-সম্প্রদায়ে এবং সমাজে নিজের উন্নত প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন এবং নিজেও সুখী হইতে পারেন; কারণ জীবনে যে সকল সুযোগ ও অধিকার লাভ করা যায়, তাহার ব্যবহারেই সুখ। এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালীতে দোষ আছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই শিক্ষা দ্বারা তাহাদের অশেষ উন্নতি হয়, তাহাদের দৃষ্টি প্রসারিত হয়, মন উদার হয়,—সুতরাং সমাজের উন্নতি হয়। * (ক্রমশঃ)

ঈশা খাঁ.

প্রথম পরিচ্ছেদ

বঙ্গের গগন-প্রাঙ্গন হইতে বর্ষার ঘনঘটা সবে মাত্র অপসারিত হইয়া গিয়াছে। মেঘমুক্ত গগন নব ধৌত সুনীলতার বিরাট মহাসাগরের মত আপনার উদার বক্ষ প্রসারিত করিয়া দিয়াছে। তাহার নিম্নে সুফলা সুফলা মলয়জ সুশীতলা জননী বঙ্গভূমির এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে। বসন্তের ঈষদুদ্ভিন্ন যৌবনের নবশ্রী বিমণ্ডিতা, পিকরব-মুখরিতা, কুসুমহার-পরিশোভিতা বঙ্গভূমির যে চিত্র তাহার সন্তানের নয়ন-সমক্ষে উদ্ভাসিত হইয়াছিল; নিদাঘের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপ-পরিক্লিষ্টা, ঘনায়তন সবুজ মখমল বিমণ্ডিতা দেশ-মাতৃকার যে রমণীয় ছবিখানি দেখা দিয়াছিল; বর্ষার অবিশ্রাম বর্ষণ-দাতা শস্য-সম্ভার-পরিপূর্ণা নদী চকল তরঙ্গলীলাময়ী জননীর শান্তিরূপিনী মূর্ত্তি,—কিছুই আর এখন নাই। এখন দিকে দিকে মায়ের জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তির বিকাশ। শরতের আগমনে বঙ্গজননীর শ্যামল ধানের ক্ষেতের উপর দিয়া বাতাসের ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে। পিক পাপিয়া শ্যামা সহস্রের কণ্ঠজাত মধুর কাকলিধ্বনিতে বঙ্গের পল্লী মুখরিত! কাশ, কুন্দ, রজনীগন্ধার অমল ধবল হাসির সহিত শারদ জোছনার অপূর্ব্ব সম্মিলন! নদীর জলে ললিত লহরীর কি মধুর কল কল ধ্বনি!

এহেন শরৎকালের মধ্যাহ্ন সময়ে এক উন্নতবপুঃ, তেজঃপুঞ্জ বলিষ্ঠ যুবক, উচ্চৈশ্রবা-প্রতিম অশ্বে আরোহণ করিয়া ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তটে আসিয়া, অশ্বের রশ্মি সংযত করিলেন। যুবকের বয়স পঞ্চত্রিংশ বর্ষের ন্যূন হইবে না। যুবকের বসন ভূষণ বহু মূল্যবান্। মাথায় মণিখচিত অপূর্ব্ব উষ্ণীষ মধ্যাহ্ন সূর্য্য-কিরণে ঝকমক করিতেছিল। যুবকের কোষে রত্নালঙ্কৃত অসি অশ্বপার্শ্বে বিলম্বিত।

ক্ষণপরে একশত জন অশ্বারোহী সৈনিক আসিয়া যুবকের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। সকলেরই সুন্দর কান্তি, বলিষ্ঠ দেহ এবং চক্ষুতে তেজস্বিতার লক্ষণ প্রকটিত। যুবক তাহাদের মধ্যে একজনকে অঙ্গুলি-সঙ্কেতে আহ্বান করিবামাত্র,—সেও যুবক, তাহার দৈহিক সৌন্দর্য্য বা বেশ-ভূষার পরিপাটি কম ছিল না—আসিয়া অবনত মস্তকে অভিবাদন করিয়া, আদেশ প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান হইল।

প্রথমোক্ত যুবক কহিলেন, "কাশেম, তোমরা সকলেই শ্রান্ত হইয়াছ, এখানে তাঁবু ফেলিয়া বিশ্রাম কর। তোমাদের আহার্য্য সামগ্রী যাহা আছে, তাহাতেই তৃপ্ত হইতে হইবে। ব্রহ্মপুত্রের তীরে সুদূরবিসর্পী বনানীর সৌন্দর্য্য সন্দর্শন ও শীকরকণবাহী সমীরণ সেবন করিয়া সুস্থ হও, আমি একবার একাকী অরণ্য প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া আসিতেছি।

এই বলিয়া তিনি ধীরে অশ্ব চালনা করিয়া সেই অরণ্য-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন ত্রিশ চল্লিশ বৎসর বয়সে মানুষ বৃদ্ধ-সাজিত না, পঞ্চাশ বৎসরে জরাগ্রস্ত হইত না। প্রায় সকলেই শতবর্ষকাল জীবিত থাকিত। এখন আমাদের সে দিন আর নাই।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া যুবক দেখিলেন, এক অতি প্রাচীন বটবৃক্ষের মূলে সুগঠিত গৌরকান্তি, আজানু-

* শ্রীযুক্তা রমণী সিনাই বি, এ, কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার মর্ম্ম।

বিলম্বিত শ্বেতশ্মশ্রুরাজি-পরিশোভিত আজানু-বিস্তৃত জটা-জুটধারী এক অপূর্ব্ব মহিমময় তপস্বী নির্ব্বাত-নিষ্কম্প প্রদীপ শিখার ন্যায় বসিয়া আছেন। তাঁহার দেহে যেন অপার্থিব জ্যোতিঃ, নিমীলিত নেত্রদ্বয়ে ও সংবদ্ধ ওষ্ঠদ্বয়ে দয়া ও শান্তি বিরাজিত।

যুবক নির্নিষ্ট চিত্তে এই তপস্বীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার হৃদয়ে ভক্তির উদ্রেক হইল। তিনি মনে মনে কহিলেন, "খোদা, যদি আমায় বিষম অন্ধকারের মধ্যে এ আলো-রশ্মি, এ অপূর্ব্ব জ্যোতিষ্মান মণিখণ্ড দেখাইয়াছ, তবে আমায় ইহার অনুগ্রহভাজন করিয়া দাও। এই মহাত্মার অনুগ্রহেই যেন আমার ভবিষ্যৎ মঙ্গলময় হইয়া উঠে। অশ্বরশ্মি বৃক্ষশাখায় বন্ধন করিয়া যুবক ধীর পদবিক্ষেপে তপস্বীর সমীপবর্ত্তী হইয়া, ভূতলে উপবেশন করিলেন।

অনেকক্ষণ পরে যোগীর যোগভঙ্গ হইল। যুবক ভক্তি-পুলকিত চিত্তে ভূলুণ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করতঃ, কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন।

প্রসন্নবদন মহাপুরুষ স্নেহ-স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "কে তুমি বৎস, এই বিবিধ হিংস্রজন্তুসঙ্কুল নির্জ্জন বনপ্রদেশে আগমন করিয়াছ?"

যুবকের মনে হইল, তাঁহার কর্ণে স্বর্গের সুধা, মায়ের স্নেহবাণী, মাথায় ভগবানের আশীর্ব্বাদ এবং বক্ষে সফল-সিদ্ধির স্থির-নিশ্চয়তা এই কয়টী কথার ভিতর দিয়া আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এমন দয়া, এমন মধুর ভাষা!

যুবক ভক্তি-বিগলিত গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিলেন, "প্রভু অন্তর্য্যামী! আমি কি বলিব?"

"বৎস! আমি অন্তর্য্যামী নই। অন্তর্য্যামী স্বয়ং 'দীন্ দুনিয়ার' মালিক যিনি! আমি সামান্য ফকীর মাত্র। বল, তোমার পরিচয় কি এবং কেনই বা এখানে আসিয়াছ।"

যুবক কহিলেন, "প্রভু, আমি ঈশা খাঁ—। আমি সম্প্রতি একটু বিপদে পতিত, সেইজন্য এ প্রদেশে আগমন করিয়াছি। দিল্লীশ্বর বাদশাহ আকবর বঙ্গের ভৌমিকগণের উচ্ছেদ সাধন মানসে সুদক্ষ সেনানায়কগণের অধীনে অসংখ্য সৈন্য সজ্জিত করিয়াছেন। সৈন্যাধ্যক্ষ সাহাবাজ খাঁ আমাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, আমি পরাজয়ের ভাণ করতঃ আরাকান পর্য্যন্ত গমন করি; সাহাবাজ আমার পশ্চাদনুসরণ পূর্ব্বক চট্টগ্রামের অনতিদূরবর্ত্তী দ্বীপে সসৈন্যে অবস্থান করেন। আমি একদা অতর্কিতে তাঁহাকে আক্রমণ ও পরাস্ত করিয়াছি।

এই সংবাদ শীঘ্রই দিল্লীতে পঁহুছিবে। সম্রাট্ আকবর এই পরাজয় নীরবে সহ্য করিবেন না, করিতে পারেনও না। অগৌণে বিপুল বাহিনী ঈশাখাঁর বিরুদ্ধে আগমন করিবে। ভারতসম্রাটের সঙ্গে সম্মুখ সমরে অগ্রসর হওয়ার সাধ্য এখনও আমার নাই। আপন ধন সম্পত্তি ও পরিবারবর্গ নিরাপদ স্থানে রাখিয়া স্থানে স্থানে সম্রাটের সৈন্যগণকে আক্রমণ ও ক্লান্ত করাই আমার ইচ্ছা। তাই নিরাপদে একটী যোগ্য আশ্রয়স্থানের সন্ধানে আমি আসিয়াছি। ভগবানের কৃপায়, আমার সৌভাগ্যক্রমে প্রভুর চরণ দর্শনে কৃতার্থ হইয়াছি। আপনার চরণই এখন আমার একমাত্র আশ্রয়। আপনি আমার গুরু, আপনি আমার পিতা, আপনিই আমার সব। রাখিতে হয় রাখিবেন—নতুবা এই স্থানেই এ জীবনের পরিসমাপ্তি হইবে।"

ফকীর ততক্ষণ নয়নযুগল মুদ্রিত করিয়া কি ভাবিতেছিলেন। তাঁহার ললাটে চিন্তার রেখা দেখা যাইতেছিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে নয়নোন্মীলন করিয়া ফকীর কহিলেন, "বৎস ঈশা, সংসারের কণ্টককঙ্করাবৃত ভূমি পরিত্যাগ করিয়াছিলাম; তুমি আবার আমায় সেখানে লইয়া যাইতে আসিয়াছ কেন? অথবা ইচ্ছাময়েরই বুঝি সেইরূপ ইচ্ছা? আমি দেখিতেছি, তোমার ভাগ্যাকাশ নির্ম্মল, তাহাতে একবিন্দুও মেঘ দেখা যায় না।"

এমন সময়ে অদূরে সৈন্যগণের জয়ধ্বনি শ্রুত হইল। ফকীর কহিলেন, "যাও বৎস, তোমার সৈন্যগণ দীর্ঘকাল তোমার অদর্শনে চিন্তিত। আজ বিশ্রাম করগে। আশ্রমের নির্জ্জনতা ভঙ্গ করিও না। অপর কাহাকেও এই আশ্রমের বৃত্তান্ত জানাইও না। কাল প্রত্যূষে একবার সাক্ষাৎ করিও।"

ফকীরের পদধূলি মাথায় লইয়া ঈশা খাঁ প্রস্থান করিলেন। ক্রমশঃ—

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ভারত মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। (মনু)

The woman's cause is man's : they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free :
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall man grow ? (TENNYSON.)

বঙ্গানুবাদ :—স্ত্রী-পুরুষের উন্নতি অবনতি একসূত্রে গ্রথিত। নারী অনুন্নত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে পুরুষ কখনই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। (ব্রিটিশ রাজকবি লর্ড টেনিসন)

"I will be as harsh as truth, and as uncompromising as Justice ; I am in earnest— I will not equivocate I will not retreat a single inch —and I will be heard." (WILLIAM LLOYD GARRISON.)

মর্ম্মানুবাদ :—আমি সত্যের ন্যায় কঠোর ও ন্যায়ের মত অনমনীয় হইব। আমি দৃঢ়সংকল্প, আমি কিছুতেই এক তিলও পশ্চাৎপদ হইব না। আমি নিশ্চিত জানি, তোমার আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। (লয়ড গ্যারিসন)

১২শ ভাগ | শ্রাবণ, ১৩২৩। | ৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন ও নারী

সাহিত্য-সম্মিলনে মেয়েদের প্রবেশাধিকার লইয়া দেশের একদল সাহিত্যিক অনেকদিন হইতেই একটা বিশ্রী আন্দোলন করিয়া আসিতেছেন। সতীদাহ নিবারণ আইন, সম্মতি আইন প্রভৃতি নারীজীবন-রক্ষক বিধান বিধিবদ্ধ হইবার সময়ে যে দেশে 'ধর্ম্ম গেল' 'ধর্ম্ম গেল' রব উত্থিত হইয়াছিল, সে দেশের আর হাওয়াতে এরূপ আন্দোলনে বিচিত্রতা কোথায়! আমরা এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ভাবি, হতভাগ্য বাঙ্গালীজাতির পাপের ভরা কি এখনও পূর্ণ হয় নাই? নারীর প্রতি অত্যাচার বাঙ্গালী জাতির মত এই ভারতবর্ষেও আর কোন জাতি করে নাই কৌলিক প্রথার মত নিষ্ঠুর, নারীর মর্য্যাদাহানিকর প্রথা সভ্যতাগর্ব্বিত বাঙ্গালী জাতির মধ্যেই প্রচলিত, নারীর রক্তশোষক, নারীর উন্নতির সর্ব্বপ্রধান বাধা কঠোর অবরোধ প্রথা ভারতের মধ্যে শুধু বঙ্গবিহার উড়িষ্যাদি অঞ্চলেই প্রচলিত। জিজ্ঞাসা করি, কংগ্রেসে, ভারতীয় সমাজসংস্কার সমিতির অধিবেশনে ভারতের তেজোবীর্য্যসম্পন্ন শিখ, মাহারাষ্ট্র প্রভৃতি জাতীয় বহু দেশগৌরব ভদ্রলোক ত উপস্থিত থাকেন, সে সকল স্থানে মহিলাদের উপস্থিতি দেখিয়া তাঁহাদের ত গাত্রজ্বালা উপস্থিত হয় না! তাঁহাদের দেশে ত নারীর অবরোধ প্রথা প্রচলিত নাই! তাহাদের সামাজিক অবস্থা কি বাংলার সামাজিক অবস্থা অপেক্ষা হীন? কখনই নহে। মহারাষ্ট্রের হিন্দুগণ অপেক্ষা বাঙ্গালী হিন্দুগণ কি অধিক নিষ্ঠাবান? কিছুতেই নহে। তাহার ত

সঙ্কুচিত তাহাদের নারীগণকে উপযুক্ত ভাবে চলাফেরা করিতে দেয়, তাহাদের দেশে ত অবরোধ প্রথা নাই। তাহাতে তাহাদের ধর্ম্ম ও সমাজ ত নষ্ট হয় না। অবরোধ প্রথা হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গ নহে, মুসলমান আক্রমণের ফল মাত্র। দীর্ঘকাল একটা কুপ্রথা সমাজে চলিয়া আসিলে অদূরদর্শী কতকগুলি লোক তাহার সমর্থন চিরকালই করিয়া থাকে; তাহারা কৃপাপাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু নারীগণের কর্ত্তব্য, সমাজ-সংস্কারকগণের কর্ত্তব্য, এই সকল মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত বাঙ্গালীর ব্যাধি যাহাতে দূর হয় তাহার উপায় অবলম্বন করা। নারীমর্য্যাদার গৌরবে মণ্ডিত শত শত বঙ্গমহিলাকে সাহিত্যসম্মিলন ও অন্যান্য সভাসমিতিতে দেখিতে দেখিতে এই সকল লোকের চকল চক্ষু শান্ত হইবে। অপরের মাতা, ভগ্নী, স্ত্রীকন্যাকে দেখিবার অভিনবত্ব ক্রমে পুরাতন হইয়া যাইবে। এই রোগের ইহাই ঔষধ।

আগামী সাহিত্য-সম্মিলন বাঁকিপুরে হইবে। সম্ভ্রান্ত-বংশীয় মহিলাগণের অবরোধ শুনিয়াছি সেখানেই পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। বহু বাঙ্গালী মহিলার এই অধিবেশনে উপস্থিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহাতে দুই লাভ হইবে। নারীর অবরোধ প্রথার অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে তাহা হইলে বেহারী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আন্দোলন উপস্থিত হইবে,—একটা চিন্তা জাগ্রত হইবে। তা ছাড়া আন্দোলনকারী বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগের চক্ষুকে সহাইয়া লইবার কাজটাতে আছেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঁকিপুরে তখন ভয়ানক গরম পড়িবে, এই সময়ে শুনিয়াছি সেখানকার স্বাস্থ্য ভাল থাকে না, বঙ্গদেশ হইতে খুব কম মহিলাই হয়ত সেখানে যাইতে পারিবেন। আশা করি আমাদের বেহার-প্রবাসিনী বাঙ্গালী ভগিনীগণ অনেকেই সম্মিলনে উপস্থিত হইয়া এই অভাব পূরণ করিবেন।

শুনিয়াছি, বাঁকিপুরে একটা স্বতন্ত্র মহিলা-সম্মিলন হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। মূল অধিবেশনের সহিত ঠিক এক সময়ে তাহা না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলে মহিলাগণের মূল অধিবেশনে উপস্থিত হওয়ার পক্ষে অসুবিধা ঘটিবে।

কবিবর রবীন্দ্রনাথ ও নারীর অবরোধ

জাপান যাইবার পথে কবিবর রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মদেশে অবতরণ করিয়াছিলেন। তিনি অবরোধবিহীন ব্রহ্মদেশের স্বেচ্ছাবিচরণকারিণী মেয়েদের দেখিয়া লিখিয়াছেন:—"এখানকার মেয়েরা খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়ে পূর্ণতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেচে। তারা নিজ অস্তিত্ব নিয়ে নিজের কাছে সঙ্কুচিত হয় নাই। রমণীর লাবণ্যে তারা যেমন প্রেয়সী, শক্তির মুক্তগৌরবে তেমনি তারা মহীয়সী। কাজই যে মেয়েদের যথার্থ শ্রী দেয়, সাঁওতাল মেয়েদের দেখে তা আমি প্রথম বুঝতে পেরেছিলুম। তারা কঠোর পরিশ্রম করে, এই পরিশ্রমের আঘাতেই সাঁওতাল মেয়েদের দেহ এমন নিটোল, এমন সুবাক্ত হয়ে ওঠে, তাদের সকল প্রকার গতিভঙ্গীতে মুক্তির মহিমা প্রকাশ পায়।

"কবি কীটস্ বলেচেন, সত্যই সুন্দর। অর্থাৎ সত্যের যথাযুক্ত সুসম্পূর্ণতাতেই সৌন্দর্য্য সত্য মুক্তি লাভ করলে আপনি সুন্দর হয়ে প্রকাশ পায়।

কাজকর্ম্মের হিল্লোলে (ব্রহ্মদেশের) মেয়েরা যেন বেশি করে বিকশিত হয়ে উঠেচে। কেবল বাইরে বেরতে পারাই যে মুক্তি তা নয়, অবাধে কাজ করতে পাওয়া মানুষের পক্ষে তার চেয়ে বড় মুক্তি। পরাধীনতাই সব চেয়ে বড় বন্ধন নয়, কাজের সঙ্কীর্ণতাই হচ্চে সব চেয়ে কঠোর বাধা।"

যে সকল দেশে স্ত্রীস্বাধীনতা প্রচলিত আছে সেই সকল দেশে যে-সকল বাঙ্গালী ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই এক বাক্যে এই অবরোধ প্রথার নিন্দা করিয়াছেন। এমন কি, সমস্ত ভারতবর্ষটা এক বার ভ্রমণ করিলেই মুক্তভাবে বিচরণশীলা নারীদের স্বাভাবিকতা দেখিয়া তুলনা দ্বারা অবরোধ প্রথার অনিষ্টকারিতা উপলব্ধি করা যায়। ভূয়োদর্শনের অভাবেই বাঙ্গালীদের মধ্যে এক দল লোক এই প্রথার সমর্থন করেন।

ব্রহ্মদেশে স্ত্রীশিক্ষা

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট ব্রহ্মদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের বিশেষ ব্যবস্থা করিতেছেন। প্রত্যেক বিভাগে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের

জন্য এক একটী কমিটী গঠিত হইবে। বিভাগের অন্তর্গত প্রতি জেলা হইতে এই বিভাগীয় কমিটীতে অন্ততঃ এক জন মহিলা সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইবেন। এই মহিলাগণ নানা স্থানে মহিলা-সমিতি স্থাপন করিয়া স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিবেন। গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক জেলার সদরে একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিতে চেষ্টা করিবেন।

প্রত্যেক স্কুল ইন্‌স্পেক্টরের অধীনে একটী শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। অবরোধ-নিবদ্ধা বলিয়া আমাদের দেশের মহিলাগণ ইচ্ছা সত্ত্বেও দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য আশানুরূপ চেষ্টা করিতে পারেন না, ব্রহ্মদেশের মহিলাগণের সে বাধা নাই, আশা করি তাঁহারা এই কার্য্যে যথেষ্ট সফলতা লাভ করিতে পারিবেন।

প্রাথমিক শিক্ষা

আমাদের বঙ্গদেশে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা নিম্নলিখিত হিসাব দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়।

প্রতি সহস্র লোকের জন্য

প্রদেশ	প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়।	প্রতি সহস্র ছাত্রের জন্য ব্যয়।
আসাম	২৮৲	১৯৩২৲
বঙ্গদেশ	১১৲	৬৬৭৲
বোম্বাই	১০৭৲	৩৮৩৯৲
ব্রহ্মদেশ	২৮৲	২২৮৩৲
মাদ্রাজ	২৫৲	১৫২৬৲
যুক্ত প্রদেশ	১৫৲	২৫৯৯৲
পঞ্জাব	২০৲	৩৭৪২৲

শিক্ষাভিমানী বঙ্গদেশের প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয় না কি?

পুনা ফারগুসন কলেজ

এই কলেজ ও তৎসংসৃষ্ট বিদ্যালয়গুলি সমস্ত ভারতবাসীর গৌরবের সামগ্রী। ৩৭ বৎসর পূর্ব্বে, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কয়েকটী মহারাষ্ট্রীয় যুবক ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, এবং সুশিক্ষা বিস্তারই দেশের কল্যাণের একমাত্র পথ বলিয়া বুঝিতে পারিয়া, পুনা নগরে "দাক্ষিণাত্য শিক্ষাসমিতি" স্থাপন করেন এবং "নিউ ইংলিশ স্কুল" নামক একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। নিজেদের সুখ স্বার্থ ভুলিয়া দেশে শিক্ষাবিস্তার করাই তাঁহারা জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করেন। মহাত্মা গোখলে, অধ্যাপক কার্ব্বে, তিলক প্রভৃতি শক্তিশালী পুরুষগণ এই সমিতির ব্রতধারী। বর্ত্তমান সময়ে ভারত-গৌরব অধ্যাপক পারঞ্জপে এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। ভারতবাসীর মধ্যে তিনিই একমাত্র সিনিয়র র‍্যাংলার। ইচ্ছা করিলে তিনি শিক্ষা-বিভাগে অতি উচ্চ বেতনে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পরম সুখে জীবন যাপন করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি মাসিক ৭০৲ টাকা মাত্র বেতনে সমিতির সর্ব্বপ্রধান বিদ্যালয় এই ফারগুসন কলেজের অধ্যক্ষতা পদ গ্রহণ করিয়াছেন। সমিতির সভ্যগণ বিশেষ বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে কিছু বেতন বাড়াইয়া দিয়াছেন, শুনিয়াছি; কিন্তু তিনি ৭০৲ টাকা বেতনেই কাজ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। এই সকল ত্যাগী পুরুষের সাধনার ফলে মহারাষ্ট্র দেশে যে সুবাতাস বহিতেছে তাহাতে সমগ্র ভারতের কল্যাণ হইবে। জীবনই জীবন গড়িতে পারে, মহৎ দৃষ্টান্তের চারি দিকে মহত্ত্বভাব অনিবার্য্যরূপেই ফুটিয়া উঠে। বোম্বাইয়ের ধন কুবেরগণ এই সমিতির হস্তে লক্ষ লক্ষ টাকা অর্পণ করিতেছেন, আর সমিতি চতুর্দ্দিকে নূতন নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। অন্যান্য অনেক বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ আপন আপন বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃত্বভার এই সমিতির হস্তে অর্পণ করিবার জন্য আবেদন করিতেছেন। সমিতি দিন দিন শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। এই ত দেশের প্রকৃত কাজ! দেশের সকল দুর্দ্দশা দূর করিবার প্রকৃত ঔষধই শিক্ষাবিস্তার। আমাদের বাংলা দেশের নেতাগণ কিন্তু এই আসল বিষয়েই উদাসীন। উপরে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি কত উদাসীন তাহা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতেছে। কিন্তু দেশের নেতাগণ কি এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন? প্রবল আন্দোলন দ্বারা তাঁহারা কি গবর্ণমেণ্টকে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়

বৃদ্ধি করিতে উদ্যুক্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন, অথবা নিজেরাই এসম্বন্ধে কিছু করিতেছেন ?

গার্হস্থ্য কথা

ছবির পিণ্টি করা ফ্রেম মলিন হইলে জলে পেঁয়াজ সিদ্ধ করিয়া সেই জল দ্বারা উহা ধুইয়া ফেল. ফ্রেম নূতনের মত হইবে।

অয়েল ক্লথ শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। উহা দীর্ঘস্থায়ী করিতে হইলে প্রথমতঃ গরম জলে প্রক্ষালন কর। সাবধান. সাবান ব্যবহার করিও না। উহা শুষ্ক হইলে দুধে এক খণ্ড নেকড়া ভিজাইয়া উহার উপর ঘর্ষণ কর, তার পর উহা মসৃণ করিয়া লও।

কাঠের হাতার দ্বারা রান্না করাই উত্তম। ইহাতে কোন বিষক্রিয়া কদাচিত হয় না।

ইস্পাতের ছুরী মরিচা ধরিলে উহা সুইট অয়েল দ্বারা ভিজাইয়া খুব ঘর্ষণ করিতে হয়। ইহার৪৮ ঘণ্টা পরে চুণের খুব মিহি গুড়া দ্বারা ঘর্ষণ করিলে মরিচা উঠিয়া যাইবে।

প্যালিচা বিবর্ণ হইলে উহা কোন স্থানে ঝুলাইয়া লাঠি দ্বারা খুব আঘাত করিতে হয়। তার পর বুরুস করা উচিত। ইহার পর হাতে সয় এমন গরম জলে দশ ছটাক ভিনিগার মিশাইয়া ঐ জলে কাপড় ভিজাইয়া ঐ কাপড় দ্বারা প্যালিচার সর্ব্বত্র ঘর্ষণ করিতে হয়। এখন দেখা যাইবে, প্যালিচা যেন নূতন হইয়াছে।

যখন কাচের একটী গ্লাসের মধ্যে আর একটী এমন আটিয়া যায় যে টানিয়া বাহির করা যায় না, তখন ভিতরকার গ্লাসে ঠাণ্ডা জল দিয়া বাহিরের গ্লাস গরম জলে কিয়ৎকাল ডুবাইয়া রাখিও, দেখিবে ভিতরকার গ্লাস সহজেই বাহির হইবে।

জাপানী ট্রে মলিন হইলে কখনও গরম জল দ্বারা ধুইও না, গরম জল ব্যবহার করিলে উহার জাবিস উঠিয়া যায়। উহার উপর অলিভ অয়েল ঘসিয়া, তার পর ফ্লানেল দ্বারা উহা পরিষ্কার কর।

ম্যাকিন্টস কখনও ঝুলাইয়া রাখিও না। উহা যদি ভিজে তবে শুকাইয়া বুরুস করার পর ভাঁজ করিয়া তুলায় রাখিও। (সঞ্জীবনী)

বারাণসী মহিলা-কলেজ

কয়েক বৎসর যাবৎ বারাণসী নগরে একটী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কুমারী পামার বি, এস-সি উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী। তাঁহার সুদক্ষ পরিচালনায় বিদ্যালয়টীর ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসর হইতে উক্ত বিদ্যালয় কলেজে পরিণত হইল। কলেজ-ক্লাসগুলির অধ্যাপনার নিমিত্ত অতি সুশিক্ষিতা মহিলাদিগকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। কুমারী কেট্ ব্রাউনিং এম, এ, প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইয়াছেন। গত ১৭ই জুলাই হইতে কলেজের প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী খোলা হইয়াছে। কলেজ-সংলগ্ন ছাত্রী-নিবাসে সুযোগ্য অভিভাবিকার তত্ত্বাবধানে ছাত্রীরা বাস করিতে পারিবেন। যাঁহারা এই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইতে চাহেন তাঁহাদিগকে বারাণসী নগরে শান্তিকুঞ্জে কুমারী অরাণ্ডেলের নিকট আবেদন পাঠাইতে হইবে।

বিদ্যালয়টি কলেজে পরিণত করিবার জন্য বিস্তর অর্থব্যয় করিতে হইতেছে। এই সদনুষ্ঠানের নিমিত্ত যাঁহারা অর্থ দান করিতে চাহেন তাঁহারা কুমারী অরাণ্ডেলের নিকট সাহায্য প্রেরণ করিবেন।

বঙ্গমহিলার কৃতিত্ব

স্বর্গীয় অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা ও বিখ্যাত কবি শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর ভগ্নী কুমারী মৃণালিনী চট্টোপাধ্যায় কয়েক বৎসর হইল শিক্ষা লাভের-জন্য ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাইপোস পরীক্ষায় মনোবিজ্ঞানে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন শুনিয়া আমরা পরম আনন্দিত হইয়াছি। এই ট্রাইপোস পরীক্ষা কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় যাঁহারা গণিতে পাশ করেন তাঁহারাই র‍্যাংলার হন। কুমারী মৃণালিনী বাঙ্গালী মেয়ের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

বালি ও যবদ্বীপে হিন্দু

এখন সমুদ্রযাত্রায় হিন্দুর জাতি যায়। কিন্তু এক সময় হিন্দুজাতি যখন জীবন্ত ছিল তখন হিন্দুর বাণিজ্য

তরী দেশ দেশান্তরে বাণিজ্য করিয়া বেড়াইত, হিন্দুর তখন জাতি যাইত না। শরীর যখন দুর্ব্বল হয় তখনই মানুষকে নানা রোগে আক্রমণ করে, এখন হিন্দুসমাজ অজ্ঞানতা, কুসংস্কারে অজ্ঞর হইয়া, জীবনী শক্তি ক্ষুণ্ণ করিয়া ফেলিয়াছে, তাই হাঁচি টিকটিকি পর্য্যন্ত তাহার গতি রুদ্ধ করে, পদে পদে শুধু বাধা।

বর্ত্তমান ইউরোপীয় জাতিগুলির ন্যায়ই হিন্দুগণ পূর্ব্বে নানা দেশে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিত। আফগানিস্থানে এখনও বহু হিন্দু বাস করে। বালি ও যবদ্বীপেও অনেক হিন্দু বাস করে। হিন্দুরও এক সময়ে বৈদেশিক উপনিবেশ ছিল—ভাবিতেও মনে কত আনন্দ হয়। বর্ত্তমান সময়ে আমেরিকার ইংরেজগণ যেমন ইংলণ্ডকে মাতৃভূমি বলিয়া স্বীকার করেন, বালি ও যবদ্বীপের হিন্দুগণও তেমনি ভারতবর্ষকে তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের মাতৃভূমি বলিয়া শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দর্শন করে। তাহারা শিব-উপাসক। "ওঁ শিবচতুর্ভুজ" বলিয়া তাহারা ভগবানের নাম উচ্চারণ করে। তাহাদের দেশের ধর্ম্মগ্রন্থাদি এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, সামান্যই অবশিষ্ট আছে; তাহারা হিন্দু ধর্ম্ম-গ্রন্থাদি পাইবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করে। "হিন্দু-স্থানী ষ্টুডেণ্ট" পত্রিকার এক জন লেখক যব ও বালি দ্বীপের হিন্দুদের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলিতেছেন, এই সকল বৈদেশিক হিন্দুর জন্য ভারতীয় হিন্দুদের কি কিছু করিবার নাই?

মেয়েদের উচ্চশিক্ষা ও গৃহকর্ম্ম

গবর্ণমেণ্ট স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে সম্প্রতি দেশের লোকের মনের ভাব জানিবার জন্য একখানি পত্র প্রচার করিয়াছেন; মান্দ্রাজ—গঞ্জাম ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অভিমতের জন্য সেখানেও একখানি পত্র প্রেরিত হইয়াছিল। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অধিবেশনে সেই পত্রের আলোচনা উপস্থিত হইলে, বোর্ডের সহকারী সভাপতি (Vice President) স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "উচ্চশিক্ষা লাভ করিলে মেয়েরা হয়ত গৃহকর্ম্মে মন দিবে না; অনেক দরিদ্র পিতা ও স্বামীর রাঁধুনী রাখিবার মত অবস্থা নয়, তাহাদের ত তবে বড় বিপদ উপস্থিত হইবে!" সুখের বিষয়, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অন্যান্য সভ্য তাঁহার মতের বিরুদ্ধে মত দেওয়ায় তাঁহার আপত্তি টিকে নাই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, যে এখনও শিক্ষিতদিগের মধ্যে এমন লোক আছে, যাহারা মনে করে উচ্চশিক্ষায় মেয়েদিগকে গৃহকর্ম্মের অনুপযোগী করে। উচ্চশিক্ষা দ্বারা মেয়েরা গৃহকর্ম্ম এবং অন্যান্য সকল কাজই যে বেশী ভাল করিয়া করিতে শিখে, নিজ পরিবারে মেয়েদের উচ্চশিক্ষা না দিলে এসকল লোক তাহা বুঝিতে পারিবে না।

চিত্রকরের চিত্র-রহস্য

একবার একজন চিত্রকর একখানি চিত্র অঙ্কন করিয়াছিল। তাহার সমসাময়িক অন্যান্য চিত্রকরদের অতি মূল্যবান ও দুর্ল্লভ অনেক রং থাকা সত্ত্বেও এবং তাহারা অনেক সুবিখ্যাত চিত্র অঙ্কিত করিলেও, এই চিত্রকরের রক্তবর্ণে চিত্রিত ছবিখানি বর্ণচ্ছটাতে সকলকে পরাজিত করিয়াছিল। দর্শকমাত্রেই একবাক্যে বলিত, "কি সুন্দর ছবিখানি—শিল্পীর কি অপূর্ব্ব বর্ণচাতুর্য্য!"

অন্যান্য চিত্রকরেরা বলাবলি করিত, "এই ব্যক্তি কোথা হইতে এই অপূর্ব্ব বর্ণ সংগ্রহ করে?" তাহারা চিত্রকরকেও এই প্রশ্ন করিয়াছে, কিন্তু সে সর্ব্বদাই মৃদুহাস্য পূর্ব্বক একই উত্তর দিয়াছে, "আমি তোমাদের সে কথা বলিতে পারি না।" বলিয়াই অবনত মস্তকে পুনঃ চিত্রাঙ্কণে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

একজন এইরূপ বর্ণ প্রস্তুত করিবার উদ্দেশে সুদূর পূর্ব্বদেশে গমন পূর্ব্বক নানাপ্রকার মহামূল্য রং ক্রয় করিল, কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই তাহা মলিনভাব প্রাপ্ত হইল। অপর একজন পুরাতন শিল্পশাস্ত্রোক্ত উপায়ে রক্তবর্ণ প্রস্তুত করিয়া তাহাদ্বারা চিত্রাঙ্কন করিল, কিন্তু অঙ্কিত চিত্রের বর্ণ স্বাভাবিক উজ্জ্বল না হইয়া আভাহীন হইল।

পূর্ব্বোক্ত চিত্রকর একাগ্রমনে স্বীয় কার্য্য সাধন করিতে লাগিল। যতই দিন যাইতে লাগিল তাহার চিত্রখানি ততই রক্তিমতর ও সজীবতাপূর্ণ হইতে

লাগিল, কিন্তু শিল্পী নিজে পাণ্ডু হইতে পাণ্ডুতর বর্ণ লাভ করিতে লাগিল। অবশেষে একদিন সকলে তাহার মৃতদেহ, চিত্রসম্মুখে ভূপতিত অবস্থায় প্রাপ্ত হইল এবং সৎকার উদ্দেশ্যে দেহ সেস্থান হইতে তুলিল।

চিত্রকরেরা বহু অন্বেষণ করিয়াও তাহার গৃহে অভিনব অথবা অভূতপূর্ব্ব কোন বর্ণ দেখিতে পাইল না।

সৎকারের অব্যবহিত পূর্ব্বে, মৃতদেহে নববস্ত্র পরিধান করাইবার সময়, তাহার বাম বক্ষের উপর একটা ক্ষতচিহ্ন দেখা গেল। দেখিয়াই অনুমিত হইল, যে ইহা অতি পুরাতন ক্ষত, সম্ভবতঃ বহুকাল ধরিয়াই এই ক্ষত সে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আসিয়াছে, পার্শ্বগুলি কঠিনতাপ্রাপ্ত ও পুরাতন ক্ষতের সর্ব্বলক্ষণযুক্ত; জীবিতাবস্থায় তাহার মুখ উন্মুক্ত ছিল, কিন্তু মৃত্যুর রূপান্তর সময়ে তাহা রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। সংকার সম্পন্ন হইল। ক্ষতচিহ্ন দেখিয়াও কেহ বুঝিল না, কোথা হইতে চিত্রকর তাহার বর্ণ পাইত, এবং তখনও পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, "এই অপূর্ব্ব রক্তবর্ণ এই ব্যক্তি কোথা হইতে লাভ করিয়াছিল?"

কালক্রমে চিত্রকরকে সকলেই বিস্মৃত হইল, কিন্তু তাহার অঙ্কিত চিত্র চির-অমরতা প্রাপ্ত হইল।•

সমাজে নারীর স্থান

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আমি বলিয়াছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা দ্বারা নারী-জীবনের যথেষ্ট উন্নতি হয়, কিন্তু একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় যে একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদ্বারাই নারী-শক্তির পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে। ইহা বলাও আমার অভিপ্রায় নয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিতা নারীগণই দেশের সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত নারী-সম্প্রদায়। আমাদের দেশে, যেমন পুরুষদিগের মধ্যে, তেমনি স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও অনেকে আছেন, যাঁহারা উচ্চ জ্ঞানচর্চ্চা ও উদার, উন্নত, চরিত্র-গুণে সমাজের অলঙ্কার-স্বরূপ। কিন্তু একথা আমি দৃঢ় ভাবেই বিশ্বাস করি, নারী-গণের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার বিস্তার হইলে দেশ পরম লাভবান হইবে। কিন্তু মেয়েদের জন্য পৃথক কলেজ প্রতিষ্ঠিত না হইলে বেশী মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে অগ্রসর হইবে না, তাহাদের শিক্ষা প্রাথমিক ও মধ্য শ্রেণীর বিদ্যালয়েই আবদ্ধ থাকিবে। স্ত্রীপুরুষের মিশ্রিত কলেজের উপকারিতা অস্বীকার করিতেছি না, কিন্তু এমন অনেক অভিভাবক আছেন, যাঁহারা অবস্থা সত্ত্বেও মিশ্রিত কলেজে মেয়েদের পাঠান না। মান্দ্রাজে মহিলা-কলেজ নাই, কিন্তু বরোদা ও ত্রিবাঙ্কুর এবিষয়ে অগ্রবর্ত্তী। এই উভয় স্থানেই রাজকীয় ব্যয়ে মহিলা-কলেজ পরিচালিত হইতেছে। কলেজে মেয়েরা বাস করিয়া যদি শিক্ষালাভ করে (Residential Universities) তবেই তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নত সামাজিক জীবনের আস্বাদন পাইবে, এবং বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া দেশের মেয়েদের মধ্যে উন্নত সামাজিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে। মেয়েদের জন্য এই সকল সাধারণ জ্ঞান-শিক্ষার কলেজ (Arts College) প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবহারিক শিক্ষাদানের কলেজ (Professional College) প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। চিকিৎসা ও শিক্ষাদান এই দুইটী ব্যবসায়ই মেয়েদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলিয়া মনে হয়। এই ব্যবসায়েই শিক্ষিতা মহিলাগণ দেশের ও তাঁহাদের ভগ্নীদের অনেক উপকার করিতে পারেন। মেয়েদের চিকিৎসার ভার পুরুষের হাতে না থাকিয়া মেয়েদের হাতেই থাকা যে উচিত এবিষয়ে আজকাল আর মতদ্বৈধ নাই বলিলেই চলে। সুতরাং মেয়েদের জন্য পৃথক মেডিকেল স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠাও আবশ্যক। এইরূপ, মেয়েদিগকে শিক্ষাদান প্রণালী শিক্ষা দিবার জন্যও স্বতন্ত্র কলেজ স্থাপন আবশ্যক। স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে গোঁড়া হিন্দুদের আপত্তিও আজকাল বড় শোনা যায় না। তবে তাঁহারা প্রাথমিক শিক্ষাই পছন্দ করেন। উৎকৃষ্ট প্রাথমিক শিক্ষাদ্বারাও

• কুমারী মাবিনী দেন এম, বি, কর্ত্তৃক ইংরেজী হইতে অনুবাদিত। অন্যান্যদেশে যাহাই কোন গুরুতর বিষয়ে কেহ সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না, এই রূপকে তাহাই প্রকাশ করিতেছে। ভা: ম: স:।

অনেক উপকার হয়। তাহা প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিলে তাহাও সুকন্যা, আদর্শ স্ত্রী ও সুমাতা হইবার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করে। কিছুদিন হইল বরোদার মহারাণী ভারতবর্ষের স্ত্রীজাতির সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। জ্ঞানচর্চ্চা, নানাবিধ শিল্প, সেবা ইত্যাদি সকল বিভাগে নারীদিগের কার্য্যানুষ্ঠানের আবশ্যকতা বিষয়ে তিনি আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যে বিভাগেই নারী কাজ করুক না, তাহার কার্য্যের ভিত্তি তাহার সুশিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক নারী যদি আপনার মূল্য বুঝিতে পারে তবে শুধু তাহার নিজের অবস্থারই যে উন্নতি হইবে তাহা নহে, দেশের সামাজিক উন্নতি তখন অতি সহজেই সাধিত হইবে। বর্ত্তমান সময়ে দেশের নারীজাতির মধ্যে শিক্ষাবিস্তার অপেক্ষা সমাজসেবীদিগের পক্ষে শ্রেষ্ঠতর কাজ আর কিছুই হইতে পারে না।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, স্ত্রীলোকদিগকে যৎসামান্য শিক্ষা দিয়া লাভ কি? কিন্তু এই সকল বিষয়ে হঠাৎ কিছুই ফল দেখা যায় না। সামাজিক উন্নতি অতি ধীরে ধীরে সাধিত হয়, এবং এই উন্নতি সাধনের প্রধান উপায়ই শিক্ষা। শিক্ষার ফল প্রথমে নিশ্চয়ই নিরাশাজনক হইবে। এমন কি, উচ্চশিক্ষার ফলও প্রথমেই যে সন্তোষজনক হইবে এমন আশা করা যায় না। কিন্তু সমাজ একটী জীবন্ত বস্তু; ধীরে, লোকচক্ষুর অন্তরালে ইহার পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। সময় সময় শিক্ষা দ্বারা আশার ঠিক বিপরীত ফলই ফলিতে দেখা যাইবে। কিন্তু জ্ঞানের শক্তির উপরে বিশ্বাস রাখিয়া যদি ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করা যায় তবে দেখা যাইবে, ক্রমবিকাশের নিয়মে সকলই ঠিক হইয়া গিয়াছে, সমাজ স্ত্রীশিক্ষার ফলে উন্নতির পথেই ধাবিত হইতেছে।

"নারীর অধিকার" কথাটা শুনিয়া অনেকেই চমকাইয়া উঠেন; না জানি তবে স্ত্রীশিক্ষা আবার কি সঙ্গে করিয়া আনে! তাঁহারা আশঙ্কা করেন, পাশ্চাত্য শিক্ষা এদেশেও "নব্য-রমণী" (new woman) এবং "সফ্রেজিষ্ট" সৃষ্টি করিবে। এরূপ আশঙ্কার কোন কারণ নাই। ভারত-নারী চিরদিন ভারত-নারীই থাকিবে, শিক্ষা তাহাকে উন্নত করিবে মাত্র। কবি বলিয়াছেন, (There is in woman) amazing brightness, purity and truth, eternal joy and everlasting love" (নারী প্রফুল্লতা, পবিত্রতা, সত্য, চির আনন্দ ও চির প্রেমের উৎস)। বংশ-পরম্পরাক্রমে ভারত-নারীর জীবনে এই সকল সদ্‌গুণ অনুস্যূত রহিয়াছে, শিক্ষা এ সকলের বিকাশ সাধন করিবে মাত্র। নারীর আর যাহা দাওয়া যাহাই থাকুক, তাহার প্রধান কার্য্যক্ষেত্র গৃহ; সুশিক্ষা দিলে তাহারা কখনই পুরুষ জাতির অধিকারে অনধিকার প্রবেশ করিবে না। পারিবারিক সদ্‌গুণরাজির বিকাশ সাধন ও গার্হস্থ্য কর্ত্তব্যে সুশিক্ষা লাভই হইবে—স্ত্রীশিক্ষার প্রধান বিষয়। কিন্তু নারীর এমন কতগুলি অধিকার আছে যাহা পুরুষদিগের স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত। এই অধিকারগুলি যাহাতে স্বীকৃত ও সম্মানিত হয় সমাজসংস্কারকগণও সেই চেষ্টা করিতেছেন। যে সামাজিক প্রথা পুরুষকে একাধিক স্ত্রী বিবাহ করিতে দেয় এবং বিধবাদিগকে, এমন কি; বালবিধবাদিগকে পর্য্যন্ত জোর করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করাইতে চায় ও তাহাদের জীবনকে সর্ব্বপ্রকার দুঃখের আলয় করিয়া তোলে, এবং যে সামাজিক প্রথা নারীকে পুরুষের সেবা ও সুখের উপকরণ মাত্র করিয়া রাখিতে চায় তাহার পরিবর্ত্তন অবশ্যই কর্ত্তব্য। এই সকল বিষয়ে পুরুষের সমকক্ষতা করিবার জন্য নয়, কিন্তু বিবেকবিশিষ্ট মানুষ রূপে, আপন অধিকার দাবী করা ভারত-নারীর অবশ্যকর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষে সামাজিক জীবন বৈচিত্র্য ও মাধুর্য্যবিহীন। গার্হস্থ্য জীবন এদেশে আছে, কিন্তু সামাজিক জীবনের সজীবতা ভারতবর্ষের অধিকাংশ সম্প্রদায়েই নাই। শত শত ভাগে বিভক্ত সম্প্রদায়গুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা ভাল করিয়া কখনই হইতে পারে না। বিবাহাদি উৎসব অনুষ্ঠানই এদেশে সামাজিক ভাবে মেলামেশার ও ভাবের আদান-প্রদানের প্রধান ক্ষেত্র; কিন্তু এরূপ পঙ্‌ক্তিকায়

মেলামেশার সামাজিক জীবনের ক্ষতিলাভ কিছুতেই সম্ভব নহে। কোন কোন স্থানে শিক্ষিত ও উন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে মহিলাদিগকে অপেক্ষাকৃত ঘন ঘন সম্মিলিত হইবার সুযোগ দেওয়া হইতেছে, যেন এই উপায়ে তাঁহারা গার্হস্থ্য জীবনের বাহিরের বিষয়ও কিছু কিছু জানিতে পারেন। এখন পর্য্যন্ত তাহার ফল আশানুরূপ হয় নাই। আশা করা যায়, এই সকল সম্মিলন আরো সুচারুরূপে এবং অধিকতর উদার ভাবে পরিচালিত হইলে, এগুলি দ্বারা বিশেষ উপকার হইবে। ভারত-নারীর জীবন প্রতিদিন একই ভাবে পরিচালিত হয়, তাহা বৈচিত্র্য-হীন। প্রতিদিনের গার্হস্থ্য শ্রম ছাড়া উন্নততর, মিষ্টতর ও বিচিত্রতাপূর্ণ জীবনের আকাঙ্ক্ষা তাহার হৃদয়ে জাগ্রত হইবার সুযোগ কোথায়? কোন কোন বড় সহরে মহিলা-সমিতি, মেয়েদের ক্লাব প্রভৃতি গঠিত হইয়াছে; কিন্তু আমার মনে হয়, এগুলির অধিকাংশই শুধু নামে মাত্র পর্য্যবসিত। কি করিয়া যে নিজেদের সামাজিক অবস্থার উন্নতি করিতে হইবে এই সকল মেয়েরা তাহা বুঝিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহাদের উচিত ভার; যদি শিক্ষিতা মেয়েরা এগুলির ভার গ্রহণ করেন এবং দরকার বোধ করিলে পুরুষদেরও সাহায্য গ্রহণ করেন তবে আমার বোধ হয় এই সকল সভা সমিতি ও ক্লাব দ্বারা যথেষ্ট উপকার সাধিত হইতে পারে। একটা বিশেষ কথা আমাদিগকে সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমরা যাহাই করি না কেন, ভারত-নারীর আদর্শ হইতে আমরা যেন ভ্রষ্ট না হই; পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সামাজিক রীতিনীতি হইতে আমরা শুধু তাহাই গ্রহণ ও আয়ত্ত করিব—যাহা উৎকৃষ্ট ও কল্যাণপ্রদ।

স্বসম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য ভারতের শিক্ষিতা মহিলাগণ অনেক করিতে পারেন। পরোপকার, সেবা ব্রত তাঁহাদের বিশেষ উপযোগী কার্য্য। দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের দুর্দ্দশা মোচন, বাল-বিধবার ভারবহ জীবনের ভার লঘুকরণ ও দুঃখীর দুঃখ দূর করণের জন্য শিক্ষিতা মহিলারা অনেক করিতে পারেন। বোম্বাই দেবাসদনের সভানেত্রীরূপে শ্রীমতী রমাবাই রাণাডে যাহা করিতেছেন তাহা পাঠ করিয়া আমরা আনন্দ ও উপকার দুইই লাভ করিতেছি। ভারতের বিভিন্ন স্থানে এইরূপ শত শত শিক্ষিতা মহিলা কাজ করিতেছেন, সন্দেহ নাই। এই প্রকার কার্য্য দ্বারা ভারত-নারীর জীবনের যেরূপ বিকাশ হয় এমন আর কিছুতেই নহে। এই সকল কার্য্য দ্বারা নারীর কর্ম্মশক্তি বৃদ্ধি পায়, তাঁহার সামাজিক মূল্য বাড়িয়া যায়। কিন্তু আমার মনে হয়, অনেক শিক্ষিতা মহিলার শক্তির ব্যবহার হইতেছে না।

আমি বলিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, পূর্ব্বকালে ভারতনারী সমাজে অতি উন্নত ও গৌরবপূর্ণ স্থান অধিকার করিতেন এবং সমাজের উন্নতির জন্য তাঁহারা অনেক করিয়াছেন। তাঁহাদের কৃতকর্ম্মের বিবরণ আমাদের নিকট সম্পূর্ণ রূপে যায় নাই। রাজনৈতিক বিপ্লব ও অন্যান্য কারণে ভারতনারী তাহার গৌরবময় স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। ব্রিটিশ শাসনে তাহাদের অবস্থার প্রতি পুনরায় লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। শিক্ষাই যে তাহাদের অবস্থার উন্নতির সর্ব্বপ্রধান উপায় সে সম্বন্ধে সন্দেহমাত্র নাই। যেরূপ শিক্ষা দ্বারা তাহাদের জ্ঞানের প্রসার ও সমাজে তাহাদের কর্ম্মশক্তি বৃদ্ধি পায় সেইরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে তাহারা, সমাজ তাহাদের স্বাধীনতার পথে যে সকল অন্যায় বাধা স্থাপন করিয়াছে এবং যদ্দ্বারা তাহাদের কর্ম্মশক্তিকে, মনুষ্যত্বকে, খর্ব্ব করিয়া রাখিয়াছে, তাহা দূর করিতে সক্ষম হইবে। আর কি কি উপায়ে তাহারা নিজেদের ও নিজ সমাজের উন্নতি সাধন করিতে পারে আমি তাহাও বিবৃত করিয়াছি। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় শিক্ষিতা মহিলা ও পুরুষদিগকেই নারীর উন্নতি সাধনের জন্য বিশেষ ভাবে খাটিতে হইবে। মেয়েদিগকে মনে রাখিতে হইবে, জীবন সামান্য নয়, ক্ষুদ্র নয়; মনুষ্য জীবন দিয়া ভগবান আমাদিগকে মহামূল্য সম্পদের অধিকারী করিয়াছেন। আমরা যেন তাঁহার এই মহাদানের অনুপযুক্ত না হই। *

---

* শ্রীমতী রমণ পিলাই বি, এর ইংরেজী বক্তৃতার মর্ম্ম।

বাঙ্গালার কথা-সাহিত্যে নূতন ধারা

কথা-সাহিত্যের যে কয়জন শক্তিমান লেখক এপর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই প্রথম শ্রেণীর, বাকী সবের লেখা পড়িয়া সেগুলিকে এমন ছেলে মানুষী বলিয়া বোধ হয় যে অমন সাহিত্য-রসলেশহীন লেখা ছাপাইয়া সাহিত্যরসিক মহলে লেখক কোন্ সাহসে বাহির করিলেন তাহা ভাবিয়া অবাক হইতে হয়!

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও কিছুদিন পর্য্যন্ত তাঁহার পরবর্ত্তী লেখকগণের লেখার তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে তিনি দেবদারু তরুর মত সাহিত্য-ক্ষেত্রে মস্তক উন্নত করিয়া বিরাজ করিতেছেন আর পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষেত্র নানাবিধ গাছ ও আগাছায় অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু তাহার কোনটাই ঠিক সাড়ে তিন হাতের বেশী উঁচু নহে। যে প্রতিভা প্রফুল্ল, শান্তি, ইত্যাদি সৃষ্টি করিয়াছে তাহার কাছে একমাত্র নরেন্দ্র, হেমলতা, ও জেলেখা-স্রষ্টা কথঞ্চিৎ দাঁড়াইতে পারিলেও আর কাহারও স্থান সেখানে হওয়া কঠিন।

রাজর্ষি যখন জন্মগ্রহণ করিল তখন পাঠক-সাধারণের ঘরে শঙ্খ বাজে নাই সত্য, কিন্তু বিচক্ষণ সাহিত্যরসিক-গণের অমনি উপলব্ধি হইয়াছিল যে বঙ্গীয় কথাসাহিত্যে নূতন যুগের সূচনা হইল। তারা দর্শকগণ যেমন নূতন তারকা নয়নপথে পতিত হইলে আনন্দে আত্মহারা হইয়া যান, তৎকালীন বঙ্গীয় সাহিত্যরসিকগণও এই ক্ষুদ্র নূতন তারকাটিকে বঙ্গসাহিত্য-গগনে উদিত হইতে দেখিয়া তেমনি আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই।

তাহার পরে ক্রমে ক্রমে বৌঠাকুরাণীর হাট, গল্পাবলি, নষ্টনীড়, চিরকুমার সভা বাহির হইয়া প্রমাণ করিয়া দিল যে এই ক্ষুদ্র তারকাটি সামান্য নহে, ইহা একটা বৃহৎ সৌরজগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বাভাস। বঙ্গীয় সাহিত্যরসিক-গণের চোখের উপর নূতন সৌরজগৎ সৃষ্টি চলিতে লাগিল, দিন দিন তাহা নব নব মহিমায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতে লাগিল, সাহিত্যরসিকগণ বিস্ময়ে, পুলকে, উৎসাহে, আশায় মাতিয়া উঠিলেন।

নব পর্য্যায়ের "বঙ্গদর্শনের" জন্মদাতা পরলোকগত মজুমদার ভ্রাতৃদ্বয়কে আজ সর্ব্বান্তঃকরণে অভিনন্দন করিতেছি। এক দল লোক আছেন যাঁহাদের কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা অসীম, কিন্তু কেমন একটা কুণ্ঠা জড়তা ও আলস্যে তাঁহারা কোন কার্য্যেই হাত দিতে চাহেন না। আর একদল লোক আছেন, যাঁহাদের কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা তেমন নাই, কিন্তু কর্ম্ম করাইবার মন্ত্র তন্ত্র সমস্ত তাঁহাদের আয়ত্ত। এই উভয় শ্রেণীর লোকের সমবায় ঘটিলেই অকর্ম্মের মৃত্যু এবং কর্ম্মের জন্ম হয়।

বঙ্গীয় লেখক এবং বঙ্গীয় শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে প্রথমোক্ত শ্রেণীভুক্ত লোক অত্যন্ত বেশী। ইঁহাদের সঙ্গে দুদণ্ড আলাপ করিলেই বুঝা যায় যে ইঁহাদের লিখিবার এবং বলিবার অনেক আছে কিন্তু শিখাইবার এবং বলাইবার লোকের অভাবে কিছুই হইয়া উঠিতেছে না। কাজে লাগাইতে চেষ্টা করিলে ইঁহারা মাথা নাড়িয়া প্রচুর আপত্তি করেন, কিন্তু একবার শুঙ্গ পাকড়িয়া যানিতে ছুড়িয়া দিতে পারিলে মহানন্দে দিব্য চলিতে থাকেন এবং প্রথম শ্রেণীর কাজ আদায় হইতে বিলম্ব হয় না।

এই যে আলস্য এবং জড়তা, দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখকও তাহা হইতে মুক্ত নহেন। সর্ষপে তৈল যথেষ্টই আছে কিন্তু তাহাও পিষিয়া বাহির করিবার লোকের অপেক্ষা রাখে। মজুমদার ভ্রাতৃদ্বয় এই কঠিন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং আশ্চর্য্য সফলতা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া সমগ্র দেশের ধন্যবাদের পাত্র। "চোখের বালি" এবং "নৌকাডুবির" অমিয় রসধারা হইতে বঙ্গবাসী খুব সম্ভবতঃ বঞ্চিত থাকিত যদি নব পর্য্যায়ের বঙ্গদর্শন বাহির না হইত। সবুজপত্রের পাতা সবুজ রাখিতে রসিকে কতটা স্নিগ্ধ কিরণ বিতরণ করিতে হইতেছে ইহা সকলেই দেখিতেছেন এবং ইহার জন্য সকলেই সবুজপত্রধরের নিকট কৃতজ্ঞ।

সূর্য্য যখন অস্তাচলচূড়াবলম্বী তখন নিশার আঁধারের

আশঙ্কা মনকে পাইয়া বসে এবং দ্বিতীয় জ্যোৎস্নাবতী চন্দ্রের আশায় লোকে উন্মুখে আকাশপানে চাহে। কিন্তু বাঙ্গালা কথা-সাহিত্যাকাশে এখন অমানিশা, দ্বিতীয় পূর্ণেই অস্তমিত হইয়াছেন, দুই একটি নক্ষত্র তারকা মেঘাচ্ছন্ন অবস্থায় কথঞ্চিৎ আলো বিতরণ করিতেছে। এ অবস্থায় উষার আলোর অপেক্ষায় ব্যাকুল হইয়া উঠা বিচিত্র নহে। কাব্য ও নাট্য ক্ষেত্রে আশার আভাস বিশেষ কিছু পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু কথা-সাহিত্যক্ষেত্রে ভাবী উজ্জ্বল উষার আলোকচ্ছটা দেখা যাইতেছে বলিয়া আমাদের অসীম আনন্দ হইতেছে। সেই আনন্দ সাধারণে জ্ঞাপন করিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী নিরুপমা দেবী ও শ্রীমতী অনুরূপা দেবী বঙ্গীয় কথা-সাহিত্যে এই আলোকের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন। বঙ্গীয় পাঠক সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে আমি তাঁহাদিগকে সসম্ভ্রম অভিনন্দন জানাইতেছি। তাঁহারা ইতিমধ্যেই বঙ্গসাহিত্যকে যাহা দিয়াছেন তাহাতে আমাদের আশান্বিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। ইঁহাদের লেখার যে খুঁত কিছুই নাই এমন নহে, বরং এই তিন জনের লেখারই এমন অনেক ত্রুটী আছে যাহার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়া দিতে পারিলে ভবিষ্যতে ইঁহাদের উপকার হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু যোগ্যতর ভবিষ্য লেখকের জন্য সমালোচনা মুলতুবী রহিল, আমি ইঁহাদের লেখা পড়িয়া যে আনন্দ পাইয়াছি, আমার মত অনেক পাঠক যে আনন্দ পাইয়াছেন ও পাইতেছেন তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত সাধারণে জানান কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি।

১৩১৪ সনে ভারতী পত্রিকা মাত্র ছয় মাস বাহির হইয়াছিল, তাহার মধ্যে শরৎবাবুর প্রথম লেখা "বড় দিদি" প্রথম প্রকাশিত হয়। অপ্রত্যাশিতভাবে সহসা নূতন একটা ঐশ্বর্য্য পাইলে যেমন মনের ভাব হয়, স্তম্ভিত-দীপ্তি ভারতীতে "বড় দিদি" পড়িয়া তেমনি একটা বিস্ময় ও আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম; ১৩১৬ সনে ভারত-মহিলা পত্রিকায় বাঙ্গালা সাহিত্যের ছোট গল্পগুলির ধারাবাহিক সমালোচনা কালে আমি সেই আনন্দ অসন্দিগ্ধ ভাষায় প্রকাশ করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠানুভব করি নাই। শরৎবাবু ইহার পূর্ব্বে কিছু লিখিয়া সাধারণে প্রচারিত করিয়াছেন কিনা জানি না, কিন্তু "বড়দিদি" পড়িয়া সাহিত্যরসিক ব্যক্তি মাত্রেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে বঙ্গসাহিত্য ক্ষেত্রে নূতন একজন শক্তিমান লেখক অবতীর্ণ হইতেছেন যিনি রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক উচ্চগ্রামে সুরবাঁধা বাঙ্গালা কথা-সাহিত্য-যন্ত্র বাজাইতে অক্ষম নহেন।

তারপরে বহুদিন শরৎবাবু নীরব ছিলেন—কারণ কি জানি না, তাঁহার সহিত পরিচয়ের সৌভাগ্য আমাদের নাই। পরে "যমুনা"র আসরে তিনি দেখা দিতে লাগিলেন এবং "ভারতবর্ষে"র আসরেও তিনি মধ্যে মধ্যে দেখা দিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুদিন হইতে তিনি আবার দুর্লভদর্শন হইতেছেন।

শরৎবাবুর লেখার আশ্চর্য্য আকর্ষণী শক্তি আছে। সামান্য ঘটনা, সামান্য জীবনকাহিনী তাঁহার লেখার গুণে এমন মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে যাহার দিকে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকিতে হয়। তাহার 'রামের সুমতি'র তুলনা নাই এবং "বিন্দুর ছেলে"ও প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমান উপভোগ্য। তিনি বঙ্গীয় পাঠকবৃন্দকে আনন্দ প্রদান করিতেছেন,—এমনি চিরদিন আনন্দ বিতরণ করিতে থাকুন, এই আমাদের কামনা। তাই দুই একটি বিষয় তাঁহার অবগতির জন্য লিখিতেছি। ভগবান তাঁহাকে ক্ষমতা দিয়াছেন—কিন্তু আমাদের ভয় হয়, সাধনা অভাবে যেন সেই ক্ষমতা মলিন হইয়া যাইতেছে। একই রকম চরিত্র-সৃষ্টির গোলক ধাঁধার মধ্যে পড়িয়া শরৎবাবু এমন ভাবে ঘুরিয়া ফিরিতেছেন যে তাঁহার মত শক্তিমান লেখকের এই দুর্দ্দশার কারণ সাধনার অভাব ভিন্ন আর কিছু বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার বিন্দু, নারায়ণী এবং বিরাজ বৌ ভিন্ন নামে একই চরিত্র; তাঁহার "পরিণীতা" এবং "পথ নির্দ্দেশ" ভিন্ন নামে এবং ভিন্ন উপসংহারে একই গল্প, এমন কি উভয়ত্রই নায়ক এটর্ণি ইত্যাদি ইত্যাদি। এই গুলিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপভোগ

করিবার যথেষ্ট বস্তু আছে, কিন্তু ক্রমাগত এক এক করিয়া পড়িয়া গেলে গ্রন্থকারের ভাণ্ডারের দৈন্য ধরা পড়িয়া যায়। উদ্দেশ্য লইয়া লিখিতে গিয়া শরৎ বাবু সফলকাম হইতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে করি না; পণ্ডিত মশায়ের বক্তৃতাকারী বৃন্দাবন নেহাৎই ম্যালেরিয়া জীর্ণ, কিন্তু মানুষ বৃন্দাবন, পুরুষ বৃন্দাবন, কুসুমের স্বামী বৃন্দাবন অনায়াসে আমাদের অন্তরঙ্গ হইয়া উঠে। যাহা হউক রামের সুমতির রাম এবং বড়দিদির সুরেন্দ্র নাথ যাঁহার হাতের সৃষ্টি তাঁহার সম্বন্ধে এখনই হতাশ হইবার কোন কারণ নাই।

"ভারতী"-সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী নব পর্য্যায়ের ভারতীতে দুইজন শক্তিমতী লেখিকাকে সাধারণে প্রচারিত করিয়া সমগ্র দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।* আমাদের দেশের অন্তঃপুরের অন্ধকারের মধ্যে কিরূপে যে মাঝে মাঝে দুই একটি প্রতিভার প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে তাহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। ইঁহাদিগকে সৃষ্টিকর্ত্তার খেয়ালের দান বলিয়াই গ্রহণ করিতে হয়। ইঁহারা প্রায়ই কুলবধূ এবং স্বশিক্ষিতা, সাধারণে ইঁহাদের প্রচারের পথে কত যে বাধা আসিয়া উপস্থিত হয় জীবন-কাহিনী প্রচারিত হয় না বলিয়াই আমরা সেই বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ। কাজেই উপন্যাস-লেখিকা রূপে পূজনীয়া স্বর্ণকুমারী বঙ্গসাহিত্যে চির-স্মরণীয় হইয়া থাকিলেও শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী এবং অনুরূপা দেবী মহাশয়া দ্বয়কে বঙ্গসাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ করানও তাঁহার এক স্মরণীয় কীর্ত্তি।

পোষ্যপুত্র যখন ভারতীতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে তখন অনেকেই বিস্মিত হইয়া খোঁজ করিয়াছিলেন যে এমন সুন্দর লেখা কাহার। বহুদিন পর্য্যন্ত পোষ্যপুত্র বেনামীতে বাহির হইয়াছিল, নাম বাহির হইলে যখন দেখা গেল যে ইহা একজন স্ত্রীলোকের রচনা তখন বঙ্গীয় সাহিত্য-রসিকগণ সানন্দে এই শক্তিমতী নূতন লেখিকার আগমন নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। তার পরে শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী যখন অনুরূপ দক্ষতা হস্তে ঐশ্বর্য্য শালিনী অন্নপূর্ণার মত রূপপরিবেষনের জন্য অন্নপূর্ণার মন্দিরে দেখা দিলেন তখন পুলকিতচিত্ত সাহিত্য-রসিক-গণ দেখিলেন যে এই দ্বিতীয়াগতা প্রথমার চেয়ে বেশী ছাড়া কম শক্তিমতী নহেন। শক্তিমতী রমণীগণের আগমনে এক শরচ্চন্দ্র ভিন্ন কথা-সাহিত্য ক্ষেত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী নক্ষত্রতারকাগণের দীপ্তি মলিন হইয়া গেল।

তার পরে অনুরূপা ও নিরুপমাদেবীর আরও লেখা বাহির হইয়াছে ও হইতেছে—এখনও তাঁহাদের সাহিত্যিক জীবনের প্রথমাবস্থা মাত্র। কিন্তু ইহারি মধ্যেই তাঁহারা বঙ্গসাহিত্যকে যাহা দিয়াছেন তাহার মূল্য অত্যন্ত অধিক। নিরুপমাদেবীর "দিদি" আমরা পৃথিবীর যে-কোন সাহিত্যের দরবারে গৌরবের সহিত উপস্থিত করিতে পারি এবং অনুরূপাদেবীর পোষ্যপুত্র, মন্ত্রশক্তি ইত্যাদি বঙ্গসাহিত্যের গৌরবের বস্তু। বিস্তৃত সমালোচনার সময় এখনও আসে নাই।

শ্রীযুক্ত প্রভাত বাবুর উল্লেখ করিলাম না। কথা সাহিত্যে তাঁহার বিভাগ স্বতন্ত্র। চারু বাবুর "স্রোতের ফুলে" ক্ষমতার পরিচয় আছে কিন্তু তরোয়াল ধরিতে শিখিতে না শিখিতেই তিনি দেশাচার কুসংস্কার ইত্যাদি অসুরের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া পদে পদে বিড়ম্বিত হইতেছেন—ইহাতে আমরা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

* অবশ্য ইহাতে শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারীর কতখানি হাত আছে না, কিন্তু সম্পাদিকা রূপে গৌরব তাঁহারই প্রাপ্য। (লেখক)।

* বর্ত্তমান বাংলা কথাসাহিত্যের আলোচনায় শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা এই ভাবে উল্লেখ করিয়া লেখক মহাশয় নিতান্ত অবিচার করিয়াছেন। কথাসাহিত্যে চারু বাবুর যশ প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। লেখক মহাশয়ের উল্লিখিত ব্যক্তিত্রয়ের কাহারও অপেক্ষা তিনি পশ্চাতে পড়িয়া আছেন, অনেক সাহিত্য রসিকই তাহা মনে করেন না। তিনি প্রচলিত সামাজিক কুসংস্কার গুলিকে আক্রমণ করেন, ইহাতে লেখক মহাশয়ের সহিত তাঁহার মতপার্থক্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহার শক্তি সম্বন্ধে কথা অস্বীকার করিলে বা ক্ষুণ্ণ ভাবে স্বীকার করিলে চলিবে কেন? একটী মাত্র লেখা পড়িয়া যদি সাহিত্য ক্ষেত্রে শরৎ বাবুর আগমনে লেখক মহাশয় একদিন উল্লসিত হইয়া থাকেন তবে "প্রবাসীতে" "লেখা আসুন" লেখিকা আমাদের অপরিচিতা শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়ার সাহিত্যক্ষেত্রে আবি ভাবেও আনন্দিত হইবার কারণ নাই কি? ভাঃ মঃ মঃ

শ্যামনগরের জমিদার

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৫)

বিক্রমপদ বাবু তাঁহার শ্যামনগরস্থিত পূর্ব্বেকার চতুষ্পাঠী, স্কুল, কলেজ, আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় প্রভৃতির অশেষবিধ উন্নতি সাধন করিলেন ; এবং তাঁহার বহুদিনের সংকল্পিত "বিজ্ঞান মন্দির" বা "বিজ্ঞান কলেজ" স্থাপন করিলেন। এই সকল চতুষ্পাঠী প্রভৃতির তত্ত্বাবধানের জন্য একটি সমিতি ও সেই সমিতির নিয়মাবলি গঠিত হইল। গভর্ণমেণ্ট সেই সমিতির নিয়মানুসারে বিক্রমবাবুর প্রতিষ্ঠিত চতুষ্পাঠী, বিজ্ঞান মন্দির, স্কুল, কলেজ ও আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় চালাইতে সম্মত হইলে, বিক্রমপদ বাবু নগদ দুই কোটি টাকা এবং দশ লক্ষ টাকার স্থাবর সম্পত্তি দান করিলেন। এ সম্বন্ধে রীতিমত দলিল সম্পাদিত হইয়া তাহা রেজেষ্টরী করা হইল। বিজ্ঞান কলেজ সম্বন্ধে একটী বিশেষ নিয়ম এই হইল যে, "বিজ্ঞান কলেজে" ভারতবর্ষের অধিবাসী ব্যতীত অন্যদেশীয় লোক অধ্যাপক নিযুক্ত হইতে পারিবে না। প্রয়োজন হইলে বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপকদিগকে বিজ্ঞানে আবশ্যকী শিক্ষালাভার্থ বৃত্তি দিয়া ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানে পাঠাইতে হইবে। যাঁহারা বিজ্ঞান কলেজে থাকিয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য বৃত্তি লইবেন, তাঁহারা আইন বা অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারিবেন না। গভর্ণমেণ্ট এই বিজ্ঞান কলেজ ও আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন, এবং বিজ্ঞান শিক্ষার্থী ও আয়ুর্ব্বেদের ছাত্রদিগের উৎসাহ প্রদানার্থ উভয় বিদ্যালয়ের উপযুক্ত ছাত্রদিগকে উপাধি ও বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা করিলেন। বিজ্ঞান কলেজটী সরলপুরের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্থানে নির্ম্মিত হইল।

বিজ্ঞান কলেজ স্থাপিত হইবার পর এক বৎসর অতীত হইয়াছে, এখন পর্য্যন্ত কৃষ্ণপদের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। বিক্রমপদ বাবু পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার পূর্ব্বেকার কলেজে সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। আমি বিজ্ঞান কলেজের রসায়নের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছি, মাসিক পাঁচ শত টাকা বেতন পাই। এতদ্ব্যতীত চিকিৎসা করিয়া থাকি। তাহাতেও পড়ে মাসিক তিন চারি শত টাকা আয় হয়। চিকিৎসা ব্যবসায়ে আমি ইচ্ছা করিলে আরও আয় করিতে পারি কিন্তু আমি সচরাচর খুব বড়লোক না হইলে, সাধারণ রোগীদিগের নিকট কিংবা বন্ধু বান্ধবদিগের নিকট কোনরূপ দর্শনী লই না, সেই জন্যই ইহাতে মাসিক তিন চারি শত টাকার অধিক আয় হয় না। অধ্যাপনা করিয়া পাঁচ শত, চিকিৎসা ব্যবসায়ে তিন চারি শত এইরূপে আমার মাসিক আট নয় শত টাকার অধিক আয় হইয়াছে। আমি ইহাতেই সন্তুষ্ট। ইতিমধ্যে সরলপুর হইতে শ্যামনগর পর্য্যন্ত একটী শাখা রেল লাইন খুলিয়াছে।

এই সময় একদিন বিনয়চন্দ্রের এক টেলিগ্রাম আসিল। তাহাতে সে জানাইয়াছে যে বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রিবিকাউন্সিলের আপীল খরচাসহ ডিস্‌মিস্ হইয়াছে, বিনয়চন্দ্র অতি শীঘ্র দেশে ফিরিতেছেন। এই আপীল ডিস্‌মিস্ হওয়াতে বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়কে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে। বন্ধু যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আমাকে জানাইলেন যে বিক্রমপদ বাবু এই মোকদ্দমার খরচাস্বরূপে বিশ্বনাথ বাবুর নিকট দেড় লক্ষ টাকার বেশী পাইবেন। এতদ্ব্যতীত এই যে প্রায় ছয় বৎসর ধরিয়া মোকদ্দমা হইল, সেই সময়ের জন্য বিশ্বনাথবাবু নালিশী সম্পত্তি দখল করিবার জন্য তাঁহার নিকট বিক্রমপদ বাবু অন্ততঃ এক লক্ষ টাকা পাইবেন। কিন্তু বিক্রমপদ বাবু অতি আশ্চর্য্য প্রকৃতির লোক। এত বড় জিদের মোকদ্দমা প্রিবিকাউন্সিলে জিতিবার পরও তাঁহার কোন প্রকার ভাবান্তর লক্ষিত হইল না।

(৬)

আমরা সকলেই বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় রায় বাহাদুরের আসন্ন বিপদের কথা ভাবিতেছি। তাঁহার কার্য্য কলাপের পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রতি আমরা বড় একটা প্রসন্ন ছিলাম না। সেই জন্য আমাদের মধ্যে কেহ বা বলিতেছেন যে ঠিক হইয়াছে, ধর্ম্মের জয় অধর্ম্মের পরাজয় ত আছেই। রায় বাহাদুর এতদিন পাপ করিয়া যা

করিয়াছিল, এইবার তার প্রায়শ্চিত্ত করুক।" তার পর বগলামবরে বিনয়চন্দ্র দেখে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতে লাগিলেন। বিলাতের প্রিবিকাউন্সিলে কাজ করিয়া তিনি সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তাহার উপর তিনি সুপণ্ডিত, বাগ্মী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি; বিষ্ণুপদ বাবুর মত লোক তাঁহার সহায় সুতরাং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি আইন ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া অজস্র অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন।

(৭)

বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রিবিকাউন্সিলের ডিক্রী জারী করিয়া নালিশী জমিদারীতে আদালত সাহায্যে দখল লইয়াছেন। এই ঘটনার এক সপ্তাহ পরে পূজা উপলক্ষে কলেজ ও কাচারী প্রভৃতি বন্ধ হইয়াছে।

আমরা সকলে এই সময়ে এক দিন সন্ধ্যার পর বিষ্ণুপদ বাবুর বৈঠকখানায় বসিয়া রহিয়াছি। রাম কমল বিদ্যালঙ্কার মহাশয় "যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের" একটী শ্লোকের আলোচনা করিতেছেন। এমন সময় বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় রায়বাহাদুর ধীরে ধীরে সেইস্থানে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের কণ্ঠরোধ হইল। আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিলাম। বিষ্ণুপদ বাবু তাঁহার স্বাভাবিক গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "আসুন বিশ্বনাথ বাবু, আসুন, নমস্কার। আজ্ঞে আজ্ঞা হউক।" বিশ্বনাথ বাবু প্রতি নমস্কার করিয়া বলিলেন, "আজ্ঞে আপনার নিকটই আসিলাম।" এই বলিয়া, একেবারে সটাং বিষ্ণুপদ বাবুর নিকট গিয়া তাঁর পা চাপিয়া ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমরা সকলেই অবাক্!

বিষ্ণুপদ বাবু। আরে বিশ্বনাথ বাবু, করেন কি! করেন কি! ছি! ছি! এমন করিয়া কি পা ধরিতে আছে? এই বলিতে বলিতে অতি কষ্টে নিজকে বিশ্বনাথ বাবুর কবল হইতে মুক্ত করিলেন। তখন বিশ্বনাথ বাবু যোড়হস্তে বিষ্ণুপদ বাবুকে বলিতে লাগিলেন, "মহাশয়, বলুন যে আমাকে রক্ষা করিবেন। নচেৎ আমি আপনার নিকট হত্যা দিব।" বিষ্ণুপদ বাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, কি হইয়াছে বলুন।"

বিশ্বনাথ রায়বাহাদুর বলিলেন, "আপনার অবিদিত কিছুই নাই। আমি আপনাদের অন্নে প্রতিপালিত। ওই জমিদারীর ব্যাটার কৌসে পড়িয়া অহঙ্কারে মত্ত হইয়া অন্যান্য সহিত বিরোধ করিতে গিয়াছিলাম, কোন কোন বিষয়ে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণও করিয়াছিলাম। তা এখনও ধন্য আছেন। এখনও চন্দ্র সূর্য্য উঠিতেছেন, এত পাপ ধরণী সহিবেন কেন? আমার পাপের প্রতিফল হইয়াছে। এখন আপনি আমার গলায় পা দিয়া মারিয়া ফেলুন, তাহা হইলে আমার সকল যন্ত্রণার অবসান হয়।

বিদ্যালঙ্কার মহাশয়।—চাটুর্য্যে মহাশয় ওই কার্য্যটী করিতে পারিবেন না।

বিশ্বনাথ। বিদ্যালঙ্কার মহাশয়, আপনারও পায়ে পড়ি, আপনারা আমাকে রক্ষা করুন। নচেৎ আমি অন্নাভাবে মারা যাইব।"

বিদ্যালঙ্কার। আপনার বক্তব্য কি তাহা এপর্য্যন্ত শুনিতে পাই নাই।

বিশ্বনাথ। আমার বক্তব্য যে কি তাহা আর কোন্ মুখে বলিব। আর না বলিলেই বা চলিবে কেন। (বিষ্ণুপদ বাবুর দিকে চাহিয়া যোড় হস্তে) বাবু আমাকে রক্ষা করুন। আপনি কিছুদিন হইল নালিশী জমিদারীতে দখল লইয়াছেন। এখন যদি আমার নিকট তিন আদালতের খরচা আর পাঁচ বৎসরের ওয়াশীলাৎ আদায় করেন তাহা হইলে আমি মারা যাইব।

যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলিলেন, "রায়বাহাদুর, আপনার একথা বলা অন্যায়, উনি ওঁর ন্যায্য দাবী ছাড়িবেন কেন?

রায়বাহাদুর। যোগেশ বাবু, আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিও না বাবা। অন্য লোকের সহিত বিষ্ণুপদ বাবুর তুলনা হয় না। তিনি অবশ্যই এই গরিব ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিবেন। এই যোলকলায় আমি পূর্ণ্যবান্ হইয়াছি। বছর দেড় হইতে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ভয়

দূর হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট হইতে অতিরিক্ত যে ভাতা পাইতাম, তাহাও বন্ধ হইয়াছে, এখন সম্বলের মধ্যে পেনসনের দুইশ টাকা, তাও আবার মাসে মাসে পাই না। ছয় মাস না গেলে টাকা পাওয়া যায় না। পোষ্য অনেক গুলি, সব গুলিই কুপোষ্য, ছেলে তিনটী সকলেই — লায়েক। এ বলে উহারে দেখ। কাহারও এক পয়সা আনিবার মুরাদ নাই। এমন অবস্থায় আমার কাছে খরচার টাকা ও ওয়াশীলাৎ আদায় করিতে যাওয়া আর আমার গলায় পা দিয়া আমাকে মারিয়া ফেলা একই কথা। সোহাই বিষ্ণু বাবু, এ গরিব ব্রাহ্মণকে রক্ষা করুন। আমি চিরকালের আপনাদের আশ্রিত, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।" রায় বাহাদুরের এই রূপ কাকুতিতে ত আমরা অনেকেই বিরক্ত হইয়া একে একে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম।

(৮)

বিশ্বনাথ বাবু তিন দিন শ্যামনগরে থাকিয়া তাঁহার কার্য্য উদ্ধার করিয়া চলিয়া গেলেন। অর্থাৎ বিষ্ণুপদ বাবু রায়বাহাদুরকে মোকদ্দমার খরচা ও ওয়াশীলাতের দায় হইতে মুক্তি দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এই ব্যবহারে রামকমল বিদ্যালঙ্কার বলিলেন, "চাটুর্য্যে মহাশয়, আপনি দয়ালু ও দাতা। বিশ্বনাথকে দয়া করিয়া আপনার উচ্চ হৃদয়ের কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু আপনি কখনই ঐ সর্পপ্রকৃতি বিশ্বনাথকে বিশ্বাস করিবেন না। ও ব্যক্তি আপনার নিকট এইরূপ অনুগ্রহ লাভ করিয়া গেল, কিন্তু ও সুবিধা পাইলেই আপনাকে দংশন করিতে বিরত হইবে না। আপনি সাবধানে থাকিবেন।"

ইহার পর বিশ্বনাথ প্রতিমাসে অন্ততঃ একবার করিয়া শ্যামনগরে আসিয়া বিষ্ণু বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে তোষামোদ করিয়া যাইতেন। বিষ্ণুপদ বাবু তোষামোদ-প্রিয় ছিলেন না, কিন্তু চক্ষুলজ্জায় তিনি বিশ্বনাথকে শ্যামনগরে আসিতে নিষেধ করিতে পারিতেন না। সরল প্রকৃতির রামকমল বিদ্যালঙ্কার বিশ্বনাথকে দেখিলেই তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিতেন। বিশ্বনাথ প্রথম প্রথম স্তব স্তুতির দ্বারা বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিয়া তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া অতঃপর আর তাঁহার দিকে ঘেঁষিতেন না।

এইরূপে দেখিতে দেখিতে ডেমডিমনা জাহাজ ডুবির পর দশ বৎসর কাটিয়া গেল। তথাপি রুক্মপদের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না।

(৯)

বিষ্ণুপদ বাবুর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিয়াছে। এখন মধ্যে মধ্যে তাঁহার পরিপাকের ব্যাঘাত ঘটে। পরেশ বাবু এক বৎসর হইল সন্ন্যাস রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। কয়েক মাস হইল বিষ্ণুবাবুর পত্নীও হৃদ্‌রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। বিষ্ণুবাবুর পৌত্রীটী তাহার পিতামহীর অত্যন্ত অনুগত ছিল। পিতামহীর মৃত্যুতে সে অত্যন্ত কাতর হইয়াছে। সেইজন্য পরেশ বাবুর স্ত্রীকে তাঁহার কন্যা ও দৌহিত্রীর নিকট আসিয়া থাকিতে হইয়াছে। ব্যাপার যখন এইরূপ সেই সময় একদিন বিষ্ণুপদ বাবু রামকমল বিদ্যালঙ্কার ও আমাদিগের কয়েকজনকে তাঁহার নিকট ডাকাইয়া বলিলেন, "আমি আর বেশীদিন বাঁচিব না। মৃত্যু কলেজের বন্দোবস্ত পূর্ব্বেই হইয়াছে, সেজন্য কোন ভাবনা নাই। আমি শীঘ্রই বৃন্দাবন যাইব। সেখানে গিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইব। আর সংসার-চিন্তা ভাল লাগিতেছে না। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় আমার দেবোত্তর সম্পত্তির ও অন্যান্য সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিবেন। আমার কর্ম্মচারীরা সকলেই বিশ্বস্ত ও প্রভুভক্ত। আমি মনে করিয়াছিলাম পৌত্রীটীর বিবাহ দিয়া যাইব, কিন্তু সে রুগ্ন ও বিষণ্ণ ভাবে থাকে এবং সে শ্বশুর বাড়ী গেলে তাহার মাতা কেমন করিয়া থাকিবে এই বিষয় চিন্তা করিয়া তাহা হইতে বিরত আছি।"

রামকমল বিদ্যালঙ্কার। আর ও বছর দুই থাকিয়া গেলে হইত না?

বিষ্ণুপদ বাবু। আর না। আমি ততদিন বাঁচিব না। বাঁচিলেও বার বৎসরের পর যে সকল অনুষ্ঠান হইবে তাহা দেখিতে পাইব না।

রামকমল বিদ্যালঙ্কার। আপনি বিজ্ঞ ব্যক্তি। আপনাকে অধিক বলা শোভা পায় না। রুক্মপদ

ফিরিয়া আসিবে। সে নিশ্চয়ই বাঁচিয়া আছে। জ্যোতিষ শাস্ত্র যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাহাকে অবশ্য ফিরিয়া আসিতে হইবে। শাস্ত্র কখনও মিথ্যা হইতে পারে না। আমি আপনার পুত্রের কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়াছি।

বিষ্ণুপদ বাবু। পণ্ডিত মহাশয়, আপনি ঠিক বলিয়াছেন, শাস্ত্র কখন মিথ্যা হয় না। গণনা যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে কোষ্ঠীর ফল ফলিবেই। সেই জন্যই ত আমি এখান হইতে যাইতে চাহিতেছি। আমার কোষ্ঠীর লিখিত ফল অনুসারে আমি আর এক বৎসরের বেশী বাঁচিব না। যিনি আমার কোষ্ঠী প্রস্তুত করেন, তিনি তখনকার সর্ব্বপ্রধান জ্যোতিষী; তাঁহার গণনায় কখনও ভুল হইয়াছে এমত শুনি নাই।

বিদ্যালঙ্কার। এ কথার পর আমি আর কি বলিব! আপনি চলিয়া গেলে আমরা কি ভাবে চলিব তৎসম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ দিয়া যাইবেন।

বিষ্ণুপদ বাবু। তাহার কোন প্রয়োজন দেখি না। তথাপি দুচারটি কথা বলিয়া যাইব। সর্ব্ব প্রথম কথা এই যে, উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া আমার পৌত্রীটীর বিবাহ দিবেন।

এই সকল কথার দুই মাস পরে সম্পত্তির ব্যবস্থা করিয়া বিষ্ণুপদ বাবু কয়েক জন ভৃত্য সঙ্গে করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন। বৃন্দাবনে যাইবার ছয় মাস পরে তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হইবার পর তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ বহুস্থানে শোকসভা হইল এবং নানা স্থানে, তাঁহার মত দানশীল, পরোপকারী ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির উপযুক্ত স্মৃতি-চিহ্ন রক্ষার আয়োজন হইতে লাগিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

অন্তিম বিদায়ে

(Rossetti'র অনুকরণে রচিত।)

(১)

আমি যবে ম'রে যাব প্রিয়,
গাহিও না বিষাদের গীতি,
নদীতটে চিতার উপরে
রোপিও না গোলাপের বীথি,
রচিওনা, সেথা কুঞ্জবন,
মর্ম্মরের মিছে আবরণ,
হোক শ্যাম দুর্ব্বাদল'পরে
প্রকৃতির অশ্রু বরিষণ।
মাধবী বকুল যুঁথী হারে
করিও না তারে আবরণ,
অশ্রুসিক্ত করোনা সে ভূমি
সন্ধ্যাদীপে নাহি প্রয়োজন।

যদি কভু ছিন্নার মাঝারে
উঠে ভাসি মূরতি আমার,
রেখো মনে, কিম্বা ভুলে যেও,
দেখিবারে আসিব না আর।

(২)

বরিষার বারিধারা আর
ঝরিবে না মাথার উপর,
প্রকৃতির সুষমা ভাণ্ডার
চিরলুপ্ত আমার গোচর।
শুনিব না কণ্ঠে পাপিয়ার
অশ্রুসিক্ত বেদনার গান,
শুনিব না প্রদোষে উধার
তটিনীর মৃদু কল তান।
তব আমি মহা অন্ধকারে
স্বপ্ন-ঘোরে চিরসুপ্ত প্রাণ,
জগতের সুখ দুঃখ প্রীতি
সকলেরই হবে অবসান!
তবু এই মর্ম্মের মাঝারে,
ওগো প্রিয়! রাখিব তোমায়,
পর পারে অতীতের স্মৃতি
যদি প্রিয়! বুঝে নাহি যায়।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

রামমোহন বার্ষিকী *

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে নভেম্বর মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর ব্রিষ্টলে তিনি দেহত্যাগ করেন। সেইদিন হইতে আজ আশী বৎসর পূর্ণ হইল। যে দিন তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন, তাহার ঠিক আট বৎসর পরে ঠিক সেই দিনেই কলিকাতা মহানগরীতে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন জন্মগ্রহণ করেন।

যতদিন যাইতেছে ততই রাজার নিকট আমাদের ঋণের পরিমাণ অধিকতর বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। ভারতের সেই অন্ধকার যুগে রামমোহনের এ দেশে আসা ও এখানে তাঁহার বড় হওয়ার মধ্যে ভগবানের একটা নিগূঢ় ইচ্ছার সন্ধান আমরা পাইয়াছি বলিয়া মনে হয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে এক করিবার জন্যই বুঝি রামমোহন এখানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। দেশের লোক তাঁহাকে তখন চাহে নাই। তিনি এক প্রকার নির্ব্বাসিত হইয়াই এ দেশে আসিয়াছিলেন। রামমোহনের নির্ব্বাসনে ও তদবস্থায় তাঁহার মৃত্যুতে ভারতে জাতীয়তার বজ্রপাত হইয়াছে। তিনি এখানে না আসিলে, স্বদেশে এবং বিদেশে তিনি স্বজাতির জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ না করিলে আজ আমরা দলে দলে দিক্ দিগন্ত হইতে এখানে আসিতাম না। ভারতীয় যুবক যে আজ পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিতেছে সে পথ তিনিই এ যুগে দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। ভারতের নাম পৃথিবী ভুলিতে বসিয়াছিল, রাজা সেই বিস্মৃতির কবল হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন।

ভারতের বর্ত্তমান রাজনীতি, ধর্ম্ম, শিক্ষাপদ্ধতি সমাজ সাহিত্যের পিতা রাজা রামমোহন রায়। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত এই দেশপিতার নামে বর্ত্তমান যুগের নামকরণ করিয়াছেন। নব্য ভারতের এমন কোনো আশা ছিল না যাহা রামমোহন দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পান নাই এবং যাহার প্রতিকার চিন্তা করেন নাই। নব্য ভারতের পক্ষে যাহা কিছু আশার কথা তাহাও তিনি ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে দর্শন করিয়াছিলেন এবং স্বদেশবাসীদিগকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

এ কথা ঠিক যে রামমোহন এ দেশে আসিবার পূর্ব্বে ইংরাজ ভারতে গিয়াছিলেন, কিন্তু রামমোহন এ দেশে আসিবার পূর্ব্বে দুই দেশের যথার্থ পরিচয় আরম্ভ হয় নাই। রামমোহনের নিকট হইতে ইংলণ্ড ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা নিগূঢ় সংবাদ শুনিয়াছিল। ভারতের প্রেমের কথা তেমন করিয়া কহিতে, ভারতকে এ দেশে তেমন করিয়া উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে আর কেহ পারে নাই, তাঁহার পূর্ব্বেও নয়, পরেও নয়।

আজ ইউরোপে নারীজাতির অধিকার লইয়া বিষম তর্ক বাধিয়াছে; কিন্তু নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশে রাজা নারীজাতির ওকালত নামা লইয়া প্রায় শতাব্দীকাল পূর্ব্বে যে তুমুল সংগ্রাম করিয়াছিলেন তাহা কি বিস্ময়কর নহে? সুসভ্য ইউরোপের আধুনিকতম সমস্যার সমাধান তিনি নির্ভয়ে করিয়া গিয়াছেন। হাইড পার্কে নারীগণ যে তাঁহাদের প্রাপ্য অধিকার দাবি করিতেছেন, সে দাবির স্বপক্ষে শতাব্দীকাল পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায় খরচাসমেত ডিক্রি দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে স্বার্থপর পুরুষের আপীল বার বার ভগবানের দরবারে ডিস্‌মিস্ হইয়া গিয়াছে।

দেশকে যখন এক শ্রেণীর লোক ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য ও অধিমিশ্র সংস্কৃত শিক্ষার নূতন নিগড়ে বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছিল তখন তিনিই সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াও তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। যে ইংরাজী শিক্ষার ফলে আসমুদ্র ভারতে আংশিক ঐক্য সম্ভবপর হইয়াছে, যে ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাবে ভারতের প্রধান প্রধান প্রাদেশিক সাহিত্য বৈচিত্র্য ও পুষ্টিলাভ করিয়াছে রাজা তাহার সর্ব্ব প্রথম ও সর্ব্ব প্রধান সমর্থক

* আমাদের পরমশ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু শ্রীযুক্ত হিন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদে। তাঁহাদের সহিত জনসঙ্ঘ হইবার পূর্ব্বে এই প্রবন্ধটী ও একটী গল্প পাঠাইয়াছিলেন। তিনি ইংলণ্ডে রাজার সমাধিস্থানের ছবি তুলিয়াছিলেন। প্রবন্ধটী ও গল্পটী হারাইয়া গিয়াছিল, পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া এবার উহা প্রকাশ করিলাম। ছবিগুলি প্রকাশ করিব। ভাঃ মঃ সঃ।

এবং সাধক। ভারতবাসিগণ যে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়া দিন্ দিন বৈষম্য হইতে সাম্যের পথে অগ্রসর হইতেছেন ইহাও তাঁহার বুদ্ধযোষণার ফল।

যে বাঙ্গালা সাহিত্য বর্ত্তমান সভ্য জগতের বিস্ময় ও আদরের সামগ্রী হইয়াছে উহা তাঁহার কঠোর তপস্যার ফল। বাঙ্গালীর প্রিয় গদ্য সাহিত্যের পিতা তিনি। বিজ্ঞান চর্চ্চার আদি সমর্থক তিনি। ব্রহ্মসঙ্গীতের আদি রচয়িতা তিনি। সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে শাস্ত্র চর্চ্চার প্রবর্ত্তক তিনি। সাময়িক পত্রের আদি প্রচারক তিনি। নব্য ভারতের মুক্তির বিধান, ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যাতা তিনি। ভারতবর্ষের সকল উন্নতির মূল তিনি।

কিন্তু তাঁহাকে শুধু ভারতবর্ষের আপনার জন বলিলে তাঁহার প্রতি সঙ্কীর্ণতা দোষ আরোপ করা হইবে। যিনি বিদেশীর জন্যে লাভে টাউন হলে ভোজ দিয়াছিলেন, যিনি স্বাধীনতার পতাকা দেখিবার আগ্রহাতিশয্যে আপনার পা ভাঙ্গিয়া আজীবন আনন্দের সহিত বহন করিয়াছিলেন তাঁহাকে শুধু ভারতের আপনার লোক বলিলে অন্যায় হইবে। ভারতের বাহিরে আসিয়া এই সুদূর দেশে বিজাতির মধ্যে তাঁহার মৃত্যু ও সমাধি তাঁহার জীবনের সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক ভাবেরই সমর্থন করিতেছে। মৃত্যুতেও বিশ্বপ্রেমিক রামমোহন সঙ্কীর্ণ হইতে পারেন নাই। আমরা বহুবার তাঁহার অস্থি দেশে বহন করিয়া লইয়া যাইবার প্রস্তাব ও সংকল্প করিয়াছি কিন্তু এখন মনে হইতেছে, উহা যে এতদিন কার্য্যে পরিণত হয় নাই ভালোই হইয়াছে। তাঁহার অস্থি বহন করিয়া গৃহে লইয়া গেলে আমরা তাঁহার উদার সার্ব্বজনীন ভাবকে খর্ব্ব করিতাম। ভারতের বাহিরেও ভারতবাসীর এই গৌরবজনক তীর্থ ভারতের উদারতারই পরিচয় দিবে।

আচার্য্য কেশবচন্দ্র যেন এ দেশে অবস্থানকালে ঠিক তীর্থযাত্রীর মত শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে অবনত চিত্তে এই স্থান দর্শন করিয়াছিলেন এবং, সমাধির পার্শ্বে জানু পাতিয়া এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন :—

"I especially offer prayer for the soul of that illustrious man who came from my country, and whose remains lie here. Nourish his soul and heart with strength, and purity and piety, that he may, O Lord, find the blessings of communion with Thee through everlasting ages. And have mercy, Father, upon all my brothers and sisters gathered in this chapel this morning; sanctify their hearts, purify their hearts, purify their resolutions and aspirations, and O our living God, gather us together in thy holy purity, that we may learn to worship Thee in spirit and in truth as our common father, in time and eternity. Amen."

রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত এক সময়ে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা হয়ত অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে :—

"তখন তোমার জ্ঞান ও ধর্ম্মোৎসাহে উৎসাহিত হৃদয়, মঙ্গলময়—পক্ষিসঙ্কুল পরিবেষ্টিত একটি অগ্নিময় আগ্নেয়গিরি ছিল : • • তুমি বিজ্ঞানের অনুকূল পক্ষে যে সুদৃঢ়ীর রণবাদ্য বাদন করিয়া গিয়াছ, তাহাতে যেন এখনও আমাদের কর্ণকুহর ধ্বনিত করিতেছে। সেই অদ্যাপিত গম্ভীর তূর্য্যধ্বনি অদ্যাপি বারবার প্রতিধ্বনিত হইয়া এই অযোধ্য দেশেও জয় সাধন করিয়া আসিতেছে। তুমি স্বদেশ ও বিদেশব্যাপী ভ্রম ও কুসংস্কার সংহার উদ্দেশে আততায়ী স্বরূপে রণদুর্ম্মদ বীরপুরুষের পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছ এবং বিচারযুদ্ধে সকল বিপক্ষ পরাস্ত করিয়া নিঃসংশয়ে সম্রাট্ রূপে জয়ী হইয়াছ। জড়ময় ভূমিখণ্ড তোমার রাজ্য নয়। তুমি একটি সুবিস্তার মনোরাজ্য অধিকার করিয়া রাখিয়াছ। তোমার সমকালীন ও বিশেষতঃ উত্তর কালীন সুমার্জ্জিতবুদ্ধি শিক্ষিত সম্প্রদায় তোমাকে রাজমুকুট প্রদান করিয়া তোমার জয়ধ্বনি করিয়া আসিতেছে। যাঁহারা আবহমান কাল হিন্দু জাতির মনোরাজ্যে নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিয়া আসিয়াছেন, তুমি তাঁহাদিগকে পরাজয় করিয়াছ। অতএব তুমি রাজার রাজা। তোমার জয় পতাকা তাঁহাদেরই

স্বাধিকার মধ্যে সেই যে উত্তোলিত হইয়াছে, আর পতিত হইল না, হইবেও না, নিয়ত একভাবেই উড্ডীয়মান রহিয়াছে : পূর্ব্বে যে ভারতবর্ষীয়েরা তোমাকে পরম শত্রু বলিয়া জানিতেন, তদীয় সন্তানেরা অনেকেই এখন তোমাকে পরম বন্ধু বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন, তাহার সন্দেহ নাই। কেবল ভারতবর্ষীয়দের কেন, তুমি জগতের বন্ধু।"

ভারতের সকল শিরা ও ধমনীতে আজ যাঁহার শোণিত বহমান আমরা সেই অলোকসামান্য পুরুষের শ্রাদ্ধ বাসরে তাঁহার দিব্য ধামবাসী আত্মার সান্নিধ্য অনুভব করি ও তাঁহার প্রতি আমাদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা অর্পণ করি। পিতৃপুরুষ দিগের তর্পণ করিবার শ্রেষ্ঠ অধিকার হইতে আজ যেন আমরা বঞ্চিত হইয়া না থাকি। *

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অব্যক্ত

বুক ভরা কত সাধ কত আশা মম
ঊষাকোলে জাগরিত বিহঙ্গের সম
নদি-নীড়ে বসি মোর দুলেছে কাকলি
আকুল- আবেগে আজ! পুলকে উথলি
বাহিরে আসিতে চায়, মধু-সাফল্যের
উদার আকাশতলে, শুভ্র আলোকের
বিপুল বন্যার মাঝে! কোথায় অরুণ,
নিরাশার মেঘে ঢাকা জীবন তরুণ
বিষাদ বেদনা মাখা; বুঝি অচেতন
নিবিড় সুপ্তির ঘোরে! বিকচ যৌবন
মুকুলিত ধরির রূপে, কহিছে কাঁদিয়া—
"উচ্ছ্বসিত সুধা-উৎস পাষাণে চাপিয়া
কোথা তুমি প্রিয়তম! রহিবে গোপন
অপূর্ণ অব্যক্ত করি আমারি ভুবন!"

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

---

* ইংলণ্ডে রাজার শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত।

ঈশা খাঁ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ব্রহ্মপুত্র-তটে শিবির সন্নিবেশ করিয়া ঈশাখাঁর অনুচরগণ বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই খাদ্য সামগ্রী ইত্যাদি সহ রক্ষিগণ-বেষ্টিত অশ্বতর সমূহ আসিয়া পৌঁছিল।

গভীর রাত্রিতে ঈশাখাঁ একাকী শিবির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহার কোষে অসি, দক্ষিণ হস্তে বর্শা। তিনি ধীরে ধীরে ব্রহ্মপুত্রের কূলে আসিয়া এক উন্মূলিত শুষ্ক বৃক্ষকাণ্ডের উপর বর্শার ভর দিয়া বসিলেন। ঈশাখাঁ দেখিলেন, শারদ চন্দ্রালোকে ধরণীর কি অপূর্ব্ব শোভা! সুপ্রশস্ত ব্রহ্মপুত্রের রজত-ধারার উপর কে যেন স্বর্গ হইতে মন্দাকিনীর স্নেহাশীষ ঢালিয়া দিয়াছে। মন্দ সমীরণের সঙ্গে সিন্ধু বীচিমালার স্বাধীন নর্ত্তন আর ঘুম পাড়ানী মাসীর মত বেলার অশ্রান্ত কুলু কুলু ধ্বনি!

"কল্লোলিনী কলস্বরে করে কুল কুল
কি ছার বংশীর ধ্বনি নহে তার তুল।"

যার কাণ আছে সে ত এই রকমই শোনে! ঈশাখাঁ মুগ্ধ নয়নে দেখিলেন, ব্রহ্মপুত্রের বুকে জোছনার অপূর্ব্ব মধুর সম্মিলন আর বেলাভূমির সাদা-বালার বন্দনা গীতি শুনিবার জন্য সুধাকর আকুল আগ্রহে ব্রহ্মপুত্রের বুকের উপর কাপাইয়া পড়িয়াছেন। এক চাঁদে শত চাঁদ হইয়া আপনার হৃদয়ের অতৃপ্ত পিপাসা মিটাইয়া লইতেছেন। দূর-বিস্তৃত বনানীর ধূসর অস্পষ্ট ছায়া-চিত্রের উপর কে যেন গভীর নিশীথে বড় গোপনে তার স্বর্গীয় আশীর্ব্বাদের সুধা-অনুলেপন মাখাইয়া দিতেছে। সবাই নিদ্রিত নিস্তব্ধ, কেহ তাহার খোঁজ খবর পাইতেছে না;—যে পাইতেছে, সে সেই সুধা-ধারা আকণ্ঠ পান করিয়া বড় আনন্দে ডাকিয়া উঠিল "পিও—পিও—পিও—"

ঈশা খাঁ বসিয়া বসিয়া ধীরে ধীরে চিন্তা করিতে লাগিলেন, নিম্ন বঙ্গের এই প্রান্তে আসিয়া আমি প্রথমেই

এক মহাপুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম, ইহার পরামর্শই আমার এখন একমাত্র অবলম্বন। কি শান্ত স্নিগ্ধ পুণ্যোজ্জ্বল মুখ-শ্রী, কি অমৃত-নিস্যন্দিনী বাণী, কি গভীর অন্তর্দৃষ্টি! যাক্,—আমি ভবিষ্যৎ এই মহাত্মার পদতলে সমর্পণ করতঃ জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া লইব। আর একটা কথা, চেষ্টা করিতে হইবে—যশোরের প্রতাপাদিত্য, শ্রীপুরের কেদার রায় এই দুইজনকে বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ করা যায় কিনা। এই তিন জন অকৃত্রিম বন্ধুতার বন্ধনে আবদ্ধ হইলে দিল্লীশ্বরের সঙ্গে একবার বোঝা পড়া করা চলে। প্রতাপাদিত্যের সৈন্য সংখ্যা শুনিয়াছি শঙ্কর চক্রবর্ত্তীর মন্ত্রণায় ও সূর্য্যকান্তের নেতৃত্বে ক্রমশঃই পরিপুষ্ট হইতেছে। তাঁহার নৌ বলও ফিরিঙ্গি রডার কৌশলে সাময়িক বিস্ময় সুশিক্ষিত হইয়া উঠিয়াছে। কেদার রায় ও সেনাপতি রাজারামের অক্লান্ত পরিশ্রমে বঙ্গদেশীয় সেনানী সকল দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছে। আমার পাঠান ও হিন্দু সৈনিক মণ্ডলীও জীবন তুচ্ছ করিয়া যুদ্ধ করিতে জানে। এই ত্রিবেণী সঙ্গম হইলে বঙ্গদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা একেবারে অসম্ভব হইবে বলিয়া ত মনে হয় না। এই তিন জনের সম্মিলন ঘটিলে অন্যান্য ভৌমিকগণ স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আমাদের পক্ষ অবলম্বনে বাধ্য হইবেন। বঙ্গদেশের দিক্‌পালগণ এক পক্ষ হইয়া বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান ও পাঠান সৈন্য লইয়া দাঁড়াইলে, সেই শক্তি নিতান্তই সহজে হুংকারে উড়িয়া যাইবে এমন ত মনে হয় না!

আর একটা সমস্যা;—এই বিরাট ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলে অবশিষ্ট জীবন অশান্তিতেই অতিবাহিত হইবে। দিল্লীশ্বর সোণার বাঙ্গালার প্রলোভন সহজে পরিত্যাগ করিবেন, এমন ত বোধ হয় না। সুতরাং প্রায় সর্ব্বদাই যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকা অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে। এমত অবস্থায় পরিবারবর্গ ও ধনরত্ন যথাসম্ভব দূর ও নিরাপদ স্থানে রক্ষা করাই সঙ্গত। এই নিরবচ্ছে তেমন একটী স্থান নির্ণয় করা প্রয়োজন।

ঈশাখাঁ আরও কত কি ভাবিলেন। কত আশা ও নৈরাশ্যের চিত্র তাঁহার চক্ষুর উপর দিয়া বায়োস্কোপের ছবির মত ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কত উত্থান পতনের ইতিহাস তাঁহার হৃদয়কে আলোড়িত করিল। তিনি বসিয়া বসিয়া যেন জগতের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের অনেকগুলি জীবন্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিলেন।

সহসা শুনিলেন, একখানি চলন্ত নৌকা হইতে কে গাহিয়া উঠিল :—

"জাগহ নৃপতানু নন্দিনী
মোহন যুবরাজে।"

বিস্মিত ঈশাখাঁ দেখিলেন পূর্ব্বাকাশে উষার অপূর্ব্ব লাবণ্যশ্রী অন্ধকারের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। তিনি ত্বরিত পদে শিবিরে প্রবেশ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যথা সম্ভব সত্বরতার সহিত প্রাতঃকৃত্য সমাপ্ত করিয়া ঈশাখাঁ সাদা সিধা পোষাক পরিধান করিলেন। হিংস্র-জন্তুসঙ্কুল বনভূমিতে প্রবেশ করিতে হইবে, তাই মাত্র কোষবদ্ধ তরবারি খানি লইলেন। তার পর কাশেমকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "কাশেম আমি যাবৎ প্রত্যাবর্ত্তন না করি, তোমরা এইখানে অবস্থিতি কর। এই অরণ্যে কোনও সৈনিক যেন প্রবেশ না করে।"

অভিবাদন করিয়া কাশেম আজ্ঞা পালনে সম্মতি জ্ঞাপন করিল।"

ঈশাখাঁ ধীরপদে অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ফকীরের নিকট উপনীত হইলেন। দেখিলেন, ফকীর আজ আর একাকী নহেন। তাঁহার পার্শ্বে ব্যাঘ্রাসনের উপর মধ্যাহ্ন তপন সদৃশ তেজস্বী এক বৃদ্ধোত্তম, বৃষস্কন্ধ শাল-প্রাংশু মহাভুজ পুরুষ উপবিষ্ট। তাঁহার সম্মুখে ভূতলে প্রোথিত এক শাণিত ত্রিশূল। ইঁহার পরিধানে রক্ত বস্ত্র, গলায়, বাহুতে রুদ্রাক্ষ মালা, ললাটে ত্রিপুণ্ড্র, মাথায় দীর্ঘ কেশ, বদনে দীর্ঘ শ্মশ্রুরাজি, বাম পার্শ্বে কমণ্ডলু। ঈশাখাঁ আভূমি প্রণত হইলে প্রসন্নবদনে ফকীর কহিলেন, বৎস, অতি সুসময়েই আসিয়াছ! এই মহাপুরুষ আমার বহু দিনের সুহৃদ। বিগত রজনীতে ইনি কৃপাপূর্ব্বক এই স্থানে আগমন করিয়াছেন।

ইহার সঙ্গে আমি তোমার কথাই আলোচনা করিতেছিলাম।

"বিনীত বচনে ঈশাখাঁ কহিলেন, "কি অনুমতি হয় প্রভো?"

ফকীর কহিলেন, "বৎস, এই মহাত্মা ব্রহ্মপুত্রের অপর তীরে অবস্থিতি করিবার আকাঙ্ক্ষায় এ দেশে আগমন করিয়াছেন। ইহার জনৈক সঙ্গিহিপন্ন শিষ্য ব্রহ্মপুত্র পার করিতে ইচ্ছুক হইয়া ইহার আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছেন। এই মহাত্মা স্থান নির্দেশ করিলেই শিষ্য এ দেশে আগমন করিবেন। স্থান নির্ণয়ের জন্য ইনি ব্রহ্মপুত্রতটবর্ত্তী সমস্ত ভূভাগ পর্য্যটন করিয়াছেন। এ পাড়ে হিংস্রজন্তু পরিপূর্ণ জঙ্গলাবৃত বনভূমি, তাই অপর পাড়ে স্থান নির্দেশ করাই ইহাঁর অভিপ্রায়। কিন্তু সে স্থানে কোচ্‌দিগের অত্যাচারের আশঙ্কা।"

ঈশাখাঁ কহিলেন, "অশিক্ষিত বন্য কোচ্‌দিগকে তাড়াইয়া দিলেই ত সেই স্থান নিরাপদ হইতে পারে।"

"তাহাই ভাবিতেছিলাম। কোচ্‌দিগের অধিনায়ক লক্ষ্মণ হাজো জঙ্গলবাড়ীতে অবস্থান করিতেছে। সেখানেই তাহার রাজভবন। এখানে তাহারই সামন্ত বেদুর কোচ রাজা হইয়া বসিয়াছে। বেদুর সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে লক্ষ্মণ হাজোও যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে। সঙ্গে সৈন্য সংখ্যা কত?"

"একশত মাত্র।"

"এই একশত সৈন্য লইয়া হাজার কোচকে পরাজিত করিতে পারিবে?"

চিন্তা না করিয়াই ঈশাখাঁ বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ প্রভু, পারিব।"

"তবে আর সময় ক্ষেপণ করা অনাবশ্যক যাও প্রস্তুত হও গে। আজ রাত্রিতেই ব্রহ্মপুত্র পার হইতে হইবে। কাল প্রত্যূষে যুদ্ধ।" এই বলিয়া সেই অজিনাসন উপরে উপবিষ্ট পুরুষ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর ফকীরকে আলিঙ্গন করিয়া গভীর বনপথে প্রবেশ করিলেন।

ঈশাখাঁ ফকীরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো, ইনি কে? কোথায় যাইতেছেন?"

"ইনি একজন তান্ত্রিক সাধক, নাম গণপতি ভট্টাচার্য্য। এই বনভূমির অপর প্রান্তে উঁহার এক শিষ্য আছে। ইনি সম্প্রতি তথায় যাইতেছেন। রজনী যোগে পুনরায় এখানে আগমন করিবেন।"

"কোচ্‌দিগকে আক্রমণ সম্বন্ধে আপনার সম্মতি প্রতীক্ষা করিতেছি।"

"দেশ অধিকার করিতে হইলে, আক্রমণ করিতেই হইবে। কিন্তু আমি ভাবিতেছিলাম—মাত্র একশত পাঠান সৈন্য লইয়া—"

"আপনার আশীর্ব্বাদে এই এক শতই এক সহস্র। যাহারা জীবন তুচ্ছ করিয়া যুদ্ধ করিতে যায়, তাহারা বড় ভীষণ। আর প্রভো, এই আমার প্রথম পরীক্ষা, এই পরীক্ষার উপর আমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। যদি জয় লাভ করি তবে বুঝিব, ভগবান আমাকে অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত করিতেছেন। আর পরাজিত হইলে এইখানেই আমা ভরসার সমাধি।"

"কেন বৎস! পরাজয়ের পর পুনরায় নূতন উদ্যমে যুদ্ধ করিবে।"

"না দেব! তা হয় না। সম্মুখসমরে পরাজিত পাঠান যুদ্ধক্ষেত্র হইতে জীবিত ফিরে না।"

"ধন্য ধন্য ঈশা—যাও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হওগে। মোদা তোমার মঙ্গল করিবেন।"

প্রণাম করিয়া ঈশাখাঁ শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন। কাসেমকে জিজ্ঞাসা করিলেন:—

"কাসেম, তুমি এই একশত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া কত সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে পার?"

"একি প্রশ্ন খোদাবন্দ! আপনি কি গোলামের ক্ষমতা অবগত নহেন? আপনার হুকুম পাইলে এই একশত পাঠান লক্ষ বিপক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইবে। যুদ্ধে জয় হউক বা না হউক—হার আসে না। তবে একথা নিশ্চয়, জীবিত থাকিতে এক পাঠানও পৃষ্ঠভঙ্গ দিবে না!"

"তবে প্রস্তুত হও, আজ রাত্রিতেই ব্রহ্মপুত্র পার হইবার আয়োজন করিতে হইবে।"

"যো হুকুম" বলিয়া কাসেম অভিবাদন করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। এক দিকে এক শত সুশিক্ষিত অশ্বারোহী পাঠান সৈন্য, অপর দিকে সহস্রাধিক অশিক্ষিত কোচ। পাঠানের কোমরে অসি, হাতে বর্শা ও ঢাল, পৃষ্ঠে বন্দুক। দেহ বর্ম্মাবৃত, শিরস্ত্রাণে মস্তক আবৃত। আর কোচেরা অর্দ্ধ উলঙ্গ। মাথায় পালকের টুপী, হাতে বল্লম, লাঠী, কুরকী, তীর ধনু ইত্যাদি।

এক তেজস্বী অশ্বোপরি ঈশা খাঁ সৈন্য পরিচালনা করিতে করিতে কোচদিগের অদ্ভুত সাহস, আশ্চর্য্য রণকৌশল এবং ভয়ঙ্কর দৈহিক শক্তি দেখিয়া প্রীত হইলেন। মনে মনে প্রশংসা করিলেন। হায়, যদি এই দীর্ঘকায় বলবান মানুষগুলিকে উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া লইতে পারিতাম!—কি সাহস—কি শক্তি!

পাঠান সৈন্য কোচদিগের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। পিপীলিকা শ্রেণীর মত অগণিত কোচ শঙ্খনদীর তীরবর্ত্তী জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া পাঠান সৈন্য আক্রমণ করিল। ঈশা খাঁ দেখিলেন এই যুদ্ধে জয়ের আশা নাই; কেবল উভয় পক্ষে অগণিত নরহত্যা। বিশেষতঃ কোচদিগের সম্বন্ধে তাঁহার যে ধারণা ছিল তাহা সত্য নহে। ইহারা সামরিক বিদ্যায় যতই অশিক্ষিত হউক ইহাদের শক্তি বড় সামান্য নহে।

পাঠানেরা কিয়ৎক্ষণ তরবারি ও বর্শার সাহায্যে যুদ্ধ করিয়াছিল—এখন এই একশত পাঠান সারি দিয়া দাঁড়াইয়া বন্দুক হাতে লইল। কিন্তু তাহাতে কি হয়! এক একটী গুলিতে একাধিক শত্রু ধ্বংস হয় না; অথচ শত্রুসংখ্যা জলস্রোতের মত জঙ্গল হইতে বাহির হইতেছে।

সূর্য্যদেব মধ্যগগন-সীমা অতিক্রম করিতে চলিয়াছেন; ঈশা খাঁর প্রায় অর্দ্ধেক সৈন্য অল্পাধিক আহত হইয়াছে। দুই দশ জন ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছে। কোচদিগের হতাহতের সংখ্যা পাঁচশতেরও অধিক। এখনও বহু কোচ চীৎকার করিতে করিতে মহোল্লাসে রণক্ষেত্রে উপনীত হইতেছে, ঈশা খাঁ বুঝিলেন এই আক্রমণের বেগ সহ্য করা মনুষ্যপর নহে। সবিস্ময়ে দেখিলেন, কোচদিগের অধিনায়ক বেবুর রাজা এক প্রকাণ্ড হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আসিতেছে। বাম হস্তে ললাটের স্বেদ মোচন করিয়া ঈশা খাঁ একবার আকাশের দিকে চাহিলেন—"ভগবান, যা হবার হইবে—পাঠান প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবে না। যুদ্ধে প্রাণ দিব—মান দিব না।

মত্ত মাতঙ্গের ভীষণ চীৎকারে পাঠানের অশ্বগণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। ঈশাখাঁ দেখিলেন পাঠান সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইল, আর এক প্রাণীও বাঁচিবে না। পশ্চিমে দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র, সম্মুখে শত্রু। হায়, অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া কি কাজই করিয়াছি! দ্রুতগামী অশ্ব প্রেরণ করিলে একডালা দুর্গ হইতে সৈন্য কামান সবই আনাইতে পারিতাম।

বেবুর রাজা রণক্ষেত্রে উপনীত হইবামাত্র কোচেরা জয়ধ্বনি দিয়া শিঙ্গা বাজাইতে আরম্ভ করিল, গজরাজ ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া উঠিল—পাঠান সৈন্য আর শ্রেণী রক্ষা করিতে সমর্থ হইল না, অনেক দূরে পশ্চাতে হটিয়া আসিল। ঈশাখাঁ কিম্বা কাশেম তাহাদিগকে শান্ত করিতে পারিলেন না। কোচেরা মহা উল্লাসে জয় ধ্বনি করিয়া অগ্রসর হইল—এমন সময় জল স্থল কানন গগন প্রতিধ্বনিত করিয়া শব্দ হইল গুড়ুম—গুড়ুম—গুম্! ঈশাখাঁ, কাশেম সৈন্যগণ সকলেরই চমক লাগিল একি! কামান ডাকে কার?

আবার শব্দ হইল গুড়ুম্—গুড়ুম্—গুম্—"

ঈশাখাঁ চাহিয়া দেখিলেন, কোচ সৈন্যের বাম পার্শ্ব আক্রান্ত হইয়াছে। মুহুর্মুহুঃ কামানের গুলিতে বাতাহত কদলীর মত কোচ সৈন্য ধরাশায়ী হইতে লাগিল। পাঠানেরা পুনরায় হুঙ্কার করিয়া অগ্রসর হইল। সহসা একটি কামানের গোলায় বেবুর রাজার গজরাজ লীলা সংবরণ করিয়া ভূপতিত হইল। কোচ সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। কিন্তু আবার কামান ডাকিল গুড়ুম—গুড়ুম—গুম্—

বিস্মিত ঈশাখাঁ চাহিয়া দেখিলেন, এক তেজস্বী অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া গণপতি ভট্টাচার্য্য!

"ঠাকুর, তোমার এত দয়া! তুমি আজ ঈশার প্রাণ মান বাঁচাইয়াছ। দেব! একি রহস্য! অনুগ্রহ করিয়া বলুন এ আমার কামান আপনি কোথায় পাইলেন?"

বামহস্তে অবিন্যস্ত কেশরাশি পৃষ্ঠদেশে ফেলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া ঈশাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে কহিলেন "খাঁ সাহেব—তোমাকে যুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াই চিন্তা করিলাম, লক্ষণ হাতে সংবাদ পাইলে যুদ্ধে জয়ী হওয়া তোমার পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। তাই দ্রুতপদে একটানা অভিমুখে চলিয়া গেলাম। তোমার সৈন্যাধ্যক্ষ মহাবংখাঁ আমার কথা প্রথমে বিশ্বাস করেন নাই। তার পর অনেক চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে বিশ্বাস করাইলাম। তিনি চারিজন গোলন্দাজ আর চারিটী কামান দিয়া পাঠাইয়াছেন।"

ঈশা "এই সময়ের মধ্যে কোথায় একডালা আর কোথায় আমি; প্রভো আপনি"—

"কিন্তু বলিতে হইবে না ঈশা! আমি কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছি। যাও, এখন দুর্গ দখল কর। কোচ সৈন্য এ অঞ্চলে আর নাই। আজ রাত্রিতেই ভুলুয়াবাড়ী অভিমুখে যাত্রা করিতে হইবে।"

"আমার গুরুদেব কোথায়?"

"তিনি সাধু, মহাপুরুষ, এই নরহত্যার ক্ষেত্রে তাঁহাকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা করিও না। তোমার এই বিজয় লাভ তাঁহারই আশীর্ব্বাদের ফল—মনে রাখিও।—আমি এখন কামাখ্যায় চলিলাম—আজই মহাবংখাঁ তোমার সাহায্যে একশত সৈন্য প্রেরণ করিবেন। তোমরা এই খানেই বিশ্রাম কর।"

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই একডালার পূর্ব্বভীরে পাঠানের বিজয় পতাকা উড্ডীন হইল। (ক্রমশঃ)

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

দেওঘর

কতবার ভাবিয়াছিলাম সকলে মিলিয়া একবার দেওঘর দেখিয়া আসিব। যাতায়াতের এত সুবিধা থাকিতে এখন কে আর তাহা হইতে বঞ্চিত থাকিতে চায়? সে বার আমরা বড়দিনের ছুটিতে দেওঘর যাত্রা করিলাম। কলিকাতা হইতে দেওঘর প্রায় দুই শত মাইল ব্যবধান। দেওঘর কিম্বা দেবগৃহ হিন্দুদের বহু পুরাতন তীর্থস্থান। প্রবাদ যে, সতীর দেহের বামহাত খণ্ডের একখণ্ড এখানে পতিত হইয়াছিল, সেইস্থানে বৈদ্যনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মন্দিরে কোন মূর্ত্তি নাই, কেবল শিবলিঙ্গ আছে। সমস্ত হিন্দুস্থানের সুদূর প্রদেশ হইতেও বহুযাত্রী এখানে সমাগত হয়। বিশেষ বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে যাত্রীর অত্যন্ত ভিড় হইয়া থাকে।

আমরা রাত্রি প্রায় ১০টার সময় দিল্লী প্যাসেঞ্জার ট্রেনে হাওড়া হইতে যাত্রা করিলাম। মাস ৩।৪ পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে দেওঘর যাইতে হইলে কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। তখন পাঞ্জাব মেলের জন্য দেওঘর ব্রাঞ্চ গাড়ী অপেক্ষা করিত না। সেই জন্য দেওঘর যাত্রীদিগকে প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে যাইতে হইত। কিন্তু ইদানীং এই নিয়মের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন রাত্রি দশটার সময় পাঞ্জাব মেলে চড়িলে তার পরদিন ভোর ৮ টার সময় যশেদী জংসন এবং সেখানে গাড়ী হইতে নামিয়া তখনই দেওঘরের গাড়ীতে উঠিয়া আটটা সাড়ে আটটার সময় দেওঘরে পৌঁছা যায়। এই যশেদীর নামই পূর্ব্বে বৈদ্যনাথ জংসন ছিল। মধুপুরের পরেই যশেদী জংসন। এইখানে নামিয়া বৈদ্যনাথধামের গাড়ীতে উঠিতে হয়। ইহারও নূতন নামকরণ হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহার নাম দেওঘর ছিল। শুনিলাম যাত্রীগণ বৈদ্যনাথ জংসনকেই তীর্থস্থান ভাবিয়া মন্দির দেখিবার অতি প্রাতে জংসনে ঘরিয়া বেড়াইত এবং সময় মত ব্রাঞ্চ ট্রেণ ধরিতে না পারায় জংসন ষ্টেসনেই দিন রাত্রি কাটাইত। সুদূর প্রদেশ হইতে সমাগত যাত্রী গণের এই অসুবিধা মোচনার্থে রেলওয়ে কোম্পানী এই রূপ নামের পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। তাহাতে যাত্রীগণের অনেক সুবিধা হইয়াছে সন্দেহ নাই। ষ্টেসনটীর নাম বৈদ্যনাথ ধাম হইয়াছে বটে, কিন্তু সহরটীকে এখনও দেওঘর বলে। বৈদ্যনাথের মন্দির ষ্টেসনের সন্নিকটেই। যশেদী হইতে যে ট্রেণ বৈদ্যনাথে যাত্রী আনা নেওয়া করে তাহা বড় লাইনের গাড়ী (Broad gauge)। ইহার কামরাগুলি সুপ্রশস্ত, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও বেশ আরামপ্রদ। যশেদী হইতে বৈদ্যনাথ মাত্র চারি

মাইল ব্যবধান। পনর, কুড়ি মিনিটের মধ্যেই এখানে পৌঁছান যায়। কলিকাতা হইতে রাত্রির আহার করিয়া তৎপর দিন ভোরে দেওঘরে পৌঁছিয়া দুপুরের আহার করিতে পারা যায়। এই নিয়ম হওয়াতে কলিকাতা যাত্রীদের বেশ সুবিধা হইয়াছে।

দেওঘর যেমন একটী তীর্থ স্থান তেমনি স্বাস্থ্যনিবাস বলিয়াও প্রসিদ্ধ। সাঁওতাল পরগণার মধ্যে মধুপুর, জামতারা, কর্ম্মাটার, সিমুলতলার ন্যায় দেওঘরও একটী স্বাস্থ্যকর স্থান। বাঙ্গালা, বিহার ইত্যাদি বহুস্থান হইতে অনেক লোক এখানে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য সমাগত হইয়া থাকেন। দেওঘর সহরটী খুবই বড়। তিন, চারটী সহর ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৬।৭ মাইল হইবে। শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ যে স্থানে বাঙ্গালী উপনিবেশ স্থাপিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন তাহা দেওঘর হইতে প্রায় ৪।৫ মাইল দূর হইবে। সেই স্থানটীর নাম রিখিয়া। তাহাও যদি দেওঘরের মধ্যে ধরা যায় তাহা হইলে ইহার পরিসর প্রায় ১৩।১৪ মাইল হইবে। দেওঘর হইতে রিখিয়া পর্য্যন্ত বেশ সুন্দর, প্রশস্ত, পাকা রাস্তা আছে। যশেদী হইতে দেওঘর পর্য্যন্তও সুন্দর, প্রশস্ত, পাকা রাস্তা আছে। এইসব রাস্তায় সর্ব্বদা লোক যাতায়াত করিয়া থাকে। দেওঘর হইতে দুমকা যাইবার সুপ্রশস্ত পাকা রাস্তা আছে। ত্রিশ, চল্লিশ মাইল ব্যবধানে যে সকল বস্তি কিম্বা সহর আছে সেই সকল স্থানে যাইবারও ভিন্ন ভিন্ন পাকা রাস্তা আছে। এই সব রাস্তা দিয়া সর্ব্বদা লোক, মোটর, ঘোড়ার এবং গরুর গাড়ী যাতায়াত করিয়া থাকে। রিখিয়া, সিমুলতলা, এমন কি মধুপুর হইতেও অনেক লোক দেওঘরে জিনিসপত্র কিনিতে আসে। এখানে প্রত্যহ প্রাতঃকালে বাজার বসিয়া থাকে। মাছ, মাংস, ডিম, মুরগী, তরি-তরকারী সমস্তই এই বাজারে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া বিস্কিট, মাখন, ঘেসী, শাড়ী এবং ধুতি ইত্যাদিরও বেশ বড় বড় দোকান আছে। এখানে একটী জিনিস ব্যতীত আর কিছুরই বিশেষ অভাব উপলব্ধি করি নাই। এখানে ভাল জুতার দোকান নাই। কঙ্কর-ময় পাথুরে রাস্তার জন্য এখানে জুতা বড় শীঘ্র অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে, কিন্তু ভাল জুতার দোকান না থাকাতে ভারী অসুবিধায় পড়িতে হয়। যে সব জুতার দোকান আছে, তা সবই প্রায় নাগরী জুতার। আমার মনে হয়, কেহ যদি এখানে ভাল জুতার দোকান খুলিতে পারেন তবে বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করিতে পারিবেন।

লোহার জিনিসের জন্য দেওঘর প্রসিদ্ধ। অল্পদামে এমন সুন্দর লোহার গামলা, থালা, কড়া, ঢাকনী, হাতা ইত্যাদি দেখিয়াছি যে কিনিবার লোভ সংবরণ করিতে পারি নাই। অনেক গৃহে এই লোহার জিনিস মাজিয়া ঘষিয়া রূপার মত করিয়া রাখা হইয়াছে দেখিয়া খুব আনন্দ অনুভব করিয়াছি। দেওঘরের পাঁড়া প্রসিদ্ধ। ফরমাস দিয়া আনিলে ইহা বেশ মুখরোচক। এখানে উৎকৃষ্ট দধি পাওয়া যায়। একজন বাঙ্গালী মহিলা এখানে মিঠাইএর দোকান খুলিয়া বেশ পয়সা উপার্জ্জন করিতেছে। জিনিসও ভাল বানাইতেছে। এই দোকা-নের মিহিদানা, বুঁদে ও জিলেপী অতি উত্তম। এখানে টাকায় ৭।৮ সের করিয়া দুধ পাওয়া যায়। পূর্ব্বে দুধ বেশ সস্তা ছিল। এখন জিনিসের সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভাল মাংসের সের সাত আট আনা করিয়া। ইহা রোজই সব সময় পাওয়া যায়। আমরা শীতের সময় গিয়াছিলাম, তখন শাক সব্জী খুবই পাইয়াছি। মাছও বেশ পাওয়া যাইত। শুনিলাম গরমের সময় অর্থাৎ জুন, জুলাই ও আগষ্ট মাসে এখানে মাছ পাওয়া যায় না। দাবোয়া নামে একটী ছোট পাহাড়ী নদী আছে। গরমের সময় এই নদী বালুকারাশিতে পরিণত হয়। আমরা শীতের সময়ই উহার যেরূপ অবস্থা দেখিয়া আসিয়াছি তাহাতে উহাকে আর নদী বলিতে ইচ্ছা হয় না। তখনই গাড়ী, পাল্কী, মানুষ ইহার উপর দিয়া বেশ যাতায়াত করিত। এক হাত আন্দাজ প্রশস্ত নদী তর তর করিয়া বহিয়া যাইতেছে। গভীরতাও ৩।৪ আঙ্গুল হইবে। বর্ষা-কালে শুনিলাম ইহার পরিসর ও গভীরতা বৃদ্ধি পায়। এই দাবোয়া নদীর জল ভারী হজমী। বালি খুঁড়িয়া এই জল নিয়মিত পান করিলে সকল প্রকার পেটের

পীড়া দূর হইয়া থাকে। বালি খুঁড়িলে যে জল বাহির হয় তাহা অত্যন্ত ঠাণ্ডা এবং নির্ম্মল। মনে হয় কে যেন জল ফিলটার করিয়া রাখিয়া দিয়াছে। বর্ষার সময় নদীতে জলের সঙ্গে সঙ্গে ছোট মৎস্যের আবির্ভাব হয়। বাঙ্গালী আসিবার পূর্ব্বে দেওঘরবাসীরা এই মাছ খুব প্রাণ ভরিয়া খাইত ও সম্বৎসরের জন্য শুটকী করিয়া রাখিত। এখন বাঙ্গালীর জ্বালায় তারা এ সুখ হইতেও বঞ্চিত হইয়াছে। যে সব বড় মাছ বাজারে ওঠে তাহা সবই চালানি। সেইজন্য গ্রীষ্মের সময় তাহা পাওয়া যায় না, কারণ পচিবার ভয়ে চালান বন্ধ থাকে। ফল মূল যাহা দেওঘরে জন্মে, তাহা সবই বড় সুমিষ্ট। পেঁপে এখানে যেমন অপর্য্যাপ্ত জন্মে তেমনি সুস্বাদু। শাক সব্জী, ফল তরকারি পূর্ব্বে সবই সস্তা ছিল। কিন্তু এখন তেমন সস্তা দেখিতেছি না। দিন দিনই সব জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে। সকল দেশেই জিনিসের প্রায় একরূপ মূল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানে কলিকাতার ওজনই প্রচলিত।

এখানে সাধারণতঃ ইন্দারার জলই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার জল অতীব সুস্বাদু, নির্ম্মল এবং হজমী। ইন্দারা কাটান এখানে একটী ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। যাঁহার ইন্দারা খুঁড়িতে খুঁড়িতে পাথর বাহির হইয়া পড়ে তাঁহার ত খরচের অন্ত নাই। গবর্ণমেণ্ট হইতে ডিনামাইটের পাশ লইয়া তাহা দিয়া তবে পাথর ভাঙ্গিতে হয়। এইরূপ পাথর কাটাইয়া যিনি জল বাহির করিতে সমর্থ হন তাঁহার কূয়ার জল খুব ভাল হয়। কিন্তু এক কূয়া কাটাইতেই তাঁহার দালানের খরচ পড়িয়া যায়।

দেওঘর সহরটী খুব উঁচু নীচু (undulated)। ঠিক সহরের মধ্যে তেমন বড় পাহাড় একটীও নাই, তবে কিঞ্চিৎ বাহিরেই নন্দন পাহাড় নামে একটী পাহাড় আছে। সহরের বাহিরে বলিয়া এই পাহাড়ের নিকট এখনও তেমন বস্তি স্থাপিত হয় নাই। দেওঘর স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া বহু বাঙ্গালী এখানে বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছেন। দেওঘর বাঙ্গালীর সহর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আদিম অধিবাসীরা বাঙ্গালীর ছাপায় পড়িয়া সহরের বাহিরে আশ্রয় লইয়াছে। এখানে বড় লোকের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকাশ্রেণী নির্ম্মিত হইয়াছে। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, ময়মনসিংহের রাজা শশীকান্ত আচার্য্য ও পাইকপাড়ার রাজা ইত্যাদি অনেক বড়লোকের বাড়ী এখানে আছে। দেওঘর সহর দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহা রোহিনী ষ্টেটওয়ালীনের সম্পত্তি। পূর্ব্বে এই জমিদারী কোর্ট অব ওয়ার্ডসে ছিল, এখন জমিদার সাবালক হওয়াতে তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিয়াছে। কোর্ট অব ওয়ার্ডসে সম্পত্তি থাকা কালীন অনেক জায়গা বাঙ্গালীদের দখলে বিলি হইয়া যাওয়াতে এদেশের লোকেরা ভারী অসন্তুষ্ট। তাহাদিগকে ভিটা মাটী ছাড়িয়া নূতন স্থানে বেশী খাজনাতে জমী লইয়া ঘর বানাইতে হইয়াছে। এইরূপে আবাদি জমি প্রায়ই হস্তান্তরিত হওয়াতে ইহাদের কিছু কষ্ট হইয়াছে। বাঙ্গালী অধিবাসীর সংখ্যা অধিক হওয়াতে জিনিষ দুর্ম্মূল্য হইয়া পড়িয়াছে। গরু চরাইবার মাঠ নাই বলিলেই হয়। পূর্ব্বে বহু কোড় জঙ্গল থাকাতে জ্বালানি কাঠ কিনিতে হইত না। এখন তাহাও পয়সা দিয়া কিনিতে হয়। এই সমুদায় কারণে দেওঘরিয়ারা বাঙ্গালীর উপর মহা চটা।

একজন বৃদ্ধ দেওঘরিয়ার মুখে শুনিলাম যে বাঙ্গালী আসিবার পূর্ব্বে এখানে চারি পয়সা সের করিয়া খাঁটি সরিষার তৈল বিক্রয় হইত। সেই নিজে ঐরূপ কিনিয়া খাইয়াছে বলিল। এখন সরিষার তৈল ৸৹ সের হইয়াছে। আমি তাহাকে বলিলাম, "তোমরা কেন বাঙ্গালীর উপর এত চটা, বাঙ্গালী আসাতে তোমরা দেখ কত কাজ পাইতেছ। বাড়ী, রাস্তা, পুল ইত্যাদিতে বহু লোক মজুরী করিয়া পয়সা পাইতেছে। দোকান করিয়া অনেক লোক কত টাকা উপার্জ্জন করিতেছে। বাঙ্গালী আসাতেই এত বড় সহর বসিয়াছে, তবে কেন তোমরা তাহাদিগকে শত্রু বলিয়া মনে কর?" কিন্তু বৃদ্ধা কিছুতেই আমার কথায় কর্ণপাত করিল না। সে বলিল, "এখন দিন মজুরী করিয়া একজন লোক চারি আনা উপার্জ্জন করে। দুই সের চাউল না হইলে তাহার সংসার

চলে না। দুই সের চাউল না হইলে তাহার সংসার চলে না। দুই সের চাউলের দাম চারি আনা। এই এক চাউল কিনিতেই তার সব গেল, এখন অন্যান্য খরচ সে কি করিয়া চালাইবে? তেল, নুন, কাপড়, কাঠ ইত্যাদি কি দিয়া কিনিবে? ইহা ছাড়া জমির খাজনা আছে।" সে আরও বলিল, "পূর্ব্বে সকলের জমিতেই কোন না কোন ফসল হইত। ফসলের আদান প্রদানেই এক গৃহস্থের দিন বেশ চলিয়া যাইত। এখন আবাদী জমি বাঙ্গালী লইয়া গিয়াছে, ফসল কোথা হইতে হইবে?" তাহার যুক্তি গুলি নেহাৎ মন্দ দেখিলাম না। জমীদারও নাকি বাঙ্গালীর উপর তেমন সুপ্রসন্ন নহেন। শুনিলাম, তিনি নাকি জমি বিলি বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এখানে ড্রেণ, রাস্তা, ভাল করিয়া গঠিত হইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্টও সম্প্রতি জমি বিলি বন্ধ করিয়াছেন। এখানে ইচ্ছামত বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে পারা যায় না। গবর্ণমেণ্টের কয়েকটী নিয়ম আছে। স্ব স্ব জায়গার এক ষষ্ঠাংশের উপর বাড়ী তৈয়ার করিতে পারিবে। ইহার বেশী জমি বাড়ীর জন্য লাগাইতে পারিবে না। খড়ের বাড়ী প্রস্তুত নিষিদ্ধ। কোনও প্রকার আবাদ করিয়া তাহার ব্যবসা চালাইতে পারিবে না। সকলের বাড়ীতেই ড্রেণের সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে। অবশ্য এই সকল নিয়ম মিউনিসিপালিটির অন্তর্ভুক্ত স্থানেই আবদ্ধ। এই নিয়মগুলি অতি উত্তম তাহাতে সন্দেহ নাই।

দেওঘরে খুব সুন্দর ফুল জন্মে। গোলাপের জন্য দেওঘর প্রসিদ্ধ। একটু যত্ন করিলেই এই ফুল চমৎকার জন্মে। এখানে প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই মনোরম গোলাপের বাগান দেখিয়াছি। ইহাতে বাড়ীগুলির সৌন্দর্য্য শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখানকার রাস্তাগুলি খুব প্রশস্ত এবং পাকা। উহার দুইধারের সুদৃশ্য ফুলের বাগানে স্থানটী কি মনোরম শোভাই না ধারণ করিয়াছে! যখন বেড়াইতে বাহির হইতাম তখন বাগানের শোভায় ও ফুলের সুগন্ধে প্রাণ বিমোহিত হইয়া যাইত। তখন বাস্তব জীবনে স্বর্গসুখভোগ করিতাম। আমিও বাগানের শোভায় মুগ্ধ হইয়া কত অচেনা বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িতাম। এইরূপে কত অচেনা লোক চেনা হইয়া গিয়াছে। আমরা যে খানেই বাস করি না কেন এমনি একটু যত্ন করিয়া যদি স্ব স্ব গৃহে ফুলের বাগান করি তাহা হইলে বাড়ীগুলি কি সুন্দর দেখায়। কবিরা শিশুর অনিন্দ্য সুন্দর মুখের সহিত ফুলের তুলনা করিয়া থাকেন। শিশুর শুভ্র কোমল মুখের সহিতই ফুলের তুলনা হইতে পারে। উহাদের ন্যায় প্রাণ মুগ্ধকারী সামগ্রী আর কোথায়? শিশুর সুন্দর মুখখানি দেখিয়া যেমন, বিভোর হইয়া যাই তেমন প্রাণমন-মুগ্ধকারী সামগ্রী আর কোথায়? সুন্দর ফুলটী দেখিলে আমাদের নিজ মনও ভগবদ্ভাবে পূর্ণ হইয়া যায়। ফুল ভগবানের একটী শ্রেষ্ঠ দান। তিনি আমাদের সুখের জন্য ধরাকে কি রমণীয় করিয়া সাজাইয়াছেন! সেই সুনিপুণ কারিকর কি কারুকার্য্যই ফলাইয়া বিশ্বকে সুশোভিত করিয়াছেন! তাঁহার প্রিয় হইতে হইলে আমাদিগকে ভিতরে বাহিরে সুন্দর হইতে হইবে, কারণ ভগবান কত সৌন্দর্য্যপ্রিয়। যে দিকে তাকাই সেখানেই তাঁর সৌন্দর্য্যের প্রকাশ দেখিতে পাই। আমাদের প্রত্যেক গৃহ তাঁহারই মন্দির। তিনি ঘরে ঘরে নানারূপে আবির্ভূত হইয়া আছেন। আমাদের গৃহ-রূপ দেবমন্দিরকে সাজাইতে হইবে।

দেওঘরের আব হাওয়া এখন পর্য্যন্ত ভালই আছে। বহু অজীর্ণ রোগী এখানে আসিয়া উপকার লাভ করিয়াছেন। পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বরের পক্ষেও এদেশ খুব ভাল। গবর্ণমেণ্টের সুদৃঢ় নিয়মগুলি থাকাতে কোন পল্লীই ঘনবিবিষ্ট হইতে পারিতেছে না। শীত কাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালেই দেওঘর বেশী স্বাস্থ্যকর। তবে যাঁহারা গরম সহ্য করিতে পারেন না তাঁহাদের পক্ষে মার্চ্চ, এপ্রিল এবং মে বেশ ভাল। তখন খুব বেশী গরম পড়ে না কিন্তু পশ্চিমা বাতাস বহিতে আরম্ভ হয়। এই পশ্চিমা হাওয়া অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। দেওঘরের প্রাকৃতিক শোভা অতি মনোরম। পশ্চিমদেশের মত এ স্থান বৃক্ষলতা শূন্য কর্কশ নহে। আমি বাঙ্গলা

দেশের মানুষ, আমার কাছে শস্য-শ্যামল দেশই বড় ভাল লাগে। পশ্চিমের অনেক দেশ দেখিয়াছি, কিন্তু বাঙ্গলার মত এমন চোখজুড়ান গ্রীন কুয়াশি দেখি নাই। আমি পূর্ব্বে কখনও মহুয়া গাছ দেখি নাই। কিম্বা চিনিতাম না। এখানে ঐ গাছ বিস্তর। পাহাড়ের পায়েও মহুয়া গাছ জন্মিয়াছে। মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি হইতে মহুয়া ফল জন্মিতে আরম্ভ করে। ইহার গন্ধ অতীব তীব্র। আমার এই গন্ধ মোটেই ভাল লাগিত না। মহুয়া এদেশের গরু ভেড়ার প্রধান খাদ্য। এই ফল শুকাইয়া রাখা হয়। ইহা দ্বারা এক প্রকার দেশী মদ প্রস্তুত হয়, তাহা এ দেশের লোকেরা খুব খায়। মহুয়া গাছ বট গাছের মত প্রকাণ্ড দেখিয়াছি। এক একটী গাছে প্রচুর ফল জন্মে। এখানে অনেক বাড়ীতেই কাঁঠাল গাছ দেখিলাম। শুনিলাম এক একটী কাঁঠাল এত বড় হয় যে দুই জন লোকেও উঠাইতে সক্ষম হয় না। এখানে খেজুর গাছ দেখিয়াছি, কিন্তু এদেশের লোকেরা গুড় বানাইতে জানে না। ইহারও তাড়ির ন্যায় মদ বানায়। নারিকেল গাছ নাই বলিলেই হয়। তবে অনেক বাঙ্গালী বাবু তাঁহাদের বাগানে নারিকেল গাছ লাগাইয়াছেন। খুব নারিকেল ফলে শুনিলাম। এখানকার মাটী অতিশয় উর্ব্বরা। যে জিনিষটী ফলে তাহা প্রচুর পরিমাণে হয় এবং খাইতেও সুমধুর।

দেওঘরে বাঙ্গালী মেয়েদের একটী বিশেষ সুবিধা এই যে তাঁরা ইচ্ছামত হাঁটিয়া বেড়াইতে পারেন। গাড়ী পাল্কীর ধার ধারিতে হয় না। যে সব কুলবধূরা বঙ্গদেশে অবরোধপ্রথা ছিলেন তাঁরাও দেওঘরে গিয়া নিঃসঙ্কোচে বেড়াইয়া বেড়ান। এখানে সে সম্বন্ধে কোনও বাধা বিঘ্ন নাই। এই রীতি এখানে প্রচলিত থাকাতে মেয়েরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খুব উপকার লাভ করিয়া থাকেন। কেন যে এই রীতি সকল স্থানে রক্ষিত হয় না উহাই ক্ষোভের বিষয়। যখন দেখিতাম দলে দলে মেয়েরা কেমন হাসিমুখে নদী, পাহাড় দেখিয়া বেড়াইতেছেন তখন মনে যে কত আনন্দ হইত! জীবনের এই শুভ মুহূর্ত্তে তাঁহারা ইহার খুবই সদ্ব্যবহার করিতেন সন্দেহ নাই। দেখিয়াছি বঙ্গনারীগণ তাড়াতাড়ি বিকালের কাজ কর্ম্ম সারিয়া প্রত্যহ বেড়াইতে বাহির হইতেন। ইহা তাঁহাদের প্রাত্যহিক অন্যান্য অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মের একটী হইয়া পড়িয়াছে। রাস্তায় বাঙ্গালী বাবুদের সদ্ব্যবহারে প্রীত হইয়াছি। তাঁরা যেন কয়েক দিনের জন্য এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইয়া তাঁদের কুলবধূগণের নিকট সমস্ত বিশ্ব খুলিয়া দিয়া বসিয়াছেন মনে হইত। রাস্তায় দেখিতাম, মেয়েরা বেশ চলিয়াছেন, পুরুষেরা রাস্তার নীচে নামিয়া যাইতেছেন। ইহা দেখিয়া খুব আনন্দ অনুভব করিতাম।

দেওঘরে হিন্দুর সংখ্যাই বেশী। বৈদ্যনাথ মন্দিরের পাণ্ডার সংখ্যা অনেক। এখানে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের বিবাহের রীতি অতি অদ্ভুত। পেটে সন্তান রহিয়াছে, সেই সন্তানের বিবাহ ঠিক হইয়া যায়। সদ্যোজাত শিশুর বিবাহ হইতে দেখা যায়! আমি দেখিয়াছি, বিবাহ-সভায় বর কনে উলঙ্গ হইয়া বসিয়া আছে। কনে ছুটিয়া ছুটিয়া মাতার দুগ্ধ পান করিয়া আসিতেছে। একটী কথা এই যে, কন্যা কিম্বা বর ইচ্ছা করিলেই ভবিষ্যতে একে অন্যকে ছাড়িয়া পুনরায় বিবাহ করিতে পারে। বিধবা হইলে ত কথাই নাই। এই রীতি থাকাতে শিশুবিবাহে উহাদের কোনও ভাবনা চিন্তা নাই। এদেশের লোকেরা অত্যন্ত অশিক্ষিত এবং কিছু নির্ব্বোধ বলিয়া মনে হয়। পাণ্ডারা ব্রাহ্মণ, কিন্তু তাহারাও অন্যান্য অশিক্ষিত, মেয়েরাও ততোধিক।

এখানে একটী আমেরিকান খ্রীষ্টীয় মিশন আছে। মিশনটী বেশ বড়ই দেখিলাম। অনেক দাওতালী মেয়ে এই মিশনে আছে। ইহাদিগকে পড়াইবার-জন্য শিক্ষয়িত্রী আছে। একজন আমেরিকান মিশনারি সপরিবারে এই মিশনে বাস করেন। তাঁহাদের সাহায্যকারী দুই জন আমেরিকান মিশনারি মহিলা আছেন। তাঁহারা ধাত্রীকার্য্যে খুব পারদর্শী শুনিলাম। তাঁরা নিম্ন-শ্রেণীর লোকদের মধ্যে ডাক্তারীও করেন। এখানে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যকৃত এণ্ট্রান্স স্কুল আছে। প্রায় তিনশত ছাত্র পড়ে। একজন ইংলণ্ডপ্রত্যাগত বাঙ্গালী ইহার প্রধান শিক্ষক। স্কুলে হোষ্টেল আছে। প্রধান

শিক্ষকের বাসভবন এই হোষ্টেল প্রাঙ্গণেই অবস্থিত। গবর্ণমেণ্টের হাসপাতাল, ঔষধালয় গবর্ণমেণ্টের ডাক্তার ব্যতীত অনেক বাঙ্গালী ডাক্তার, কবিরাজ এখানে স্ব স্ব ব্যবসা করিতেছেন। এখানে গিরিডির মত বালিকা বিদ্যালয় নাই। এই বিদ্যালয়ের বিশেষ প্রয়োজন দেখিলাম। কোনও উৎসাহী সজ্জন এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে দেশের মহৎ উপকার সাধিত হইবে। এখানে বাঙ্গালী অধিবাসীর সংখ্যা যেরূপ তাহাতে ঐরূপ একটী স্কুল অনায়াসে চলিতে পারে বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আশাকরি কোনও সদাশয় ব্যক্তি এই সদনুষ্ঠানে ব্রতী হইবেন।

শ্রীকুলদা দেবী।

বায়ু পরিবর্ত্তন

সে আজ ৪ বৎসরের কথা। পিতার অকাল মৃত্যুর পর জ্ঞাতিরা মিথ্যা মোকদ্দমায় আমাদের যথাসর্ব্বস্ব হস্তগত করিয়া লইলে আমার মাতা আমাদের লইয়া যখন প্রতিবেশী শ্রীনাথ রায়ের বাটীতে আসিলেন তখন আমার বয়স ১৮ বৎসর এবং পত্নী মৃণালিনী ১১ বৎসরের বালিকা। বৃদ্ধ শ্রীনাথ রায় মাতার দূরসম্পর্কীয় মাতুল। দুঃখের সংসারে আর কেহ ছিল না। আমাদের লইয়া তিনি আবার নূতন সংসার পাতাইলেন। দিন কতক বেশ সুখে কাটিয়া গেল। কিন্তু অদৃষ্ট প্রতিকূল দাঁড়াইলে সুখের আশা কোথায়? সে বৎসর কলিকাতা অঞ্চলে বিসূচিকা রোগের বড়ই প্রাদুর্ভাব হওয়ায় নিয়তি তাহার করাল কবলে দুটী বৃহৎ হারা বালক-বালিকার সংসারের প্রধান অবলম্বন দুইটীকে গ্রাস করিয়া আপনার সামর্থ্যের পরিচয় প্রদান করিয়া ক্ষান্ত হইল। আজ আমরা প্রকৃতই দুইটী গৃহহারা অবলম্বনশূন্য বালক-বালিকা। শৈশবে পিতৃমাতৃহীনা অভাগিনী মৃণালিনী এতদিন আমার মাতার স্নেহময় অঙ্কে আশ্রয়লাভ করিয়া জনক জননীর অভাব অনুভব করে নাই। আজ তার কোমল হৃদয়ে শোকের এই প্রথম নির্ম্মম আঘাত। সেও কত কাঁদিল—আমিও কাঁদিলাম। আমার প্রাণে যতই কষ্ট হোক হয়ত তাহা কোনরূপ সহ্য করিতে পারি, কিন্তু মিনুকে কেমন করিয়া শান্ত করিব, কি করিলে তাহার প্রাণের শূন্য শান্তি আবার ফিরিয়া আসে এই চিন্তায় নিতান্ত আকুল হইয়া পড়িলাম।

দিন যার কাহারও জন্য বসিয়া থাকে না—সুখেই হোক দুঃখেই হোক দিন যায়। আমাদের ন্যায় অসহায় বালকবালিকারও দারিদ্র্যের মর্ম্মন্তুদ পেষণের সহিত দিন কাটিতে লাগিল। কত সুপ্তিহীন রজনী—কত দীর্ঘ-দিবস কখনও উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসে উত্তপ্ত করিয়া, কখনও বা অশ্রুসিক্ত করিয়া আরও এক বৎসর অতিবাহিত করিলাম। মাতৃবিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া ছাড়িতে হইয়াছিল। যার পেটের ভাতের সংস্থান নাই সে লেখাপড়া শিখিবে কেমন করিয়া? আর চলে না। এইবার হয়ত উদরান্নের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে। ইহা-ভিন্ন একমাত্র উপায় চাকুরী; কিন্তু তাহাই বা কেমনে জুটিবে? যাহার সংসারে কোন অভিভাবক নাই, উপযুক্ত বিদ্যা নাই, তাহার চাকুরী হওয়া নিতান্ত দুরূহ। তথাপি আমার চেষ্টার ত্রুটী ছিল না। প্রতিদিনই উদ্‌ভ্রান্ত উমেদারী করিয়া বুকভাঙ্গা নিরাশা লইয়া সন্ধ্যার পর বাটী ফিরিতাম। মিনু সমস্ত দিনটী কত আশা লইয়া আমার আগমন প্রতীক্ষা করিত, কিন্তু যখন শেষে আমার সেই নৈরাশ্যের হাহাকার স্বরূপ আমার অকৃতকার্য্যতার সেই একটী উত্তর শুনিত তখন কেবল মাত্র একটী উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসে আমায় তাহার সহানুভূতি জানাইয়া আমার তৎকালীন সেবা আহারাদির উদ্যোগে ব্যস্ত হইয়া পড়িত।

সেদিন রবিবার। প্রভাতের পাখীর কলরবের সঙ্গে সঙ্গে যখন আমি শয্যাত্যাগ করিলাম, তখন দেখিলাম মিনু আবশ্যক কাজকর্ম্ম সারিয়া প্রত্যহ যেরূপ রন্ধন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত আজও সেইরূপ ব্যস্ত। আমি উঠিয়াই বলিলাম, "মিনু, আজ এত তাড়াতাড়ি করছ কেন?"

"কেন, তুমি কি আজ বেরোবে না?"

"না, আজ রবিবার, সব আপিস বন্ধ। বেরিয়ে রোজ না হয় আজও তাই হবে, তাই মনে করছি আজ আর বেরোব না।"

"তা বেশ ত—সকাল সকাল খেয়ে নিও এখন।"

নয়টার মধ্যে আহারাদি শেষ করিয়া শুইয়া পড়িলাম। চিকিৎসা বিদ্যা আমার কখনই অভ্যাস ছিল না। বাল্যকাল হইতে ডাক্তারী শিখিবার বড় ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ দারিদ্র্যপীড়নে ঘটিয়া আমার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় নাই তথাপি আমার সংগৃহীত দুই একখানি ডাক্তারী পুস্তক আমি অবসর মত একটু আধটু পড়িতাম। আজিও একখানি মেটিরিয়া মেডিকা লইয়া দেখিতেছিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে মিনু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখনও ঘুমাওনি?"

"দিনের বেলায় আমার কখনই ঘুম হয় না।"

তবে তুমি এখন একটু বই পড়, আমি একবার ওবাড়ী থেকে আসছি। আমি নিতান্ত বিরক্তভাবে বলিলাম, "যারা আমার সর্ব্বনাশ করেছে তাদের বাড়ী কি করতে যাবে?"

"মেজ দি ডেকেছেন।"

"কেন?"

মেজদির কাছে ১৪ টা টাকা পাওনা আছে, তাই আনতে যাবো।"

"মেজ বৌএর কাছে টাকা পাওনা আছে?"

"হাঁ, সে দিন আমার চুরীগুলো মেজদি কিনে নিয়েছেন, তারই দরুণ ১৪৲ টাকা বাকী পাওনা আছে।"

এমন সময় ঝীরা কি আসিয়া ডাকিল, "বৌ দিদি আছ গা?" মিনু বাহিরে গেল। আমি আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। মনের ভিতর একটা অসহনীয় যন্ত্রণা, একটা তীব্র আত্মগ্লানি ভাসরুক হইয়া আমার মস্তিষ্কগুলি ছিঁড়িয়া অস্থিগুলিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পিষিয়া ফেলিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে কুদ্ধ অশ্রু দর দর ধারে বহিয়া উপাধান সিক্ত করিল। মনে হইতে লাগিল, কে যেন আমার গলাটা সবলে চাপিয়া ধরিয়াছে, এখনি বোধ হয় শ্বাস রুদ্ধ হইয়া যাইবে। কতক্ষণ ধরিয়া এরূপ অসহ্য যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, "একি, আমি কি হয়েছি? কি করছি? যার সুখ দুঃখ সম্পদ বিপদ ও ধর্ম্মাধর্ম্মের সমস্ত দায়িত্ব আমার উপর, ন্যায়তঃ—ধর্ম্মতঃ যাকে আমি সাধ্যমত সুখী করিতে বাধ্য, যাকে আমি প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর মনে ক'রে ভালবাসি, তার উপর একি ব্যবহার করছি? নিজে উপার্জ্জন ক'রে তার ভরণপোষণ করা দূরে থাক, তারই নিজস্ব, অসময়ের অবলম্বন সে আমার জন্য—আমার উদর পূর্ত্তির জন্য অম্লান বদনে নষ্ট করছে, আর আমি তাহা লক্ষ্য করবার অবসর পাই না? আমি কি মানুষ! এত অপদার্থ আমি!' এইরূপ কত কি চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ উত্তেজনাবশে আমার অজ্ঞাতসারে আমার মুখ হইতে বাহির হইল। 'আমি গৃহত্যাগ করব, মিনুকে সুখী করতে, দারিদ্র্য মোচন করতে, প্রাণপাত পরিশ্রম করব। হয় মন্ত্রের সাধন না হয় শরীর পতন।' আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলাম, সম্মুখে চাহিয়া দেখি মিনু। ধীর অথচ কম্পিতস্বরে মিনু বলিল, "অতটা নিষ্ঠুর হয়োনা। অদৃষ্টে থাকলে এখানে থেকেই হবে—আর অদৃষ্টে না থাকলে কোথাও কিছু হবে না। অমন নিষ্ঠুর কল্পনা মন থেকে মুছে ফেল। তুমি গৃহত্যাগের সঙ্কল্প করছো—না আমার পরিত্যাগের সঙ্কল্প করছো? এ সংসারে আমার আর কে আছে বল দেখি? আমাকে কার কাছে রেখে যাবে?"

মিনুকে দেখিয়া, তাহার ঐ কথা শুনিয়া তখন যেন আমি কেমন এক রকম হইয়া গেলাম। নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। দেখিলাম, তার অশ্রুসিক্ত উৎপল সদৃশ নয়ন যুগল হইতে প্রভাত-শিশিরবিন্দুর ন্যায় দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। মিনু আবার বলিল, "আমার অলঙ্কার নষ্ট হচ্ছে বলেই ত তোমার এত দুঃখ? তা দুঃখ কেন? যা আমার তাতে তোমারও সম্পূর্ণ অধিকার। স্ত্রীলোকের অলঙ্কার কিসের জন্য? এক হিসাবে তার অঙ্গের শোভা-বর্দ্ধন, অন্য হিসাবে অসময়ের অবলম্বন। স্ত্রীলোক শুধুই স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য গহনা পরে। স্বামীর চক্ষে যে কুরূপা, গহনা পরিলে কি সে সুরূপা হইতে

পারে? যে স্বামীর চক্ষে সুরূপা তার গহনার প্রয়োজন কি? স্বামীর ভালবাসার চেয়ে অমূল্য অলঙ্কার জগতে আর কিছু নেই! তুমি যখন আমার সেই অমূল্য অলঙ্কারের গৌরব করবার অধিকার দিয়েছ তখন ছুটো সামান্য কৃত্রিম অলঙ্কারে আমার প্রয়োজন কি? এখন আমাদের অসময়, এসময় ঐ অলঙ্কারগুলোই আমাদের অবলম্বন। এমন দিন চিরকাল থাকবে না—যখন সে দিন আসবে তখন আবার কত সোনা দানা পরবো। বল তুমি কোথাও যাবে না?"

আমি এতক্ষণ মুগ্ধ বিস্ময়ে মিনুর মুখের দিকে চাহিয়াছিলাম, সে আমার হাত দুখানি ধরিয়া পুনরপি বলিল, "বল, তুমি আমায় ফেলে কোথাও যাবে না?" আর থাকিতে পারিলাম না—দুই হস্তে বক্ষের মধ্যে মিনুকে টানিয়া লইয়া বলিলাম, "না মিনু, প্রাণ থাকতে তোমায় ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।"

আরও কয়েক মাস কাটিয়া গেল। একে একে মিনুর সমস্ত অলঙ্কারগুলি সে বিক্রী করিয়া ফেলিল। বাড়ীওয়ালা দুই মাসের বাড়ী ভাড়া বাকী পড়িয়াছে বলিয়া নোটীস দিবার ভয় দেখাইল। মুদীর দোকানে বাকী পড়ায় মুদী চাউল প্রভৃতি সওদা দেওয়া বন্ধ করিল। গোয়ালিনী দুগ্ধ বন্ধ করিল। তার উপর সংসারের ভাবনা ভাবিয়া এবং অত্যধিক পরিশ্রম ও অনাহারের অনিয়মে আজ প্রায় দুইমাস ধরিয়া মিনুর জ্বর—জ্বর একেবারেই ছাড়ে না। সঙ্গে সঙ্গে একটু কাশিও আছে। কফের সঙ্গে রক্তও দেখা দেয়। বড়ই ভাবনায় পড়িলাম। মিনুর রোগ যে সাংঘাতিক তাহা আর বুঝিতে বাকী রহিল না। কি করি—যে আমার জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে আজ অর্থাভাবে তার চিকিৎসা হইবে না? অদৃষ্টের একি ক্রূর অত্যাচার! দুই মাস ক্রমাগত হাঁটাহাঁটি ও উমেদারী করিয়া কোনও একটী সওদাগরী আফিসের বড় বাবুর ছেলেকে বিনা বেতনে পড়াইবার ভার লওয়ায় তিনি অনুগ্রহ করিয়া একটী চাকরী করিয়া দিবেন বলিয়া আশা দিয়াছেন। কিন্তু সে আশা যে কত দিনে পূর্ণ হইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। নিজে উপবাস করিয়া দুই দিন কাটাইতে পারি কিন্তু মিনুর ঔষধ এবং পথ্যের ব্যবস্থা কেমন করিয়া করিব? এত বড় কলিকাতা সহরে কেউ কারও খোঁজ নেয় না। মিনুর অনুরোধে একবার জ্যেঠা মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সমস্ত বলিলাম এবং কিছু সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। কিন্তু জ্যেঠা মহাশয় আমার সে কাতরোক্তিতে কর্ণপাত করিলেন না। অগত্যা ফিরিয়া আসিয়া মিনুকে সমস্ত কথা বলিলাম। মিনু আমার কথা শুনিয়া বলিল, "তার জন্য আর ভাবনা কি? আমার অসুখ এমন কিছু বেশী হয় নি যার জন্য তুমি এতটা উতলা হচ্ছো। বড় বাবু যখন আশা দিয়েছেন তখন আর ভাবনা নেই। আমার অসুখ বলিয়া তুমি বড় বাবুর বাড়ী যাওয়া বন্ধ ক'রো না। সিন্দুরের চুবরীতে এক গাছা নো আছে, সে গাছটা আমার হাতে পরিয়ে দিয়ে এই সোণার নো গাছটা হাত থেকে খুলে নাও, এ গাছটা বিক্রি করলে আরও দিন কতক চলবে—নাও, এতে তোমার অকল্যাণ হবে না।"

"মিনু, তুমি কি বলছো। আমি তা পারবো না।"

"তোমার একটু চাকরী হ'লে আমার সব হবে। কেন ভাবচো?" এমন সময় একজন পাওনাদার আসিয়া পুনঃ পুনঃ ডাকাডাকি করাতে আমি বাহিরে গেলাম। পাওনাদার আমার প্রতিবেশী সেই মুদী, কিছুদিন পূর্ব্বে সে জিনিসপত্র দেওয়া বন্ধ করিয়াছিল। অন্য তাহাকে টাকা দেওয়ার কথা ছিল। আমি পাওনাদারের পায় ধরিয়া কাঁদিলাম এবং সমস্ত কথা তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম। বুঝি আমার দুঃখে তাহার একটু দয়া হইল, তাই সে বলিল, "মশায়, আরও একমাস আপনি দরকার মত জিনিসপত্র নিন, কিন্তু আর এক মাস পরে আমায় টাকা দিতে হবে।" আমি তাহাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া তাহাকে বিদায় করিয়া ফিরিতেছি, ঘরে প্রবেশ করিয়াই দেখিলাম, মিনু ধীরে ধীরে দেওয়াল ধরিয়া উঠিল। আজ প্রায় এক মাস যে রোগী একেবারে শয্যাগত ছিল উঠিবার সামর্থ্য নাই সে যেন আজ নব বলে শয্যাত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে আলমারি হইতে সিন্দুরের চুবরী নামাইয়া

তাহা হইতে এক গাছি নো বাহির করিল। আমি "কর কি, কর কি" বলিয়া দৌড়িয়া তাহাকে ধরিবার পূর্ব্বেই সে দেওয়াল ধরিয়া ধীরে ধীরে শয্যায় বসিয়া পড়িল এবং হাতের নো গাছটী খুলিয়া সেই নো গাছটী পরিল, এবং ধীরে ধীরে শুইয়া পড়িল। আমি আসিয়াই তাহাকে বলিলাম, "মিনু, একি করলে—এখনি যে সর্ব্বনাশ হ'ত?" সে তৎক্ষণাৎ আমার কথার উত্তর দিতে পারিল না, কারণ একবার উঠিয়াই সে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, শুধু তাই নয়, সে দুই একবার কাশিল, তাহাতে তাহার মুখ হইতে খুব এক ঝলক রক্ত উঠিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, "যার স্বামীকে পাওনাদারের পায় ধরিয়া কাঁদিতে হয় সে সোণার নো পরিয়া স্বামীর কল্যাণ করিবে? ঈশ্বর জানেন আমি বাস্তবিক স্বামীর কল্যাণ করিয়াছি কি না। তুমি যে সর্ব্বনাশের কথা বলছো—সর্ব্বনাশ কিসের? আমি মরতাম? স্বামীর এরূপ অপমান, এরূপ দুর্গতি চক্ষে দেখাই যে মৃত্যু অপেক্ষাও ভয়ানক। এই নাও, এই নো গাছটী বিক্রী ক'রে বৌকে কিছু দাও গে—ওকে কিছু দিলে ও আরও এক মাস তোমার জিনিসপত্র দিবে। এক মাসের মধ্যে তোমার চাকরীও হয়ে যাবে। তারপর তোমার চাকরী হ'লে আর এত দুঃখ থাকবে না।" মিনু অনেক কষ্টে এই কথাগুলি বলিল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার কাশি—আবার রক্ত উঠিল। মিনুর অবস্থা দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। হায় অভাগিনী, আমার হাতে পড়িয়া তোমার আজ এই অবস্থা—বিনা চিকিৎসায়, আজ তুমি মরণের দ্বারে উপস্থিত! মনে মনে স্থির করিলাম, এই নো বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে একজন ডাক্তার ডাকিয়া মিনুর জন্য ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিব। এইরূপ সংকল্প করিয়া মিনুকে বলিলাম, "মিনু এখন একবার বেরোবো কি?"

"যাও আমি বেশ আছি।"

আমি চিন্তিত মনে বাহির হইলাম।

নো গাছটী বিক্রয় করিয়া যাহা পাইলাম তাহাতে মিনুর জন্য কিছু বেদানা প্রভৃতি লইয়া ডাক্তারের বাটী গেলাম এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত কথা বলিলাম। ডাক্তার বাবু আমার সঙ্গে আসিলেন। বাটীতে আসিয়া ডাক্তার বাবু রোগীকে পরীক্ষা করিবার সময় তাঁহার মুখের ভাবভঙ্গী দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। কত দুর্ভাবনা, কতক্ষণে তাঁহার মুখে মিনুর রোগের প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিব কেবল সেই জন্য প্রতি মুহূর্ত্ত ব্যাকুল ভাবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। পরীক্ষা শেষ হইলে ডাক্তার বাবু বাহিরে আসিলেন, আমি তাঁহার সঙ্গে বাহিরে আসিলাম। মিনুর সম্মুখে এতক্ষণ কোনরূপে ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছিলাম, আর পারিলাম না—ডাক্তার বাবুর পা দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম, "ডাক্তার বাবু আমার স্ত্রীকে বাঁচিয়ে দিন"—ডাক্তার বাবু আমার তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন এবং আমার নিকট কিছু গোপন না করিয়া সস্নেহ বচনে বলিলেন, "দেখ তোমার স্ত্রীর রোগটা এখন একটু শক্ত হয়ে পড়েছে, চেঞ্জে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় দেখছি না। উপস্থিত আমি একটা ঔষধ দিচ্ছি, কিন্তু যত শীঘ্র পার চেঞ্জে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর।" ডাক্তার বাবু চলিয়া গেলেন। যথাসম্ভব সত্বর ঔষধ আনিয়া মিনুকে খাওয়াইলাম। মিনু জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তার বাবু কি বললেন?"

"ডাক্তার বাবু চেঞ্জে নিয়ে যাবার কথা বলছিলেন, চেঞ্জে গেলে শীঘ্র সেরে উঠবে।"

"তা সে তখন হবে, আগে তোমার একটা চাকুরী বাকরী হোক, দেনা পত্তরগুলো শোধ কর, তারপর তাই যাওয়া যাবে। কদিন বড় বাবুর বাটী যাওনি, আজ একবার যাও, জানত বড় লোকের মেজাজ, কখন কি হয় বলা যায় না।"

"তোমায় এই অবস্থায় রেখে?"

"কতক্ষণের জন্য? আর আমার অবস্থা এখন ততটা খারাপ হয়নি, আমি ত বেশ আছি। আমার জন্য ভেব না, তুমি যাও।"

ভাবিয়া দেখিলাম, মিনুর কথাই ঠিক। তাঁরা বড় লোক, তাঁহাদের পায়ে ধরিয়া কাঁদিলে হয়ত কিছু

সাহায্য করিতে পারেন, যদি একান্তই না করেন ভিক্ষা করিয়া হোক, যেমন করিয়া হোক, অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। মিনুকে বাঁচাইতে হইবে। মিনুকে হারাইয়া আমি মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারিব না, সাত পাঁচ ভাবিয়া বৈকালে বাড়ী হইতে বাহির হইলাম।

বড় বাবুর বাড়ী গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি আমার এত দিনের অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তদুত্তরে সমুদয় বিষয় তাঁহার নিকট বিবৃত করিলাম এবং গলদশ্রুলোচনে এবং আকুল বচনে কহিলাম, "বড় বাবু, এ সংসারে আমার কেউ নেই, আপনি একটা উপায় করুন।" আর বলিতে পারিলাম না, বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলাম। বড়বাবু আমায় সান্ত্বনা করিয়া স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "বাপু সে জন্য তুমি ভেবো না। পূজার ছুটীতে আমরাও শিমুলতলা যাবো মনে কচ্ছি, সেই সঙ্গে তুমিও তোমার স্ত্রীকে নিয়ে যেও। আর দেখ, সাহেবকে ব'লে তোমার একটা চাকুরীরও যোগাড় করেছি, এই সোমবারে আমার সঙ্গে অফিসে যেও। এখন এই দশটা টাকা নাও, তোমার স্ত্রীর ঔষধ পত্রের ব্যবস্থা করগে।" বড় বাবুর কথায় ও ব্যবহারে আমি যেন স্বর্গ হাতে পাইলাম—কৃতজ্ঞতার অশ্রুজলে আমার নয়নযুগল ভরিয়া উঠিল—বিনীত ভাবে বলিলাম, "বড়বাবু, আপনি দেবতা, তাবার এমন কোন কথা নাই যদ্দারা আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা আপনাকে জানাইতে পারি।" আর কিছু বলিতে পারিলাম না—কাঁদিয়া ফেলিলাম। বড়বাবু বলিলেন, "ওসব কথা থাক—কেঁদো না। তুমি এখন বাড়ী যাও—।" পুনরায় তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া মনে মনে সেই করুণাময়, জগৎপিতাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিতে দিতে গৃহে ফিরিলাম।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। শরতের নিস্তেজ আকাশে চন্দ্রমা হাসিতেছিল। আমি গৃহে প্রবেশ করিলাম। ঘরের জানালা খোলা ছিল—মৃদুবায়ু বাতায়ন পথে প্রবিষ্ট হইয়া মিনুর জ্যোৎস্না-স্নাত-কপোল-বিলম্বিতকেশগুচ্ছ লইয়া খেলা করিতেছিল। তাহাতে তাহার অনিন্দ্য সুন্দর মুখখানি যেন আরও সুন্দর দেখাইতেছিল। মনে ভাবিলাম, মিনু নিদ্রিত, নচেৎ আমার আগমন কি সে বুঝিতে পারে নাই? ধীরে ধীরে শয্যাপার্শ্বে গিয়া ডাকিলাম, "মিনু"—কোন উত্তর নাই। আবার ডাকিলাম—তথাপি উত্তর নাই। একি, মিনুর আয়ত লোচনদ্বয় অর্দ্ধনিমীলিত—গায়ে হাত দিয়া দেখিলাম স্পন্দহীন—অসাড়—হিম! কম্পিত আকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলাম, "মিনু—মিনু এতদিন পরবাসে থাকিয়াও গৃহহারা হই নাই—আজ আমি প্রকৃতই গৃহহারা। আর তুমিও এসংসারের রুদ্ধ বিষাক্ত বায়ু ছেড়ে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য অনন্তের কোন্ নিভৃত নিকেতনে চলেছ?"

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়।
লক্ষ্ণৌ।

রোগীর পথ্য

শরীরে রোগ উৎপন্ন হইলে যে নানাবিধ ঔষধাদি ব্যবহারেই তাহা আরোগ্য হয় তাহা নহে, সুপথ্যও রোগ মুক্তির বিশেষ সহায়তা করে। অতএব পথ্য নির্ব্বাচন বিষয়ে সকলেরই মোটামুটী জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সুপথ্য ব্যবহার দ্বারা ক্ষীণকায় ও দুর্ব্বল রোগী সবল হয়, পাচক শক্তি পুনরুদ্দীপিত হইয়া থাকে, এবং সেই সঙ্গে রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। আমাদের বঙ্গ সংসারে বিশেষতঃ সহরে পথ্যের অধিক বিভ্রাট ঘটিতে দেখা যায়। পল্লীগ্রামস্থ গৃহাঙ্গনাগণ এখনও পূর্ব্বকালের ক্ষীণ স্মৃতিটুকু বজায় রাখিবার চেষ্টা করে, কিন্তু সহরবাসী কোমলপ্রাণা রমণীগণ বাটীর দাসী অথবা পাচক ব্রাহ্মণকে অর্ডার দিয়াই নিশ্চিন্ত হন, তাঁহারা নবাবিষ্কৃত পাকপ্রণালী পুস্তক পাঠ করিয়া নানাবিধ সাহেবী ধরণের খাদ্য প্রস্তুতি শিক্ষা করিতে কষ্ট বোধ করেন না। কিন্তু দেশের নিজেদের গুণ ও প্রস্তুতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জনে কুণ্ঠিত হন। ইহা আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয় নয় কি?

রোগীর পথ্য প্রস্তুত করিতে হইলে একটু গুণপনা ও যথেষ্ট বিচারশক্তির প্রয়োজন হইয়া থাকে, প্রস্তুতির গুণে রোগী আনন্দের সহিত পথ্য গ্রহণ করিয়া থাকে। পথ্য প্রস্তুতি কালে বিশেষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে থাকা উচিত। প্রস্তুতির বাসন ইত্যাদি বেশ ভাল করিয়া মাজিয়া লওয়া কর্ত্তব্য এবং যে সমস্ত উপাদান ব্যবহার করিতে হইবে তাহাও নির্দ্দোষ হওয়া প্রয়োজন। বাসি বা পর্য্যুষিত পথ্যাদি এবং অনাবৃত ঠাণ্ডা দুগ্ধ প্রভৃতি কদাচ ব্যবহার করিবে না। পথ্য অনাবৃত থাকিলে নানাবিধ রোগ-বীজাণু প্রভৃতি তাহাতে পতিত হইয়া বিষময় করিয়া তুলে। রোগীর পথ্য যতদূর সাধ্য মুখরোচক করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। তবে সাধারণ ভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় অন্ন, ব্যঞ্জন প্রস্তুতির ন্যায় ঘৃত, মসলাদি দেওয়া বিশেষ নহে পথ্য প্রস্তুতির ভার মাতা, ভগিনী প্রভৃতি আত্মীয়ের হস্তে ন্যস্ত করা উচিত। পথ্য প্রস্তুত করিবার সময় অন্যরূপে অমনোযোগী হইবে না। কয়লার জ্বালে কখনও পথ্যাদি প্রস্তুত করিবে না, কারণ তাহাতে অনেক সময় পথ্য প্রদানের উদ্দেশ্য সম্যকরূপে ফলপ্রদ হয় না, কাষ্ঠ বা ঘুটের জ্বালে প্রস্তুত করিবে কিন্তু যেন ধোঁয়ার গন্ধ না লাগে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে। পথ্যের মধ্যে তৈল ও ঘৃত যত কম ব্যবহার হয় ততই মঙ্গল। তৈল বা ঘৃত ব্যবহার করিতে হইলে তাহা নির্দ্দোষ ও বিশুদ্ধ হওয়া উচিত। আজকাল বাজারে বিশুদ্ধ ঘৃত পাওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার, ঘৃতের মধ্যে-সাপের চর্ব্বি এবং বাদাম প্রভৃতি নানাবিধ উদ্ভিজ্জ তৈলাদির সংমিশ্রণে অত্যন্ত বিষাক্ত হইয়া উঠে। তৈল ব্যবহার করিতে হইলেও তাহা খাঁটী সরিষার তৈল হওয়া প্রয়োজন। পথ্য রন্ধন-কালে পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখা দরকার, কিন্তু যে ক্ষেত্রে সর্ব্বদা নাড়িতে হইবে তথায় তাহা চলে না, তবে পথ্য প্রস্তুত হইলেই তাহাতে ঢাকা দেওয়া উচিত। পাক-পাত্র কখনও লৌহ, তাম্র, টীন প্রভৃতির ব্যবহার করিবে না, আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে তাম্র পাত্রে ভোজন নিষিদ্ধ, ইহাতে অনেক প্রকার ব্যাধি আক্রমণ করে। লৌহ পাত্রে রন্ধন করিলে তরকারী বা অন্যান্য দ্রব্য এক প্রকার কৃষ্ণাভ রং হইয়া যায়। আমাদের দেশের মাটীর বাসন এ কার্য্যে বিশেষ প্রশস্ত, তবে তাহা বিশুদ্ধ দেখিয়া লওয়া উচিত, মাটীর হাঁড়ি, সরা প্রভৃতি দামেও খুব সস্তা, কাজেই প্রত্যহ পরিবর্ত্তন করিলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না।

নিম্নে কতকগুলি দেশীয় পথ্য প্রস্তুতির নিয়মাবলী লিখিত হইল।

খৈয়ের মণ্ড :—পথ্য প্রস্তুত খৈ বস্ত্রখণ্ডে বন্ধন করিয়া ফুটন্ত জলে কিয়ৎক্ষণ নিমগ্ন রাখিবে। খৈ কোমল হইলে উক্ত জলে হস্ত দ্বারা মর্দ্দন করিয়া পাতলা কাপড়ের দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে। তাহা হইলেই খৈয়ের মণ্ড প্রস্তুত হইল। দুগ্ধ সহযোগে চিনি সংযোগ করিয়া ব্যবস্থা করিবে। ইহা লঘুপাক, পাচকশক্তি বৃদ্ধিকারক ও পোষক।

চিড়ের মণ্ড :—অধিকাংশ চিকিৎসকগণ রোগীকে চিড়ের মণ্ড ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। চিড়ের মণ্ড প্রস্তুত করিতে হইলে পরিষ্কার, ক্লেদশূন্য ও সরু দেখিয়া চিড়াগুলি উত্তমরূপে বাছিয়া লইতে হইবে। পরে এক সের জলে অর্দ্ধছটাক চিড়া আবৃত পাত্রমধ্যে ২০ মিনিট পর্য্যন্ত ফুটাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। রোগীর রুচি অনুসারে ইহার সহিত চিনি বা লবণ মিশাইয়া দিতে হয়।

দাইলের যূষ :—সোণা মুগ বা খাঁড়ি মসুর দাইল উত্তমরূপে বাছিয়া ও ধুইয়া লইবে, তৎপরে যথা পরিমাণে জল মিশাইয়া মৃদুজ্বালে ফুটাইতে থাকিবে, ফুটিতে আরম্ভ হইলে অল্প পরিমাণে গোটা জিরা, ধনে, দারুচিনি ও তেজপাত ফেলিয়া দিবে। দাইল উত্তমরূপে গলিয়া গেলে পর তাহাতে আবশ্যক মত লবণ মিশাইয়া কিয়ৎক্ষণ পরে নামাইয়া লইবে, পরে কিয়ৎক্ষণ স্থির ভাবে রাখিয়া বেশ ঠিতাইয়া উপরের জলীয়াংশ ছাঁকিয়া লইবে। ইহা মুখরোচক ও সুপথ্য। খাঁড়ি মসুরের যূষ মাংসের কাথের ন্যায় পুষ্টিজনক হইয়া থাকে, যাহারা মাংস ভোজন করিতে আপত্তি করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে অনায়াসে ইহা ব্যবস্থা করিতে পারা যায়। (স্বাস্থ্য সমাচার)

ভারত মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। (মনু)

The woman's cause is man's : they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free :
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall man grow ? (TENNYSON.)

বঙ্গানুবাদ :- স্ত্রী-পুরুষের উন্নতি অবনতি একসূত্রে গ্রথিত। নারী অনুন্নত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে পুরুষ কখনই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। (ব্রিটিশ রাজকবি লর্ড টেনিসন)

"I will be as harsh as truth, and as uncompromising as Justice : I am in earnest—I will not equivocate—I will not retreat a single inch—and I will be heard." (WILLAM LLOYD GARRISON.)

মর্ম্মানুবাদ :—আমি সত্যের ন্যায় কঠোর ও ন্যায়ের মত অনমনীয় হইব। আমি দৃঢ়সংকল্প, আমি কিছুতেই এক তিলও পশ্চাৎপদ হইব না। আমি নিশ্চিত জানি, তোমার আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। (লয়ড গ্যারিসন)

১২শ ভাগ { ভাদ্র, ১৩২৩। } ৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বঙ্গের কারাগারে নারী

সম্প্রতি বঙ্গদেশের কারাগার সমূহের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল বঙ্গের কারাগার সম্বন্ধীয় বার্ষিক বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার সমালোচনা উপলক্ষে "বিজ্ঞানে" লিখিয়াছেন :- রমণী-অপরাধীর সংখ্যা পাঠ করিলে চমকিত হইতে হয়। হিন্দু রমণী-অপরাধীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তাহাদের বয়স ১৬ হইতে ৪০ বৎসর। মোট ৭০২ জন অপরাধিনীর মধ্যে ২৩০ জন বিবাহিতা, ৭ জন অবিবাহিতা, ২৭৩ বিধবা, ১৮৭ জন পতিকা। বিধবা অপরাধিনীর সংখ্যাই অধিকতর। বিধবার বিবাহ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত কি না, নীতিসঙ্গত কিনা, এবং তাহাতে জাতিত্ব রক্ষা সম্ভব কি না, তাহা বিজ্ঞানবিৎ, সমাজতত্ত্ববিৎ এবং মনস্তত্ত্ববিৎ সুধীমণ্ডলের বিবেচ্য। কিন্তু এ কথা ঠিক, বর্ত্তমানকালে বঙ্গ বিধবাগণের দুরবস্থা অত্যধিক। তাহাদের মুখের দিকে চাহিবার কেহই থাকে না। তাহারা পৃথিবীর মধ্যে অভিশপ্ত মানবীর ন্যায়, ঘৃণা কুক্কুরীর ন্যায়, প্রতিপদে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও তাড়িত হইতে থাকে। আমি প্রাচীন কালের কথা বলিতেছি না ; তখন বিধবাগণকে সম্মানের চক্ষে দেখা হইত কিনা কে বলিবে ? হয়ত কোন একটা ঘটনা উল্লেখ করিয়া কেহ বলিতে পারেন যে তখন বিধবাগণ সম্মানিত হইত। হয়ত একজনও সম্মানিত হইতেছে দেখিয়া অন্য সহস্র বিধবা সান্ত্বনা পাইত। কিন্তু আজকাল হে বঙ্গবাসী, একবার তাঁর দেখি, গৃহ মধ্যে একজন বালবিধবা থাকিলে, পুত্রহীনা বিধবা থাকিলে, মন্দভাগ্যা বিধবা থাকিলে,

তাহাকে কি তদ্রূপ ঘৃণার পাত্রী হইতে হয়? কোন কোন স্থলে হয়ত মৌখিক আদর দেখান হয় কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাহাকে দেখিয়া ঘৃণায় অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে কি না? এরূপ ঘৃণা স্বাভাবিক। এই নিদারুণ জীবন-সংগ্রামের দিনে যখন লোকে বহু পরিশ্রমে নিজের দুই বেলা দুই মুষ্টি অন্নের সংস্থান করিতে পারে না, তখন একটী নিরন্না বিধবা গলগ্রহ হইলে কষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক, বিধবাকে ঘৃণা করাই স্বাভাবিক। এই বিধবা দ্বারা আমরা কোন উপকার পাই না, তাই তাহাদিগকে ঘৃণা করি। এই যে সহস্র সহস্র বিধবা বসিয়া অন্ন ধ্বংস করিতেছে যদি কোন মহাপ্রাণ স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তি তাহাদিগকে কোনও একটী গৃহ-শিল্পে শিক্ষিত করিয়া লইয়া শিল্প-কার্য্যের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাহারা স্বয়ং উদরান্নের সংস্থান করিতে পারিত, কাহারও গলগ্রহ হইত না, অথচ দেশে একটী শিল্প প্রতিষ্ঠার বিস্তর সুবিধা হইত। বিধবা অপরাধীর সংখ্যাধিক্য দেখিয়া বাস্তবিকই মর্ম্মাহত হইতে হইয়াছে। ইহাদিগকে লইয়া কোন পারিবারিক শিল্প আজ প্রতিষ্ঠিত না হইলে ইহাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হইবে। হয়ত অপরাধিনীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইবে।"

মাননীয় "বিজ্ঞান"-সম্পাদক বিধবাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। কিন্তু বিধবাদের দুরবস্থা দূর করিবার তিনি যে প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা সম্ভবপর এবং সমীচীন কি না সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে।

আমাদের মনে হয়, হিন্দু বিধবাদের উন্নতিপথের প্রধান অন্তরায় বিধবাদের সেই সকল আত্মীয়—যাহাদের তাহারা গলগ্রহ। হিন্দু বিধবার মত বিনা পয়সায় এমন চাকরানী দুনিয়ায় আর নাই। যত প্রকারে পার তাহার ভরণ পোষণে ব্যয়সঙ্কোচ কর, কিন্তু ক্রীতদাসীর ন্যায় তাহাকে খাটাইয়া লও। এমন সুবিধা আর কোথায় পাইবে? যে পরিবারে বিধবা বাস করে, স্বার্থনাশের ভয়ে সেই পরিবারের লোক ত তাহার উন্নতির জন্য কোন চেষ্টা করেই না, অন্য কোন আত্মীয় সেরূপ করিলেও তাহারা তাহাতে রীতিমত বাধা দেয়। বহু পরিবারে এরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়, অবশ্য স্থান-বিশেষে ভাল দৃষ্টান্তও যে একেবারে না পাওয়া যায় তাহা নয়। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে বিধবাদের আত্মীয়গণই তাহাদের দুঃখ দূর করিবার পথে অন্তরায়। বিজ্ঞান-সম্পাদকের প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য হিন্দু বিধবা এ দেশে মিলিবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। ইহা অপেক্ষা অধিকতর সম্মানিত উপায়ে জীবিকা অর্জ্জনের জন্যও বিধবাগণ সহজে অগ্রসর হইতে পারে না, যদিও তাহাদের এবিষয়ে আগ্রহের অভাব নাই। আজ কাল স্ত্রীশিক্ষার পথ ক্রমেই অনেকটা উন্মুক্ত হইতেছে। বর্ণপরিচয় থাকিলে ৩।৪ বৎসরের মধ্যে এই সকল বিধবা শিক্ষালাভ করিয়া প্রাথমিক বালিকাবিদ্যালয় সমূহের শিক্ষয়িত্রীর পদ পাইতে পারে, গবর্ণমেণ্ট এমন ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। এই সকল পদে মাসিক ২০।২৫৲ টাকা বেতন পাওয়া যায়। কিন্তু দেশে এত অভাবগ্রস্ত বিধবা থাকিতেও, সকল সুবন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও, কয়টী বিধবা এই পথে অগ্রসর হয়? নিজেদের বিনাপয়সার ক্রীতদাসীটিকে তাহার নিজের উন্নতির জন্য ছাড়িয়া দেওয়া কম স্বার্থত্যাগ নয়। খুব কম লোকেই তাহা পারে। হাত-পা বাঁধিয়া যাহাদিগকে মারা যায় তাহারা সুবিধা পাইলেই অপরাধ করিয়া কারাগারে যাইবে, অথবা অন্য প্রকারে মুক্তির পথ অনুসন্ধান করিয়া দেশের পাপের ভার বৃদ্ধি করিবে, ইহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? দুঃখিনী হিন্দু বিধবাদের দুঃখে যাঁহাদের প্রাণ কাঁদে তাঁহারা স্বার্থপর অভিভাবকদের চিত্তে করুণার উদ্রেক করিতে চেষ্টা করুন, বিধবাদিগের আত্মোন্নতি সাধনে তাহারা যাহাতে বাধাস্বরূপ না হয় এজন্য দেশময় আন্দোলনের সূচনা করুন।

বিশ্রাম

আমাদের দেশে পরিশ্রম ঘৃণ্য, বিশ্রাম পূজ্য। তাকিয়ায় ঠেস দিয়া আরামে বসিয়া বসিয়া গল্প-গুজব করিয়া যাহার দিন কাটে সেই ত মহাশয়

ব্যক্তি। আর যে পরিশ্রম করে, সে তো "নক'ড়ে ছক'ড়ে!" জগতের ইতিহাস কিন্তু তাহা বলে না। যে যত বড়, যত মহৎ, তার তত কাজ। যে কর্ত্তব্য-পরায়ণ তারই কাজ শেষ হয় না। একটী কর্ম্ম সুসম্পন্ন করার পুরস্কার আরও বেশী কাজের ভার পাওয়া। পাঁচটা চাকরের মধ্যে যে যত ভাল কাজ করে, তাকেই তত বেশী কাজের ভার দেওয়া হয়,—সে তার শাস্তি নয়, গুণের আদর। কোন আফিসের দশজন কর্ম্মচারীর মধ্যে দুএক জনের উপর অনেক বেশী কাজের ভার পড়ে, কারণ তারা বিশ্বাসযোগ্য; তাদের বেশী কাজ যোগ্যতার পুরস্কার। যারা বিশ্রাম চায়, আরাম চায়, তারা মানুষই নয়, তারা ভীরু, তারা হীন। জীবনের লক্ষণই চলা, কিছু করা। তাই বলিয়া যা-ইচ্ছা-তাই করিলেই হইবে না। কর্ত্তব্য বুঝিয়া কাজ করিতে হইবে, দায়িত্বজ্ঞানের চালনায় অধীন হইয়া কাজ করা চাই; দশ কাজের ভিতর হইতে নিজের কাজ বাছিয়া নিয়া করিতে হইবে; আর যাহা নিজের কাজ নয়, তাহা কেহ কাঁধে চাপাইয়া দিলেও ঠেলিয়া ফেলিতে হইবে। ইহাতে মনের তেজ চাই, দৃঢ়তা চাই। ছোটখাট কাজে অভ্যাস করিলে, বড় কাজেও দৃঢ়তা আসে। কাজেই দৃঢ়তা, তেজ, মহত্ব স্ফূর্ত্তি পায়। বিশ্রাম, কর্ম্মহীনতা মৃত্যুর লক্ষণ।

উদারতা

যে যাহা বলে তাহাই গ্রাহ্য করা, তাহাই মানিয়া নেওয়া উদারতা নয়, দুর্ব্বলতা। সত্য কি এবং মিথ্যা কি তাহা বিচার করিয়া বুঝিতে হয়। নিজে যাহা সত্য বলিয়া বুঝি তাহা মানিতে আমি বাধ্য। কিন্তু তুমি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছ তাহার সঙ্গে যদি আমার না মিলে, তাহা হইলেও আমি আমার মতে দৃঢ় থাকিয়াও তোমার মতের প্রতি যদি সম্মান রাখিতে পারি, তাহা হইলেই হয় উদারতা। উদারতার আর এক লক্ষণ, নিজের বিপরীত মতের সপক্ষে কি যুক্তি আছে তাহা শান্তভাবে শোনা। আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহা বুঝিয়াছি, তাহাই সত্য, আর সব মিথ্যা, কেহ কিছু বোঝে না—এমন ভাবই সংকীর্ণতা এবং সকল উন্নতির প্রতিবন্ধক। সকল বিষয়েই কত জানিবার, ভাবিবার, বুঝিবার আছে, কত পরিবর্ত্তন ও বিকাশের সম্ভাবনা আছে, তাহা মনে রাখিয়া, নিজের বুদ্ধি ও জ্ঞানে স্থির থাকিয়াও, সকল পক্ষের কথা শোনা, বিপরীত পক্ষের প্রতিও সম্মান রক্ষা করা এবং তাহাকে তাহার মত অনুসারে চলিতে বাধা না দেওয়া উদারতা। এই গুণ না থাকায়, ঘরে ঘরে, দলে দলে কত বিবাদ হয়। স্বামীস্ত্রীর মধ্যে অপ্রীতি হয়, হিন্দু-মুসলমানে কপড়া হয়। আমরা উদার হই, নিজের মত অপরকেও গ্রহণ করিতে দিই। তাহাতেই কল্যাণ।

ইংরাজী ভাষা শিক্ষা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান রেজিষ্ট্রার সুবিজ্ঞ অধ্যাপক ক্রম্ একবার ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, যে একটা ভাষা জানে তার পক্ষে অন্য ভাষা শিক্ষা করা কয়েকমাসের ব্যাপার। ঠিক প্রণালী অবলম্বন করা হয় না বলিয়া, কত বৎসর কাটিয়া যায়, তবুও একটা ভাষা একজন আয়ত্ত করিতে পারে না। তাঁহার নিজের কথা বলিয়াছিলেন, তিনি জার্ম্মান; যখন শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে আসিলেন, তখন একবারেই ইংরাজী জানিতেন না; লিখিতে, পড়িতে, বলিতে বা বুঝিতে কিছুই পারিতেন না। কি করিয়া পড়াবেন? তিনি তিন মাসের ছুটি নিলেন। একমাসে তিনি একটু একটু কথা বুঝিতে লাগিলেন। তিনমাস পরে তিনি ইংরাজী ভাষায় পড়াইতে লাগিলেন। শব্দ ও অর্থ মুখস্থ করিয়া ভাষা শিক্ষাকরা বড় কঠিন! অক্ষর পরিচয়ের পর, ভাল ভাল সরলভাষার লেখা বই পড়া ভাষা শিক্ষার প্রধান উপায়। খুব মন দিয়া প্রতি বাক্য পড়িতে হয়। ব্যাকরণের নিয়ম মুখস্থ করিয়া ভাষা শিক্ষা হয় না। বাংলার যেমন চারুপাঠ প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, তৃতীয় ভাগ আছে,

তেমনি ইংরেজীতেও এক এক শ্রেণীর (Series of books) পাঠ-বই আছে। এই রকম দুতিন পর্য্যায়-এর বই পড়িলে, গোড়া বেশ পাকা হয়। অবশ্য ঝড়ের মত পড়িয়া গেলে কিছুই হয় না, খুব মন দিয়া ভাষা ও ভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পড়িতে হয়। এই গেল প্রথম স্তর। তারপর দ্বিতীয় স্তরে—Robinson Crusoe, Swiss Family Robinson, Gulliver's Travells, Pilgrim's Progress, Uncle Tom's Cabin প্রভৃতি বই পড়িতে হয়। তৃতীয় স্তরে—Lamb's Tales from Shakespeare, Johnson's Rasselas, ও Spectator; চতুর্থ স্তরে Scott's Talisman, Ivanhoe প্রভৃতি। পঞ্চম স্তরে Help's Essays, Smile's Duty, Self-help, Character প্রভৃতি, এবং ষষ্ঠ স্তরে Children's Treasury of English Songs জাতীয় কোন কবিতা গ্রন্থ। এই প্রণালীতে কয়েকখানি নির্দ্দিষ্ট বই দুতিন বৎসরে শেষ করিলে, বেশ ভাল ইংরাজী শিক্ষা করা যায়। ভাল বই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে একখানা ভাল অভিধান নিতান্ত আবশ্যক। ইংরাজী ভাষার প্রামাণ্য ছোট অভিধানের মধ্যে The Concise Oxford Dictionary শ্রেষ্ঠ। তার দাম ৮৵০ আনা মাত্র। যে সকল মেয়ে পরে বসিয়া ইংরেজী শিখিতে ইচ্ছা করেন, এমন কি স্কুল কলেজে পড়েন, তাহারাও যদি এইরকম ধারাবাহিক কয়েকটি স্তরের কয়েকখানি বই ভাল করিয়া পড়েন, তাহা হইলে সহজে ভাষা আয়ত্ত করিতে পারেন।

ঘড়ী ও সময়ের মূল্যবোধ

আমেরিকার সবই আশ্চর্য্য। ওহিও প্রদেশের ক্লীভল্যাণ্ড নগরে ঘড়ী-পরিদর্শনের একটি প্রকাণ্ড আফিস আছে; এই আফিসে ৮০ টি রেলওয়ে কোম্পানীর ঘড়ী পরীক্ষা করা হয়। নানা স্থানে এই আফিসের শাখা আছে।

যত গার্ড, ড্রাইভার ও অন্যান্য রেলওয়ে কর্ম্মচারী ঘড়ী ব্যবহার করেন, প্রত্যেককে মাসে দুইবার কোন না কোন আফিসে তাঁহার ঘড়ী লইয়া যাইতে হয়। পরীক্ষক ঘড়ীর সময় ঠিক করিয়া দেন; প্রত্যেককে বৎসরে একবার নিজের নিজের ঘড়ী পরিষ্কার করাইয়া নিতে হয়। রেলওয়ে কর্ম্মচারীদের ঘড়ী ঠিক রাখার জন্য এত বড় ব্যাপার কেন? কত আফিস, কত লোক, কত অর্থব্যয় হইতেছে কেন? তাহারাও তো লাভের জন্যই ব্যবসা করে। তবে এত বাজে খরচ করে কেন?

বাজে খরচ সম্বন্ধে মানুষের নানা রকম ধারণা আছে। রুগণ রোগে ঔষধ খাওয়াকেও বাজে খরচ মনে করে; কেহ কেহ গরিব দুঃখীকে কিছু দেওয়া বাজে খরচ মনে করে; এমন লোকও নেহাৎ কম নয়, যারা ছেলেমেয়ের লেখা পড়ার জন্য ব্যয় করা বাজে-খরচ মনে করে। আমেরিকার লোক সময়ের এত মূল্য বোঝে যে, তার জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ করাকেও বাজে খরচ মনে করে না। এমন মূল্যবান সময়ের জন্য লক্ষ টাকা ব্যয় করা কিছুই নয়। সময়ের প্রতি এমন সজাগ দৃষ্টি হইতেই নানা শ্রেণীর ঘড়ীর সৃষ্টি হইয়াছে। কাজ করিতে করিতে এক পলকে সময় দেখা যাবে; পকেটে রাখা, আবার বাহির করা এত কাণ্ড করিতে হইবে না বলিয়াই হাতে-বাঁধা ঘড়ীর (Wrist watch) সৃষ্টি হইয়াছে। এদেশে উহা একটি সখের বস্তুতে পরিণত হইয়াছে! এমনই হাওয়ার গুণ। রেলওয়ে কোম্পানী সকল কর্ম্মচারীদের ঘড়ী নির্ভুল রাখিবার জন্য নিয়ম করিয়াছেন, এবং নানা স্থানে বহু অর্থব্যয়ে আফিস খুলিয়াছেন। তাঁরা বণিক। এই মূল্যবোধের জন্যই আমেরিকার এত উন্নতি। যথাসময়ে নির্দ্দিষ্ট কাজ করা, এক সেকেণ্ড এদিক ও দিক হইতে না দেওয়া, সমস্ত দিন রাত্রি সকল কাজ ঘড়ি ধরিয়া করা, প্রতিমুহূর্ত্ত অমূল্য-সম্পদ জ্ঞানে ব্যবহার করা,—এ এক মহাবিদ্যা। এ বিষয়ে, অর্থাৎ সময়ের সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে, যে যত জাগ্রত, উদ্যত, অনুগত, সে তত শক্তিশালী ও উন্নত হইবেই হইবে। সময়ের মূল্য-জ্ঞান যার যত কম, সে তত হীন, দুর্ব্বল, অবনত থাকিবেই থাকিবে। কোন প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থে কালকেই ভগবান বলা হইয়াছে। সত্যসত্যই কালই ভগবান,—সময়ই প্রাণ ও শক্তি। সময়কে তুচ্ছ জ্ঞান

করা, আর ঈশ্বরকে, তাঁহার শ্রেষ্ঠ দানকে অগ্রাহ্য করা একই কথা। আমরা বহুকাল সময়ের সদ্ব্যবহার করি নাই। তাই আমাদের এমন দুর্দ্দশা। আবার নব আলোক, নব জাগরণ, নব যুগ আসিয়াছে। এখন আমরা যদি উঠিয়া পড়িয়া লাগি, সময়ের সদ্ব্যবহার করি, ঘড়ী ধরিয়া চলি, ঘরে ঘরে সময়ের মর্য্যাদা রক্ষা করি, তাহা হইলে আমাদের উন্নতি ও শক্তি অদূরে।

পরলোকগত অধ্যাপক মেচনিকফ

পারিসের পাস্তর ইনষ্টিউটের সুবিখ্যাত অধ্যাপক মেচনিকফ্ সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। সাহিত্য-প্রতিভার জন্য যে "নোবল" পুরস্কার লাভ করিয়া শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশ বিদেশে এত খ্যাতি লাভ করিয়াছেন অধ্যাপক মেচনিকফ ১৮৯৬ খৃঃ চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রতিভার জন্য সেই নোবল পুরস্কার লাভ করেন। দীর্ঘজীবন লাভের কারণানুসন্ধানের জন্যই তিনি সাধারণের নিকট বিখ্যাত। পাকস্থলিতে খাদ্যবস্তুর পচন হেতুই আমাদের জরা উপস্থিত হয় এবং ইহাই আমাদের অকালমৃত্যুর কারণ—মেচনিকফ এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন। বুলগেরিয়ান কৃষকগণের দীর্ঘজীবনের হেতু অনুসন্ধান করিয়া তিনি দেখিতে পান, তাহারা সকলেই প্রচুর পরিমাণে দধি সেবন করে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদ্বারা তিনি দেখিতে পান, যে-সকল বীজাণু দ্বারা দুগ্ধ হইতে দধি উৎপন্ন হয় সেই সকল জীবাণুর পচন নিবারণের ক্ষমতা আছে। এই জন্য তিনি বলিয়া গিয়াছেন, প্রত্যহ দধিভক্ষণ আয়ু বৃদ্ধির পক্ষে নিতান্ত অনুকূল। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত এখনও সর্ব্ববাদীসম্মতরূপে গৃহীত হয় নাই, উপযুক্ত পরীক্ষার পর কোনও দিন হয়ত গৃহীত হইতে পারে। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া চলিলে অকালমৃত্যু পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইবে, শুধু বৃদ্ধগণই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে এবং তাহাদের মৃত্যুও ক্লেশবিবর্জ্জিত হইবে। এখন নিদ্রা যে ভাবে আমাদের নিকট আসে, বৃদ্ধদের নিকট মৃত্যুও ঠিক সেই ভাবেই আসিবে; মৃত্যু বিশ্রাম ও আরাম লইয়া আসিবে, মৃত্যুযন্ত্রণা সংসার হইতে লোপ পাইবে।

আয়ুর্ব্বেদে দধি

দধির প্রশংসাসূচক অনেক কথা আমাদের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও লিখিত আছে। সম্প্রতি "বঙ্গবাসী" ও "ভারতবর্ষ" পত্রে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা ভারতবর্ষ হইতে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

দধির সাধারণ গুণ ও ব্যবহার

দধ্যাক্যং দীপনং স্নিগ্ধং কষায়াম্লরসং গুরু।
পাকেঽম্লং গ্রাহি পিত্তাস্রশোথমেদঃ কফপ্রদম্॥
মূত্ররক্তে প্রতিশ্যায়ে শীতকে বিষমজ্বরে।
অতীসারেঽরুচৌ কার্শ্যে শস্যতে বলভক্রুৎ।

অর্থাৎ দধি উষ্ণবীর্য্য, জঠরানলবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, কষায়াম্লরস, গুরু, অম্লবিপাক এবং ধারক। ইহা রক্তপিত্ত, শোথ, মেদ ও কফবর্দ্ধক; কিন্তু মূত্ররক্ত রোগে, সর্দ্দিতে, শীতজ্বরে, বিষমজ্বরে, অতিসারে, অরুচিতে ও কৃশতায় প্রশস্ত। ইহা বলকর ও বীর্য্যবর্দ্ধক।

গব্যদধি

গব্যং দধি বিশেষেণ স্বাদু বল্যংরুচিপ্রদম্।
পবিত্রং দীপনং স্নিগ্ধং পুষ্টিকৃৎপবনাপহম্।
উক্তং দধ্যামলেষ্বাদ্যং মধ্যে গব্যং গুণাধিকম্॥

গব্যদধি অতিশয় স্বাদু, বলকারক, রুচিপ্রদ, পবিত্র, অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর ও বায়ুনাশক। অন্যান্য প্রকার দধির মধ্যে গব্যদধি সর্ব্বাপেক্ষা অধিকগুণবিশিষ্ট বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

রাজ-নির্ঘণ্টকার বলেন

দধিগব্যমতিপবিত্রং শীতং স্নিগ্ধঞ্চ দীপনং বলকৃৎ।
মধুরমরোচকহারি গ্রাহিচ বাতাময়ঘ্নঞ্চ॥

অর্থাৎ গব্যদধি অতিশয় পবিত্র, শীতল, স্নিগ্ধ, অগ্নিদীপক, বলকারক, মধুররস, অরুচিনাশক, ধারক, এবং বায়ুরোগনাশক।

মহিষ দধি

মাহিষংদধি সুস্নিগ্ধং শ্লেষ্মলং বাতপিত্তজুৎ।
স্বাদু পাকমতিস্নিগ্ধং বৃষ্যং গুর্ব্বস্ত্র দূষকম্॥

মাহিষদধি স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মাকারক, বাতপিত্তনাশক, বাজি, অভিষ্যন্দি (রসনির্গত করিতে সমর্থ) বৃষ্য, গুরু এবং রক্তদূষক।

ছাগদধি

অজং দধ্যুত্তমং গ্রাহি লঘু দোষত্রয়াপহম্।
শস্যতে খাস কাসার্শঃ ক্ষয় কার্শ্যেষু দীপনম্॥

অর্থাৎ ছাগদধি অতিশয় ধারক, লঘু, ত্রিদোষনাশক এবং অগ্নিদীপক ;" ইহা শ্বাস, কাস, অর্শ, ক্ষয় এবং কৃশতা রোগে প্রশস্ত।

দধি চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করা উচিত। চিনি-মিশ্রিত দধি শ্রেষ্ঠ। ইহা তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত এবং দাহনাশক।

"সশর্করং দধি শ্রেষ্ঠং তৃষ্ণাপিত্তাস্রদাহজিৎ।"

রাত্রিতে দধি ভোজন করিবে না ; ভোজন করিতে হইলে ঘৃত এবং চিনি মিশ্রিত করিয়া ভোজন করিবে।

"নক্তং দধি ত্যজেৎ"

শস্যতে দধি নোরাত্রৌ শর্করাঘৃতসংযুতম্।
রক্তপিত্ত, কফোপেত্থ বিকারেষু তু নৈবতৎ॥

অর্থাৎ রাত্রে দধি প্রশস্ত নহে, কিন্তু ঘৃত ও জল সংযুক্ত করিয়া পান করিলে দোষ হয় না। রক্তপিত্ত এবং কফজরোগে দধিব্যবহার করা উচিত নহে। জল-করা তক্রও দধি সারক, কিন্তু দধির জল বিরেচক।

লেডি-হার্ডিং-মেডিকেল কলেজ

দিল্লীনগরের লেডি-হার্ডিং-মহিলা মেডিকেল-কলেজের কার্য্য আগামী ২৮এ সেপ্টেম্বর আরম্ভ হইবে। ঐ তারিখ হইতে ছাত্রীরা ভর্ত্তি হইবেন। ২রা অক্টোবর নিয়মিত পাঠ আরম্ভ হইবে।

এই কলেজ হইতে ছাত্রীদিগকে এম, বি, বি, এস উপাধি দেওয়া হইবে। যে সকল ছাত্রী এই কলেজে প্রবেশ করিতে চাহেন তাঁহাদিগকে শারীরিক সুস্থতার ও সচ্চরিত্রের সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হইবে। সাধারণতঃ যাহারা ইণ্টারমিডিয়েট আর্ট কিংবা তদনুরূপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তাহাদিগকে কলেজে গ্রহণ করা হইবে। ম্যাট্রিকুলেশন ও তদনুরূপ পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রীদিগকে ৬ বৎসরের স্থলে ৭ বৎসর কলেজে পাঠ করিতে হইবে।

বরপণ

শত মেহনতের আয়দানেও এই ঘৃণিত কুপ্রথা দেশ হইতে দূর হইবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। সম্প্রতি দেশ-নায়ক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত সুপ্রসিদ্ধ "বেঙ্গলী" পত্রে ইংরেজীতে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহার মর্ম্ম এই :—'দুঃখের কথা এই যে, দেশের প্রচলিত বিধি অনুসারে সকল বালিকারই বিবাহ দিতে হইবে, এবং এই বিবাহটি কোন নির্দ্দিষ্ট বয়সের পূর্ব্বে হওয়া চাই। কিন্তু যুবকদের বেলা এরূপ কোন বিধি নাই, কাজেই বিবাহার্থী যুবকের তুলনায় বিবাহযোগ্যা মেয়ের সংখ্যা অনেক বেশী ; এবং বরপণও অপরিমিত। যদি মেয়েদের বিবাহের বয়স আরও বাড়াইয়া দেওয়া যায় তবে পাত্রের এত টানাটানি আর থাকিবে না, সুতরাং বরপণও হ্রাস পাইবে। দেশের যুবকগণ যদি দলবদ্ধ হইয়া সঙ্কল্প করেন যে, যে বিবাহে বরপণ লওয়া হইবে তাহাতে তাহারা যোগ দিবেন না, তাহা হইলে এই অভিনব অনিষ্টকর প্রথা কথঞ্চিৎ দমন হইতে পারে। বরপণের বিরুদ্ধে জনমত প্রবল করিয়া তোলাই এই প্রথা নিবারণের প্রথম পন্থা।'

'বেঙ্গলী' যাহা বলিয়াছেন শুদ্ধ তাহাতেই এই কুপ্রথা দূর হইবে, আমরা এমন মনে করি না। আমাদের এই অধঃপতিত দেশের মানুষ এখনও নিজকে লইয়া এত বিব্রত যে কোন উচ্চ আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষার চিন্তা তাহারা খাঁটি মানুষের মত করিতে পারে না। স্বার্থচিন্তা ও স্বার্থ উদ্ধারই তাহাদের সর্ব্বপ্রধান অথবা একমাত্র কাজ। তুমি যত বক্তৃতাই দেও, আর যত লেখাই লেখ, দেশের শত মেয়ে বরপণের জ্বালায় আগুনে পুড়ুক, আর গলায় কাঁসি দিক, দেশের লোকের স্বার্থ-জড় অন্তর আপনার স্বার্থপরতার গণ্ডীর বাহিরে যাইতে কিছুতেই প্রস্তুত হইবে না। দেশের যুবকগণকে আর বলিব কি? তাহারা দুর্ভিক্ষ জলপ্লাবনেই যাউক, আর এনফ্লুয়েঞ্জা কোরে মেদোপিটেমিয়াই যাউক, বরপণটীর বেলায় ছুঁচ সাজিবে, এখানে তাহাদের সকল নৈতিক

বল পরাস্ত। এমন হয় কেন?—আমরা বলি, দেশের লোকের মধ্যে ধর্ম্মভাব ম্লান হইয়াছে। পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে দেশে যে একদল নৈতিকবল-বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যসম্পন্ন শিক্ষিত যুবক দেখা গিয়াছিল, এখন তাহার অভাব হইয়াছে। এখনকার যুবকদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তাশক্তি হ্রাস পাইয়াছে, সমাজের কুসংস্কার, কুপ্রথা সকলের দোষগুণ ভাল করিয়া চিন্তা করিবার শক্তি ইহাদের নাই। এখন আর এক ধুয়া দেশময় উঠিয়াছে, 'দেশের সকলই ভাল।' স্বাধীন-চিন্তাবিহীন যুবকগণ দেশব্যাপী এই ধুয়ার সহিত সুর মিলাইয়া, বুঝিয়া না বুঝিয়া, দেশের সকলই সমর্থন করিতেছে। কোনও প্রচলিত কুপ্রথার বিরুদ্ধে তাহাদের চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠে না, তাহাদের নৈতিক বল মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারে না। জীবন্ত ধর্ম্মভাব অন্তরে জাগ্রত হইলে তাহার আলোকে অসত্য ধরা পড়ে, আত্মদৃষ্টি খুলিয়া যায়, কিন্তু দেশে জীবন্ত ধর্ম্ম কোথায়? ধর্ম্ম এখন বিবেকে প্রতিষ্ঠিত নয়, আত্মচিন্তায় ও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনায় প্রতিষ্ঠিত নয়, ধর্ম্ম এখন নূতন নূতন অবতারের নিকট মাথা নত করায়, বাহ্যিক উৎসব আমোদে ও দেশের সকল প্রকার প্রাচীন প্রথার সমর্থনে পর্য্যবসিত। যেরূপ যাহাদের দুর্ব্বল তাহারা এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইবে কি করিয়া? নারীর হাহাকার তাহাদের হৃদয়ে স্পর্শ করিয়াও তাহা বিদ্ধ করে না, সৎসঙ্কল্প তাহাদের প্রাণে জাগিয়াও হৃদয়ে শক্তি দিতে পারে না।

হে ভগবান্, এই অধঃপতিত দেশে তুমি ধর্ম্মের বিমল আলোক প্রজ্বলিত কর। যুবকদের প্রাণে তুমি জীবন্ত ধর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত কর। তাহাদিগকে ধর্ম্মবলে বলীয়ান কর, আত্মচিন্তা, আত্মপরীক্ষা, প্রার্থনা তাহাদের নিত্যকর্ম্ম হউক। তবেই নারীর দুর্দ্দশা ঘুচিবে, দেশের দুর্দ্দশা ঘুচিবে।

বোম্বাই বিধবাশ্রম

সমাজসংস্কার কার্য্যে বোম্বাই প্রদেশ ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর। তাহারা কর্ম্মীর জাতি, কথা অপেক্ষা কাজ ভালবাসে এবং যতটুকু কথা বলে কাজেও তাহাই করিতে চেষ্টা করে। বাংলা দেশের সমাজসংস্কার—জীবনের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য বক্তৃতায়, কার্য্যে পরিণত করিবার ইচ্ছাশূন্য আকুলতা প্রকাশে। পুনার হিন্দু বিধবাশ্রম, নারীবিশ্ববিদ্যালয়, বোম্বাই সেবাসদন, দলিতা-বিশ্রাম, অবনতজাতির উন্নতিবিধায়িনী সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বোম্বাইবাসীর সমাজ-সংস্কারচেষ্টার জীবন্ত দৃষ্টান্ত। কিন্তু বাংলা দেশে বক্তৃতা ছাড়া সমাজ-সংস্কারের আর কোন চিহ্ন আছে কি? হায়! কবে বাঙ্গালীর চোখ খুলিবে!

সম্প্রতি বোম্বাই সহরে আর একটী হিন্দু বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। "বোম্বাই প্রেসিডেন্সী সমাজসংস্কার সমিতি" কয়েক বৎসর হইতে কয়েকটী বিধবাকে আশ্রয় দিয়া ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে রক্ষা করিতেছিলেন। সম্প্রতি এই কয়েকটী এবং নবাগতা আরো কয়েকটী বিধবা লইয়া সমিতি একটী বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। বোম্বাইবাসীর যেরূপ কর্ম্মানুরাগ, কয়েক বৎসর মধ্যেই এই আশ্রমটী বৃহদাকার ধারণ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বালিকাদিগকে কিরূপ শিক্ষা দেওয়া হইবে?

আজকাল বালিকাদের শিক্ষার সম্বন্ধে এক নূতন মতের আবির্ভাব হইয়াছে। বোম্বাইর কতিপয় হিন্দু-মহিলা গত ডিসেম্বর মাসে এক সভা করিয়া এই মীমাংসা করিয়াছেন যে, সমাজে বালিকাদের যেরূপ অবস্থা, তাহাদের শিক্ষাও তদনুরূপ হওয়া উচিত।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটির শিক্ষা কমিটিও ঐ মতের সমর্থন করিয়াছেন।

ঐ অভিনব মতের বিশ্লেষণ করিলে উহার প্রকৃত অভিপ্রায় স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

একটী সূত্রধরের পুত্র যদি বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে, তবে তাহাকে যদি বলি, তুমি সূত্রধরের কায করিয়া জীবন অতিবাহিত করিবে, অতএব কাঠ কিরূপে করাত দিয়া চিরিতে হয়, দুইখানা কাঠ কিরূপে জুড়িতে হয়, সেইরূপ শিক্ষা তোমার পক্ষে উপযোগী। তবে কি সূত্রধর জাতি ক্ষুণ্ণ হইবে না?

এক নাপিতের পুত্র যদি বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইতে আইসে, তাহাকে যদি বলি, ক্ষুর ও নরুণ লইয়া তোমার জীবিকা অর্জ্জন করিতে হইবে, অতএব কিরূপে দাড়ি কামাইতে হয়, চুল, কাটিতে হয়, তোমার পক্ষে সেইরূপ শিক্ষার প্রয়োজন।

যে ব্রাহ্মণের পুত্র সে যদি বিদ্যাশিক্ষার জন্য আইসে, তাহাকে যদি বলি, তোমার যজন যাজন তোমার কার্য্য, তুমি বাঁচিয়া সংস্কৃত পাঠ কর। তবে কি দেশমধ্যে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইবে না?

কিন্তু মুচির কন্যাকে মুচির সংসার চালাইবার উপযুক্ত শিক্ষা দাও; তাঁতির কন্যাকে সুতার মাড় দিবার উপযুক্ত শিক্ষা দাও, গরীবের কন্যাকে গরীবের মত, আর ধনীর কন্যাকে ধনীর যোগ্য শিক্ষা দেও, আজ কাল বালিকা শিক্ষা সম্বন্ধে এই মত প্রচার করা হইতেছে। অনেকে বিবেচনাহীন হইয়া তাহাই ভাল বলিতেছেন। কতগুলি শিক্ষা প্রত্যেক নরনারীরই যে প্রয়োজন, এই মূলতত্ত্ব অনেকেই ভুলিয়া যাইতেছেন।

বিভিন্ন শ্রেণীর জীবনযাত্রার জন্য বিভিন্ন শিক্ষার যে প্রয়োজন, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু কতগুলি শিক্ষা এমন যাহা মানব মাত্রেরই, পুরুষ নারী নির্ব্বিশেষে লাভ করা প্রয়োজন।

জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা ও ঈশ্বরবিশ্বাস প্রত্যেক মানবের মধ্যেই নিহিত হইয়া রহিয়াছে। এগুলিকে সমুজ্জ্বল করা শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। এই শিক্ষা ব্রাহ্মণের ও মুচির, পুরুষ ও নারীর সমভাবে প্রয়োজন। এই বিষয়ে সমাজ বা অবস্থা ভেদে শিক্ষার তারতম্য হইতে পারে না। সকলেই এই শিক্ষার অধিকারী, সকলের পক্ষেই এই শিক্ষা প্রয়োজন।

কামার কুমার ব্রাহ্মণ বৈদ্যের পুত্রদের পক্ষে যে ঐ শিক্ষা প্রয়োজন, ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু যে দেশে বহুকাল হইতে বর্ণভেদ চলিয়া আসিতেছে, সে দেশে মধ্যে মধ্যে এই রব শুনিতে পাওয়া যায়, নিম্ন শ্রেণীর আবার শিক্ষার প্রয়োজন কি? কিন্তু এই অতি ক্ষীণস্বরকারীরা সাহস করিয়া মাথা তুলিতে পারিতেছে না।

জ্ঞানের অধিকারী সকলেই, সেখানে জাতিভেদ বা সমাজভেদ নাই।

নারীশিক্ষা সম্বন্ধে এই উদার মত শিক্ষিতেরাও গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে এমন বহুলোক আছেন, যাঁহারা মনে করেন নারীদের উচ্চগণিত, উচ্চ দর্শন শাস্ত্র, উচ্চ বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজন কি? যে দেশে খনা, লীলাবতী, মৈত্রেয়ী, গার্গীর জন্ম সে দেশের লোক কি হীন হইয়া গিয়াছে? আপনাদের প্রাচীন মহিমাময় গৌরব ভুলিয়া গিয়া মনে করিতেছে, নারী কেবল ঘরকন্না ও সন্তান পালনের জন্য সৃষ্ট, তাহাকে ঐ কার্য্য সুচারুরূপে করিবার উপযুক্ত কর। নারীর সম্বন্ধে এমন হীন ধারণা হওয়াতেই এই জাতি সর্ব্বপ্রকার হীনতা বরণ করিয়া লইয়াছে।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটি নিম্নশিক্ষার বিষয় আলোচনা করিতেছেন। শিখাইবেন বর্ণ পরিচয়, হস্তলিপি ও ধারাপাত। অথচ বলিতেছেন, বালিকাদিগের জন্য তাহাদের সামাজিক অবস্থানুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। যেন হাড়ি মুচির কন্যাদের যোগোদয় ও ধারাপাত শিক্ষার প্রয়োজন নাই।

মানবের চিরন্তন অধিকার এই দাবী করিতেছে, জ্ঞান লাভে ছোট বড় বিচার করিতে দিবে না, নর নারীর পার্থক্য এরাজ্যে স্থান পাইতে পারে না। ছোট যখন মাথা তুলিতে চেষ্টা করিবে, তখন যদি বল তুমি তোমার পৈত্রিক ব্যবসায় শিক্ষার চেষ্টা কর, বালিকা যখন বিদ্যালয়ের প্রয়াসী হইয়া আসিবে, তখন যদি বলি তুমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, তুমি পূজা অর্চ্চনা শিক্ষা কর, তুমি শূদ্রের মেয়ে তুমি রান্না বান্না শিখ, তুমি মেথরানীর মেয়ে তুমি মাথায় ঝাড়ুতি লইতে শিখ, তবে মানবের অন্তর্নিহিত শক্তি বিদ্রোহী হইয়া তোমার এই চেষ্টা সংহার করিবে। (সঞ্জীবনী)

লুসী ষ্টোন ব্ল্যাকওয়েল

৭৫ কি ৮০ বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের স্ত্রীজাতির অবস্থা যে কি রকম শোচনীয় ছিল, তাহা শুনিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। বাঙ্গলা দেশের নারীদের অবস্থার সঙ্গে কেমন মিলিয়া যায়। পুরুষের দাসীর মত ঘরকন্নার কাজ করা ছাড়া নারী-জীবনের আর কোন লক্ষ্য ছিল না। রমণীর কোন অধিকার ছিল না। যখন সমস্ত আমেরিকাবাসী স্বাধীন এবং আইনের চক্ষে সমান বলিয়া ঘোষিত হইল, তখন তার ব্যাখ্যা হইয়া ছিল যে, স্ত্রীলোক বাদে। দেশ, জাতি, আইন, বিত্ত সম্পদ, বিদ্যা, সম্মান, সুখ, বিশ্রাম প্রভৃতির সঙ্গে স্ত্রী-জাতির কোন সংস্রব নাই। বাপ, স্বামী, ভাই, এমন কি রাস্তার লোকেও কথায় কথায় মেয়েদের প্রতি অন্যায়, অত্যাচার ও অভদ্র ব্যবহার করিতে একটুও ইতস্ততঃ করিত না! মেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষা হাসির বিষয় ছিল। স্ত্রীলোকের দ্বারা গৃহকর্ম্ম ছাড়া যে জগতে আর কিছু হইতে পারে এ চিন্তাই তখনকার আমেরিকাবাসীদের পক্ষে যেন অসম্ভব ছিল। ভাল লোক, ভদ্রলোক, অথচ পত্নীর কিংবা কন্যার সঙ্গে ব্যবহার করিবার বেলায় কর্কশ, অভদ্র, এই ছিল ঘরে ঘরে অবস্থা। স্ত্রীলোক আবার মানুষ, এই ছিল পুরুষদের ভাব!

দেশের এই রকম অবস্থার মধ্যে, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ম্যাসাচুসেট্ নগরে লুসী ষ্টোনের জন্ম হয়। তাহার মাতা যখন শুনিলেন যে মেয়ে হইয়াছে তখন দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "মেয়েদের যে পোড়া কপাল, মেয়ে হইয়াছে তার আনন্দ কি!" এতেই বোঝা যায়, আমেরিকার স্ত্রীজাতির অবস্থা তখন কেমন ছিল। লুসীর পিতার অবস্থা মন্দ ছিল না, তবুও তাহার মাতাকে অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হইত; এবং নয়টি ছেলেমেয়ের মা ও বৃহৎ পরিবারের গৃহিণী হইয়াও কথায় কথায় স্বামী ও পুত্রদের অপমান সহিতে হইত! লুসী অল্প বয়স হইতেই মাতার সাহায্য করিত এবং জননীর অবস্থা দেখিয়া তাহার মনে বড় খটকা লাগিত। কিছুদিনের মধ্যে সে তাহার ভাইদের এবং তাহার নিজের অবস্থার পার্থক্যও মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে লাগিল। তাহারা প্রভু, আর সে যেন দাসী! লুসী খুব কর্ম্মিষ্ঠা ও বুদ্ধিমতী ছিল। ঘরকন্নার কাজও ভাল করিয়াই করিত, আবার পড়াশুনাও উত্তমরূপেই শিখিত। বাড়ীর পড়া শেষ হইলে, লুসী তাহার দাদার মত কলেজে পড়িতে চাহিয়াছিল; তখন তাহার বয়স প্রায় পনের ষোল বৎসর। তাহার পিতা তাহা শুনিয়া বলিয়াছিলেন—"মেয়েটা পাগল হইয়াছে নাকি? মেয়ে মানুষ, লেখা পড়া শিখে কি হবে?"

খুব অল্পবয়সেই মেয়েদের কঠিন পরিশ্রম করিতে হইত। সূর্য্য উঠিবার পূর্ব্বে বিছানা হইতে উঠিয়া খালিপায়ে শিশিরসিক্ত ঘাসের উপর দিয়া মাঠে গরু তাড়া নিয়া চলিতে চলিতে লুসীর পা কন্‌কন্ করিয়া উঠিত, পরে পায়ের উপর পা ঘষিয়া পা গরম করিয়া লইতে হইত। এই রকম কত কষ্ট করিয়া কাজ করিতে হইত। তাহার পিতা সকলই দেখিতেন; কিন্তু মেয়েদের পক্ষে ও কিছুই নয়! এই ভাবে বাল্যকাল কাটিয়া গেল; গৃহে তাহার মাতা ও ভাতাদের অবস্থা এবং অন্য সকল স্ত্রীলোকের অবস্থা দেখিয়া দেখিয়া লুসীর অত্যন্ত কষ্ট এবং ঘৃণা হইত। সে সর্ব্বদাই ভাবিত, এ কি রকম! এমন অন্যায় কাহারো চক্ষে পড়ে না! মেয়েরাই বা নীরবে এত অত্যাচার সহ্য করে কেন? মেয়েরা কি মানুষ নয়? তাহার এই চিন্তা—জীবন-ব্যাপী সাধনায় পরিণত হইল—যখন তাহার পিতা তাহাকে কলেজে যাইতে দিলেন না। আমেরিকার কোন কলেজে বা স্কুলে তখন মেয়েদের পড়িবার অধিকার ছিল না। কেবলমাত্র "ওবার্লিন কলেজে" মেয়েরাও ভর্ত্তি হইতে পারিত। লুসী প্রতিজ্ঞা করিল—"যেমন করিয়া পারি, পয়সা জমাইয়া ওবার্লিন কলেজে শেষ পর্য্যন্ত আমি পড়িব। এবং যদি নারীজাতির অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন করিতে না পারি, কখনও কোন পুরুষের স্ত্রী হইব না।" এই প্রতিজ্ঞা করিয়া লুসী নানা উপায়ে অর্থসঞ্চয় করিতে লাগিল। নিজে নিজে বাড়ীতে পড়াশুনা করিয়া, মার সাহায্য করে,

এবং অবকাশ সময় নানা রকম ঘাস বুড়াইয়া বিক্রী করিয়া টাকা জমায়। গ্রীষ্মকালে ছোট ছেলেদের জন্ম অস্থায়ী স্কুল হইত; লুসী সামান্য বেতনে সেই স্কুলে পড়াইত। ছাত্রেরা তাহাকে খুব ভালবাসিত। ভাল শিক্ষক বলিয়া লুসীর নাম পড়িয়া গেল। কিন্তু তবুও লুসী বড় ছেলেদের স্কুলে পড়াইতে পারিত না। কারণ, মেয়েমানুষের দ্বারা কি সে কাজ হয়!

একবার, একটী বড় স্কুলের ছাত্রেরা তাহাদের মাষ্টার মহাশয়ের উপর রাগিয়া তাঁহাকে জানালা পার করিয়া রাস্তার মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছিল। স্কুল আর চলে না! স্কুলের সম্পাদক অনেক চেষ্টা করিয়াও যোগ্য পুরুষশিক্ষক না পাইয়া এবং লুসীর সুখ্যাতি শুনিয়া তাহাকেই সেই স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। অন্যান্য ভদ্রলোকেরা বলাবলি করিতে লাগিলেন—"ইনি কি ক্ষেপিয়াছেন? একজন মেয়েকে এই স্কুলের মাষ্টার করিলেন!" স্কুলের ছাত্রেরা প্রায় তার সমান, এবং নামজাদা দুষ্ট। তবুও লুসী ভাবিল—প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করিয়া কতদূর করা যায় তাহা আমি একবার দেখিব। আর এইসব ছেলেই ত কয়েক বৎসর পরে স্বামী হবে, ইহারা যাহাতে মেয়েদিগকে শ্রদ্ধা করিতে শিখে সে চেষ্টাও করিয়া দেখিতে হইবে। এই ভাবিয়া লুসী স্কুলে গেল। সকলেই বলিতে লাগিল—এমন দুষ্ট যুবকদের মধ্যে একজন মেয়েকে পড়াইতে দেওয়া ঠিক হয় নাই। ওরা পুরুষ-শিক্ষককেই গ্রাহ্য করে না; একজন মেয়ে, তাও আবার অল্প বয়স, তাকে মানিবে? না জানি কবে কি শোনা যাবে!

লুসীর ভদ্রব্যবহার, সকলের প্রতি সরল প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার ও সুন্দর শিক্ষাদান-প্রণালীর গুণে অতি অল্পদিনের মধ্যেই ছেলেরা তাহার অনুগত হইল। কয়েক মাসের মধ্যেই পরিদর্শকগণ দেখিতে পাইলেন, লুসীর স্কুলের মত শান্ত, সুশৃঙ্খল, সুশিক্ষার স্থান সে জেলায় আর নাই। ছাত্রেরা সকলেই তাহাকে ভালবাসিত, তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিত। বড় বড় দুর্দান্ত ছেলেদের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখিয়া অভিভাবকেরা বিস্মিত হইলেন। একজন মেয়ের দ্বারা এমন গুরুতর কাজ সম্পন্ন হইল, যাহা পুরুষের পক্ষেও কঠিন ছিল! তবে তো 'স্ত্রীলোকের দ্বারা আরও কিছু হওয়া সম্ভব! তবে তো মেয়েমানুষ একবারে অসার নয়!

এই স্কুলে লুসীর খুব নাম হইল। কিন্তু সে যে বেতন পাইত, তাহা পুরুষশিক্ষকের অর্দ্ধেক! এই অন্যায় আচরণ, স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে এই পার্থক্য, দূর করিয়া সমাজে স্ত্রীজাতির অবস্থা পুরুষদের সমকক্ষ করিবার জন্য, তাহার জেদ আরও প্রবল হইয়া উঠিল। কয়েক বৎসর এই স্কুলে কাজ করিয়া প্রায় ২৫ বৎসর-বয়সের সময় তাহার সঞ্চিত অর্থ লইয়া লুসী "ওবার্লিন কলেজে" পড়িবার জন্য যাত্রা করিল। হাতে পয়সা কম, ভদ্র পরিবারের মেয়েদের মত জাহাজের ঘরের ভাড়া দিয়া গেলে খরচ বেশী হইবে, এই জন্য লুসী তৃতীয় শ্রেণীর টিকেট কিনিয়া, কয়েকজন গরীব স্ত্রীলোকের সঙ্গে জাহাজের ডেকের উপর যেখানে মাল থাকিত, সেইখানেই রাত্রে শুইয়া যাইতে লাগিল। ইরি হ্রদে, বাফেলো হইতে ক্লিভল্যাণ্ড পর্য্যন্ত জাহাজে যাইয়া "ওবার্লিন কলেজে" ভর্ত্তি হইল।

কলেজের খরচ চালাইবার জন্য লুসী মেয়েদের বোর্ডিংএ ঝির কাজ করিত, নীচের শ্রেণীতে পড়াইত এবং নিজেই নিজের ঘরে রান্না করিয়া খাইত। চারি বৎসর কলেজে পড়িয়াছিল, এতদিন একটিমাত্র পরিচ্ছদ সম্বল ছিল। চারিবৎসরের মধ্যে একবারও বাড়ী যাওয়ার খরচ জোটে নাই! টাকা নাই; কেহ সহায় নাই, আত্মীয়স্বজন সকলেই বিরোধী,—এই অবস্থায় ২৫ বৎসরের যুবতী স্ত্রীজাতির মুক্তির পথ পরিষ্কার করিবার জন্য একাকী সংগ্রামে লিপ্ত হইলেন। দারিদ্র ও কঠোর পরিশ্রম, সব মাথা পাতিয়া লইয়া প্রতিজ্ঞাপালনে ব্রতী হইলেন, এবং অসাধারণ ত্যাগ, অধ্যবসায় ও আত্মনির্ভরপরতাবলে সংগ্রামে জয়ী হইয়া আমেরিকার স্ত্রীজাতির সকল নীচ বন্ধনপাশ ছিন্ন করিলেন!

লুসী স্ত্রীজাতির দাসত্ব দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইলেন। তখন ক্রীতদাস-প্রথার যুগ।

"ওবার্লিন" এই প্রথার ঘোর বিরোধী ;—এ নগরে পলাতক দাসেরা আশ্রয় পাইয়া বাঁচিয়া যাইত। এ নগরবাসীদের মত দাসদের বন্ধু আমেরিকায় খুব কম ছিল। সুতরাং নিগ্রো দাসেরা দলে দলে সেখানে আসিয়া বাস করিত। নগরে বাস করিলে অথচ বন্ধ পশুর মত থাকিলে, তাহা ভাল নয়, এই ভাবিয়া নগরবাসী ধর্ম্ম যাজক ব্যক্তিগণ তাহাদের জন্য একটা স্কুল করিলেন। কুমারী ষ্টোনকে সেই স্কুলের ভার নিতে বলা হইল, তিনিও রাজী হইলেন। নিগ্রোদের মধ্যে এই সংবাদে অসন্তোষের সৃষ্টি হইল—একজন স্ত্রীলোকের কাছে পড়িতে হইবে! যাহাই হউক, স্কুলের প্রবর্ত্তকগণ লুসীকে কিছু না বলিয়া স্কুলে সমবেত নিগ্রোদের সম্মুখে তাঁহাকে লইয়া গিয়া বলিলেন, ইনিই তোমাদের শিক্ষক। চারিদিকে নানা অস্পষ্ট কথা শোনা যাইতে লাগিল, এক জন দীর্ঘকায় ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, "ইঁহার প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ নাই, কিন্তু স্ত্রীলোকের কাছে শিখতে আমার বিষম আপত্তি আছে!" লুসীর মনের অবস্থা তখন কেমন হইল! শ্বেতকায় সভ্য জাতি তো স্ত্রীলোককে মানুষ বলিয়াই মনেই করে না, অসভ্য ক্রীতদাস নিগ্রোপর্য্যন্ত স্ত্রীলোককে অগ্রাহ্য করে! তিনি তাঁর ব্রত স্মরণ করিয়া, স্থির ভাবে মিষ্টস্বরে তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা দাসত্ব ও অজ্ঞতার মধ্যে ছিলে, দাসত্ব হইতে মুক্তি পাইয়াছ। অজ্ঞান-অন্ধকার হইতে মুক্তি লাভের জন্য যে কোন ব্যবস্থা তোমাদের সম্মুখে আসিবে তাহাই আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করা উচিত; তাহাতে তোমাদের কল্যাণ হইবে।" তাঁহার সুমিষ্ট ও যুক্তিপূর্ণ উপদেশে তাহারা শান্ত হইল; তিনি তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। অতি অল্পদিনের মধ্যে তিনি নিগ্রোদের আরাধ্যা দেবী স্বরূপ হইয়া উঠিলেন। একবার বোর্ডিংএ আগুন লাগিয়াছিল; তখন তাঁহার জিনিষ পত্র বাঁচাইবার জন্য নিগ্রোরা প্রাণপণ করিয়াছিল।

এই সময় নিগ্রোগণ তাহাদের স্বাধীনতা লাভের উপলক্ষে একটি সভার আয়োজন করে; এবং কলেজের অধ্যক্ষ ও তিন জন অধ্যাপকের সঙ্গে লুসীকেও বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করে। এই তাঁহার প্রথম বক্তৃতা, আমেরিকায় স্ত্রীলোকেরও এই প্রথম বক্তৃতা। সাধারণ সভায় সকলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া একজন স্ত্রীলোক বক্তৃতা করিবে, এ স্বপ্নের অগোচর ছিল। লুসী নারীজাতির উন্নতির পথ মুক্ত করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। ধীরে ধীরে ভগবান তাহার সুযোগ উপস্থিত করিতে লাগিলেন। লুসীও সুযোগের সদ্ব্যবহারের জন্য প্রাণপণ করিতে লাগিলেন। তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া নিজের বক্তব্য বিষয় লিখিয়া নিয়া গিয়াছিলেন। এক দল লোক তাঁহার বক্তৃতার সময় যথেষ্ট গোলমাল করিয়াছিল, তবুও তিনি সুন্দর ভাবে তাঁহার বক্তব্য বিষয় বলিতে পারিয়াছিলেন; সকলেই তাঁহার বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বক্তৃতার পরদিন সেখানকার মহিলা-সমিতি তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন যে, প্রকাশ্য সভায় পুরুষ বক্তাদের সঙ্গে বক্তৃতা করিয়া তিনি অত্যন্ত অন্যায়—স্ত্রীলোকের অযোগ্য কাজ—করিয়াছেন। মহিলা সমিতির এই অভিযোগ শুনিয়া লুসী স্তম্ভিত হইলেন। "ওবার্লিন" উদার নীতির লীলাভূমি। সেখানেও যদি মেয়েদের এই দশা তবে অন্যত্র কি হইবে! তিনি সভায় গেলেন। কলেজের অধ্যক্ষের স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি পুরুষ মানুষের সঙ্গে বক্তৃতামঞ্চে বসিতে লজ্জা বোধ কর নি? একটুও ভয় হয় নি?" তিনি বলিলেন, "একথা কেন বলছেন? আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকগণের কাছে বসতে আবার ভয় পাব কেন? তাঁদের সঙ্গে তো রোজ ক্লাশে দেখা হচ্ছে। তাঁদের সঙ্গে কোন কাজ করতে আমার একটুও ভয় হয় না।" তাঁর এইরূপ উত্তরের পর, মহিলা-সমিতির দিক হইতে তাঁহাকে একটু তিরস্কার করিয়া বিদায় দেওয়া হইল! ওবার্লিনের মহিলা সমিতির এই অবস্থা!

এই ঘটনার কিছু দিন পরে যেবার তিনি বি, এ, পাশ করেন, সেবার তাঁহাকে একটা রচনা লিখিতে বলা হয়, এবং সেই সঙ্গে একথাও বলা হইয়াছিল যে, তাঁর লেখাটা তিনি পড়িতে পাইবেন না, কারণ মেয়েছাত্রের পক্ষে সকলের সঙ্গে রচনাপাঠ নীতিবিরুদ্ধ, সুতরাং একজন অধ্যাপক তাঁহার রচনা পাঠ করিবেন।

তিনি বলিলেন, "আমার লেখা যদি আমি পাঠ করতে না পাই, তা হ'লে আমি রচনা লিখব না, অন্ততঃ সে অধিকার আমার আছে।" তিনি রচনা লেখেন নাই। এই ঘটনার প্রায় ৩০ বৎসর পরে, কলেজের জুবিলি উৎসবের সময় মুন্সী একজন প্রধান বক্তা ছিলেন।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে মুন্সী সুখ্যাতির সহিত এ. এ, উপাধি লাভ করিলেন। তিনি কলেজের একজন শ্রেষ্ঠ ছাত্র ছিলেন। এখন তাঁহার জীবনের কাজ আরম্ভ করিবার সময় উপস্থিত। এই সময় দাস-ব্যবসায় লইয়া আমেরিকায় তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল। একদল লোক দাস-ব্যবসায় রাখিতে চায়, আর এক দল এ কলঙ্ক একেবারে দূর করিতে চায়। ওবার্লিন চিরদিন এই কুপ্রথার বিরোধী। এ সময় দাসত্বপ্রথার বিরোধী সমিতির কাজ সুবিস্তৃত হইয়া পড়িল। এই সমিতির পক্ষে তিনি একজন বক্তা নিযুক্ত হইলেন। পূর্ব্বে তিনি দু তিন বার স্ত্রীজাতির অধিকার সম্বন্ধে প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সুবক্তা বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছিল। এখন তিনি নিগ্রোদাসদের মুক্তির পক্ষে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণাংশে দাসত্বপ্রথার পক্ষপাতী ছিল—দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে বলিতে যাইয়া তিনি অনেক সময় সেই সঙ্গে আমেরিকার উত্তরাংশে শ্বেতকায় নারীর দাসত্বের কথারও উল্লেখ করিতেন। এই জন্য তাঁকে এই সমিতির সংস্রব ছাড়িতে হইল। তিনি এই প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "নিগ্রো নরনারীর জন্য আমার প্রাণ কাঁদে, তাহাদের মুক্তি চাই; কিন্তু তারা তো দূরের বিষয়! আমাদের ঘরে ঘরে মেয়েরা যে ক্রীত দাসীর জীবন যাপন করছে, এ দাসত্ব হতে কে তাদের উদ্ধার করবে! আমি চাই আগে আমার মা মাসী বোনদের মুক্তি।" এইসকল বলিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, যাঁরা খুব ভাল লোক, উদারহৃদয়, দাসদের স্বাধীনতা চাহেন, তাঁহারাও তাঁহাদের নারীগণ যে সর্ব্ববিধ দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পুরুষদের সমকক্ষ হয়, তাহা চাহেন না। তবুও তিনি সময়ে সময়ে এই সমিতির পক্ষে বক্তৃতা করিতেন। কিন্তু তিনি প্রধানতঃ তাঁহার শক্তি ঢালিয়া দিলেন নারীজাতির উদ্ধার সাধনে।

সহায় নাই, সঙ্গী নাই, সমিতি নাই, একাকী তিনি আপনার ব্রত উদ্‌যাপনে লিপ্ত হইলেন। চারিদিকে রটিতে লাগিল, ইনি বড় অহঙ্কারী, মেয়েদেরও অহঙ্কারী করিয়া তুলিতে চাহেন,—প্রভুত্ব চাহেন! চারিদিকে সে কি বিরুদ্ধাচরণ! কেহ তাঁহার কাজ করিবে না! তিনি নিজ হাতে নিজের বক্তৃতার বিজ্ঞাপন রাস্তায় রাস্তায় লাগাইয়া বেড়াইতেন, দলে দলে ছেলেরা হৈ হৈ করিয়া পেছনে পেছনে যাইত, তিনি বিজ্ঞাপন লাগাইলে তাহারা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিত; তবুও তিনি ধৈর্য্য ধরিয়া তাহাদিগকে শান্ত করিতেন। কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তিগণ নানা উপায়ে তাঁহার বক্তৃতার বাধা দিত। বক্তৃতার সময় খুব গোলমাল করিত, শব্দ করিত, কত সময় কাগজের বল তৈয়ার করিয়া ঘরময় ছুঁড়িত। কোন দিন বা বক্তৃতার সময় সেই ঘরে লঙ্কা পোড়াইত! একবার শীতকালে সন্ধ্যার পর তিনি বক্তৃতা করিতেছেন, পেছনদিকের জানালা ফাঁক করিয়া একটা লোক এক কলসী বরফের মত ঠাণ্ডা জল তাঁহার গায়ে ঢালিয়া দিল।—সমস্ত কাপড় ভিজিয়া গেল, তবুও তিনি থামিলেন না। এত অত্যাচারেও তিনি দমিয়া যান নাই; বক্তৃতা করা ছাড়েন নাই। সব অত্যাচার সহ্য করিয়া বক্তৃতা শেষ করিয়াছেন, এবং সকলের সহায়তা ও শুভকামনা প্রার্থনা করিয়াছেন। তিনি শান্তভাবে, স্ত্রীজাতির—শ্রোতাদের মা বোন, পত্নী ও কন্যাদের—দুর্গতি, হীন অবস্থার বিষয় সুললিত ভাষায় বর্ণনা করিয়া সকলের সহানুভূতি উদ্রেকের চেষ্টা করিতেন, এবং শেষে প্রায়ই জয়ী হইতেন। স্ত্রীজাতির দুর্গতির বিষয় কেহ চিন্তাই করিত না, তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া সকলের মনে প্রকৃত অবস্থা স্পষ্ট হইতে লাগিল, এবং সকলেই বিস্মিত হইতে লাগিলেন যে এসকল ঘরের কথা জানিয়াও কেহ বুঝিত না।

রোড্‌ দ্বীপের আইন সভায় যাইয়া তিনি স্ত্রীজাতির অধিকার ও বর্ত্তমান হীনতার কথা এমন সুন্দর

রূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন যে বিজ্ঞ সভাপতি ও সভ্যগণ নিজেদের অজ্ঞতা বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হইয়াছিলেন, ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

যে সময়ে দাসত্বপ্রথাবিরোধী সভা অথবা স্ত্রীজাতির অধিকার লাভ বিষয়ক সভা সমিতি হইলেই দলে দলে নিম্নশ্রেণীর লোক নানা প্রকার উৎপাত করিত, অনেক স্থলে বক্তাদের ভাগ্যে প্রহার পর্য্যন্ত বাদ যাইত না। কিন্তু লুসীর সম্বন্ধে ক্রমে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। তিনি যেখানেই বক্তৃতা করিতেন তাঁহার বক্তৃতার সময় সকলেই চুপ করিয়া থাকিত; তাঁহার সরল, নিঃস্বার্থ, তেজঃ উক্তিতে দুষ্ট লোকদের হৃদয়ও শান্ত হইতে লাগিল। একবার, নিউইয়র্ক নগরে কোন সভায় অপর কয়েক জন বক্তার সঙ্গে তিনিও উপস্থিত ছিলেন। এক একজন বক্তা বক্তৃতা করেন, আর দুষ্টলোকেরা গোলমাল করে; লুসী যখন বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন তখন সকলে নীরবে শুনিতে লাগিল। বক্তৃতার পর যখন বক্তাগণ ফিরিয়া যাইতেছিলেন তখন সেই দুষ্টলোকেরা তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিল, লুসী দৃঢ় স্বরে তিরস্কার করিবা মাত্র, তাহারা ফিরিয়া গেল।

একবার "কড" অন্তরীপের একটি বাগানে দাসত্ব প্রথার বিরোধী সভা হইয়াছিল। তক্তা দিয়া উচু বক্তৃতা-মঞ্চ প্রস্তুত করা হইয়াছিল। দলে দলে সভার বিরোধীগণ বাগান পূর্ণ করিয়াছিল। বক্তাগণ দেখিলেন, গতিক ভাল নয়। কিন্তু কি করা যাবে। যথাসময়ে বক্তৃতা আরম্ভ হইল, তর্জ্জন গর্জ্জন গোলমালও আরম্ভ হইল। তখন অবস্থা দেখিয়া বক্তাগণ একে একে সেই মঞ্চ হইতে নামিয়া সরিয়া পড়িতে লাগিলেন। শেষে থাকিলেন লুসী এবং ষ্টিফেন ফষ্টার নামক একজন বিখ্যাত বক্তা। তখন বিরোধীগণ গর্জ্জন করিয়া মঞ্চের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। লুসী বলিলেন, "মিষ্টার ফষ্টার, আপনি পালান; ঐ এলো বলে।" মিঃ ফষ্টার বলিলেন, "তোমাকে কে দেখবে?" সেই মুহূর্ত্তে একজন দীর্ঘকায় ব্যক্তি প্রকাণ্ড লাঠি হাতে মঞ্চে উঠিল। লুসী তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "এই ভদ্রলোকটি আমাকে দেখবেন।" এই কথা শুনিবা মাত্র সে ব্যক্তি—"হাঁ আমি তোমাকে রক্ষা করব" এই বলিয়া লুসীর হাত ধরিয়া নিরাপদ স্থানে লইয়া গেল। ওদিকে অন্যান্য বিরোধীগণ অপর বক্তাদিগকে ধরিয়া যথেষ্ট অত্যাচার করিল, কাহারো টুপী, কাহারো কোট ছিঁড়িয়া দিল। লুসীর কথায় একজন লোক এত নরম হইয়া গেল যে, তখনই তাঁকে একটী টুলে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতে বলিল। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া সভার বিরোধীগণ বক্তাদের একজনের কোটের দাম প্রভৃতির জন্য প্রায় ৬০৲ টাকা চাঁদা তুলিয়া দিয়াছিল।

এ সময় লুসী নিতান্ত দুঃখিনীর মত অর্থব্যয় করিতেন। কারণ, তিনি চাকরী করিতেন না। প্রতিদিন আট দশ আনার বেশী খরচ করিতেন না। যেখানে খাইতেন সেইখানে একটা স্বতন্ত্র ঘর নিজের জন্য ভাড়া করিতে পারিতেন না,—রাত্রে কোন এক জায়গায়, কোন মেয়ের বিছানার পাশে শুইয়া থাকিতেন! অতি সাধারণ পরিচ্ছদে বৎসর কাটাইতেন। শীতের সময় সেই ভীষণ শীতের দেশের উপযুক্ত শীতবস্ত্রের অভাবে কত কষ্ট পাইতে হইয়াছে। এই ভাবে স্ত্রীজাতির এবং ক্রীতদাসদের জন্য তিনি সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার জীবনে এক মহাপরিবর্ত্তনের কারণ উপস্থিত হইল।

ম্যাসাচুসেট ব্যবস্থাপক সভায় স্ত্রীজাতির অধিকার বিষয়ে সাক্ষ্যদানের জন্য লুসী উপস্থিত। সেইদিন মহাত্মা গিওডোর পার্কার বক্তারূপে সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি শ্রোতারূপে সেখানে গিয়াছিলেন। বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর হেনরী ব্লাকওয়েল নামক একজন বণিক লুসীর সঙ্গে আলাপ করিলেন। তিনি অতি উদারচেতা সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। কয়েকদিন পরে, লুসীর সকল উদার মতের সমর্থন করিয়া এবং তাঁহার জীবনব্রত পালনে সহায় হইবেন বলিয়া আশা দিয়া, তিনি বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করেন। কিন্তু লুসী প্রথমে সেই প্রস্তাবে কর্ণপাত করেন নাই। নারীজাতির বন্ধন মোচন ছিল তাঁহার জীবনের পবিত্র ব্রত, সেই ব্রত পালনে বাধা

জন্মাইতে পারে এমন কোন কার্য্যে অগ্রসর হইতে তিনি কিছুতেই প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহার আশঙ্কা হইল, বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইলে হয়ত জীবনব্রত পালনে ব্যাঘাত উপস্থিত হইবে। কিন্তু মিঃ ব্ল্যাকওয়েল বলিলেন, লুসীর আদর্শের মহত্ব ও কার্য্যের সারবত্তা তিনি ভাল করিয়া বুঝিয়াছেন এবং নিজেও বিষয়কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া লুসীর সহিত একই মন্ত্র সাধনে জীবন পাত করিবেন। লুসীকে তিনি বুঝাইলেন, দুই জনে মিলিয়া একজন অপেক্ষা অধিক কাজ করিতে পারিবেন এবং একটী মাথা অপেক্ষা দুইটী মাথার মূল্য অধিক। অবশেষে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে উভয়ে পবিত্র উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। এই বিবাহ অতি সুখের ও সুফলপ্রসূ হইয়াছিল।

বিবাহের পূর্ব্বে প্রায় দশ বৎসর তিনি ক্রমাগত বক্তৃতা করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। এত পরিশ্রম সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। স্ত্রীজাতির মুক্তি সাধনের জন্য তিনি কত উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি "স্ত্রীজাতির অধিকার সঙ্ঘ" নামক সভা আহ্বান করেন। স্ত্রীজাতির অধিকার সম্বন্ধীয় সভাসমিতির মধ্যে এই প্রথম সমিতি। তার পর তিনি প্রতি বৎসর এই সভা আহ্বান করিতেন এবং নিজের ব্যয়ে সভার বিজ্ঞাপন, নিমন্ত্রণ, রিপোর্ট প্রভৃতি ছাপাইয়া বিতরণ করিতেন। এই সঙ্ঘের ফলে ইংরাজ নারীগণও তাঁহাদের অধিকার সম্বন্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেন।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে অনেক পরিশ্রমের ফলে, "আমেরিকান নারী-অধিকার সমিতি" স্থাপিত হয়। পর বৎসর এই সমিতির মুখপত্র স্বরূপে উম্যান্‌স জার্ণাল বা মহিলা-পত্রিকার জন্ম হয়। লুসী স্বয়ং সম্পাদিকা, লেখিকা, এবং গ্রাহক-সংগ্রাহিকা সবই ছিলেন। সুবিখ্যাত লয়ড্ গ্যারিসন এই পত্রের একজন লেখক ছিলেন। এই কাগজে তাঁহার বক্তৃতা প্রভৃতির রিপোর্ট, কিছু কিছু প্রকাশিত হইত। তিনি নিজে তাহার কাজের কথা প্রকাশ করিতেন না। অন্যেরা যাহা জানিতে পারিতেন তাহাই ছাপিতেন। তিনি প্রকাশ্য সভা আহ্বান করিয়া বক্তৃতা করিতেন, গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করিয়া নারীদের অবস্থার বিষয়ে আলোচনা করিতেন, ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের সঙ্গে পরামর্শ করিতেন, শত শত লোককে পত্র লিখিতেন, কাগজে প্রবন্ধ লিখিতেন, স্থানীয় সভা সমিতি স্থাপন ও পরিচালন করিতেন। এত কাজ সত্ত্বেও তিনি সুগৃহিণী ছিলেন, স্বামী ও সন্তানগণের প্রতি কর্ত্তব্য পালনে কখনই ত্রুটি করিতেন না। তাঁহার গৃহ আত্মীয় বন্ধু সকলের আনন্দ-নিলয় ছিল।

এক লক্ষ্যে গভীর নিষ্ঠা এবং অটল অধ্যবসায় ছিল বলিয়া তিনি এত কাজ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ন্যায়ের প্রতি তাঁহার প্রবল প্রেম ছিল। কোন কাজ একবার কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিলে, আর কোন বাধা মানিতেন না।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর তিনি দেহত্যাগ করেন। আমেরিকার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ, তাঁহার শ্রাদ্ধ বাসরে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্পণ করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন, এবং প্রধান প্রধান কাগজেও তাঁহার মহৎ জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল। কয়েকটি উক্তির মর্ম্ম এখানে দেওয়া গেল:—

আচার্য্য চার্লস্ এমেসু—"তিনি ধর্ম্মবুদ্ধির অবতার-স্বরূপ ছিলেন। তিনি ন্যায়কে সোজা সুজি দেখিতেন, অন্য কোন চিন্তা করিতেন না। প্রস্তরমূর্ত্তির মত স্থির এবং মৃদু হাসি ও মিষ্টস্বরের সঙ্গে তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিতেন যে জগতে সত্যের—ন্যায়ের—জয় অবশ্যম্ভাবী। সত্যের বিজয়লাভেই ভগবানের রাজত্ব। • • • তিনি নিন্দা প্রশংসার অতীত ছিলেন। তিনি অন্তরে অন্য একজনের বাণী শুনিতেন, এবং তাহাই গ্রাহ্য করিতেন। ভগবান তাঁহার উপর এই কাজের ভার দিয়াছেন, এই বিশ্বাস প্রবল ছিল বলিয়া তাঁহার কাছে আইন, সমাজ, সংসার, বিরুদ্ধাচরণ, দুঃখ কষ্ট সবই তুচ্ছ ছিল। তিনি মহাযাত্রার সময় অসঙ্কোচে বলিয়া যাইতে পারিতেন, "আমি আমার ব্রত উদ্‌যাপন করেছি, আমার কাজ শেষ হয়েছে, আমি প্রভুর কাছে বিদায় নেকেছি।"

মিষ্টার হিগিনসন্—"তিনি সর্ব্বত্র এক ছিলেন। • • • • তাঁর মধ্যে কখনও কিছু ঢাকবার বা ছাঁটবার

পাওয়া যায় নাই। ... তাঁর সমস্ত জীবন এক রকম, এক লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত। কলেজের ছাত্রীরূপে, স্ত্রীজাতির উদ্ধার কর্ত্রীরূপে, পরিচ্ছদের সংস্কারকর্ত্রীরূপে তিনি সর্ব্বদা তাঁর একই মূর্ত্তি প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর জীবন পরিপূর্ণতা ও শুদ্ধতার একটী মহাসঙ্গীত স্বরূপ ছিল।"

বোষ্টনের একখানি দৈনিক কাগজে লিখিত হইয়াছিল, "তিনি কেবল মেয়েদের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য পরিশ্রম করেন নাই। এই ক্ষমতা লাভও তাঁহার উপলক্ষ্য মাত্র ছিল। স্ত্রীশিক্ষার যারা মুক্তকারী দিগের তিনি অগ্রণী ছিলেন। মেয়েদের জন্য নূতন নূতন শিল্পের পথ খুলিয়া দেওয়া, সমান পরিশ্রমে পুরুষদের সমান মজুরী পাওয়ার ব্যবস্থা করা—এ সকলও তাঁহারই কীর্ত্তি। এদেশের নারীদের স্ত্রীধন বলিয়া কিছু ছিল না, সন্তানদের উপর মাতার কোন অধিকার ছিল না; স্বামীর ধনসম্পত্তিতে স্ত্রীর কোন অধিকার ছিল না, আরও কত প্রকারে রমণীর অবস্থা অতি হীন ছিল।—তিনি আজীবন এই সকল অধর্ম্ম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছেন।"

শ্যামনগরের জমিদার

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কথা।

(১)

বিষ্ণুপদ বাবুর পরলোকগমনের ছয় মাস পরে আমি হঠাৎ কঠিন পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসার্থে কলিকাতায় আসিতে বাধ্য হইলাম। কলিকাতায় থাকিয়া অনবরত সাত আট মাস কাল আয়ুর্ব্বেদোক্ত প্রণালী অনুসারে চিকিৎসিত হইবার পর পুনরায় কার্য্যক্ষম হইলাম। রমানাথের উপদেশ অনুসারেই আয়ুর্ব্বেদ মতে আমার চিকিৎসা হইয়াছিল। এই কয় মাস আমি এক প্রকার উদ্যমশক্তিরহিত হইয়া ছিলাম। আরোগ্যলাভ করিয়া কার্য্যস্থানে ফিরিয়া গিয়া দেখিলাম, বিষ্ণুপদ বাবুর ত্যক্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধান সম্বন্ধে বিস্ময়জনক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে আসিয়াছে। মিঃ স্মিড নামক এক জারমান সাহেব ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন। বহুদিন এদেশে বাস করিয়া তিনি ব্রিটিশ প্রজার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মাসিক বেতন এক হাজার টাকা। রায় বাহাদুর বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় সব্ ম্যানেজার হইয়াছেন এবং তাঁহার বেতন হইয়াছে মাসিক তিন শত টাকা। ম্যানেজারের ব্যবহারের জন্য একখানি বহুমূল্যের মটর গাড়ী ক্রয় করা হইয়াছে। সব্ ম্যানেজারের জন্য ভাল ঘোড়ার গাড়ীর বন্দোবস্ত রহিয়াছে। বিষ্ণুবাবুর দেবোত্তর সম্পত্তির তত্ত্বাবধানও কোর্ট অব ওয়ার্ডস করিতেছেন। ম্যানেজার ও সব্ ম্যানেজার দেবসেবার ব্যয় অনেক কমাইয়া দিয়াছেন। কৃষ্ণপদবাবুর স্ত্রী এই বিষয়ের আপত্তি করিয়া কালেক্টার, কমিশনার এবং অবশেষে বোর্ড অব রেভিনিউর নিকট দরখাস্ত করিয়া বিফল-মনোরথ হইয়াছেন। রামকমল বিদ্যালঙ্কার ও রমানাথ সেনগুপ্তকে বিষ্ণুবাবুর বৈষয়িক ব্যাপারে কোন প্রকারে লিপ্ত হইতে নিষেধ করা হইয়াছে। সাহেব অতিথিদিগের থাকিবার জন্য শ্যামনগরে একটী প্রকাণ্ড "গেষ্ট হাউস্" নির্ম্মিত হইতেছে। তজ্জন্য বোর্ড অব রেভিনিউ পঞ্চাশ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

মিঃ স্মিডের নীলের কুঠি ছিল। নীলের কারবার উঠিয়া যাওয়ায় তিনি বেকার বসিয়াছিলেন। অনেক চেষ্টায় বিষ্ণুবাবুর সম্পত্তির ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি মাতৃভাষা জারমান কতটা জানেন জানা যায় নাই, কিন্তু ইংরাজী জানেন না বলিলেই হয়। ইংরাজী কথাবার্ত্তা এক রকম কহিতে পারেন বটে, কিন্তু বিদ্যার মা সরস্বতীর বরপুত্র। বিষ্ণুবাবুর সম্পত্তির ম্যানেজার হইবার পর মিঃ স্মিডের একটী নূতন নাম হইয়াছে। দুষ্টলোকে তাঁকে "কোকো ম্যাগাজিন্" বলিয়া থাকে। একদিন তিনি বিষ্ণুবাবুর বাড়ীর লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ানকে লিখিয়া পাঠান, "আমার নিকট একখানি কোকো ম্যাগাজিন্ পাঠাইয়া দিবেন।" লাইব্রেরীয়ানের তো চক্ষু স্থির। সে বেচারি পুস্তক ও মাসিক পত্রাদির

তালাস তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া "কোকো ম্যাগাজিন" বাহির করিতে পারিল না। নিরুপায় হইয়া সে অবশেষে রমানাথকে তাহার বিপদের কথা জানাইল এবং জিজ্ঞাসা করিল যে বিলাতে কোকো ম্যাগাজিন কোথায় পাওয়া যায়?" রমানাথ ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? ম্যানেজার সাহেবের জন্য বিলাত হইতে আনাইবেন না কি?"

লাইব্রেরীয়ান। আজ্ঞে হাঁ। তা না হইলে ম্যানেজার আমার উপর চটিয়া আমার বিরুদ্ধে কালেক্টারের নিকট রিপোর্ট করিবেন। তাহা হইলে আমার চাকরিটী যাইবে।

রমানাথ। আপনার চাকরি যাইবে না। "কোকো ম্যাগাজিন" আপনাদের লাইব্রেরীতেই আছে।

লাইব্রেরীয়ান। আজ্ঞে, আপনি আমার সহিত তামাসা করিতেছেন?

রমানাথ। তামাসা নয়। কোকো ম্যাগাজিন, বলিয়া কোন ম্যাগাজিনের অস্তিত্ব আমার জানা নাই। আপনাদের ম্যানেজার মিঃ স্মিড কোন কালে কোন ম্যাগাজিন পড়ার তোয়াক্কা রাখে না। ও যে লাইব্রেরী হইতে পুস্তকাদি লইয়া যায়, তা লোক দেখান মাত্র। একখানিও পড়ে না।

লাইব্রেরীয়ান। তা হইতে পারে, কিন্তু "কোকো ম্যাগাজিন" তাহা হইলে চাহিবেন কেন? আমাদের লাইব্রেরীতে ওরূপ নামের কোন মাসিক পত্র নাই।

রমানাথ। আপনাদের লাইব্রেরীতে ষ্টেডসাহেব সম্পাদিত "রিভিউ অব রিভিউজ" আছে ত?

লাইব্রেরীয়ান। আজ্ঞে আছে।

রমানাথ। এক মাসের আনুন দেখি।

লাইব্রেরীয়ান। কেন?

রমানাথ। আরে মশায় আনুন না!

লাইব্রেরীয়ান আর কি করেন, এক মাসের "রিভিউ অব রিভিউজ" লইয়া আসিলেন। রমানাথ সেই রিভিউ অব রিভিউজের মলাটের উপর বড় অক্ষরে লেখা কোকোর বিজ্ঞাপন লাইব্রেরীয়ানকে দেখাইয়া বলিলেন, "এই দেখুন, একেই বলে কোকো ম্যাগাজিন।"

এই বলিয়া হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন। লাইব্রেরীয়ান সেই হাসিতে যোগ দিয়া বলিলেন, "আজ্ঞে বলেন কি, ম্যানেজার সাহেব কি অতবড়—

রমানাথ। পণ্ডিত। তাতে সন্দেহ নাই।

লাইব্রেরীয়ান। আপনি ঠিক করিলেন কেমন করিয়া?

রমানাথ। ওই রকমের আর দু একটী পণ্ডিত আমি ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি।

তারপর লাইব্রেরীয়ান এক মাসের "রিভিউ অব রিভিউজ" মিঃ স্মিডের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তিনি বিনা আপত্তিতে তাহা গ্রহণ করিলেন এবং কয়েকদিন বাদে তাহা ফেরত পাঠাইলেন। সেই অবধি মিঃ স্মিডের ডাক নাম হইল "কোকো ম্যাগাজিন্।"

(২)

আমি পীড়িত অবস্থায় কলিকাতায় না থাকিলে, এসব ব্যাপার ঘটিত কিনা সন্দেহ। রায়বাহাদুর বিশ্বনাথের চক্রান্তেই যে বিষ্ণুবাবুর সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসে গিয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। আমার সরলপুর হইতে অনুপস্থিতির সুবিধা লইয়া তিনি এই চাল চালিয়াছেন। তাঁহার সব্ ম্যানেজার নিযুক্ত হওয়া সম্বন্ধে কৃষ্ণপদ বাবুর স্ত্রী, রামকমল বিদ্যালঙ্কার ও রমানাথ সেনগুপ্ত আপত্তি করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে বিষ্ণুপদবাবুর সহিত রায় বাহাদুরের বিষয় সম্পত্তি ঘটিত মামলা মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। বিষ্ণুবাবুর সহিত রায়বাহাদুরের সদ্ভাব ছিল না। এমন অবস্থায় রায়বাহাদুর বিষ্ণুপদবাবুর সম্পত্তির সব্ ম্যানেজার হইতে পারেন না। ইহাঁর উত্তরে রায়বাহাদুর গভর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছিলেন যে একবার বিষ্ণুপদ বাবুর সহিত রায়বাহাদুরের একটী বড়গোছের মোকদ্দমা হয়। সেই মোকদ্দমায় বিষ্ণুপদ বাবু প্রিবি কাউন্সিল পর্য্যন্ত জয় লাভ করেন। তৎপর তাঁহার সহিত বিষ্ণুপদবাবুর মনোমালিন্য দূর হইয়া তাঁহাদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। তাহার ফলে বিষ্ণুপদ বাবু রায়বাহাদুরকে মোকদ্দমার খরচ ও ওয়াসীলাতের দায় হইতে মুক্তি দেন। রায়বাহাদুর তাহার পর হইতে বিষ্ণুপদ বাবু

বৃন্দাবনে যাওয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই বিষ্ণুবাবুর বাটীতে যাইতেন এবং প্রতিবারেই তিনচার দিন করিয়া শ্যামনগরে থাকিতেন। রায়বাহাদুরের এই সকল কথার কিয়দংশের সত্যতা আপত্তিকারীদিগকে স্বীকার করিতে হইল। এতদ্ব্যতীত সেই সময়কার সরলপুর বিভাগের কমিশনার ছিলেন রায়বাহাদুরের মুরুব্বি। সেই কমিশনার যখন ইন্‌স্‌পেকটার জেনারল অব পুলিশ ছিলেন সেই সময় তাঁহার অধীনে রায়বাহাদুর ডেপুটী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। সুতরাং বাধা বিপত্তি খণ্ডন করিয়া রায়বাহাদুর সব ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন। সব ম্যানেজার নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে তিনি যেমন নরম ছিলেন সব ম্যানেজারী পাইবার পর হইতে সেই অনুপাতে গরম হইয়াছেন এবং ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেছেন।

ব্যারিষ্টার বিনয়চন্দ্র এই সকল বিষয়ের প্রতিকার করিতে পারিতেন। কিন্তু বিষ্ণুপদ বাবুর দেহত্যাগের তিন চার মাস পরে তিনি একটী করদ রাজ্যের দেওয়ানী পাইয়া সেইখানে চলিয়া গিয়াছেন।

ক্রমে আমি বুঝিতে পারিলাম যে, রায়বাহাদুর তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ভুজঙ্গনাথের সহিত কৃষ্ণপদ বাবুর কন্যার বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতেছেন। কোন উপায়ে এই বিবাহটী দিতে পারিলেই বিষ্ণুপদ বাবুর অগাধ সম্পত্তি রায়বাহাদুরের হস্তগত হইবে। কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ যে সম্পত্তির ভার লইয়াছেন সে সম্পত্তির অধিকারীর বা তাঁহার পুত্র কন্যার বিবাহ কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে সম্পন্ন হওয়া সুকঠিন। কৃষ্ণপদ বাবুর কন্যাটী বিবাহযোগ্যা হইয়াছে। ম্যানেজার স্বিড বন্ধু, রায়বাহাদুর ধন্বী। কালেক্টার সাহেব রায়বাহাদুরের মধ্যে মুগ্ধ। বিভাগীয় কমিশনার রায় বাহাদুরের প্রধান মুরুব্বি—মা বাপ। রায়বাহাদুরের কনিষ্ঠ পুত্র ভুজঙ্গনাথ দুইবার ফেল করিয়া এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া এফ্ এ, পড়িতেছে। বয়ঃক্রম বাইশ। দেখিতে মাঝারি গোছের। স্বভাব চরিত্র মন্দ নয়। এদিকে এইরূপ যোগাড় যন্ত্র। ওদিকে কৃষ্ণপদ বাবুর শাশুড়ী হইতেছেন রায়বাহাদুরের দূরসম্পর্কীয়া মামাত ভগিনী। তিনি রায়বাহাদুরের সহিত কথা বার্ত্তা কহিতেন। কিছুদিন যাবৎ রায়বাহাদুর বড় ঘন ঘন কৃষ্ণপদ বাবুর শাশুড়ীর সহিত দেখা করিতেছেন এবং তাঁহাদের সন্তোষ বিধানের জন্য দেবসেবায় যে ব্যয়সংকোচ হইয়াছিল তাহা দূর করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত স্পষ্ট তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করিতে সাহস করেন নাই।

(৩)

ব্যাপার যখন এইরূপ সেই সময় একদিন কৃষ্ণপদ বাবুর শাশুড়ী আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি শ্যামনগরে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। তিনি আমাকে বলিলেন যে, "নাতনীকে ত আর অতি অবিবাহিত রাখা চলে না। তাহার বয়স চৌদ্দ বৎসরের বেশী হইতে চলিল, সামান্য লোকের ঘরে হইলে কত কথা হইত। বড় লোকের বাড়ী বলিয়া কেহ প্রকাশ্যে কিছু বলিতেছে না। কিন্তু অপাক্ষাতে এজন্য সকলেই আমাদের নিন্দা করিতেছে। ইহার একটা উপায় কর। সেদিন দাদা আমার সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন যে বোর্ড অব রেভিনিউর কর্ত্তাদেরও এ বিষয়ে দৃষ্টি পড়িয়াছে। শীঘ্রই নাতনীর বিবাহের যোগাড় হইবে। পাত্রের জন্য বিশেষ চিন্তা করিতে হইবে না। তাঁর জানামত খুব ভাল পাত্র আছে। আমি দাদার (অর্থাৎ রায়বাহাদুর) নিকট সেই পাত্র কে জানিতে চাহিলাম, কিন্তু তিনি তাহা বলিলেন না। বলিলেন, ইহার পর সে কথা বলিবেন। পূর্ব্বে সব কথা প্রকাশ করিলে কুলোকে শুভকার্য্যে বাধা দিবে। মালবিকা আমার দাদাকে চুচক্ষে দেখিতে পারে না। সে বলে যে, "তোমার দাদার পছন্দ করা পাত্রের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে কিছুতেই দিব না। সে পাত্র কখনও ভাল হইবে না। উনি যখন কোন কথা খুলিয়া বলিতেছেন না তখন নিশ্চয় ওর মনে কোন কুমতলব আছে।" বিদ্যালঙ্কার মহাশয়, তুমি, রমানাথ, হরকুমার প্রভৃতির সহিত এ সম্বন্ধে পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য সে আমাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছে। সেই

জন্ত তোমাকে ডাকাইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়, ভবসুন্দরী ও রমানাথ ইহারা সকলেই লোক খুব ভাল। দেখা বলিলেই হয়। কিন্তু উহাদের কাহারও বিষয়বুদ্ধি নাই। তাই তোমাকে সকল কথা উহাদের সকলের পূর্ব্বেই বলিলাম। এখন তুমি এখানে দুইচারি দিন থাকিয়া উহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া যা ভাল বিবেচনা কর, তাই স্থির কর। একটী ভাল পাত্র অনুসন্ধান কর। আর বেশী দিন নাতনীকে অবিবাহিতা রাখিতে পারিবে না।" (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত।

শিকারী

উপত্যকা-বেষ্টিত কোন স্থানে একজন শিকারী বাস করিত। প্রতিদিনই বন্যপক্ষী শিকারার্থে সে অরণ্যে গমন করিত। একদিন বিশাল হ্রদের তীরস্থিত তৃণদলের উপর জলচর পক্ষীদিগের আগমন প্রতীক্ষা কালে সে মুহূর্ত্তেকের জন্য স্বীয় দেহোপরি কাহার ছায়া ও হ্রদের স্বচ্ছ সলিলের উপর কিসের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইল। যে পদার্থের ছায়া ও প্রতিবিম্ব দৃষ্টি-গোচর হইল তাহাকে দেখিবার জন্য অবিলম্বে আকাশ-মার্গে চক্ষু উত্তোলন করিয়াও কিছু দেখিতে পাইল না. নিমেষের মধ্যেই পদার্থটি যেন শূন্যে মিলাইয়া গেল। কিন্তু এই পদার্থটি অথবা তাহার প্রতিবিম্ব হ্রদের উপর দেখিবার জন্য তাহার প্রবল বাসনা জন্মিল, সে সমস্ত দিনই তাহার প্রতীক্ষায় হ্রদতীরে বসিয়া রহিল। দিন শেষ হইয়া রাত্রি উপস্থিত হইল, তথাপি তাহার বাসনা পূর্ণ হইল না। সে অগত্যা নিরাশ হৃদয়ে ও শূন্যহস্তে গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক দুঃখিত ও মৌনভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। তাহার সহচরেরা আসিয়া তাহার বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া কোন উত্তর পাইল না। একাকী মৌনভাবে চিন্তায় নিমগ্ন আছে, এমন সময়ে তাহার প্রিয় সুহৃৎ তৎসমীপে উপনীত হইয়া মাত্র শিকারী বলিল, "আমার আজ এক অদৃষ্টপূর্ব্ব পদার্থ নয়নগোচর হইয়াছে। অনন্ত নীলাকাশে একটি বৃহৎ শুভ্রবর্ণ, বিস্তারিত-রজত-পক্ষ বিহঙ্গ দেখিতে পাইয়াছি। এইক্ষণে এই পক্ষী দর্শন লালসা আমার হৃদয়কে তীব্র অনল-শিখার ন্যায় দগ্ধ করিতেছে। আমি পক্ষীটিকেই যে দর্শন করিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। প্রথমতঃ একটা অলৌকিক জ্যোতি, একটা ক্ষণস্থায়ী দীপ্তির আবির্ভাব হইল, তৎপরে স্বচ্ছ সলিলে তাহার দেহ-প্রতিবিম্ব লক্ষিত হইল। ইহাতেই আমার মানসিক অবস্থা এমন হইয়াছে যে, এইরূপ বিবেচনা হয় যে, পক্ষীটি লাভ ভিন্ন আপাততঃ জীবনে আমার অন্য প্রার্থিত বস্তু কিছু নাই।

সুহৃদ হাসিয়া বলিলেন, "তুমি সলিলে সূর্য্যকিরণ-রেখার ক্রিয়া অথবা নিজ মস্তকের ছায়া দেখিয়াছ। কল্যই তুমি প্রতিবিম্বের কথা বিস্মৃত হইবে।"

অনন্তর দিনের পর দিন অতীত হইতে লাগিল, শিকারী প্রত্যহই একাকী সমস্ত অরণ্য পরিভ্রমণ করিয়া বনে জঙ্গলে, হ্রদতীরে, হ্রদতীরস্থ তৃণমধ্যে সর্ব্বত্রই তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াও পক্ষীর সন্ধান পাইল না। শিকার কার্য্য সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিল। তাহার ত অন্য পক্ষীতে আর প্রয়োজন নাই।

পূর্ব্ব-সহচরেরা বলিতে লাগিল, "ইহার কি ব্যাধি হইয়াছে?" একজন বলিল, "মস্তিষ্ক বিকৃতি।" আর একজন বলিল, "না, না, মস্তিষ্ক বিকৃতি নহে। বাস্তবিকই শারীরিক ব্যাধি হইলে ত ভালই ছিল, যাহা কেহ কখনও দেখে নাই, কেবল নিজেই তাহা দেখিয়াছে, এই ব্যক্তি সকলকে এইরূপ বিশ্বাস করাইয়া নিজকে অনন্যসাধারণ ও অদ্ভুত ক্ষমতাশালী প্রতিপন্ন করিতে চাহে।"

সকলেই একমত হইয়া তাহার সঙ্গ পরিত্যাগে কৃতসংকল্প হইল।

শিকারীও সম্পূর্ণ বন্ধুবান্ধবহীন হইয়া একাকী ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

একদিন রজনীর অন্ধকারে, নৈরাশ্য-বেদনাক্লিষ্ট হৃদয়ে সে তপ্ত অশ্রু বর্ষণ করিতেছিল, এমন সময়ে একজন সৌম্যাকৃতি ও উন্নতদেহ বৃদ্ধ তাহার নিকট আবির্ভূত হইলেন।

শিকারী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে ?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "আমার নাম বিদ্যা, কিন্তু কেহ কেহ আমাকে জ্ঞান বলিয়াও ডাকে। এই উপত্যকা পরিবেষ্টিত জনপদেই আমার নিবাস। কিন্তু আমি এই স্থানের নিবাসী হইলেও দুঃখপরিশুষ্ক-হৃদয় মানব ব্যতীত কেহই আমার দর্শন পায় না। আমাকে দর্শন করিবার যোগ্য হইবার জন্য চক্ষুর মলিনতা ব্যাকুল অশ্রুপাতে ধৌত করিতে হয়। মানবহৃদয়ের দুঃখের পরিমাণ অনুসারে আমি তাহাদের সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হই।"

শিকারী বলিল, "আপনি এই উপত্যকানিবাসী, তবে ত আপনি আমার সংশয়ের নিরাকরণ করিয়া দিতে পারিবেন। আমি নীলাকাশে একটি সুন্দর শুভ্র রজতপক্ষ বিহঙ্গ দেখিয়াছিলাম, কিন্তু কেহই আমার কথা বিশ্বাস করে না; তাহাদের ধারণা, ইহা স্বপ্ন অথবা কল্পনা, অথবা হ্রদজলে আমার নিজ মস্তকের ছায়া। আপনি আমাকে পক্ষীটির সন্ধান বলিয়া দিন।"

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন, "বিহঙ্গটির নাম সত্য। যে একবার তাহার দর্শন পাইয়াছে সে তাহাকে লাভ না করা পর্য্যন্ত বিশ্রাম করিতে পারে না, আমরণ সে তাহাকে কামনা করে।"

শিকারী বলিল, "তবে শীঘ্র বলুন, আমি কি প্রকারে তাহাকে পাইব।"

"সত্যকে ধরিবার উপযুক্ত দুঃখ ও যন্ত্রণা এখনও তুমি পাও নাই", এইকথা বলিয়াই বৃদ্ধ সেস্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

শিকারী তখন তাহার নিজ বক্ষ হইতে কল্পনার যন্ত্র বাহির করিল এবং তাহাতে আকাঙ্ক্ষার সূত্র জড়াইয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণ পূর্ব্বক একখানি জাল বয়ন করিল। প্রত্যূষে এই সুবর্ণজালে পিতৃভাণ্ডার হইতে প্রাপ্ত "অন্ধবিশ্বাস" নামক শস্যের কতিপয় বীজ স্বীয় বসনাঞ্চল হইতে খুলিয়া লইয়া ইহাতে স্থাপন করত জালখানি ভূমিতে পাতিয়া কি ঘটনা ঘটে দেখিবার জন্য সেই স্থানে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

প্রথমে একটি তুষারশুভ্র কপোতাক্ষ পক্ষী জালে পতিত হইয়া কলকণ্ঠে "মানব দেবতা" "মানব দেবতা" ইত্যাদি সুললিত তানে ঝঙ্কার দিতে লাগিল। তৎপরে একটি কৃষ্ণকায় অলৌকিক জ্ঞানসম্পন্ন পক্ষী আসিয়া জালে পড়িল। ইহার চক্ষু কৃষ্ণবর্ণ ও সুকোমল, দৃষ্টি আত্মার অন্তরতমস্থলস্পর্শী। সে গাহিল "অমরত্ব।"

শিকারী পক্ষীদ্বয়কে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া বলিল, "তোমাদের সুন্দর আকৃতি ও প্রকৃতি দেখিয়া তোমাদিগকে সত্যের নিকট সম্পর্কিত আত্মীয় মনে হইতেছে।"

ইহার পর হরিৎ ও স্বর্ণসংমিশ্রিত বর্ণের কর্কশভাষী একটি পক্ষী হাটে বাজারে বিক্রেতারা যেরূপ উচ্চকণ্ঠে স্বীয় পণ্যদ্রব্যের গুণ ঘোষণা করে সেইরূপ স্বরে "জীবনান্তে বা মৃত্যুর পর পারের পুরস্কার" এই গান গাহিল।

"তুমি পূর্ব্বের পক্ষীদ্বয়ের ন্যায় সুন্দর না হইলেও মন্দ না" বলিয়া শিকারী তাহাকে গ্রহণ করিল।

পক্ষ সম্পূর্ণ নিঃশেষিত না হওয়া পর্য্যন্ত উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত অনেক পক্ষীই জালে পড়িল। শিকারী একটা প্রকাণ্ড লৌহপিঞ্জর নির্ম্মাণ করিয়া পক্ষীগুলিকে একত্র করিয়া তাহাতে বদ্ধ করিল এবং পিঞ্জরটিকে "নূতন ধর্ম্মমত" নামে অভিহিত করিল।

ক্রমে ক্রমে অনেক নরনারী এই পিঞ্জরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তৎসমীপে আগমন পূর্ব্বক নৃত্যগীতাদি করিতে লাগিল। তাহারা বলিত, "শিকারীর কি সুখ, কি সৌভাগ্য! তাহার ধৃত পক্ষীগুলি কি মনোরম! তাহাদের সঙ্গীতই বা কি হৃদয়গ্রাহী!"

পক্ষীগুলির আদিম বাসস্থান কোথায়, কোন্ স্থান হইতে কিপ্রকারে ধৃত, এই সকল বিষয় জানিবার কাহারও ইচ্ছা হইল না। পক্ষীগণের পিঞ্জর সম্মুখে নৃত্যগীতাদি করিয়াই তাহারা সন্তুষ্ট।

শিকারীর আনন্দের পরিসীমা নাই, কেননা তাহার বিশ্বাস, এই পক্ষীগণ মধ্যে সত্যও বিদ্যমান, পালক পরিবর্ত্তনের সময় উপস্থিত হইলেই তাহার প্রকৃত স্বরূপ দেখা যাইবে।

এই ভাবে দিন কাটিতে লাগিল। নরনারী পূর্ব্ববৎ পিঞ্জর সম্মুখে নৃত্যগীতাদি করিতে লাগিল। শিকারীর

হৃদয় কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় প্রফুল্ল নাই, নিরাশার মেঘ ক্রমশঃই তাহাকে আচ্ছন্ন করিতেছিল। সে আবার একাকী নির্জ্জনে অশ্রু বর্ষণ করে, সত্যকে লাভ করিবার ইচ্ছা আবার জাগ্রত হইয়া তাহাকে পীড়ন করিতেছে। একদিন অশোবনে বসিয়া রোদন করিতেছে, এমন সময় সহসা জ্ঞানের পুনরাবির্ভাব হইল। শিকারী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সকল কথাই তাহাকে জ্ঞাপন করিল।

জ্ঞান বিমর্ষভাবে ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক বলিলেন, "তুমি যে জাল সত্যকে ধরিবার জন্য বিস্তার করিয়াছ, অনেকেই তাহা করিয়াছে; কিন্তু সত্য কদাপি এই জালে পতিত হয় না। অন্ধ বিশ্বাস নামক মস্ত তাহার আহার্য্য নহে; বাসনাজালে তাহার পদদ্বয় কখনও আবদ্ধ হয় না; উপত্যকার দূষিত বায়ু সেবন তাহার শ্বাস প্রশ্বাস প্রক্রিয়ার উপযোগী নহে। তুমি যে সকল পক্ষী ধৃত করিয়াছ তাহারা সকলেই মিথ্যা জাতীয়। চিত্তাকর্ষক ও সুন্দর হইলেও তাহারা মিথ্যার বংশ-সম্ভূত, সত্যের সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই।

শিকারী তীব্র বেদনায় অধীরস্বরে বলিয়া উঠিল, "তবে কি আমি বৃথায়ই সত্যানুসন্ধানরূপ অনলে দগ্ধ হইব?"

জ্ঞান বলিলেন, "তুমি সত্যের জন্য অনেক কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছ বলিয়াই আমি নিজ অভিজ্ঞতার কথা তোমাকে বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। সত্যানুসন্ধান-তৎপর মানবাত্মাকে এই কুসংস্কার, ভ্রমাত্মক বিশ্বাস ও উপধর্ম্ম উপত্যকার নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। এই উপত্যকা-সম্ভূত অথবা ইহার সংস্রষ্ট দ্রব্যকণাও অগ্রহণীয়। সম্পূর্ণ একাকী তাহাকে নাস্তিবাদ প্রতিবাদ রাজ্যে যাইয়া বাস করিতে হইবে। সেখানে নিজকে সকল প্রকার প্রলোভননির্ম্মুক্ত রাখিয়া আলোকমালার প্রতীক্ষা করিতে হইবে। তাহার আবির্ভাব মাত্রেই সেখান পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহার অনুগামী হইয়া প্রখর সূর্য্যালোক রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। বাস্তবিকতার পর্ব্বত সমূহ এই স্থানেই অবস্থিত, এই পর্ব্বতশ্রেণী আরোহণ পূর্ব্বক, সেই প্রদেশ অতিক্রম করিলেই সত্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে।

শিকারী উত্তেজিত স্বরে বলিল, "সত্যের সন্ধান প্রাপ্ত মানব তৎপরে তাহাকে নিজ হস্তমুষ্টিগত করিয়া দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকিবে!"

জ্ঞান মস্তক ঈষৎ কম্পিত করিয়া বলিলেন, "মানব তাহাকে দর্শন অথবা স্পর্শ করিতে পারিবে না, কেননা সেই গুপ্ত গুহের আবরণের এখনও বিলম্ব আছে।"

শিকারী বলিল, "তবে কি সত্য লাভের আশা একেবারেই নাই?"

জ্ঞান বলিলেন "নিজ অভিজ্ঞতা হইতে এইমাত্র বলিতে পারি, যে কেহ কেহ এই পর্ব্বতশ্রেণী আরোহণ করিয়াছেন; ঘূর্ণ্যমান পিরিপথ সোপানশ্রেণীর ন্যায় আরোহণ করিয়া কেহ কেহ বা সেই স্থানে সত্যের পক্ষচ্যুত দুই একটি রজত বর্ণের পালক আহরণ করিয়াছেন।"

এই কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধ উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আকাশমার্গে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "হয়ত এমন সুদিন আসিবে যখন বিভিন্ন মানবহস্ত-আহৃত বহুসংখ্যক রজত পালক সংযোগে এক সুদীর্ঘ রজ্জু নির্ম্মিত হইবে। এই রজ্জু যোজনা দ্বারা একখানি জাল প্রস্তুত হইবে। সত্য সেই জাল দ্বারাই ধৃত হইতে পারে। সত্যদ্বারাই সমগ্র সত্যকে ধরা, সত্য ব্যতীত তাহাকে লাভ করিবার অন্য উপায় নাই।"

শিকারী গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বলিল, "আমি সত্যের সন্ধানে চলিলাম।"

জ্ঞান তাহাকে থামাইয়া বলিলেন, "এই কথা স্মরণ রাখিবে যে, এই উপত্যকা-বেষ্টিত জনপদ একবার পরিত্যাগ করিলে আর ফিরিয়া আসিতে পাইবে না, এই জনপদের সীমান্তদেশে বসিয়া সপ্ত দিবা ও সপ্ত নিশি রক্ত অশ্রু বর্ষণ করিলেও একবার যে এই স্থান ছাড়িয়া যায় সে ইহাতে আর পদস্থাপন করিবার স্থান পায় না। যে এই স্থান পরিত্যাগ করে সে নিজেও ইহা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হয়। তোমার গন্তব্যপথে লাভের আশা নাই জানিও। যে এইস্থান পরিত্যাগ করিয়া

সত্যপথের পথিক হয় তাহাকে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায়, সত্যের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতিপ্রণোদিত হইয়াই সত্যের সন্ধানে যাইতে হয়। সত্যলাভের জন্য অবিশ্রান্ত পরিশ্রমই তাহার একমাত্র পুরস্কার।"

শিকারী পুনরায় বলিল, "তবে আমি চলিলাম। পর্ব্বতশ্রেণীসমূহ কোন্‌টি আমার গন্তব্যপথ তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলিয়া দিন।"

জ্ঞান বলিলেন, "আমি যুগযুগের পুঞ্জীকৃত অভিজ্ঞতার পুত্র, সুতরাং বহুল মনুষ্যপদচিহ্নিত পথের কথাই বলিতে পারি। যে স্থানে মনুষ্যপদচিহ্ন বিরল অথবা যে স্থান মনুষ্যপদচিহ্ন বিবর্জ্জিত তাহার কথা কি প্রকারে বলিব! দুই একটি মানব যাহারা এই পথের পথিক হন তাঁহারা নিজের বিবেচনাশক্তির পরিচালনা করিয়া নিজের দায়িত্বেই চলেন। আমার কণ্ঠস্বর সেস্থান পর্য্যন্ত পৌঁছে না। আমি ইহাদের অনুসরণ করিতে পারি বটে, কিন্তু পথ প্রদর্শনার্থে অগ্রে অগ্রে গমন করিবার ক্ষমতা আমার নাই।"

জ্ঞান ইহার পর অন্তর্হিত হইলেন।

প্রস্থানোদ্যত শিকারী আসিয়া পিঞ্জরের অভিমুখীন হইয়া স্বহস্তে লৌহশলাকাগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তীক্ষ্ণ শলাকায় হস্ত ক্ষত বিক্ষত হইল। আমরা কি অনেক সময়েই দেখিতে পাই না, যে গড়িতে সত না হয় ভাঙ্গিয়া ফেলিতে ততোঽধিক কষ্ট হয়? শিকারী এক একটি করিয়া প্রত্যেকটি পক্ষী ছাড়িয়া দিল। একমাত্র অবশিষ্ট কৃষ্ণপক্ষবিশিষ্ট পক্ষীটিকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার মনোহর চুঞ্চের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র সে মৃদু গম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিল "অমঙ্গল"।

শিকারী বলিল, "আমি ইহাকে বিদায় করিতে পারিতেছি না। ইহার শরীর লঘু, আহার্য্যও অকিঞ্চিৎকর, ইহাকে নিজ বক্ষে লুকাইয়া সঙ্গে লইয়া যাইব।" এই বলিয়া তাহাকে বক্ষোপরি রাখিয়া অঙ্গাচ্ছাদন পরিধান করিল।

কিন্তু পথে চলিতে চলিতে এই লুক্কায়িত পক্ষীটির ভার ক্রমশঃই গুরু হইতে গুরুতর বোধ হইতে লাগিল, অবশেষে শিকারী চলৎশক্তিরহিতপ্রায় হইল। তখন ইহাকে লইয়া উপত্যকা পরিত্যাগ অসম্ভব বুঝিয়া বক্ষ হইতে বাহির করিয়া তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিল, "চিত্তবৃত্তকর অতিপ্রিয় পক্ষীটি, তোমারও কি আমাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে!" তৎপরে হস্তমুষ্টি খুলিয়া বিষণ্ণ ভাবে বলিল, "যাও তবে, হয়ত বা সত্য ন্যূনকল্প তব পক্ষীর সঙ্গীত শ্রবণে তোমার প্রাণের সুখও থাকিবে; কিন্তু আমি কি তাহা শুনিতে পাইব!" দুঃখক্লিষ্ট হৃদয়ে খুলিবা মাত্র পক্ষীটি চির বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

তৎপরে শিকারী কল্পনার যন্ত্র হইতে বাসনার পর খুলিয়া লইয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিল। পর ফেলিয়া দিল বটে, কিন্তু যন্ত্র পুনরায় নিজ বক্ষে ধারণ করিল। পর উপত্যকাজাত হইলেও যন্ত্র কোন এক বিশাল প্রদেশ হইতে আনীত হইয়াছিল। শিকারী একবার যাত্রার জন্য পর্ব্বত অভিমুখী হইয়া দাঁড়াইল, কিন্তু অসংখ্য নরনারী তাহার গতিরোধ করিয়া বলিতে লাগিল, "মূর্খ বর্ব্বর, বিকৃতমস্তিষ্ক, উন্মাদ, তোমার স্পর্দ্ধা ত কম নহে, কোন্ সাহসে তুমি এমন সুন্দর পিঞ্জরটি ভাঙ্গিয়া দিয়া পক্ষীগুলিকে উড়াইয়া দিলে?"

শিকারী তাহাদিগকে বুঝাইতে অনেক প্রয়াস পাইল, কিন্তু কেহই তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না। তাহারা বলিল, "সত্য আবার কিরূপ পক্ষী! সত্যের কি অস্তিত্ব আছে? থাকিলেও তাহাকে লইয়া কি প্রয়োজন? সত্য কি আহার অথবা পানীয় সোমার? কে তাহাকে দেখিয়াছে? তোমার নানা বর্ণের সুরূপ পক্ষীগুলির অস্তিত্ব সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই। আমরা সকলেই তাহাদিগকে চক্ষে দেখিতে পাইয়াছি ও তাহাদের সুমধুর গান কর্ণে শুনিয়াছি। মূর্খ, নীতিশত্রু, নাস্তিক, তোমার সহিত একত্রে বাস করাও অন্যায়, কেননা তোমার স্পর্শে বায়ু দূষিত হয়।"

কেহ কেহ বলিল, "আইস প্রস্তরখণ্ড সংগ্রহ করিয়া ইহার গায়ে নিক্ষেপ করি।"

কেহ কেহ "নিরোধকে তাড়িয়া দাও" বলিয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল।

অবশেষে ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত দেহে সে ধীর পদবিক্ষেপে অন্ধকারে আশ্রয় লইল। চলিতে চলিতে

সমস্ত স্থান ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। শিকারী প্রথমতঃ চির রাত্রির সীমান্ত প্রদেশে ও তৎপর মধ্যদেশে উপস্থিত হইল। চিররাত্রির সেদেশে আলোকের লেশমাত্রও নাই, সর্ব্বত্রই অবিচ্ছিন্ন অন্ধকার। সে হস্ত স্পর্শ দ্বারা পথ নির্ণয়ের চেষ্টা করিতে লাগিল। রুক্ষ-শ্যামায় হস্তার্পণ করিবামাত্র তাহা ভগ্ন হইয়া খসিয়া পড়িতে লাগিল। পদতলস্থ ভূমি ভস্মাবৃত, প্রতি পাদ-বিক্ষেপে পদদ্বয় ধূম চূর্ণস্তরের মধ্যে প্রোথিত হইতেছিল ও নাসারন্ধ্রে ও মুখবিবরে ভস্মরাশি প্রবেশ করিতেছিল। সর্ব্বত্রই ঘন অন্ধকার। এই স্থানে এক উপলখণ্ডের উপর আসীন হইয়া করতলে মুখাচ্ছাদন করিয়া শিকারী এই অন্ধকারময় নাস্তিবাদ প্রতিবাদ রাজ্যে আলোকের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। হৃদয়ও তাহার তামসী রজনীর ন্যায় তমসাচ্ছন্ন ছিল।

অতঃপর দক্ষিণ ও বামদিক হইতে পশ্চিম আর ভূমিস্তর কুজ্ঝটিকা আসিয়া তাহাকে পরিবেষ্টন করিল। অন্ধকারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুপলক্ষ বৃষ্টিবিন্দু তাহার সমস্ত মস্তক ও পরিচ্ছদ বস্ত্র সিক্ত করিল, তাহার হৃদয়ের স্পন্দন হ্রাস ও হস্তপদাদি অবসন্নপ্রায় হইয়া আসিল। চক্ষু তুলিবামাত্র দূরে দুইটি ক্রীড়াশীল আলোকরেখা দৃষ্টিগোচর হইল। তাহারা ক্রমেই নিকটতর হইতে লাগিল। অন্ধকার ও তীব্র শৈত্যের মধ্যে উষ্ণতা ও উজ্জ্বলতা বিকীর্ণ করিয়া দেখা দুইটি জ্বলন্ত তারকার ন্যায় মনোহর নৃত্য করিতে করিতে তাহার সম্মুখে আসিয়া থামিয়া গেল। চতুর্দ্দিকব্যাপ্ত অনলশিখাবলের মধ্যে দুইটি রমণীমুখ সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইল। একটি আলোক-শিখার অভ্যন্তরে একখানি রমণীমুখ দেখা গেল, তাহার শুভ্রদ্বয় মৃদু মধুর হাস্যে তরঙ্গায়িত, তাহার উজ্জ্বল কেশদাম বায়ুভরে ক্রীড়া করিতেছে; অপর শিখার অভ্যন্তর আননের উচ্চ হাস্যে মুখরিত, যেন সুধাপাত্রে বুদবুদ স্ফুরিত হইতেছে।" শিকারী তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তোমরা আমার এই অন্ধকার দুর্দ্দিনে আমার নিকট আসিয়াছ?"

প্রথমা বলিল, "আমরা দুইটি যমজ ভগিনী। আমাদের নাম ইচ্ছাশক্তি। আমাদের পিতার নাম মানব-প্রকৃতি, মাতার নাম অমিতাচার। আমরা বহুকাল হইতে পৃথিবীতে আছি। বস্তুতঃ পৃথিবীর প্রাচীনতম পাহাড়, পর্ব্বত, নদ নদী ও প্রথম-সৃষ্ট মানব আমাদের সমসাময়িক। আমরা কিন্তু অজর ও অমর, মৃত্যু আমাদের সম্মুখীন হইতে সাহস করে না।"

দোসরা পুনঃ বলিল, "তুমি কি আপনাকে আমার সুকোমল বাহুর বন্ধনে বদ্ধ করিতে দিবে না? তোমার হৃদয় শীতাতিশয্যে তুষারীভূত হইয়াছে, আমি স্বীয় উত্তাপ দ্বারা তোমার স্পন্দনহীন হৃদয়কে স্পন্দিত করিয়া দিব। আইস, আমার নিকটে আইস।"

কনিষ্ঠা বলিল, "আমার হৃদয়ের তপ্ত জীবনীশক্তি তোমার হৃদয়কে দান করিব। তোমার বুদ্ধিবৃত্তি জড়বৎ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মৃতবৎ অসাড় হইয়াছে, আমার সাহায্যতায় তাহারা বন্ধনমুক্ত হইয়া সবল ও সজীব হইবে। আমাকে কি তুমি তোমার হৃদয়ের ভার দিবে না?"

অতঃপর উভয়েই একবাক্যে বলিতে লাগিল, "আমাদের অনুগামী হইয়া আমাদের সহিত বাস কর। তোমা হইতে বহুযুগে মহত্তর বহু হৃদয় অন্ধকারময় স্থানে প্রতীক্ষাকালে আমাদের শরণাগত হইয়া আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা এমন শরণাগতবৎসল যে শরণার্থীকে কখন পরিত্যাগ করি না; একবার যে আমাদের কাছে আইসে, সে আমাদের চিরসঙ্গী হইয়া থাকে। এই নশ্বর জগতে সকলেই মায়ামোহাচ্ছন্ন, কেবল আমরাই প্রকৃত ধ্রুব সত্য। সত্য ছায়ামাত্র, কুসংস্কার ও ভ্রমাত্মক বিশ্বাস প্রহসন স্বরূপ। পৃথিবী ধূলি ভস্মপূর্ণ, বৃক্ষলতাদি ধ্বংসপর, কিন্তু আমরা—একবার আমাদের স্পর্শ করিয়া দেখ ত—আমরা বাস্তব, জীবন্ত ও জাগ্রত, আমাদের ত চাক্ষুষই দেখিতেছ, সুতরাং আমাদের সম্বন্ধে সংশয় অসম্ভব। আমাদের শরীর স্পর্শ দ্বারা উত্তাপ অনুভব করিয়া দেখ। আইস, আমাদের কাছে আইস, আমাদের সঙ্গে চল।"

তাহারা ধীরে ধীরে নিকটতর হইয়া শিকারীর মস্তকের চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিতে লাগিল, তাহার কপালে ঘর্ম্মের ধারা বহিতে লাগিল। ইহাদের শরীরের দীপ্তি

চক্ষে ও মুখে পতিত চিত্তবিক্ষিপ্ততা উৎপাদন করিতে লাগিল, শিখিনীভূত রমনীর রক্তসঞ্চালন তীব্রগতি সম্পন্ন করিয়া দিল। সে সগত বলিল, "সত্যই ত! কেন আমি এই ভীষণ অন্ধকারাবৃত স্থানে প্রাণ হারাইতে বসিয়াছি! ইহাদের উদ্ধার দ্বারা ইহারা আমার জন্মান্তর রক্ত তরল করিয়া দিতে পারে।" শিকারী তাহাদের অভিমুখে হস্ত ঈষৎ প্রসারণ করিল।

সেই মুহূর্ত্তেই তাহার চক্ষের সম্মুখে চিত্রপ্রার্থিত প্রিয় পদার্থটির প্রতিকৃতি যেন প্রতিভাত হইল, তাহার প্রসারিত হস্তদ্বয় সহসা পার্শ্বদেশে অবনত হইয়া পড়িল।

ভগিনীদ্বয় পুনর্ব্বার বলিল, "তুমি কি আমাদের সহগামী হইবে না?"

শিকারী দুইহস্তে মুখ আচ্ছাদন করিয়া বলিল, "তোমরা আমার দৃষ্টিভ্রান্তি উপস্থিত করিতেছ, আমার শিথিল হৃদয়কে উত্তপ্ত করিতেছ, কিন্তু তোমরা ত আমার চিত্র-প্রার্থিত ধন আমাকে দিতে পার না! আমি তাহার জন্য এইস্থানে অপেক্ষা করিব, তাহারই ধ্যান করিব।" সে তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিল। যখন পুনরায় মুখ তুলিয়া চাহিল তখন দেখিতে পাইল, তাহারা দুইটি স্ফুরিত-রশ্মি তারকার ন্যায় দূর দিগন্তে মিলাইয়া যাইতেছে।

কুসংস্কার ও ভ্রমের উপত্যকা বর্জ্জন করিতে যাহারা কৃতসংকল্প, তাহাদের সকলকেই তমসাচ্ছন্ন প্রদেশের মধ্য দিয়া গমন করিতে হয়। কাহাকেও কিছুদিনমাত্র এখানে কাটাইতে হয়, কাহারও বহুমাস, কাহারও বা বহুবর্ষ অতীত হয়, কেহ কেহ বা এইখানেই মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হয়। অনেকদিন অপেক্ষার পর শিকারী গগনপ্রান্তে একটি আলোকরেখা দর্শন করিল, এবং উহা লক্ষ্য করিয়া চলিতে চলিতে উহার সমীপস্থ হইল এবং অবশেষে পূর্ণ সূর্য্যালোকে আসিয়া উপস্থিত হইল। সম্মুখেই অসীম শক্তিশালী শুভ্র ঘটনা ও বাস্তবিকতার পর্ব্বতশ্রেণী দেখিতে পাইল। নির্ম্মল ও উজ্জ্বল সূর্য্যালোক পর্ব্বতগাত্র বিধৌত করিলেও শৃঙ্গ সমূহ মেঘাবৃত ছিল। তদ্দর্শনে শিকারীর মুখ হইতে স্বতঃই আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল। সর্ব্বাপেক্ষা সরল পথটি মনোনীত করিয়া সে পর্ব্বতারোহণে প্রবৃত্ত হইল। তাহার আনন্দধ্বনিতে পর্ব্বতশ্রেণী প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। এই সময়ে তাহার মনে হইল যে, পথশ্রমের কথা সকলেই তাহাকে অতিরঞ্জিতভাবে বলিয়াছে, সম্মুখস্থ পর্ব্বতশ্রেণী বাস্তবিক ত তেমন উচ্চ অথবা দুরারোহ নহে। অল্পদিনে না হইলেও কোন দিন না কোন দিন শৃঙ্গদেশে উপস্থিত হওয়া যাইবে। তখন সে সত্যের কেবলমাত্র একখানি পালক লইয়াই সন্তুষ্ট হইবে না। আবহমান কাল হইতে যত পালক সত্যের গাত্র হইতে স্খলিত হইয়াছে, সমুদয় আহরণ করিয়া তাহা দ্বারা জাল বয়ন করিয়া সত্যকে ধৃত করিবে। একবার জালে আবদ্ধ হইলে তাহাকে আর কিছুতেই ছাড়িয়া দিবে না। অতি সাবধানে দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া তাহার শরীর-স্পর্শজনিত আনন্দ উপভোগ করিবে।

সুখের কল্পনায়, সূর্য্যকিরণে বসিয়া উৎফুল্ল-হৃদয়ে শিকারী মুক্তকণ্ঠে আনন্দসঙ্গীত গাহিতে লাগিল। সাফল্য ত এখন একপ্রকার নিশ্চিত ও হস্তসম্মুখীন।

এদিকে কিছুদূর যাইয়াই পথ দুরারোহ হইতে আরম্ভ হইল। পর্ব্বতারোহণক্রিয়াতেই এখন সমস্ত শক্তির আবশ্যক, গান গাহিবার শক্তি আর অবশিষ্ট রহিল না। দক্ষিণে ও বামে তৃণপত্রবিহীন প্রকাণ্ড পর্ব্বতশ্রেণী; পর্ব্বতগাত্রে তুষারবহ গহ্বর ও শ্বেত কঙ্কালস্তূপ। পথ প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট, ক্রমে অস্পষ্টতর হইয়া আসিল। তাহার পর আর পথ নাই, কেবল দূরে দূরে দুই একটা পদচিহ্ন; সর্ব্বশেষে সকল চিহ্ন লুপ্ত হইয়া আসিল। শিকারীর সঙ্গীতধ্বনি থামিয়া গিয়াছে; পথ না থাকাতে নূতন পথ করিয়া লইতে হইতেছে। কিয়দ্দূর যাইয়া একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীরবৎ পর্ব্বতের সম্মুখে উপস্থিত হইল; বোধ হইতে লাগিল, এই পর্ব্বত-প্রাচীর যেন দিঙ্মণ্ডলব্যাপী, ইহাকে অতিক্রম করিবার কোন উপায় নাই দেখিয়া শিকারী স্বগত বলিতে লাগিল, "এই পর্ব্বতগাত্রে সোপানাবলী স্থাপনপূর্ব্বক অচিরেই গন্তব্যপথে উপস্থিত হইব!" নিজ যন্ত্র বাহির করিয়া প্রস্তর খোদন কার্য্য আরম্ভ করিল, কিন্তু সোপান নির্ম্মাণ তাহার পক্ষে বড়ই কঠিন

সোপান হইয়া দাঁড়াইল। একখানা প্রস্তরখণ্ড সোপানের জন্য অন্য প্রস্তরখণ্ডে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন করা উচিত হইল, সংলগ্নীকৃত প্রস্তরখণ্ডগুলিও আবার দুইচারি দিনে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। শিকারী সকলকে এই বলিয়া আশ্বাস দিত যে, এই প্রাচীর অতিক্রম করিলেই সহরের আবাসভূমি লাভ ও জীবনের কার্য্যের পরিসমাপ্তি হইবে।

অনেক দিন পর সে প্রাচীরের উচ্চতম প্রদেশে উপস্থিত হইয়া চতুষ্পার্শ্বস্থ দৃশ্য অবলোকন করিতে লাগিল। পাদমূলে মেঘাবৃত কুজ্ঝটিকা ও ভ্রমাত্মক বিশাল নামক উপত্যকারাজি এবং মস্তকের উপর পর্ব্বতের অভ্রভেদী শৃঙ্গ দেখিতে পাইল। দূর হইতে পর্ব্বতশৃঙ্গগুলিকে এত উন্নত বোধ হয় নাই। চিরস্থায়ী তুষারকিরণ এই শৃঙ্গগুলির সহিত ক্রীড়া করিতেছিল। শিকারী ইহাদের অত্যধিক উচ্চতা দর্শনে উচ্চকণ্ঠে রোদন করিয়া উঠিল, কিয়ৎকাল ভূমিতলে শয়ন করিয়া নিরাশ বিবর্ণ মুখে উঠিয়া দাঁড়াইল, ও নিরবচ্ছিন্ন নীরবতার মধ্যে পুনরায় চলিতে লাগিল। মুখে শব্দ নাই, উন্নত প্রদেশের অনভ্যস্ত লঘু বায়ু উপত্যকাবাসীদের শ্বাস প্রক্রিয়ার উপযোগী নহে, প্রত্যেক শ্বাস ও প্রশ্বাস যন্ত্রণাপ্রদ হইতে লাগিল, অঙ্গুলীপ্রান্ত দিয়া রক্তধারা প্রবাহিত হইল।

সম্মুখেই আর একটি পর্ব্বত-প্রাচীর দেখিয়া, সে স্থানেও আবার সোপান নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইল। ইহার উচ্চতা অনন্ত মনে হইলেও নিঃশেষে কার্য্য করিতে লাগিল। লৌহকঠিন পর্ব্বতগাত্রে দিবারাত্রি তাহার খোদন যন্ত্রের শব্দ ধ্বনিত হইতে লাগিল। বৎসরের পর বৎসর এই একই কার্য্যে নিরত থাকিয়াও দেখে, অভ্রভেদী প্রাচীরের যেন আর শেষ নাই! সঙ্গের জীবনশূন্য প্রস্তরমধ্যে একটু উদ্ভিদজীবনও যদি না রাখিত! তাহার সঙ্গীরূপে অবস্থান করিবার জন্য সে একটু শৈবালজীবন সঞ্চারের জন্যও প্রার্থনা করিত, কিন্তু প্রার্থনা অপূর্ণ ই রহিল।

এদিকে বৎসরের পর বৎসর অতীত হইল, সোপানশ্রেণী দ্বারা শিকারী এখন বৎসর গণনা করে। এক বৎসরে অতি অল্পসংখ্যক সোপানই শেষ হইত। তাহার কণ্ঠে এখন আর কথা নাই, মুখে "ইহা করিব, উহা করিব" বাক্য নাই। রাত্রের প্রারম্ভে গোধূলির সময়ে পর্ব্বতপ্রাচীরস্থ গহ্বর ও কোটর হইতে কতক নূতন ও ভয়াবহ মুখ বাহির হইয়া তাহাকে বলিত, "হে বন্ধুবান্ধবহীন মানব, বিফল শ্রম হইতে বিরত হইয়া আমাদের সহিত কথাবার্ত্তা বল।"

শিকারী বলিত, "অবিশ্রান্ত পরিশ্রমেই আমার পরিত্রাণ। আমি মুহূর্ত্তেকের জন্যও কার্য্যবিরত হইলে তোমরা আমাকে আক্রমণ করিবে।"

তাহারা এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাদের দীর্ঘ গ্রীবা ভূমিমুখে প্রসারিত করিয়া বলিত, "তোমার পদতলসন্নিহিত প্রস্তরের দিকে দৃষ্টিপাত কর। কি দেখিতেছ, কঙ্কালরাশি? এই কঙ্কালস্তূপ কাহার জান? তোমারই ন্যায় অসীম সাহসী ও দৃঢ়বল এক ব্যক্তি পর্ব্বতারোহণ করিয়া এই স্থানে আসিয়াছিল, সে এই স্থানে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল যে তাহার চেষ্টা করা বৃথা, সত্যকে সে লাভ করিতে সমর্থ হইবে না, তাহার দর্শনসুখ অনুভব করিবে না, এমন কি তাহার সন্ধানও পাইবে না। সে তখন নিরাশহৃদয়ে ও পরিশ্রান্তদেহে এই স্থানে শয়ন করিয়া চিরনিদ্রার ক্রোড়ে অনন্ত বিশ্রাম লাভ করিল। নিদ্রা বড়ই শান্তিপ্রদ, সেইজন্য সে স্বেচ্ছায়ই নিদ্রাকে আলিঙ্গন করিয়াছিল। নিদ্রাকালে কেহ নিঃসঙ্গতা অনুভব করে না, প্রমক্লিষ্ট হস্ত বেদনা, ও নিরাশ হৃদয় যন্ত্রণা অনুভব করে না।"

শিকারী ইহাদের এই কথায় অট্টহাস্য করিয়া বলিত, "মৃত্যুশোষণকারীগণ, মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া তোমাদের আহার্য্য হইবার জন্যই কি আমি জনস্থ হইতে বহুতীব্র প্রিয়তম পদার্থ উৎপাটন করিয়াছি? চিরতমসাবৃত নৈশদেশে একাকী বিচরণ করিয়াছি? সকল প্রলোভন হইতে আত্মাকে নির্ম্মুক্ত রাখিয়াছি? সর্ব্বদা কচিৎ মনুষ্যকণ্ঠ ধ্বনিত হয় এমন স্থানে বাস করিয়াছি, এবং একান্তমনে একাকী সকল প্রকার অসাধ্য সাধন করিয়াছি?"

তাহার তীব্র ও ভীতিজনক হাস্যধ্বনি শুনিয়া নিরাশার প্রতিধ্বনিগুলি পলায়নতৎপর হইত। সাহসপূর্ণ ও

দৃঢ়বল হৃদয়ের স্নেহপূর্ণ হাস্য ইহাদের পক্ষে অমোঘ মৃত্যুবাণ।

কিয়ৎক্ষণ পরে যুক্তির নূতন অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া আবার তাহারা শিকারীর সম্মুখীন হইয়া বলিত, "তুমি বোধ হয় জান না যে তোমার ভ্রমরকৃষ্ণ কেশ-কলাপ তুষারশুভ্র হইয়াছে, সুদৃঢ় হস্ত শিশুর হস্তের ন্যায় কম্পনশীল হইয়াছে! ধনন যন্ত্রের অগ্রভাগ ভগ্ন ও মধ্যভাগ শতধা বিদীর্ণ হইয়াছে? তোমার সম্মুখস্থ সোপানটি তুমি উঠিতে পারিবে কিনা সন্দেহ, সক্ষম হইলেও ইহাই তোমার শেষ সোপান।"

"আমি তাহা জানি" বলিয়া শিকারী আরব্ধ কার্য্যে পুনঃ প্রবৃত্ত হইল।

বার্দ্ধক্যদশা প্রাপ্ত শীর্ণ হস্তদ্বয় প্রস্তর সুচারুরূপে কাটিতে এখন একেবারেই অক্ষম, কেননা অঙ্গুলিগুলি অবশ ও বক্রভাবাপন্ন হইয়াছে। শারীরিক সৌন্দর্য্য এবং শক্তির অবসান হইয়াছে।

পর্ব্বতের উপর হইতে একখানি বার্দ্ধক্যভারাক্রান্ত শুষ্ক ও শীর্ণ মুখ আবহমানকালস্থায়ী পর্ব্বতপ্রাচীর ও উর্দ্ধস্থিত মেঘের সম্মিলন সতৃষ্ণনেত্রে দর্শন করিতে লাগিল। এখন শিকারীর আর শক্তি নাই, তাহার জীবনের কার্য্য শেষ হইয়াছে। বৃদ্ধ শিকারী, শ্রান্ত হস্ত-দ্বয় একত্র করিয়া, গিরিশৃঙ্গ-পৃষ্ঠে, যেস্থানে অবিশ্রান্ত কঠিন পরিশ্রমে তাহার জীবনপাত হইয়াছে সেইস্থানে শয়ন করিল, এতদিন পর তাহার নিদ্রার অবসর মিলিল।

নিম্নে উপত্যকারাজি ঘন কুজ্ঝটিকাতে আচ্ছন্ন; আসন্নমৃত্যু চক্ষুদ্বয় একবার বাল্যকালের চির পরিচিত বৃক্ষ ও প্রান্তরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। সুদূর হইতে নীর জালধৃত পক্ষীদের কলরব ও নরনারীর সমস্বর গীতধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। পূর্ব্বসহচরদিগের স্বরও কর্ণে প্রবেশ করিল। শৈলবক্ষোপরি সূর্য্যকিরণ প্রতি-ভাত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছিল। শিকারীর নেত্রদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইল, সে অস্ফুটস্বরে বলিল, "স্বদেশে যাহাদের মৃত্যু হয় তাহারা স্বজন-পরিবৃত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করে, আমার ন্যায় একাকী প্রাণত্যাগ করে না।"

তৎপরে ঘন কুজ্ঝটিকা দৃশ্যপট অদৃশ্য করিয়া দিল. শিকারীও চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া বলিতে লাগিল:—"আমি সত্যের বহু অনুসন্ধান করিলাম, বহুদিনব্যাপী পরিশ্রমের ফলেও তাহাকে পাইলাম না। আমি এক দিবসের জন্যও বিশ্রাম করি নাই, তথাপি ক্ষুণ্ণ হই নাই, কিন্তু এত করিয়াও তাহার দর্শন লাভ হইল না। আমি এক্ষণে যেস্থানে শ্রান্তদেহে পড়িয়া আছি তরুণ-বয়স্ক উদ্যমপূর্ণ ব্যক্তিরা এইস্থানে উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে দাঁড়াইবে, আমার হস্তনির্ম্মিত সোপানের সাহায্যে তাহারা পর্ব্বতারোহণ করিবে। সোপান-নির্ম্মাতার নাম তাহারা জানিবে না, তাহার কদর্য্য কার্য্য দেখিয়া পরিহাস করিবে, সোপানের প্রস্তর খসিয়া পড়িলে তাহাকে অভিসম্পাত করিবে; কিন্তু তাহা হইলেও আমারই শ্রমের ফলে, আমার সোপান সাহায্যেই তাহারা পরম্পর আরোহণে সক্ষম হইবে। আরোহণান্তে সত্যের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎকার হইবে। এই পৃথিবীতে কেহই নিজের জন্য জীবন যাপন করে না, কাহারও জীবনের কার্য্য মৃত্যুতে পর্য্যবসিত হয় না।" শীর্ণ নেত্রপল্লব বহিয়া অশ্রুধারা দরদর ধারে পড়িতে লাগিল। এখন সত্য, শিকারীর মস্তকের উপরিস্থিত মেঘের মধ্যে আবির্ভূত হইলেও তাহার আর দেখিবার সাধ্য ছিল না, কেননা, তাহার নেত্রদ্বয় মৃত্যু-কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হইয়াছে।

শিকারী পুনরায় বলিল, "অনন্তধামগামী আমার আত্মা ভবিষ্যতে আমার পদানুগামী মানবগণের আনন্দ-ধ্বনিক পদধ্বনি শ্রবণ করিতেছে। তাহারা পর্ব্বতা-রোহণ পূর্ব্বক নিশ্চয়ই সত্যের সন্ধান পাইবে।" এই বলিয়া শীর্ণ হস্তদ্বয় চক্ষুর উপর স্থাপন করিল।

ধীরে—অতি ধীরে—শুভ্র গগন হইতে নিস্তব্ধ বায়ু-রাশি ভেদ করিয়া কি যেন নীচে নামিতে লাগিল। ধীর কম্পনে কি যেন মুমূর্ষু ব্যক্তির বক্ষোপরি পতিত হইল। মুমূর্ষু হস্তে সত্যের দেহস্খলিত পালকখানি স্পর্শ করিয়া তাহা হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক শিকারী ইহলোক পরিত্যাগ করিল।

---

* কুমারী মার্সিনী মেন এম, বি, কর্ত্তৃক ইংরেজী হইতে অনুবাদিত।

চেতনার প্রেরণা

আনন্দের বার্ত্তা লয়ে যাইবারে অমৃতের গান
জাগ মোর হে মৃত পরাণ!
বহুকাল সুপ্ত ঘুম ঘোরে,
বহুকাল লিপ্ত আঁখি লোরে!
সব ফেলে সব ছেড়ে আজ
নিশি-শেষে সবিতৃ সমান
জাগ জাগ বসুন্ধরা মাঝ!

২

কি মহান্ কর্ম্ম-পথে অগ্রসর নিখিল জগত
সাধিবারে জীবনের ব্রত!
পিছে যারা এসেছিল পরে,
আগে তারা যায় গর্ব্বভরে!
শুধু কবি অতীতের ধ্যান
পড়ি' রবে তুমি স্থাণু মত?
জাগ জাগ হে মোর পরাণ!

৩

কোথা তব উচ্চ লক্ষ্য? কোথা তব অনাহত-গতি?
বিশ্ব-জয়ে আত্মার আরতি!
আজি শুধু ধূধূ চারিধার,
বক্ষভরা তীব্র হাহাকার!
আশাহত শূন্য-ছবি ম্লান
ধূলিরূপে তোমার বসতি!
জাগ জাগ হে সুপ্ত পরাণ!

৪

ওই দীপ্ত ধ্রুব-জ্যোতিঃ বুঝি তোমা করিছে আহ্বান
মৃত প্রাণ! থেকো না শ্মশান!
বেয়ে আসে স্নিগ্ধ সমীরণ
তোমা আজি দিতে আলিঙ্গন!
কলকণ্ঠ বিহঙ্গসমাজ
গায় তব উদ্বোধন গান!
প্রাণ মোর! জাগ তুমি আজ!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

পশু-প্রকৃতি

ব্যাঘ্র।।

ব্যাঘ্র সিংহের ন্যায় শক্তি-সম্পন্ন। অপরিসীম শক্তি-সাহায্যে ব্যাঘ্র অনায়াসে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহিষ বা বলদ পৃষ্ঠে বহন করিয়া লইয়া যায়। একবার এদেশীয় কোন এক কৃষকের একটি হৃষ্টপুষ্ট মহিষ কাদায় আটকাইয়া যায়। কৃষক কিছুতেই উহাকে কর্দ্দমমুক্ত করিতে না পারিয়া সাহায্যলাভার্থ প্রতিবেশীদিগকে আহ্বান করিতে প্রস্থান করে। ইত্যবসরে একটি ব্যাঘ্র আসিয়া সেস্থানে উপস্থিত হইল, বাঘ কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মহিষটাকে হত্যা করিল এবং অনায়াসে পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া পরিতৃপ্তির সহিত উহার রক্ত পান করিল। তৎপরে প্রকাণ্ড মহিষটাকে পৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থানপর হইলে কৃষক প্রতিবেশীদের সঙ্গে তথায় উপস্থিত হইল।

বাঘ, সিংহের ন্যায় শক্তিবিশিষ্ট হইলেও সাহসে অনেক হীন। সিংহ কখনও বিপক্ষ সম্মুখে পলায়ন-পর হয় না। কিন্তু ব্যাঘ্র শত্রুর নিকট হইতে প্রথমতঃ পলায়নেরই চেষ্টা করে। অপেক্ষাকৃত হীনবল পশু আক্রমণ করিতেই ব্যাঘ্র বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে এবং তাহার অজ্ঞাতসারে পশ্চাৎদিক হইতে কাপুরুষের ন্যায় আক্রমণ প্রণালীই অধিক পছন্দ করে।

ক্ষিপ্রতা ও ধূর্ত্ততাতে ব্যাঘ্র সকল পশুকে পরাজয় করিয়াছে। এই মুহূর্ত্তে ব্যাঘ্র যে স্থানে বিচরণ করিতেছে, পর মুহূর্ত্তে সে স্থান হইতে ক্রোশাধিক দূরে যাইয়া উপস্থিত হইতে পারে। রাত্রিকালে ব্যাঘ্র পশু শিকারের জন্য যে উপায় অবলম্বন করে তাহাতে ধূর্ত্ততার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। যেখানে অনেক শিকার-যোগ্য পশু বিচরণ করে, ব্যাঘ্র সেখানে যাইয়া অতি ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে থাকে। গর্জ্জনশব্দে ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়মান পশু সকল আপন আপন বিবর ও গুহা মধ্যে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। সর্ব্বত্র অব্যাহতগতি দুর্দ্দান্ত ব্যাঘ্র মহাশয়ের বনপ্রদেশের

সকল স্থানই পূর্ব্বপরিচিত, পরন্তু সকলের ঘর বাড়ী কিছু-মাত্র উহার অগোচর থাকে না। সুতরাং নিঃশব্দে যাইয়া বিনা ক্লেশে গুহাগত পশু সকলের প্রাণ সংহার করে।

ব্যাঘ্র সিংহের ন্যায় আপন স্ত্রীর প্রতি তত কর্ত্তব্য-পরায়ণ নয়, কাজে কাজেই বাঘিনীকে নিজে নিজেই আপন আহার সংগ্রহ করিতে হয়। অনেকে মনে করেন, বাঘিনী শাবকগুলিকে তত স্নেহ করে না, কিন্তু তাহা ঠিক বলিয়া বোধ হয় না।

ক্যাপটেন উইলিয়ামসনের কয়েকজন ভৃত্য এক জঙ্গলের মধ্যে দুইটি বাঘের ছানা পাইয়াছিল। ভৃত্য-গণ শাবক দুইটিকে অশ্বশালায় আবদ্ধ করিয়া রাখে। উহারা কিন্তু কিছুতেই শান্ত ও সুস্থির না হইয়া সমস্ত রাত্রি অনবরত চীৎকার করিতে থাকে। তৃতীয় কি চতুর্থ প্রহরে শাবকদুটীর কাতরধ্বনি দূরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। প্রথমে ক্ষীণ, পরে ক্রমেই গভীর ও ভীষণতর গর্জ্জনে সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। ক্রমে এই গর্জ্জন অশ্বশালার দ্বারে আসিয়া থামিল। অশ্ব-শালা-রক্ষকেরা দেখিল, এক ভীষণাকার বাঘিনী ক্রোধে অন্ধ হইয়া দ্বারে আঘাত করিতেছে। তাহারা প্রাণভয়ে ভীত হইয়া জানালা দিয়া শাবকদুটীকে নিক্ষেপ করিল, বাঘিনীও তখন শান্ত হইয়া শাবকসহ প্রস্থান করিল।

কয়েক বৎসর গত হইল কতিপয় ইংরাজ কর্ম্মচারী মূলকাপুরের নিকট তাঁবু ফেলিয়াছিল। তাহারা শিকারের জন্য বাহির হইয়া চমৎকার একটী ব্যাঘ্রী শিকার করিল। তাঁবুতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময়ে তাহারা বনের নিভৃত স্থানে একটী বাঘের গর্ত্ত দেখিতে পাইল। গর্ত্তের চারিদিক মনুষ্য ও পশুর অস্থিরাশি দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল ও স্থানে স্থানে পোষাকের ছিন্নাংশ-সকল পতিত ছিল। দলস্থ একজন লোক গর্ত্তের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিল, প্রায় এক পক্ষ বয়স্ক একটী ব্যাঘ্র-শাবক লুক্কায়িত হইয়া তাহাদিগকে দেখিতেছে! শিকারীরা নিহত বাঘিনীর শাবক মনে করিয়া সন্তুষ্ট-চিত্তে শাবকটীকে লইয়া তাঁবুতে প্রত্যাগমন করিল।

শাবকটীকে পাইয়া সকলেরই মহা আনন্দ হইল। কুকুরের গলাবন্ধ ও শিকল দিয়া উহাকে তাঁবুর মধ্যস্থিত স্তম্ভের সঙ্গে আবদ্ধ করা হইল। শাবকটি তখন লাফাইয়া লাফাইয়া সকলের প্রচুর আনন্দ বিধান করিতে লাগিল, এবং স্তম্ভের চতুর্দ্দিকে বসিয়া প্রায় বিশজন লোক হাস্য-পরিহাস করিতে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপ আমোদ চলিতেছে, হঠাৎ তাঁবুর বাহিরে অতি গভীর গর্জ্জনশব্দ ও বিকট ধ্বনি উপস্থিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে সকলের প্রাণে মহা আতঙ্কের সঞ্চার হইল। কেহই আপন স্থান হইতে নড়িল না, কেবল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল। শাবকটীও তখন দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিল; কাতরস্বরে চীৎকার করিতে ও শিকল ধরিয়া টানিতে লাগিল। সকলেরই মনে হইল, নিহত বাঘিনী পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া প্রতিহিংসার জন্য উপস্থিত হইয়াছে; সকলেই নীরবে ও স্পন্দিত হৃদয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

মুহূর্ত্ত মধ্যে এক প্রকাণ্ড বাঘিনী লম্ফ প্রদান করিয়া তাঁবুর মধ্যে পড়িল এবং কাহারও প্রতি দৃক্-পাত না করিয়া শাবকটিকে মুখমধ্যে গ্রহণ করিয়া সজোরে এক টান দিয়া শিকলটীকে ছিঁড়িয়া ফেলিল এবং তৎক্ষণাৎ তাঁবুর দ্বার দিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল। তাঁবুর সকলের মৃতদেহে প্রাণ ফিরিয়া আসিল।

অতি অল্প পশুই ব্যাঘ্রের আগমনে বা গন্ধে ভীত হয় না। এই সকল নিঃশঙ্ক পশুর মধ্যে বন্য মহিষ অন্যতম। বুনো ব্যাঘ্র ভিন্ন অন্য কোন শ্রেণীর বাঘকেই একটী পূর্ণবয়স্ক বড় মহিষ আদৌ ভয় করে না, বরং সময় সময় উহাদিগকে আক্রমণ করিতেও নিরস্ত হয় না। দলবদ্ধ মহিষকে কোন শ্রেণীর বাঘই কখনও আক্রমণ করে না; যদি অসমসাহসী হইয়া কেহ কখনও করে তবে অচিরাৎ জীবনদানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য হয়। মহিষদল কখনও আপন দলস্থিত কোন একটীকে বাঘের মুখে ফেলিয়া পলায়ন করে না, পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিয়া থাকে এবং সকলে একত্র হইয়া সম্মুখ-শত্রুকে বিমুখ করে। ক্ষুৎপীড়িত হইয়া যদি বাঘ দলস্থ একটী মহিষকে আক্রমণ করে তবে অন্যান্য সকলে তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ নীচু করিয়া বাঘের

শরীরের প্রবেশ করাইয়া দেয় এবং বাঘ গুরুবিদ্ধ হইয়া শীঘ্রই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। গরুর মধ্যে কিন্তু এরূপ একপ্রাণতা নাই, ব্যাঘ্র নিভৃতে প্রাপ্ত একটী বলদকে আক্রমণ করে; তখন অন্য সকলে লেজ উঁচু করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে।

ব্যাঘ্র সাধারণতঃ জলাশয়ের সন্নিকটে বা বন-মধ্যস্থ পথপার্শ্বে ঘন ঝোপের মধ্যে বাস করে। শিকার সংগ্রহের জন্য তাই উহাকে আর বড় অধিক কষ্ট ভোগ করিতে হয় না।* জলপানার্থ জলাশয়ে আগত, স্থানান্তরে গমনাশায় বনমার্গাবলম্বী পশু মাত্রই উহার উদর পূর্ত্তির নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। সময় সময় ক্ষুধাতিশয্যে অসম-সাহসী হইয়া বাঘ গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করে; তখন সুবিধামত যাহা কিছু পায়, তাহা লইয়াই প্রস্থান করে। গৃহপালিত পশু-সকল নিহত হওয়ায় এই সময় কৃষকদের বিষম আতঙ্ক উপস্থিত হয়। গ্রামের মধ্যে আসিয়া আর কিছু না মিলিলে বাঘ মনুষ্য পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়া থাকে। যে সকল দেশে অনুচ্চ খুঁড়ে ঘরে বা কুটীরে মানুষ বাস করে, বাঘ এক অভিনব উপায়ে তথায় মানুষের প্রাণ সংহার করিয়া থাকে। বাঘ প্রথমতঃ এক লাফ দিয়া খুঁড়ে ঘরের চালার উপর উঠিয়া পরে তৃণাচ্ছাদন সরাইয়া চালার মধ্যস্থল ফাঁক করিয়া এক ভীষণ গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মেজেতে লাফাইয়া পড়ে এবং নিদ্রিত পরিবারটী আপনা-দের অবস্থা বুঝিবার পূর্ব্বেই ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত হয়।

কিন্তু সময় সময় আবার বাঘকেও বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। একবার একটী গৃহস্থ, বাঘে চালা ফাঁক করি-তেছে টের পাইয়া, ধীরে ধীরে বাহিরে প্রস্থান করিল। পরে বাহির হইতে ঘরের দ্বার বেশ করিয়া বন্ধ করিয়া দিল। বাঘ ঘরের মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়া খাবার জন্য কিছুই পাইল না, পরন্তু নিজেই উত্তমরূপে আবদ্ধ হইল। অত্যল্পকাল মধ্যেই আগন্তুক পরিবারটী প্রতি-বেশীদের সাহায্যে উহাকে বিনাশ করিয়া উহার দুষ্টতার প্রতিফল প্রদান করিল।

নানা প্রণালীতে লোকে ব্যাঘ্র শিকার করিয়া থাকে। দুই একটী ক্রমে বর্ণিত হইবে।

কোন গ্রামে বাঘের ভারী উপদ্রব হওয়ায় তথাকার একজন সাহসী পুরুষ উহার ধ্বংস সাধনে বদ্ধপরিকর হইল। বাঘ যেখানে অর্দ্ধভক্ষিত পশুমাংস পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহার নিকটে একটী আড়ালে বাঁশের এক মঞ্চ প্রস্তুত করা হইল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে লোকটী বন্দুকসহ মঞ্চে আরোহণ করিয়া বাঘের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। রাত্রিতে বাঘ আসিয়া নিশ্চিন্তমনে মাংস খাইতে প্রবৃত্ত হইল। লোকটী বিশেষ মনোনিবেশ করিয়া গুলি নিক্ষেপ করিলেও তাহা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল। বাঘ এক তুমুল গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের শব্দানুযায়ী লম্ফ প্রদান করিয়া মঞ্চের উপরে পতিত হইল। কম্প-মান মঞ্চে লোকটি পতনোন্মুখ অবস্থায় রহিয়া গেল এবং প্রাণপণে সাহায্যের জন্য চীৎকার করিতে লাগিল। বাঘ কিন্তু বংশ-দণ্ড নির্ম্মিত মঞ্চে নখর বিদ্ধ করিতে না পারিয়া স্থির থাকিতে পারিল না, নীচে পড়িয়া গেল। পুনরায় দ্বিগুণিত ক্রোধের সহিত মঞ্চে লাফাইয়া পড়িল, ক্রমে গ্রামের লোকে আসিয়া এইরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থা হইতে শিকারাভিলাষীর প্রাণ রক্ষা করিল।

কখন কখন অর্দ্ধভক্ষিত শিকার-মাংসের মধ্যে বিষ মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। বাঘ আসিয়া নিঃসন্দেহ চিত্তে মাংস খাইতে আরম্ভ করে কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই বিষের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে। তখন তাহার রক্ত গরম হইয়া উঠে, মুখ শুষ্ক হইয়া পড়ে। বাঘ তৃষ্ণার্ত্ত পীড়িত হইয়া নিকটবর্ত্তী জলাশয়ে যাইয়া জল পান করে এবং অত্যল্পকাল মধ্যেই বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

একবার নর্ম্মদা নদীর তীরে ক্ষুদ্র পশু শিকার করিবার মানসে লেঙ্‌লী সাহেব লুক্কায়িতভাবে ছিলেন। এমন সময় দেখিতে পাইলেন, একটি বাঘ বিষ ভক্ষণে উন্মত্ত হইয়া জলপানার্থ তথায় উপস্থিত হইল। আসিয়াই জলে লাফাইয়া পড়িল এবং জল আলোড়িত করিতে লাগিল, যেন বিষভক্ষণ-জনিত শরীরাগ্নি সে এইরূপে নির্ব্বাপিত করিবে। তাহার পরেই বাঘ যাইয়া ভূমিতে পড়াইতে ও ঝোপ জঙ্গল ধরিয়া কামড়াইতে লাগিল। তাহার পর দ্বিতীয়বার জলে

লাফাইয়া পড়িল। কাপ্তান লেণ্ড্‌লি গুলি করিয়া উহার যন্ত্রণার অবসান করিতে যাইতেছেন এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, এক কুমীর ভয়ানক মুখ ব্যাদান করিয়া বাঘটাকে কামড়াইয়া ধরিল। বাঘ তখন বিশের যন্ত্রণা ভুলিয়া ভয়ানক ক্রুদ্ধভাবে আততায়ীর শরীরে দন্ত ও নখর বিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু দুর্ভেদ্য কুমীরের চর্ম্ম ভেদ করিতে পারিল না। অপর পক্ষে কুমীর বাঘকে জলমগ্ন করিতে যত্ন করিতে লাগিল। তখন দুই যোদ্ধা একবারে জলে ডুবিতে লাগিল, পুনরায় জলের উপর ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। জলে ডোবার এবং বিষ ও কুমীরের আক্রমণে বাঘ ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। কুমীর উহাকে লইয়া প্রস্থানপর হইলে লেণ্ড্‌লী কুমীরকে লক্ষ্য করিয়া গুলি নিক্ষেপ করিলেন। কুমীর মরিয়া ভাসিয়া উঠিল। দ্বিতীয় গুলি বাঘের মৃতপ্রায় জীবনী শক্তি একবারে নির্ব্বাপিত করিয়া দিল।

অযোধ্যার লোকেরা এক অভিনব উপায়ে বাঘ শিকার করিয়া থাকে। আটাল একপ্রকার পদার্থ দ্বারা তাহারা প্রথমতঃ বড় বড় বৃক্ষপত্র সকল সংলিপ্ত করে। এই পাতা একবার কোন কিছুতে সংযুক্ত হইলে এরূপভাবে তাহাকে আটকাইয়া ধরে যে সহজে তাহা বিচ্যুত করা যায় না। এই পাতাগুলি বাঘ যেখানে সর্ব্বদা বিচরণ করে, তথায় বিছাইয়া রাখা হয়। বাঘ নিঃসন্দেহ-চিত্তে তথায় আসিলেই একটী পাতা উহার নাকেতে আটকাইয়া যায় এবং বাঘ সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ অনুভবপ্রবণ বলিয়া বাঘ পাতাটিকে বিচ্যুত করিবার জন্য পা ছুড়িতে থাকে। উহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া বাঘ মস্তকের একপার্শ্বে ঘর্ষিত করিতে প্রবৃত্ত হয়; তাহাতে পাতা-মিশ্রিত আটা চক্ষু ও লোমে সংলিপ্ত হইয়া পড়ে। এইরূপে ক্রমে বাঘের মেজাজ গরম হইয়া উঠে এবং প্রত্যেক পাতা ও লাঙ্গুল ক্রমে আটাযুক্ত পাতায় জড়াইয়া যায়। তখন ক্রোধান্ধ হইয়া বাঘ পাতাগুলি কামড়াইতে আরম্ভ করে এবং পত্র-বিরত ভূমির মধ্যে গড়াগড়ি দেয়। ক্রমে সমস্ত শরীর, মুখ, চোখ ইত্যাদি পাতায় আবৃত হইয়া কিছুই দেখিতে পায় না। এই অবস্থায় লোকজন আসিয়া সহজেই উহার প্রাণসংহার করে।

একজন প্রসিদ্ধ শিকারী হাজারীবাগ অঞ্চলে শিকার অনুসন্ধানে বহির্গত হন। একদিন একজন লোক তাঁহার তাঁবুতে আসিয়া সংবাদ প্রদান করিল যে, "দুই ক্রোশ দূরে ভটসিমারাম নামক গ্রামে এক প্রকাণ্ড বাঘ অনেক মানুষ বধ করিয়াছে। কালই একজন স্ত্রীলোকের প্রাণসংহার করিয়াছে। গ্রামের লোকেরা অনেকবার বাঘের সন্ধানে বাহির হইয়াও কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। যখন সকলে অনুসন্ধানে ক্ষান্ত হইয়া বাড়ীতে বিশ্রাম করিতে থাকে, তখন বাঘ চোরের মতন আসিয়া একজনকে লইয়া প্রস্থান করে।"

শিকারী এইরূপ বৃত্তান্ত শুনিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সেই দিনই গ্রামে চলিয়া গেলেন, সেখানে বাঘ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা শুনিতে পাইলেন। গ্রামের লোকেরা বাঘকে 'বড় বাঘ' আখ্যা প্রদান করিল; বড় বাঘের নিকট পশু-মাংস অপেক্ষা নর-মাংস বিশেষ প্রিয়, সে গৃহপালিত পশু-সকল ফেলিয়া পশু-পালকদের লইয়া প্রস্থান করে; গ্রামের বড় রাস্তার পার্শ্বে ঘনাবৃত জঙ্গলে গুপ্তভাবে অবস্থান করে, আর পথগামী পথিকদের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়ে। গত ছয় মাসে প্রায় চল্লিশজন লোকের প্রাণ বধ করিয়াছে; উহাদের মধ্যে ১৬ জন ডাক-রানার। ডাক-রানারেরা বংশ-যষ্টির এক প্রান্তে রুন্ রুন্ শব্দকারী একপ্রকার পিত্তল-অঙ্গুরীয় ব্যবহার করে; ধূর্ত্ত বাঘ ঐ শব্দ শুনিয়াই বুঝিতে পারে, শিকার উপস্থিত। বাঘ এইরূপে অনেক ডাক-রানারের প্রাণ বধ করিয়াছে বলিয়া তাহাদের মধ্যে আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। কোন লোকই এই রাস্তায় ডাক বহন করিতে স্বীকৃত হইতেছে না। আর ধূর্ত্ত বাঘ কখনও একস্থানে দুই রাত্রি থাকিত না, কাজেই উহার অনুসন্ধান করাও একপ্রকার পণ্ডশ্রম হইয়া দাঁড়াইত।

শিকারী এইসকল কথা মনোযোগ দিয়া শুনিয়া আপনার সঙ্গী ও অনুচরদিগকে একত্র করিলেন এবং সকলে মিলিয়া বড় বাঘের সন্ধানে বহির্গত

হইলেন। অনেক কষ্টে বহু বন জঙ্গল ভাঙ্গিয়া তাহারা এক ঘন কোপের নিকটবর্ত্তী হইলেন। কোপের মধ্য হইতে ঘড় ঘড় শব্দ ও অস্থিচর্ব্বণের শব্দ হইতেছিল। সকলে সতর্ক হইয়া চলিল। শিকারী কোপের নিকটে আসিয়া হামাগুড়ি দিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং শীঘ্রই নরহন্তা বাঘের আবাসস্থলে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু বড় বাঘ বাড়ী ছিল না, দুইটী শৃগাল উহাদের প্রভুর ভুক্তাবশিষ্ট অস্থি চর্ব্বণ করিতেছিল ও পূর্ব্বকৃত শব্দ করিতেছিল। সেখানে অনেক মনুষ্যকঙ্কাল নিপতিত ছিল; চুল, পোষাক এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্ম্মিত অলঙ্কারাদি বিক্ষিপ্ত ছিল। গ্রামের লোকেরা পূর্ব্বদিনের নিহত স্ত্রীলোকটীর ভুক্তাবশিষ্টাংশ চিনিতে পারিল ও তাহার বড় দুইটী কঙ্কণ পাওয়া গেল।

সেদিন আর কিছু করা সম্ভব হইল না,—বাঘ লোক জন থাকিতে আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না। কাজেই সকলে বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিল। কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া বড় বাঘকে বিনাশ করিতে হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করার জন্য এক সভা করা হইল। নানা জনে নানা প্রণালী অবলম্বন করিতে বলিল, কিন্তু কোনটীই শিকারীর মনঃপুত হইল না। পরিশেষে তিনি নিজেই এক উপায় স্থির করিলেন এবং একাকীই তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে মানস করিলেন। উপায় যদিও বেশ বুদ্ধির পরিচায়ক কিন্তু বড়ই বিপদসঙ্কুল।

পরবর্ত্তী ঘটনা শিকারী নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন :—

"সূর্য্য প্রায় অস্তমিত হইতেছিল. আমি শিকারের উপযোগী অস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত হইলাম। ডাক-রানারদের একটী বংশযষ্টি গ্রহণ করিয়া সন্ধ্যার পরই ডাক-রাস্তা দিয়া ঝন্ ঝন্ করিতে করিতে স্থির ও অবিচলিতভাবে অগ্রসর হইলাম। আজ বড় বাঘের নাশ সাধন করিব নতুবা নিজেই প্রাণ দিব বলিয়াই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলাম। কিন্তু যখন যেখানে ডাক-রানার নিহত হইয়াছে সেই স্থলে উপস্থিত হইলাম তখন শরীর একটু রোমাঞ্চিত হইল ও সর্ব্ব শরীর দিয়া ঘর্ম্ম বাহির হইতে লাগিল। আমি সতর্কতার সহিত সামান্য শব্দ মাত্রও লক্ষ্য করিয়া চলিলাম।

"পনর তৃণাচ্ছাদিত নিম্নভূমির পার্শ্ব দিয়া উপরে উঠিতেছিলাম, তখন শুষ্ক পত্রের সামান্য মর্ম্মর শব্দ শুনিতে পাইলাম। তৎক্ষণাৎ সেই দিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, পরক্ষণেই লম্বা ঘাস সকল দলিত করিয়া কোন একটা জন্তু আমার দিকে আসিতেছে বুঝিতে পারিলাম। ইহার একটু পরেই দেখিলাম, আমার প্রায় ৮।১০ হাত দূরে কতকগুলি অমুচ্চ ঝোপ ও লম্বা ঘাসের মধ্যে বড় বাঘ একবার এদিক আবার সেদিক যাইতেছে ও এক প্রকার আনন্দসূচক শব্দ করিতেছে। এইটী একটী ভীষণ মুহূর্ত্ত, কিন্তু আমি প্রস্তুত হইয়াছিলাম।

"ভালরূপ দৃষ্টিলাভের অভিপ্রায়ে আমি কতিপয় পদ সরিয়া দাঁড়াইলাম। ইহাতেই সে যাত্রা আমার প্রাণ রক্ষা হইল। কারণ বাঘ তৎক্ষণাৎই লাফাইয়া আমি পূর্ব্বে যে স্থানে দাঁড়াইয়াছিলাম তথায় পড়িল,—আমার বর্ত্তমান স্থান হইতে ছয় ফিট মাত্র দূরে। আমি আবার লাফ মারার সুযোগ না দিয়াই তাড়াতাড়ি গুলি করিলাম। যখন ধূম্র পরিষ্কার হইল তখন বড় বাঘ ধূলিতে গড়াইতেছে দেখিতে পাইলাম। দ্বিতীয়-গুলি ক্ষিপ্রহস্তে নিক্ষিপ্ত হইয়া নরহন্তার জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত করিল।" (বিজ্ঞান)

গৌরীর উক্তি

১

রাজি রাজেশ্বর শঙ্কর আমার
পথের ভিখারী নয়,
না শোভুক শিরে যদিও মুকুট
কণ্ঠে হার রত্নময়।
নয়নরঞ্জন না থাক্ বসন
নৃপতি মতন কায়,
তবু তাঁর মত না পাই সন্ধান
খুঁজিয়াও বসুধায়।

২

ক্ষমা যে ভূষণ দয়া যে আসন,
জ্ঞান সিংহাসন তাঁর,
প্রেম প্রীতি ডোরে বাঁধিয়াছে কিবা,
কে রবে ছাড়িয়া আর?
হেরি ও [illegible] নত হয় শির
শ্রদ্ধা প্রেম অনুরাগে.
হলেও নগণ্য বড় যে আমার
এ তাপী শরণ মাগে।

১৩২৩। ১৮ই বৈশাখ। শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত *

মোসলেম নারীর শিক্ষানৈপুণ্য

পূর্ব্বকালে মোসলমানগণ যে শিক্ষা-সোপানের চরম সীমায় আরোহণ করিয়া পৃথিবীর সভ্যজাতি সমূহের নিকট অতি উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন তাহার বিবিধ নিদর্শন রহিয়াছে। পুরুষগণের কথা ছাড়িয়া কেবল স্ত্রীলোকগণের জীবনকাহিনী আলোচনা করিলেও প্রমাণিত হয় যে, অনেক মুসলমান স্ত্রীলোক শিক্ষা-ক্ষেত্রে অসাধারণ বুৎপত্তি অর্জ্জন করিয়া চিরস্মরণীয়া হইয়া গিয়াছেন।

আজ আমরা এক জন মোসলমান মহিলার অদ্ভুত-পূর্ব্ব শিক্ষানৈপুণ্যের জলন্ত দৃষ্টান্ত, 'ভারত-মহিলার' পাঠক পাঠিকাগণকে উপহার দিতে ইচ্ছা করিয়াছি। এই মহিলা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মহাত্মা আবদুল্লা বেন্ মোবারকের সহিত কথোপকথন কালে যেরূপ প্রতিভা ও শিক্ষানৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন বর্ত্তমানে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল।

উক্ত মহাত্মা বলিয়াছেন, একদা তিনি পবিত্র ধাম মক্কাশরিফে হজ্জ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া স্বীয় উষ্ট্রারোহণে পুণ্যভূমি মদিনাশরিফের উদ্দেশে গমন করিতেছিলেন। পথিপার্শ্বে এক বৃদ্ধা মহিলাকে একাকিনী উপবিষ্টা দেখিয়া আবদুল্লা বেন্ মোবারক তাঁহাকে 'সালাম' করিলেন। বৃদ্ধা তদুত্তরে কোরাণের "সুরা ইয়াসিন" অধ্যায়ের "দয়াময় প্রতিপালকের পক্ষ হইতে সালাম কথিত হইতেছে" এই বাক্য পাঠ করিলেন। আবদুল্লা বৃদ্ধার মুখে কোরাণ শুনিয়া আনন্দিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এখানে একাকিনী বসিয়া আছেন কেন?"

বৃদ্ধা কোরাণের "সুরা মোমেন্" অধ্যায়ের—"খোদা তালা যাহার পথ ভুলাইয়া দেন, তাহাকে কেহ পথ প্রদর্শন করিতে পারে না"—বাক্য উচ্চারণ করিলেন। আবদুল্লা বুঝিতে পারিলেন যে, বৃদ্ধা পথ হারাইয়াছেন। সুতরাং তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কোথায় যাইবেন?"

বৃদ্ধা "সুরা বনিইস্রাইলে" অধ্যায়ের—"সেই খোদা-তালা অতিশয় পবিত্র, যিনি একই রাত্রে আপন দাসকে মক্কা হইতে জেরুজালেম পর্য্যন্ত ভ্রমণ করাইয়াছেন" —বাক্য উচ্চারণ করিয়া উত্তর দিলেন। ইহাদ্বারা মহাত্মা আবদুল্লা বুঝিতে পারিলেন যে, বৃদ্ধা হজ্জ ক্রিয়া সমাধা করিয়া জেরুজালেম যাইবেন। তৎপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এখানে কয়দিন যাবৎ রহিয়াছেন?"

বৃদ্ধা "সুরা মরিয়ম" অধ্যায়ের—"তিন রজনী পূর্ণ হইয়াছে"—বাক্যাংশ পাঠ করিলেন। তৎপর আবদুল্লা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার খানাহারের সুবিধা কি?"

বৃদ্ধা উত্তরার্থে "সুরা শোআরা" অধ্যায়ের—"সেই খোদা (ই) আমাকে খানাহার করান"—শ্লোক আবৃত্তি করিলেন। তৎপর আবদুল্লা বলিলেন, "আমার সঙ্গে খাবার আছে, খাইবেন কি?"

বৃদ্ধা উত্তরে "সুরা বকর" অধ্যায়ের—"রজনী পর্য্যন্ত রোজা সমাধা কর"—বাক্য পাঠ করিলেন। আবদুল্লা ইহাতে বুঝিলেন যে, বৃদ্ধা রোজাদার। কিন্তু প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "ইহাতো রমজানের মাস নয়!"

বৃদ্ধা উত্তরে "সুরা বকর" অধ্যায়ের "যে কেহ নফল (১) রোজা রাখে তাহা, তাহারই মঙ্গলার্থে" এবং

(১) অতিরিক্ত পুণ্য কাজ।

* আমার একমাত্র কনিষ্ঠা ভগ্নী "শিশির" ও "মাধবী" রচয়িত্রী হেমন্তবালা বিগত ১১ জ্যৈষ্ঠ লোকান্তরিতা হইয়াছে। তাহার অন্তিম রোগশয্যায় লিখিত ও প্রকাশিত "বৈশাখী" কবিতা হইতে এ কবিতাটী সঙ্কলিত হইল।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

"যদি রোজা রাখ তাহা তোমারই মঙ্গলার্থে" যদি তাহা জান এই বাক্যদ্বয় উচ্চারণ করিলেন।

মহাত্মা আবদুল্লা বৃদ্ধার অসাধারণ প্রতিভা দর্শনে বিমোহিত হইলেন, এবং পবিত্র কোরাণ শরিফে তাঁহার অসাধারণ অধিকার দেখিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন। তিনি বিনীত ভাবে বলিলেন, "আপনি কোরাণের আয়েৎ (বাক্য) ছাড়িয়া সাধারণ ভাবে কথোপকথন করিলেই যথেষ্ট হইতে পারে।"

বৃদ্ধা "সুরা মোজাম্মেল" অধ্যায়ের—"কোরাণে যাহা সহজ, তাহাই পাঠ কর"—আবৃত্তি করিয়া উত্তর দিলেন। আবদুল্লা বুঝিলেন যে, কোরাণ ছাড়া উক্ত মহিলার কথা বলিবার অভ্যাস নাই। যখন প্রয়োজন হয় তখন তিনি কোরাণের ঐ মর্ম্মের যে কোন বাক্য উচ্চারণ করিয়া আপনার বাক্য শেষ করেন। তিনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোন্ বংশীয়া?"

বৃদ্ধা—"সুরা বনিইস্রাইল" অধ্যায়ের—"অজ্ঞানতা পূর্ণ বাক্যের সম্ভাষণ করিও না"··· বাক্য উচ্চারণ করিলেন। আবদুল্লা বুঝিলেন যে, বৃদ্ধা পরিচয় প্রদানে অনিচ্ছুক, সুতরাং তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

বৃদ্ধা "সুরা ইউসোফ" অধ্যায়ের—"আল্লাতালা "আপনাকে ক্ষমা করুন"—বাক্য পাঠ করিলেন।

অতঃপর আবদুল্লা বৃদ্ধাকে বলিলেন, "আপনাকে" আমি উষ্ট্রে আরোহণ করাইয়া অবিলম্বে আপনার সহযাত্রীর নিকট পৌঁছাইয়া দিতে ইচ্ছুক, আপনি সম্মত আছেন কি?"

বৃদ্ধা উত্তরে "সুরা বকর" অধ্যায়ের—"সদ্ভাবে যাহা করিবে খোদা তাহা জানেন" বাক্য উচ্চারণ করিলেন। আবদুল্লা বৃদ্ধার সম্মতি বুঝিয়া আপনার উষ্ট্র সজ্জিত করিয়া তাঁহাকে আরোহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। বৃদ্ধা তখন "সুরা নূর" অধ্যায়ে—"তুমি (হে মোহম্মদঃ) বিশ্বাসীদিগকে বল যে, তাহারা আপনার দৃষ্টি নত করুক"—বাক্য উচ্চারণ করিলেন। আবদুল্লা বৃদ্ধার উদ্দেশ্য বুঝিয়া অন্য দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধা সসঙ্কোচ অথচ সত্বরে উষ্ট্রে আরোহণ পূর্ব্বক খোদাতালাকে ধন্যবাদ করিলেন। আবদুল্লা দ্রুতগতিতে উষ্ট্র চালাইয়া বহুশ্রমে পরদিবস যাত্রীদের সহিত মিলিত হইয়া বৃদ্ধাকে বলিলেন, "ঐ যাত্রীদলে আপনার কেহ আছে কি?"

বৃদ্ধা উত্তরে "সুরা কাহাফ" অধ্যায়ের—সম্পদ এবং সন্তানগণ পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য্য বিশেষ"—বাক্য উচ্চারণ করিলেন। আবদুল্লা বেশ বুঝিলেন যে, যাত্রীদলে বৃদ্ধার সন্তানগণ আছে। সুতরাং তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার ছেলেরা কি কাজ করেন"

বৃদ্ধা তদুত্তরে "সুরা নহল" অধ্যায়ের—"নক্ষত্র সাহায্যে উহারা পথ প্রদর্শিত হয়" পাঠ করিলেন। আবদুল্লা বুঝিলেন যে, বৃদ্ধার পুত্রগণ এই যাত্রীদলের পথপ্রদর্শকের কাজ করে। কাজেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহাদের নাম কি?"

বৃদ্ধা উত্তরচ্ছলে যথাক্রমে "সুরা নেসা" অধ্যায়ের দুইটী এবং "সুরা মরিয়ম" অধ্যায়ের একটী বাক্য উচ্চারণ করিলেন। উক্ত বাক্যত্রয়ের মর্ম্মে, আবদুল্লা বুঝিতে পারিলেন যে, ইব্রাহিম, নুহা এবং য়াহয়া নামে বৃদ্ধার তিন পুত্র আছে। সুতরাং তিনি ঐ ঐ নাম ধরিয়া চীৎকার করিলেন। তাঁহার আহ্বানে তিনটী যুবক তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া আহূত হইবার কারণ জিজ্ঞাসু হইলেন। আবদুল্লা সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। যুবকগণ তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া আপনাদের বৃদ্ধা জননীকে সসম্মানে শিবিরে লইয়া গেল।

বৃদ্ধা ছেলেদের উদ্দেশ্যে "সুরা কাহাফের"—তোমাদের কাহাকেও বাজারে পাঠাইয়া দাও এবং তাহাকে পক্কে উচিৎ যে, সে যেন খাদ্যাদি মধ্যে যাহা ভাল তাহাই লইয়া আসে।" বাক্য উচ্চারণ করিলেন।

জননীর আদেশ প্রতিপালিত হইল। বাজার হইতে উৎকৃষ্ট খাদ্যাদি আনিয়া উপকারী অভ্যাগতের সম্মুখে স্থাপন করিল। বৃদ্ধা উপকারীর উদ্দেশ্যে "আপনি আমার সহিত গত কালে যেমন ভদ্র ব্যবহার করিয়াছেন তাহার পরিবর্ত্তে আজ পরিতৃপ্তির সহিত পানাহার করুন" বাক্য আবৃত্তি করিলেন। আবদুল্লা পানাহার করিলেন এবং ছেলেদের নিকট হইতে জানিতে পারিলেন যে,

পারিলেন যে, তাহাদের মাতা ইহার ৪০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে কেবলই কোরাণের সাহায্যে কলোপকথন করিয়া থাকেন। ধন্য মোসলমান মহিলার প্রতিভা, ধন্য তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ ও শিক্ষা-নিপুণতা! মোসলেম জগতে এরূপ অমূল্য নিধির বর্ত্তমানে অভাব হইলেও তাহাদের প্রাচীন কাহিনীতে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। *

আসদুল্লা মজালেব।

ধনুষ্টঙ্কার বীজাণুর কথা

আমরা ধনুষ্টঙ্কার বীজাণু। আমাদের আকার দেখিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরল রেখার ন্যায়; তবে উভয় প্রান্ত গোল। এজন্য রঙ্গপ্রিয় মানুষেরা জয়ঢাক বাজাইবার যষ্টির সহিত আমাদের অবয়বের তুলনা করিয়া থাকে। নিকোলিয়ার নামক জনৈক ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগকে নয়নগোচর করে। আমরা অনেককাল হইতেই এই ভারতে বাস করিতেছি। সুতরাং এখন আমাদের নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করা তোমাদের পক্ষে দুরূহ নহে। তবে চরক ঋষির আমলেও এদেশে আমাদের আধিপত্য যে বিলক্ষণ ছিল, একথা সত্য।

"পীড়য়ন্ হৃদয়ং নৃণাং শিরঃশঙ্খৌচ পীড়য়ন্।
ধনুর্ব্বল্লম্বয়েদ্যোগাদ্যাক্ষিপেন্মোহয়েত্তদা॥"

চরকের এই সকল কথায় তোমরা বেশ বুঝিতে পার যে, সে যুগেতেও আমাদের সংহারিণী শক্তি কত প্রবল ছিল। এখন আমরা বুড়া হইয়াছি, মনে করিও না। আজও আমাদের শক্তি ঠিক পূর্ব্বের ন্যায়ই অক্ষুণ্ণ আছে।

আমরা অণুদেহী বটে; তবে কোন গতিকে একবার মনুষ্যদেহে প্রবিষ্ট হইতে পারিলেই তোমাদের দেহ-যষ্টি খানিকে ধনুর্ব্বল্লীরূপে আকুঞ্চিত করিয়া ধনুর্ব্বৎ বক্রাকৃতি করিয়া ফেলি। আমরা মানব-দেহকে কখন সম্মুখ দিকে কখন পশ্চাৎদিকে এবং কখন বা পার্শ্বদিকে বাঁকাইতে পারি। আবার কখন কখন নর-দেহটী যষ্টিবৎ করিয়াও রাখি। আমাদের "চালচলন" অনেকটা বড় মানুষের মত। আমরা অধিকাংশ সময় বড় বড় শহরে বাস করি। সহরের ধূলিমণ্ডিত রাজপথগুলিই আমাদের বিহার-স্থান। তবে প্রসূতি ও নবজাত শিশুকে আমরা দেখিতে চিরদিনই ভালবাসি। এজন্য সময় সময় পল্লীগ্রামে গিয়া সূতিকাগারস্থ—ওরফে ঘর্ম্মাগারস্থ—শিশু ও তাহার মাতার সংবাদ লইয়া আসি। তোমরা যেমন "পাড়াগেঁয়ে" নাম ঘুচাইবার জন্য পল্লীটিকে পরিত্যাগ করিয়া সহরে অর্দ্ধাশনে থাকিয়াও সুখানুভব কর, আমাদের অবস্থাও সেইরূপ। পাছে "পাড়াগেঁয়ে" রোগ বলিয়া লোকে ঘৃণা করে, এই ভয়ে আমরা প্রায়ই পল্লীগ্রামে থাকি না। সহরের রাজপথে মনুষ্য ও মনুষ্যেতর প্রাণীরা অনবরত আমাদের পদাঘাত করিয়া চলিয়া যাইতেছে, তাহাতে আমরা কিছুমাত্র দুঃখিত হই না। অধিক কথা কি বলিব, তথায় মেথরের সম্মার্জ্জনীর আঘাতে আমাদের বংশধরগণের মধ্যে অনেকেই নিত্য ভবলীলা সাঙ্গ করিতেছে, তাহাতেও আমরা ভ্রূক্ষেপ করি না; সহর বাসেই আমাদের সুখ। দ্বিতীয় কথা, সহরে বাস না করিলে আমাদের ব্যবসায়ও ভাল চলে না। এই দেখ না কেন, এক কলিকাতা সহর হইতে আমরা প্রতি সপ্তাহে গড়ে ২০ জনেরও অধিক লোক শমন সদনে রপ্তানি করিয়া থাকি। পল্লীগ্রামে এরূপ আসামী সংগ্রহ করা কি সম্ভব হইতে পারে? বিশেষতঃ তাহাকার সকল লোকই নিয়ত ম্যালেরিয়ার সেবা করিয়া থাকে। ঐ সকল আসামী ধরিয়া কি শেষে একটা গৃহবিচ্ছেদ ঘটাইব?

আহত, বিকৃত ও অস্ত্রবিদ্ধ লোকের প্রতি আমাদের কৃপাদৃষ্টি অধিক। এ কারণ আমরা মধ্যে মধ্যে রণস্থল পরিদর্শন করিতে বাহির হই। গত আমেরিকার যুদ্ধে আমরা ৩৬০ জন আহতসৈন্যের দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে আমরা কি করিতেছি তাহার কিছু পরিচয় যথাসময়ে পাইবে। আমরা কি ভাবে মানব-দেহে অনুপ্রবিষ্ট হই তাহা বোধ হয় তোমরা জান না। শরীরের কোন স্থান কাটিয়া গেলে উহার মধ্য

* "সমাজ প্রদর্শন" অবলম্বনে লিখিত।

দিয়া দেহাভ্যন্তরে চলিয়া যাই। এমন কি, কোন স্থানের ত্বক্ অল্প উঠিয়া গেলেও আমরা তন্মধ্য দিয়া অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারি। পুঁথে তোমরা মনে করিতে, আমরা দেহপ্রবিষ্ট না হইলেও কোন কোন রোগ প্রকাশ পায়; কিন্তু সে ধারণা ভ্রমাত্মক, শরীরের যে কোন দ্বার দিয়া আমরা দেহমধ্যে না গেলে কখনই মানুষের টঙ্কার হয় না। অনেক সময় আমরা এত সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া দেহাভ্যন্তরে উপস্থিত হই, যে তোমরা তাহা কিছু বিসর্গও জানিতে পার না। একটি রোগীর কথা বলিতেছি, শুন। ঐ রোগীর শরীরে ক্ষতাদি কিছুই ছিল না। কিন্তু তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইবার অব্যবহিত কাল পূর্ব্বে তাহার চিকিৎসক দেখিল, যে রোগীর বৃদ্ধাঙ্গুলের অগ্রভাগে একটি রক্তবর্ণের চিহ্ন রহিয়াছে। আমরা তখনই মনে মনে হাসিতে লাগিলাম। কারণ ঐ চিহ্নিত স্থান দিয়াই আমরা রোগীর দেহে প্রবেশ করিয়াছিলাম। ঐ স্থানে কয়েক দিন পূর্ব্বে একটি কণ্টক বিদ্ধ হইয়াছিল। রোগী ঐ কথা তাহার চিকিৎসককে বলা আবশ্যক বলিয়াই মনে করে নাই। সম্প্রতি তোমাদের ডাক্তারেরা কার্ব্বলিক্ অয়েল ও তদ্বৎ আরও কতগুলি জীবাণুনাশক ঔষধ আবিষ্কার করিয়া আমাদের ব্যবসায়ের বিলক্ষণ ক্ষতি করিয়াছে। ঐ সকল পদার্থ দ্বারা ক্ষতস্থান আবৃত করিয়া রাখিলে—আমাদের প্রবেশদ্বার অর্গলবদ্ধ করিলে—আমরা আর কিছুই করিতে পারি না। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, অধিকাংশ লোকই সে সম্বন্ধে উদাসীন। শরীরের কোন স্থানে ক্ষত হইলে তাহারা হয়ত ঐ ক্ষত স্থানটি অপরিষ্কৃত বস্ত্রে বেষ্টিত করিয়া বসে, ক্ষত অনাবৃত রাখিয়াই ইতস্ততঃ গমনাগমন করে। কেহ কেহ এমন বুদ্ধিমান্, যে কোন স্থান একটু কাটিয়া গেলে রক্ত-রুদ্ধ করিবার জন্য তাহার মাটি লইয়া ঐ স্থানে সংযুক্ত করে। আমরা বিনা চেষ্টায় সেই মাটির সঙ্গেই দেহাভ্যন্তরে চলিয়া যাইতে পারি। ঐ সকল ব্যক্তির কর্ণে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেও তাহারা ইহার কুফল বুঝিতে চাহে না। অধিক গণ্ডগোল করিলে তাহাদের শিরঃ মস্তিষ্ক অমনি উত্তপ্ত হইয়া উঠে। তাহারা তৎক্ষণাৎ বলিয়া বসে—"তোমরা কি হনুমান-বিভীষণের ন্যায় মনুষ্যগুলিকে অমর করিবে!" বলিহারি বুদ্ধি! এমন বুদ্ধি না হইলে কি "ডারুইনের ডিওরির" মর্য্যাদা রক্ষা হয়!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সূতিকাগারে প্রবেশ করিয়া আমরা প্রসূতি ও ক্ষুদ্র শিশুর সংবাদ লইয়া থাকি। যে সকল ক্ষেত্রে তোমরা শুনিতে পাও যে সন্ধ্যার প্রাক্কালে সুস্থ শিশু জন্মগ্রহণ করিল, আর পরদিন প্রাতেই শিশুর চোয়াল ধরিয়া গেল—সে স্তন্য পান করিতে পারিতেছে না—সে সকল স্থানে নিশ্চয় জানিও যে শিশুর দেহে আমরা প্রবেশ করিয়াছি। আমরা মানব-দেহে প্রবিষ্ট হইয়াই সর্ব্বাগ্রে তাহার নিম্ন হনুস্থির মাংসপেশীগুলি আড়ষ্ট করিয়া ফেলি। তোমরা অনেক সময় রামের দোষ শ্যামের স্কন্ধে চাপাইয়া বলিয়া থাক। আমরা শিশুর দেহে উপস্থিত হইয়া তাহার চোয়াল বন্ধ করিয়া দিলাম, আর তোমরা নিরপরাধ "পাঁচুঠাকুরের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া বলিতে লাগিলে, "ছেলেকে পেঁচোয় পাইয়াছে।" এ তোমার কোন দেশী বিচার বলিতে পার? প্রসূতির প্রসবদ্বার ও শিশুর নাভিরন্ধ্র দিয়াই আমরা সচরাচর উহাদের দেহমধ্যে উপস্থিত হই। যে চৈচাড়ির দ্বারা শিশুর নাড়ী কাটা হয়, আমরা অনেক সময় উহাতেই লিপ্ত থাকি। অন্ধান্ধকার সূতিকাগৃহে বাস করিলে—আর্দ্র ভূমিতে শয়নোপবেশনে সন্তান ও প্রসূতি উভয়েই আমাদের অনুগ্রহ লাভে প্রায়ই বঞ্চিত হয়েন না। পল্লীগ্রামে শীতবাতসমাকুল প্রাঙ্গনের এক স্থান শুষ্ক খর্জ্জুরপত্রাচ্ছাদিত করাইয়া যে সূতিকাগার প্রস্তুত হয়, তথায় আমাদের প্রবেশ করিবার পক্ষে কোন বিঘ্ন ঘটে না। আমরা বায়ুর স্কন্ধে চড়িয়া ধূলিকণার সহিত ঐ স্থানে উপনীত হইতে পারি। অথবা মশিকৃষ্ণ বস্ত্রাদি সাহায্যেও তন্মধ্যে চলিয়া যাইতে পারি। বাড়ীর মধ্যে যে ঘরটি সর্ব্বাপেক্ষা বড়, যে ঘরের মেঝে বেশ খটখটে এবং যে ঘরে পবন ও রবি সমানভাবে প্রবেশ করিতে পারে, সে ঘর সূতিকাগার রূপে নির্ব্বাচিত হইলে আমাদের তথায় গতিবিধির পক্ষে বড়ই অসুবিধা হয়। তোমাদের মূর্খ মানুষগুলার

আচরণ দেখিয়া আমরা সময় সময় অবাক্ হই। তাহারা মুখে বলিয়া বেড়ায়—"শিশু আমাদের সর্ব্বস্ব, শিশুকে আমরা 'প্রাণতুল্য ভালবাসি" কিন্তু কৈ, সে কথাত আমাদের একেবারেই বিশ্বাস হয় না। শীতের রাত্রিতে এক বিন্দু ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে তাহারা রাশি রাশি উষ্ণবস্ত্র পরিধান করিয়া ঘরের মধ্যে বসিয়া থাকে, আর নবনীত-কোমল শিশুকে অবাধে বাহিরে আর্দ্র মৃত্তিকার উপর একখানি সহস্রগ্রন্থি মলিন কন্থা পাতিয়া ফেলিয়া রাখে। হায়! হায়! ইহা অপেক্ষা নৃশংসতা আর কি হইতে পারে?

কথায় কথায় অনেক বিষয় বলা হইল। কিন্তু ঐ যে টিজোনি ও কেটলি নামক দুইজন লোক আমার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া আমাদের পাছু লাগিয়াছে, সে কথাটি একেবারেই বলি নাই। ঐ দুই ব্যক্তি দন্তুষ্টকারগ্রস্ত জীবের রক্তরস হইতে এক প্রকার ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছে। উহা পিচকারী দ্বারা শরীরে প্রবেশ করিলে আমাদের বল বিক্রম নাকি সমস্তই বৃদ্ধি হইবে। এই চিকিৎসা এখনও পরীক্ষাধীন। ইহা সফল হইলে দেখিতেছি আমরা অনাহারেই মারা পড়িব।

(ষ্ট্রাণ্ড ম্যাগাজিন)

সম্পদের বেদনা

(বিদেশী গল্প)

বড় আনন্দে সে একদিন তাকে মৃদুস্বরে বললে, "মেরী, প্রতিদিন যতই আমি তোমাকে দেখছি ততই বুঝতে পারছি তুমি আমাকে কত ভালবাস!" সে অত্যন্ত ক্ষীণস্বরে ধীরে ধীরে উত্তর করলে, "সত্যি চার্লি, তোমার মত আর কাউকেই এত ভালবাসি না।" সে হচ্ছে একজন সামান্য চিত্রকর, তার নাম চার্লস, আর মেরী হচ্ছে একটি সামান্য গ্রাম্য কুমারী মেয়ে। চার্লস মেরীর কাছ থেকে ইচ্ছানুরূপ উত্তরটি পেয়ে আনন্দে তার সুকোমল কম্পিত ঠোঁটে ধীরে ধীরে একটি চুমো দিল। তার পরে একদিন পবিত্র সন্ধ্যায় পবিত্র বন্ধনে বদ্ধ হয়ে মেরী আশৈশব-পরিচিত পিতার স্নেহপূর্ণ গৃহখানি ছেড়ে চলল। তারা দুইজনে নূতন পথের যাত্রী হল। যাত্রার দিনে চার্লস বলে, "মেরী আমাদের এই শুভদিনে শুভ মিলনে তোমাকে আমার কোন উপহারই দেবার শক্তি নাই। আমি তোমাকে কি দিব মেরী? তোমাকে দেবার মত এক মাত্র অন্তরপূর্ণ ভালবাসাই আছে। আমি তোমাকে প্রাণের চাইতেও ভালবাসি মেরী। এ ভালবাসাই দিন দিন আমাদের দরিদ্রের কুটীরখানি আনন্দে পরিপূর্ণ করে তুলবে।"

তার পরে কত বাগান কত কুটীরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে বড় বড় দুর্গ তারা দেখতে পেলে। তাদের চারিপাশের বনে বাতাসের মৃদু আঘাতে সমস্ত গ্রামটিকে একটি অস্পষ্ট কলধ্বনিতে পূর্ণ করে তুলেছে।

হঠাৎ যেন গভীর চিন্তা থেকে জেগে চার্লস বলল, "মেরী, চল আমরা এইসব সুন্দর সুন্দর বাড়ীগুলি ঘুরে ফিরে দেখি।" তাহাদের ক্ষুদ্র কুটীরে যাবার পথে যা কিছু সুন্দর আছে সবই দেখতে দেখতে ও নিজেদের গভীর প্রেমের কথা বলতে বলতে দুজনে ক্রমে অগ্রসর হতে লাগল। নানারকম গাছের ছায়ায় বাগানগুলি কেমন সুন্দর হয়ে উঠেছে। কত বড় বড় বাড়ী কতজন আমোদের জন্য কত সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে। যা কিছু সে দেখতে ভালবাসে সবই মেরীকে দেখালে। মেরী আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়টিতে তার ক্ষুদ্র কুটীরখানির চিত্রই অনবরত চিত্রিত করে চলেছিল। ভাবছিল, সেই কুটীরে তারা দুজনে একসঙ্গে কত আনন্দে দিন অতিবাহিত করবে। সে তাকে বাস্তবিকই প্রাণ দিয়ে ভালবাসবে, তার চার্লির জন্য সে তার দরিদ্রের কুটীরখানি কত আনন্দেই পূর্ণ করে তুলবে, কেমন সুন্দর করে সে গৃহের সকল জিনিষ সাজিয়ে রাখবে।

কত আনন্দে এসব ভাবতে ভাবতে তারা একটি প্রাসাদের কাছে উপস্থিত হল। সৌন্দর্য্যে ইহা সকল প্রাসাদকে হার মানিয়েছে। দরজার পাশে বিনীত ভৃত্যেরা বিনয় শিরে আজ্ঞাপালনের জন্য দাঁড়িয়ে আছে। চার্লস দৃঢ়পদক্ষেপে সমস্ত বাড়ী ঘুরে ঘুরে

দেখতে লাগল। মেরীও কিছুই বুঝতে না পেরে তার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধের মত ঘুরে ফিরে বেড়াতে লাগল। হঠাৎ গর্ব্বিতভাবে চার্লস মেরীর দিকে ফিরে বললে—"প্রাণের মেরী, এর সবই যে তোমার ও আমার!" সে যে শাসনকর্ত্তা, সমস্ত ফ্লেণ্ডার্সে যে তার মত বড় লোক আর কেউ নাই! মুহূর্ত্তে মেরীর মুখখানি মান হয়ে গেল। আনন্দের জ্যোতি সরে গিয়ে মৃত্যুর ছায়া যেন মুখখানি অধিকার করে বসল। চার্লস তাকে বড় আদরে বুকে টেনে নিয়ে হৃদয়ের গভীর ভালবাসা দিয়ে আবার মেরীর হৃদয়খানি আনন্দে ভরে তুলল।

মেরী তার মনের এই দুর্ব্বলতার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করলেও সময় সময় তার প্রাণটি কি যেন মর্ম্মান্তিক বেদনায় মুষড়ে পড়ত। স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক সহিষ্ণুতায় তার হৃদয়টি সে তার পদের উপযুক্ত সকল কাজের জন্যে প্রস্তুত করল। তার প্রাণটি এমনই সুন্দর, এমনই মধুর, যে সকলেই তাকে অত্যন্ত ভালবাসতে লাগল। কিন্তু যে সম্মান, যে সম্মানের ভিতর সে জন্ম গ্রহণ করে নাই, যে সম্মান যে পদ তার আজন্ম-লব্ধ নয় আজ তা পেয়ে তার ভার সে কিছুতেই সইতে যেন পারছে না। রাত্রি দিন সে মর্ম্মান্তিক তার তাকে ব্যাকুল করে তুলছে, সে বেদনা দিনের পর দিন তাকে শক্তিহীন করে তুলছে। একথা সে নিজের মনে বারে বারেই বলে, "আর একবার যদি চার্লি আগের মত, সামান্য একজন চিত্রকরের মত আমার পাশে এসে দাঁড়াত। সে সামান্য চিত্রকরের বেশে এসে সে আমার হৃদয়টি জয় করে নিয়েছে আর একবার মাত্র যদি সে ভাবে ধরতে পারতাম।" তার প্রাণসর্ব্বস্ব, এত আদরের চার্লির পাশে থেকেও দিনের পর দিন সে দুঃখের মত করে পড়তে লাগল। তারপরে আদরের চার্লির জন্য তার নিদর্শন-স্বরূপ প্রাণের তিনটি শিশুসন্তান রেখে অকালেই সব শেষ করে সে চলে গেল।

প্রথম মিলন-সন্ধ্যায় সে তার দরিদ্রের কুটীরখানি যে পবিত্রতায় ও সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করে রংয়ের উপর রং দিয়ে আপনার প্রাণটি বিচিত্র করে তুলেছিল সে চিত্রের রেখা একটির পর একটি প্রতি দিন মুছতে মুছতে আজ যখন তার শেষ রেখাটুকু পর্য্যন্ত মোছা শেষ হয়ে গেল তখন সে আর কি নিয়ে বেঁচে থাকবে?

সে তো একা তার স্বামীর নয়। আজ তার অভাবে চার্লসের গভীর দুঃখের সঙ্গে দুঃখ মিলিয়ে তার চোখের জলের সঙ্গে চোখের জল মিশিয়ে দেশ শুদ্ধ লোক কেঁদে উঠল।

চার্লস মেরীকে বড় যত্নে তাদের প্রথম মিলন-দিনের পোষাকটি পরিয়ে সাজিয়ে দিল। তার পরে ধীরে ধীরে তার সুকোমল হাতটি নিজের হাতের ভিতরে নিয়ে মেরীর স্থির শীতল ওষ্ঠে একটি চুম্বন দিল।

সুখের দিনে, মিলনের দিনে সে তাকে যে বেশে বরণ করে নিয়েছিল আজ দুঃখের দিনে বিদায়ের দিনে তাকে সেই বেশেই বিদায় দিল।

শ্রীইন্দুবালা সেন।

মিলন ও বিরহ।

'মিলন' তোমার প্রভো, শুধু এক স্থানে
রেখে রেখেছিল; কিন্তু আজ আমি প্রাণে
কি ক্ষুদ্র সে স্থানটুকু! হে বাঞ্ছিত মোর,
'বিরহ' কাটি' সে ক্ষুদ্র 'মিলনের' ভোর
পড়েছে নবীন এক মূরতি তোমার
কি বিরাট, কি মধুর! হেরি চারিধার
রূপের উদ্ধাসে তার গিয়াছে ভরিয়া।
অফুরন্ত অনিবার পিয়াসা লইয়া
নিরখে তোমায় আজ মুগ্ধ আঁখি মম
বিশ্বব্যাপী—বিশ্বরূপ ওগো প্রিয়তম!

শ্রীসরোজবাসিনী গুপ্তা।

ভারত মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। (মনু)
The woman's cause is man's: they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free:
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall man grow? (TENNYSON.)

বঙ্গানুবাদ :—স্ত্রী-পুরুষের উন্নতি অবনতি একসূত্রে গ্রথিত। নারী অনুন্নত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে পুরুষ কখনই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। (টেনিসন)

"I will be as harsh as truth, and as uncompromising as Justice; I am in earnest—I will not equivocate; I will not retreat a single inch—and I will be heard." (WILLIAM LLOYD GARRISON.)

বঙ্গানুবাদ :—আমি সত্যের ন্যায় কঠোর ও ন্যায়ের ন্যায় অনমনীয় হইব। আমি দৃঢ়সংকল্প, আমি কিছুতেই এক-তিলও পশ্চাৎপদ হইব না। আমি নিশ্চিত জানি, তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। (উইলিয়ম গ্যারিসন)

১২শ ভাগ { কার্ত্তিক, ১৩২৩। } ৭ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

একটী বিবাহের নথি।

সিন্ধুদেশে সম্প্রতি একটী শিশু-বিবাহের মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। ১২ মাস বয়স্ক এক মুসলমান বালকের সহিত ১৩ বৎসর অথবা এক বালিকার বিবাহ হয়। বালিকার মাতা এই বিবাহের বিরুদ্ধে আপীলে এই বলিয়া অভিযোগ উত্থাপিত করে যে, এই বিবাহে তাহার কন্যার স্বার্থের নিতান্ত প্রতিকূল, বালিকার অসচ্চরিত্র ও অপব্যয়ী পিতা অর্থলোভে কন্যার স্বার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া এই নিষ্ঠুর বিবাহ দিয়াছে। সবজজ এই মোকদ্দমা রহিত করিয়া দেন, কিন্তু শিশু-বরের অভিভাবকগণ জিলা-জজের নিকট আপীল করে। সহকারী জিলা-জজ সবজজের বিচারের বিরুদ্ধে বরপক্ষকে মোকদ্দমা ডিক্রী দেন। তিনি বলেন, বয়সের এই পার্থক্য তেমন কিছু নয়,—ইহাতে কন্যের স্বার্থহানির কোন আশঙ্কা নাই,—তাহার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হয় নাই। উচ্চতর বিচারপতি—সিন্ধুদেশের ডিভিসিয়াল কমিশনারের নিকট বালিকার মাতা এই রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করে। তিনি বিবাহ রদ করিয়া দিয়াছেন। রায়ে তিনি লিখিয়াছেন, "এই বিবাহ যে বালিকার স্বার্থসঙ্গত নয় তাহা কোন রূপ প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা প্রমাণিত হয় নাই। ১২ বৎসরের বালিকার সহিত এক বৎসরের বালকের বিবাহ নিশ্চয়ই অযথা ও নিষ্ঠুর ব্যাপার।"

পৃথিবীর কোন অসভ্য জাতির মধ্যেও এরূপ বিবাহ প্রচলিত আছে কিনা জানি না, বোধ হয় নাই। এইরূপ শিশুবিবাহ যে দেশে প্রচলিত আছে সে

দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থার কথা ভাবিলে প্রাণের সকল আশা ভরসা যেন লুপ্ত হইয়া যায়। মুসলমানদিগের সমাজবিধি সমর্থন না করিলে এইরূপ বিবাহ কখনই ঘটিতে পারিত না,—সেই সমাজবিধির পরিবর্ত্তন হয়ত সম্ভবপর বা সহজসাধ্য নহে, কিন্তু দেশে শিক্ষাবিস্তার হইলে এরূপ বিবাহ ক্রমে অসম্ভব হইয়া পড়িবে। দেশের নেতাগণ কিন্তু শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে এখনও উদাসীনতা পরিত্যাগ করিতেছেন না। কবে তাঁহারা দেশের আসল অভাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন?

হিন্দুসমাজে শিশুবিবাহ

মুসলমান সমাজে শিশুবিবাহের একটী দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইল। বরক'নের বয়সের এত পার্থক্য না থাকিলেও শিশুবিবাহ মুসলমান সমাজে খুবই প্রচলিত আছে বলিয়া মনে হয়। হিন্দুসমাজে শিশু-বিবাহ এই বিংশ শতাব্দীতেও যে কিরূপ প্রচলিত তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের সেন্সাস্ রিপোর্টে বঙ্গদেশে হিন্দু শিশুবিধবার সংখ্যা এইরূপ দেওয়া হইয়াছে:—

বয়স	বিধবার সংখ্যা
০—১	৫
১—২	১৬
২—৩	৭১
৩—৪	২০৮
৪—৫	৬৪১
৫—১০	৮৪৩৬
মোট	৯৩৮৪

সমগ্র ভারতবর্ষে:—

০—১	৮৬৬
১—২	৭৪৫
২—৩	১৪৬৪
৩—৪	৩৯৮৭
৪—৫	৬৬০৩
৫—১০	১১৫৮৫
	২২৩৮০

সুতরাং দেখা যাইতেছে, বঙ্গদেশে শিশু-বিধবার সংখ্যা নয় হাজারের উপর, এবং ভারতবর্ষে বিয়াল্লিশ হাজারের বেশী। এই ত গেল শুধু শিশুবিবাহ-সংঘটিত বিধবার সংখ্যা। তা ছাড়া কত হাজার হাজার শিশু-বালিকা সধবারূপে দেশের কত পরিবারে পুতুল খেলার অভিনয় করিতেছে তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিবার উপায় নাই।

খুব সম্ভব, অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর মধ্যেই অধিকাংশ শিশু-বিবাহ সংঘটিত হয়। শিক্ষিত সমাজে এইরূপ বিবাহ দেখা যায় না। এতগুলি শিশু-বিধবার কথা শুনিলে, তাহাদের গভীর দুঃখ ও পরীক্ষা প্রলোভনপূর্ণ ভাবী সুদীর্ঘ জীবনের কথা চিন্তা করিয়া অশ্রু সংবরণ করা কঠিন হয়। আর যে সকল শিশুবালিকা সধবারূপে এখন হিন্দুগৃহের বধূরূপে বিরাজ করিতেছে তাহারা কিরূপ ভবিষ্যবংশ প্রসব করিবে তাহা ভাবিলে মনে কেমন আশার সঞ্চার হয়?

শিশুবিধবাদের বিবিধ দুঃখ-কাহিনী বর্ণন করিয়া বিধবাশ্রমের প্রতি আমরা দু দশ জন লোকের সহানুভূতি পাইয়া থাকি সত্য, কিন্তু যাহাদের মধ্যে এই সকল বিধবার জন্ম, শত শত সমাজসংস্কারকের বক্তৃতা তাহাদের নিকট পৌঁছায় না; পৌঁছাইলেও কাজ করিবে কিনা সন্দেহ। তাহারা দেশের শিক্ষালোকবঞ্চিত সম্প্রদায়। যাঁহারা দেশের জন্য ভাবেন ও কিছু করেন শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা কবে ভাল করিয়া বুঝিবেন? ভগবান তাঁহাদের প্রাণে শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করুন, আমরা অকপট হৃদয়ে এই প্রার্থনা করি।

বেঙ্গালোর শ্রীনিবাস-মন্দির

বৃদ্ধাচার্য্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর মুখে একবার একটী গল্প শুনিয়াছিলাম। তিনি তখন মাদ্রাজে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন, দেশে খুব দুর্ভিক্ষ। একদিন তিনি একটী ভক্তিমতী মহিলা দেখিতে পাইলেন, তিনি অশ্রুতে গদগদ হইয়া ভগবন্নাম কীর্ত্তন করিতেছেন, আর সাধারণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন।

স্বামী মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার কথাবার্ত্তা হইল, মহিলাটী যে খুব ধর্ম্মপ্রাণ একথা তিনি বুঝিতে পারিলেন। সংগৃহীত অর্থ দিয়া তিনি কি করেন জানিতে চাহিলে মহিলাটী বলিলেন, তিনি এইরূপে বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়া একটী ধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং তাহাতে তাঁহার আরাধ্য দেবতা রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বিগ্রহের অলঙ্কার নির্ম্মাণের জন্য পুনরায় অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। স্বামী মহাশয় বলিলেন, 'দেশে এত দুর্ভিক্ষ, আপনি বিগ্রহের অলঙ্কার এখন স্থগিত রাখিয়া ভগবানের ছাওার ছাওার সন্তান যে অন্নাভাবে মারা যাইতেছে, এই অর্থ দ্বারা তাহাদের প্রাণ বাঁচান না!' মহিলাটী উত্তর করিলেন, "ঈশ্বরের ইচ্ছায় লোক মরিতেছে, তাহাতে আমার কি?—আমি আমার ঠাকুরের জন্য অর্থ সংগ্রহ না করিয়া ঐ কাজ করিতে যাইব কেন!" নরসেবাই যে ভগবানের প্রকৃষ্ট সেবা মহিলাটী তাহা বুঝিতে পারেন নাই, তাই তিনি তাঁহার আদর্শ অনুসারে কাজ করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ মঠাধীশ যদি তাঁহাদের অগাধ ধনরাশি দেশের জনসাধারণের সেবায় ব্যয় করিতেন তবে দেশের বহু দুর্গতি দূর হইত। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে লক্ষ লক্ষ ধর্ম্মার্থীর ভক্তিপূত এই সকল অর্থ মামলা মোকদ্দমা ও মঠাধীশদের বিলাস-বাসনার পরিতৃপ্তি প্রভৃতি কত অনুপায়ে ব্যয়িত হইতেছে! তাই মাঝে মাঝে দুই একটী ব্যতিক্রম দেখিলে প্রাণে আনন্দ হয়।

তেত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে মিঃ গোপাল চারলু নামক জনৈক শিক্ষিত ভদ্রলোক মহীশূর—বেঙ্গালোর সহরে শ্রীনিবাস মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। মন্দিরের সঙ্গে তিনি একটী অনাথাশ্রম, একটি ফ্রি লাইব্রেরী ও একটী মহিলা বিভাগের প্রতিষ্ঠা করেন। এই অনাথাশ্রমে এখন ৪৮টী অনাথ বালকবালিকা প্রতিপালিত হইয়া সাধারণ ও ব্যবহারিক শিক্ষা লাভ করিতেছে। এই মন্দিরটী সম্বন্ধে সংবাদপত্রে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু এই টুকু পড়িয়াই মনে হয়, মন্দির অতি মহৎকার্য্য সাধন করিতেছেন। জনসাধারণের অর্থেই এই মন্দির পরিচালিত হইতেছে। সম্প্রতি মন্দির প্রতিষ্ঠাতা মিঃ গোপাল চারলুর মৃত্যু হইয়াছে। তিনি মন্দির পরিচালনের সুব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। দেশের অন্যান্য সকলের ধর্ম্মমন্দিরগুলিতে কি এই সুন্দর নরসেবাব্রত প্রচলিত করিতে দেশবাসী চেষ্টা করিতে পারেন না? শক্তি থাকিতেও আমরা কিছু করিতে না চাহিলে বিধাতা আমাদের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিবেন কেন?

অবরোধ ও যক্ষ্মারোগ

ডাক্তার ল্যাঙ্কেষ্টার নামক জনৈক অভিজ্ঞ চিকিৎসক "ইয়ংমেন অব ইণ্ডিয়া" পত্রে, ভারতে অবরোধ প্রথার দ্বারা যক্ষ্মারোগ কত নারীর জীবন প্রথমে অভিশপ্ত, তৎপর সংহার করিতেছে তাহার আলোচনা করিয়াছেন। আমরা মূল প্রবন্ধটীর মর্ম্ম স্থানান্তরে অনুবাদ করিয়া দিলাম। ডাক্তার ল্যাঙ্কেষ্টার বলেন,—ভারতবর্ষের যে যে সহরে অবরোধ প্রথা আছে সেই সকল সহরে যক্ষ্মা-রোগে আক্রান্ত নারীদিগের সংখ্যা পুরুষের তিন গুণ; কিন্তু যে সকল সহরে অবরোধ নাই, সেই সকল স্থানে এই রোগে আক্রান্ত স্ত্রীপুরুষের সংখ্যা সমান ব্রহ্মদেশে অবরোধ প্রথা নাই, সেখানে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষই যক্ষ্মারোগে অধিক আক্রান্ত হয়। বস্তুতঃ যে সকল কারণে যক্ষ্মারোগের উৎপত্তি হয় স্বাভাবিক নিয়মে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষেরই তাহাতে বেশী আক্রান্ত হইবার কথা, কিন্তু ভারতবর্ষের অবরোধ-প্রবল বড় বড় সহরগুলিতে যে পুরুষ অপেক্ষা তিন গুণ বেশী স্ত্রীলোক যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়, সহরের অপরুদ্ধ বায়ুতে গৃহকোণে আবদ্ধ হইয়া থাকাই কি ইহার একমাত্র কারণ নয়? এই কথাটা বুঝাইবার আর কোনও কারণ কেহ আবিষ্কার করিতে পারিবেন না। কিন্তু তথাপি এই অস্বাভাবিক অবরোধপ্রথার সমর্থন-কারী শিক্ষিত লোক এদেশে গণ্ডায় গণ্ডায়। শুধু কি তাই! কলিকাতার অবরোধবাসিনী মেয়েদের হাওয়া খাইবার জন্য একটী উদ্যান কলিকাতা মিউনিসিপালিটী হইতে মেয়েদের জন্য পৃথক করিয়া রাখার প্রস্তাব কোনও কোনও ইউরোপীয় ও এদেশীয় সভ্য করিয়া

ছিলেন। কিন্তু কলিকাতার দেশীয় মিউনিসিপাল কমিশনার-ধুরন্ধরগণের অধিকাংশের মতে তাহাও যুক্তিযুক্ত হইল না! চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিলেও ইহারা বোঝে না, নারীবধেই যেন এদেশের পুরুষদের আনন্দ!

কারাগারে বিধবা

ভাদ্রমাসের ভারতমহিলায় কারাগারে নারীদের সংখ্যার আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখাইয়াছি, হিন্দু বিধবার ক্লেশময় জীবন তাহাকে পাপ-পথে কিরূপ প্ররোচিত করে। এসম্বন্ধে প্রবাসী লিখিয়াছেন :—"বাংলাদেশে ১৯১৪ সালে আদালত হইতে মোট ৭০২ জন স্ত্রীলোককে জেলে পাঠান হয়। তাহার মধ্যে ৩২২ জন হিন্দু, ১৯৪ জন মুসলমান, ৮ জন বৌদ্ধ ও জৈন, ৯১ জন খৃষ্টিয়ান, এবং ৬৬ জন অন্য নানা সম্প্রদায়ের। মোট হিন্দু স্ত্রীলোক বঙ্গে আছে ১০,০৯৭,১৬২ জন এবং মোট মুসলমান স্ত্রীলোক আছে ১২,৩৭৭,২১৫; কিন্তু হিন্দু স্ত্রীলোকদের মোট সংখ্যা কম হইলেও হিন্দু অপরাধিনীদের সংখ্যা মুসলমান অপরাধিনীদের সংখ্যার চেয়ে বেশী। ইহার কারণ কি? ইহা আরও চিন্তার বিষয় বলিয়া মনে হয় যখন দেখা যায় যে আলোচ্য বৎসরে মোটের উপর হিন্দুরা মুসলমানদের চেয়ে আইনভঙ্গ কম করিয়াছিল।

তার পর আবার দেখুন মোট অপরাধিনী ৭৭২ জনের মধ্যে ২৩৫ বিবাহিতা, ৭ জন অবিবাহিতা, ২৭৩ বিধবা, এবং ১৮৭ জন পতিতা নারী। এই পতিতাদের অনেকেও যে বিধবা তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায় যে অপরাধিনী-দের মধ্যে বিধবাদের সংখ্যা কুমারী ও বিবাহিতাদের চেয়ে বেশী। দেশের সমগ্র অবিবাদিনীদের মধ্যে মোট অবিবাহিতা বিবাহিতা ও বিধবার সংখ্যা বিবেচনা করিলে এই ন্যূনাধিক্য মনকে আরও পীড়া দেয়। বঙ্গে মোট অবিবাহিতা ৭৫,৬০,৮২৫ জন, বিবাহিতা ১,০৪,৩২২ জন এবং বিধবা ৪৫,১৬,৯০২ জন, অর্থাৎ বিধবাদের মোট সংখ্যা বিবাহিতা ও অবিবাহিতাদের মোট সংখ্যার সিকি মাত্র। কিন্তু অপরাধিনী বিধবাদের সংখ্যা অপরাধিনী বিবাহিতা অবিবাহিতাদের চেয়ে অনেক বেশী। সুতরাং ইহাতে আর কোনই সন্দেহ থাকে না, যে বৈধব্য আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগকে এমন অবস্থায় ফেলে যে তাহাদের মধ্যে অনেক বেশী স্ত্রী-লোক অন্য স্ত্রীলোকদের চেয়ে আইনভঙ্গ করে। হিন্দু অপরাধিনীদের সংখ্যা যে মুসলমান অপরাধিনীদের চেয়ে বেশী, তাহারও অন্যতম কারণ যে হিন্দু নারীর চিরবৈধব্য, এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট হেতু রহিয়াছে। যাঁহার বিশ্বাস হয় না, তিনি অন্য কারণ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করুন।"

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা

পাশ্চাত্য সভ্যতার নিন্দা এদেশের লোকের মুখে ধরে না। সম্প্রতি একখানি ইংরেজী সংবাদপত্রে ফরাসী দেশ হইতে একজন ইংরেজ এসম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—"আমি মিঃ গান্ধির একজন প্রশংসাবাদী। কিন্তু তাঁহার কোন কোন উক্তির প্রতিবাদ না করিয়া পারি না। দুঃখের বিষয়, অনেক পত্রিকা-সম্পাদক নিজ নিজ পত্রিকায় প্রশংসার সহিত এই সকল উক্তি উদ্ধৃত করেন। মিঃ গান্ধি বলেন, 'ইউরোপে বর্ত্তমানে যে শয়তানী লীলার অভিনয় চলিতেছে তাহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, আধুনিক সভ্যতা অসৎ ও অন্ধকারের প্রতিকৃতি, এবং প্রাচীন অর্থাৎ ভারতীয় সভ্যতা দেব-ভাবের প্রকাশক। বর্ত্তমান সভ্যতা জড়বাদের ও আমাদের সভ্যতা আত্মার প্রাধান্যের দ্যোতক।' এই সকল উক্তি অসার। ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে কি এমন সময় আবিষ্কার করা যায় না, যখন সমস্ত ইউরোপে প্রগাঢ় শান্তি বিরাজ করিতেছিল, আর ভারতবর্ষ যুদ্ধ ও অশান্তিতে পরিপূর্ণ ছিল? তবুও মিঃ গান্ধি প্রাচীন সভ্যতার দোহাই দেন! তা ছাড়া ভারতবাসীগণই ত বলেন, যে ঘোর অশান্তির হাত হইতে ইংরেজ জাতি ভারতবর্ষকে রক্ষা করিয়াছে। তাঁহারা ইহাও বলেন যে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শান্তি ইংরেজশাসনেরই ফল। তার-পর মিঃ গান্ধি নিম্নলিখিত ভাবে অহিংসার গুণ বর্ণন করিয়া-ছেন :—'আমাদের সভ্যতা দৃঢ়তার সহিত আমাদিগকে বলে যে অহিংসা-গুণ—যাহার রূপান্তর দয়া ও বিশুদ্ধ প্রেম—সমস্ত পৃথিবীকে আমাদের পদতলে অবনত করিতেছে।'

অহিংসা পরম ধর্ম্ম হইতে পারে, পাশ্চাত্য দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষে ইহার বেশী আদর হইতে পারে,—কিন্তু অহিংসা ভারতবাসীর বিশেষ ও প্রকৃতিগত ধর্ম্ম, এমন কথা বলা চলে না। ভারতবর্ষের মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত পড়িয়া ত মনে হয় না, যে অহিংসা ভারতবাসীর প্রকৃতিগত ধর্ম্ম; বরং শ্রীকৃষ্ণ বিপরীত গুণেরই প্রশংসা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। ভারতবর্ষের সমরপ্রিয় জাতিগুলির কথা ত ভারতবাসীগণ গৌরবের সহিতই উল্লেখ করেন। রাজপুতজাতি ত যুদ্ধের জন্যই বিখ্যাত; মহারাষ্ট্রীয়গণ বিখ্যাত যোদ্ধা; শিখদিগের ষষ্ঠ গুরু তাহাদিগকে "সিংহ" আখ্যা দিয়াছিলেন। তা ছাড়া এই যে আজকাল ভারতীয় যোদ্ধাগণ ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকায় আপনাদের বীরত্ব প্রদর্শন করিতেছে ভারতবর্ষ কি তজ্জন্য গৌরব করিতেছে না? সুতরাং অহিংসা যে ভারতবাসীর স্বাভাবিক ধর্ম্ম একথা আমি স্বীকার করি না। বৌদ্ধ যুগে বৌদ্ধগণের ইহা বিশেষ ধর্ম্ম ছিল, বর্ত্তমান সময়ে জৈনদিগের ইহা বিশেষ ধর্ম্ম; কিন্তু ভারতের আর কোন সম্প্রদায়ের ইহা বিশেষ ধর্ম্ম বলিয়া ত আমি জানি না।

অহিংসা পরম ধর্ম্ম হইতে পারে, কিন্তু ইহারও ব্যতিক্রম-স্থল আছে। ব্যাঘ্র আক্রমণ করিলে তখন অহিংসার দোহাই দিলে চলে কি? শত্রুর আক্রমণ হইতে আপনাকে ও দুর্ব্বলকে রক্ষা করিবার চেষ্টা হিংসা হইলেও তাহা ত দোষণীয় বলিয়া মনে হয় না। "বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধ পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বাভাবিক ফল বলিয়া মনে করা কখনই ন্যায়সঙ্গত নহে।"

স্যর সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ

স্যর কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত যখন বিলাতে ভারত সচিবের কাউন্সিল হইতে অবসর গ্রহণ করেন তখন স্যর সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহকে সেই কার্য্য গ্রহণ করিতে গবর্ণমেণ্ট অনুরোধ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছিলাম। বিলাত তাঁহার পত্নীর স্বাস্থ্যের অনুকূল হইবে না বলিয়া তিনি সেই কার্য্য গ্রহণ করেন নাই। ভারতগবর্ণমেণ্টের মন্ত্রীসভার সভ্যপদ গ্রহণ করিয়াও স্যর সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ সিমলাবাস তাঁহার স্ত্রীর পক্ষে অসুবিধাজনক বলিয়া সেই কার্য্য পরিত্যাগ করেন। ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে তাঁহার আয় এত বেশী যে এই সকল সরকারী কার্য্য গ্রহণ করিলে তাঁহার আয় অনেক কমিয়া যায়। তথাপি সম্প্রতি তিনি গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে উপরোক্ত দুই কার্য্য অপেক্ষা অল্প সম্মান ও আয়ের কার্য্য বঙ্গীয় গবর্ণরের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা ইহার রহস্য বুঝিতে পারিলাম না। গবর্ণমেণ্ট কি স্যর সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহকে কোনও প্রদেশের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন? তাহা হইলে দেশের লোক অত্যন্ত আনন্দিত হইবে।

আগামী জাতীয় মহাসমিতির সভাপতি

আগামী ডিসেম্বর মাসে, লক্ষ্ণৌ নগরে কংগ্রেস বা জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হইবে। কংগ্রেসের সভাপতি মনোনয়ন লইয়া এবার বেশ একটা গোলযোগ চলিয়াছিল। যে স্থানে মহাসমিতির অধিবেশন হয় সেখানে মহাসমিতির কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য একটা অভ্যর্থনা-সমিতি গঠিত হয়। এই অভ্যর্থনা-সমিতি দেশের লোকের অভিপ্রায় বুঝিয়া সভাপতি হইবার উপযুক্ত কয়েক ব্যক্তির নাম মহাসমিতির প্রাদেশিক শাখাগুলির নিকট প্রেরণ করে। অধিকাংশ প্রাদেশিক সমিতি যাঁহার পক্ষে মত বা ভোট দেয় তিনিই সাধারণতঃ সেই অধিবেশনের সভাপতি মনোনীত হন। কিন্তু অধিকাংশ প্রাদেশিক সমিতির মত যদি অভ্যর্থনা সমিতির মনঃপূত না হয় তবে অভ্যর্থনা-সমিতি ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির নিকট তাঁহাদের আপত্তি জানাইতে পারেন। এই বৎসর সভাপতির পদের জন্য লক্ষ্ণৌ অভ্যর্থনা সমিতি যে কয়েকজনের নাম প্রাদেশিক সমিতিগুলির মতের জন্য তাহাদিগের নিকট প্রেরণ করেন তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার ৫ ভোট ও শ্রীমতী অ্যানি বেসাণ্ট দুইটী ভোট পাইয়াছিলেন। এই ভোট লক্ষ্ণৌ

অভ্যর্থনা-সমিতির মনঃপূত না হওয়ায় তাঁহারা ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির নিকট এই বিষয়টী বিবেচনার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌ অভ্যর্থনা সমিতি শ্রীমতী অ্যানি বেসাণ্টকে সভাপতি করিতে চাহিয়াছিলেন। ত্যাগ ও পরহিত ব্রতে এবং শক্তিমত্তায় অধিকাংশ নারী অপেক্ষা শ্রীমতী বেসাণ্ট যে যোগ্যতর ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি ত ভারতবাসী নহেন, এজন্য অনেকের মত এই যে, জাতীয় মহাসমিতিতে বিজাতীয় সভাপতি না করা ভালই হইয়াছে। আমাদের নিকটও এই কথা যুক্তিযুক্ত বলিয়াই মনে হয়।

স্বর্গীয়া যমুনাবাই সক্কাই

স্বর্গীয়া যমুনাবাই বোম্বাইয়ের সুবিখ্যাত বণিক তুলসীদাস বরজদাসের কন্যা। তাঁহার বাল্যকালে এদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি লোকের অনুরাগ ছিল না। তিনি মাতৃভাষা গুজরাটী শিক্ষা করিয়া গোপনে গোপনে দুই খানা প্রথম-পাঠ্য ইংরেজী পুস্তক পড়িয়া ফেলেন। তাঁহার ১৩ বৎসর বয়সে ১৪ বৎসর বয়স্ক এক বালকের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। যমুনাবাইয়ের স্বামী নগিনদাস সক্কাই এই বয়সেই এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাস করিয়াছিলেন, কিন্তু সাংসারিক অবস্থা ভাল ছিল না বলিয়া পড়াশুনা ছাড়িয়া ৪০৲ টাকা বেতনে চাকুরী গ্রহণ করেন।

যমুনাবাই অল্প বয়সেই তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন। প্রথম বয়সে ক্রমে তাঁহার বারটী সন্তান হয় কিন্তু সকলগুলি সন্তানই অতি শৈশবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাঁহাদের দাম্পত্য জীবন অতি মধুর ছিল। স্ত্রীকে আদর্শ নারী রূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য স্বামীর প্রাণপণ চেষ্টা ছিল। অল্প বয়স্ক বালক হইলেও নগিনদাস যমুনাবাইয়ের শিক্ষার প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল ছিলেন। দম্পতি উভয়েই পরস্পরের প্রতি কর্তব্যগুলি অতি সুচারুরূপে সম্পাদন করিতেন। তাঁহার মাতা মণিবাইয়ের নিকট হইতেই যমুনাবাই এই সুন্দর চরিত্র লাভ করিয়াছিলেন।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে কয়েকজন শিক্ষিত গুজরাটী ভদ্রলোকের চেষ্টায় বয়স্কা গুজরাটী স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার উদ্দেশ্যে গুজরাটী হিন্দু স্ত্রীমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হয়। মিসেস সক্কাই এই স্ত্রীমণ্ডলের সভানেত্রী নির্বাচিত হন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রতি বৎসরই তিনি এই সমিতির সভানেত্রী নির্বাচিত হইয়াছিলেন। এই স্ত্রীমণ্ডলের প্রতিষ্ঠার সময় গুজরাটী স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে একজন গুজরাটী কবি গুজরাটী মেয়েদের অবস্থা আমেরিকার ক্রীতদাসদিগের অবস্থা অপেক্ষাও শোচনীয় বলিয়া গিয়াছেন। সমিতির প্রতি চারি বিদ্রূপ যথেষ্টই বর্ষিত হইয়াছিল; কিন্তু মিসেস সক্কাই কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া দৃঢ় চিত্তে নিজ কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ হইতে এই স্ত্রীমণ্ডল মহাত্মা দাদাভাই নৌরোজির জন্মোৎসব অনুষ্ঠান সম্পাদন করিতে আরম্ভ করেন। এই নূতন অনুষ্ঠানটী মিসেস সক্কাইয়ের অন্তরে এক নব ভাবের বীজ রোপণ করে। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের বিখ্যাত সেবাসদন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। মিসেস সক্কাই গুজরাটী হিন্দু স্ত্রীমণ্ডলে এই সেবাসদনের উপকারিতা সম্বন্ধে কতকগুলি বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন এবং সেবাসদনের কার্যে যোগ দিতে গুজরাটী মহিলাদিগকে আহ্বান করেন। তিনি নিজে সেবাসদনের কার্য্যে যোগ দেন এবং তাহার অন্যতম সম্পাদিকা নিযুক্ত হন। ইতিপূর্ব্বে ত্যাগের যে নূতন বীজ তাঁহার অন্তরে রোপিত হইয়াছিল, সেবাসদনের কার্য্যে যোগ দিয়া তাহা অঙ্কুরিত হয়, এবং পশ্চিম ভারতে স্ত্রীশিক্ষার আদি প্রবর্ত্তক দাদাভাই নৌরোজীর ৮৫ তম জন্মোৎসবে তিনি সংকল্প গ্রহণ করেন, যে দেশের, বিশেষতঃ অশিক্ষিতা ভারতনারীর কল্যাণের জন্য তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিবেন। সেই সময় হইতে তিনি আশ্চর্য্য সাহস ও দৃঢ় একনিষ্ঠতার সহিত দেশের প্রতি তাঁহার কর্তব্য করিয়া গিয়াছেন। এই সকল কার্য্যের মধ্যে ১৯১১—১২ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে তাঁহার কাজই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। কঠোর শীতকালে তিনি আর কয়েকটী গুজরাটী মহিলার সহিত নিজ ব্যয়ে তিন মাস কাল দুর্ভিক্ষপীড়িত

দেশে ভ্রমণ করিয়া লোকের দুরবস্থা নিজ চক্ষে দর্শন করেন এবং ২১ হাজার টাকা ও অনেক কাপড় সংগ্রহ করিয়া বিপন্ন নরনারীর সাহায্য করেন। মহাত্মা গোখলে প্রতিষ্ঠিত ভারত-ভৃত্য সমিতির জনৈক সভ্য মিঃ যোশী পাঁচ-মহল জেলায় ভ্রমণ কালে মিসেস সকাইএর সঙ্গে ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, মিসেস সকাই যে শুধু বিপন্নদিগকে সাহায্য করিবার প্রণালী নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহা নয়, পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে সেই প্রণালী যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয় নিজে তাহা দেখিয়াছেন।

সন্ন্যাসত হইবার অল্প পূর্ব্বে নিতান্ত ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া তিনি স্ত্রীমণ্ডলের জন্য অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হন এবং অল্প সময়ের মধ্যে ছয় হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। সেবাসদনের সম্পাদিকা রূপে তিনি নিয়মিত রূপে ঔষধালয় ও হাসপাতাল পরিদর্শন করিয়াছেন। সহানুভূতিপূর্ণ সুমিষ্ট বাক্যে ও মধুর ধর্ম্মসঙ্গীত গান করিয়া তিনি রোগীদিগকে সান্ত্বনা দিয়াছেন। দরিদ্র রোগীদিগকে তিনি ফল ও ফুল উপহার দিয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। দরিদ্রের গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিয়া তিনি তাহাদের প্রকৃত অবস্থা অবগত হইয়াছেন এবং তারপর এমন ভাবে তাহাদের সাহায্য করিয়াছেন যাহাতে তাহাদের আত্মসম্মান নষ্ট না হয়। তিনি নববিধবা দিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদিগের সহিত গভীর সহানুভূতি প্রদর্শন করতঃ সান্ত্বনা দিতেন; তাঁহার মিশিবার প্রণালী দেখিয়া তাহারাও তাঁহাকে আপনার জন বলিয়া মনে করিত। সেবাসদনের প্রতিষ্ঠাতাদিগের মধ্যে একজনের ব্যবহারে প্রতিষ্ঠান টীর অবস্থা একসময় নিতান্ত সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে। মিসেস সকাই এই সঙ্কট সময়ে বাক্যে ও কার্য্যে অতিশয় দৃঢ়তার সহিত সদনের পক্ষ সমর্থন করেন এবং তাঁহার এই দৃঢ়তার বলেই সেবা-সদন সেই সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা হইতে রক্ষা পায়। সেবাসদন-সমিতি তাঁহার এই কৃতজ্ঞতার ঋণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

মিসেস সকাই যে শুধু উপরোক্ত দুইটী প্রতিষ্ঠানেরই বন্ধু ছিলেন তাহা নহে। জৈনমহিলাদিগের সকল প্রকার উন্নতিচেষ্টায় তিনি সাহায্য করিতেন। সুরাট, বোম্বাই ও আহমেদাবাদের বনিতাবিশ্রাম গুলিকে তিনি সর্ব্বপ্রযত্নে সাহায্য করিতেন। এতদ্ব্যতীত নারীজাতির কল্যাণের জন্য যখন যে অনুষ্ঠান হইয়াছে তিনি তাহাতেই যোগ দিয়াছেন। তাঁহার উদ্যোগে ভদনগরে স্ত্রীমণ্ডলের একটী শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরামর্শ ও প্রচুর অর্থদ্বারা তিনি এই শাখাটীকে সফল করিয়া তোলেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে এই শাখা স্ত্রীমণ্ডলের সভ্যগণ কৃতজ্ঞতার ঋণ স্বীকার করিয়া তাঁহাকে এক অভিনন্দন প্রদান করেন। নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে উদার মত প্রচার করিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনে প্রবল ছিল। তিনি এইরূপ ভ্রমণের আয়োজনও করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে স্বামী-বিয়োগে ভগ্নচিত্ত হইয়া তিনি এই সঙ্কল্প ত্যাগ করেন।

মিসেস সকাই আদর্শ নারী ছিলেন। সকল লোকনেত্রী হইবার সকল গুণই তাহাতে বিদ্যমান ছিল। তাঁহার চাল চলন অতি সাদা সিধা ও তাঁহার ব্যবহার অতিশয় সরলতাপূর্ণ ছিল। তাঁহার সহানুভূতিপূর্ণ হাস্য ও কর্ম্মনৈপুণ্য তাঁহার চারি দিগের কর্ম্মীদিগের মধ্যে প্রফুল্লতা ও কর্ম্মশক্তি বিস্তার করিত। তাঁহার চক্ষের দৃষ্টিতে তাঁহার অন্তরের মহত্ত্ব যেন ফুটিয়া উঠিত। তাঁহার গৃহ যেন পবিত্র দেবমন্দির ছিল। তিনি অতি সুচারু রূপে তাঁহার গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন, এবং এই কর্ত্তব্যপরায়ণতা বলেই সুচারুরূপে স্ত্রীমণ্ডলের নেতৃত্ব ও অন্যান্য জনহিতকর কার্য্য করিয়া যাইতে পারিয়াছেন।

তাঁহার নিজ ব্যক্তিত্বের প্রভাব ব্যতীত তাঁহার জীবনের সফলতার আর একটী প্রধান কারণ ছিল তাঁহার স্বামীর সাহায্য। মিঃ নগিনদাস পত্নীর সকল কার্য্যে প্রাণ খুলিয়া সাহায্য করিতেন। এই দম্পতির জীবন দাম্পত্য-জীবনের আদর্শ স্বরূপ ছিল। একজন ইংরেজ কবি আদর্শ দম্পতির কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :—

They joyed one joy, one grief they grieved
One love they loved, one life they lived.

বাস্তবিকই এই দম্পতি এক আনন্দে আনন্দিত, এক দুঃখে দুঃখিত হইতেন, তাঁহাদের ভালবাসার বন্ধ এক, তাঁহারা মিলিতভাবে একই জীবন যাপন করিতেন।

মিসেস সন্তাই প্রাচীনা ও নবীনা স্ত্রীলোকদের মধ্যে যৌগসূত্র স্বরূপ ছিলেন। সমাজসংস্কার সম্বন্ধে তাঁহার মত অতি উদার ছিল। নারীগণ এই কার্য্যের ভার গ্রহণ না করিলে প্রকৃত সমাজসংস্কার কিছুতেই হইবে না, এই তাঁহার মত ছিল। নারীরা যাহাতে সুচারুরূপে সমাজসংস্কার কার্য্য করিতে পারেন এই উদ্দেশ্যে তিনি উদাসীনতা পরিত্যাগ করিতে ও সুশিক্ষা লাভ করিতে নারীগণকে সর্ব্বদা উৎসাহিত করিতেন। তিনি বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার ব্যয়বাহুল্য হ্রাস, বাল্যবিবাহ রহিত করণ, আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুতে নিষ্ঠুর ও অশ্লীল ভাবে বক্ষে করাঘাত নিবারণ প্রভৃতি সংস্কারের চেষ্টা সর্ব্বদাই করিতেন। তিনি যাহা প্রচার করিতেন, নিজ জীবনে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতেন। তাঁহার বক্তৃতা অপেক্ষা তাঁহার জীবনই তাঁহার মতগুলি ভাল করিয়া প্রচার করিত। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার স্বামীর মৃত্যুকালে তাঁহাদের সমাজ-প্রচলিত বক্ষে করাঘাত প্রথা তিনি বন্ধ করিয়াছিলেন। হিন্দু বিধবার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তিনি সর্ব্বদাই উপদেশ দিতেন, স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি এই সকল উপদেশ অনুসারে চলিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন, আদর্শ হিন্দু-বিধবার জীবন কিরূপ হওয়া উচিত।

তিনি অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার পক্ষপাতিনী ছিলেন। দেশের কোটী কোটী অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকের মূর্খতা দূর করিবার জন্য অবৈতনিক লাইব্রেরীর প্রয়োজনীয়তা তিনি পুনঃ পুনঃ প্রচার করিয়াছেন। অবনত জাতির উন্নতির জন্য তিনি সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেন। আর্য্যসমাজ, প্রার্থনাসমাজ প্রভৃতি সুসংস্কৃত সমাজের সামাজিক সম্মিলনীতে তিনি নির্ভয়ে উপস্থিত হইতেন। মৃত্যুকালে উইল করিয়া তিনি ১৮ হাজার টাকা নানা সৎকার্য্যে দান করিয়া গিয়াছেন; ইহাতেই তাঁহার অসাম্প্রদায়িক ভাব ও হৃদয়ের মহত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে।

উপযুক্ত পাত্রে দান তাঁহার এত প্রিয় কার্য্য ছিল যে জীবদ্দশায় তাঁহার গৃহ যেন তীর্থস্বরূপ ছিল। এই জন্য জৈনগণ তাঁহাকে জৈনসম্প্রদায়ের মাতৃস্বরূপিনী মনে করিত। সকল দানে, সকল কথাবার্ত্তায় তিনি জৈন-নারীদিগের আত্মশক্তি বিকাশের পথ দেখাইয়া দিতেন। শুধু স্নান ধারণায় আত্মার মুক্তি হয় না, ঈশ্বরের জীব জন্তুদের সেবারূপ ভগবৎ সেবা দ্বারাই আত্মার মুক্তি হয়—তিনি এই মত প্রচার করিতেন। মিসেস সন্তাইয়ের শেষ চারিটী অভিলাষ এই :—(১) তাঁহার প্রথম অভিলাষ ছিল, বোম্বাই নগরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে গুজরাটী স্ত্রীমণ্ডলের শাখা প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং মূল সমিতির ন্যায় এই সকল শাখাসমিতি নারীজাতির কল্যাণচেষ্টা করিবে। (২) তাঁহার দ্বিতীয় অভিলাষ ছিল, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার উদ্দেশ্যে তিনি প্রতি বৎসর গুজরাট, কচ্ছ প্রদেশ ও কাথিয়াবারে ভ্রমণ করিবেন। (৩) তাঁহার তৃতীয় অভিলাষ ছিল, নিজে আশ্রমবাসিনী রূপে বোম্বাইয়ের বনিতাবিশ্রাম নামক বিধবাশ্রমে প্রবেশ করিয়া বৈধব্য জীবনের আদর্শ প্রচার করিবেন। তাঁহার মতে নরসেবাই ছিল বৈধব্য জীবনের আদর্শ। (৪) তাঁহার শেষ আকাঙ্ক্ষা ছিল, গুজরাটী স্ত্রী-মণ্ডলের একটী স্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণ করা। এই স্ত্রীমণ্ডলের সন্তানেরই কাজ করিয়াই তাঁহার অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ হইয়াছিল; এই স্ত্রীমণ্ডল বনিতাবিশ্রাম, সেবা-সদন প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা ও সফলতার পথ পরিষ্কার করিয়াছিল। একটী স্থায়ী বাসগৃহের অভাবে মণ্ডল-প্রতিষ্ঠিত বিবাহিতা স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার শ্রেণীগুলির অসুবিধা হয়, তিনি ইহা বিশেষ ভাবে অনুভব করিতেন। তাঁহার উইলে তিনি মণ্ডলের গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যে পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

আমরা খৃষ্টান, ব্রাহ্ম প্রভৃতি সুসংস্কৃত সমাজভুক্তা ভারত-মহিলার লোকহিতব্রতময় জীবনের কথা মাঝে মাঝে শুনিয়া থাকি, কিন্তু নিষ্ঠাবতী সধবা হিন্দুমহিলার এরূপ অপূর্ব্ব জীবনের পরিচয় ইতিপূর্ব্বে আর পাই নাই। ভগবান্ করুন হিন্দু সমাজে এরূপ মহিলার সংখ্যা বৃদ্ধি হউক।

শ্যামনগরের জমিদার

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

রামকমল বিদ্যালঙ্কারের কথা

(১)

সুখের বিষয়, বিজয়নারায়ণ সাগরিকাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছে। সে আমার নিকট অকপট-চিত্তে বলিল যে, "সেই মধ্যাহ্নভোজনের দিন সাগরিকাকে দেখিবার পর হইতেই সাগরিকার প্রতি আমি আকৃষ্ট হইয়াছি। আমার মনের ভাব আমি প্রথমে ঠিক বুঝিতে পারি নাই। আপনার ইঙ্গিতের পর হইতেই যা অস্পষ্ট ছিল তা স্পষ্ট হইয়াছে। এখন যে সাগরিকাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইতেছি তা বিলাত যাইবার লোভে নয়। তা সাগরিকাকে পত্নী-রূপে পাইবার জন্য। তারপর বিলাত যাওয়া ঘটিয়া উঠে উত্তম। কিন্তু এই বিবাহ হইলে আমার দাদার সহিত আমার মনোমালিন্য বৃদ্ধি হইবে। তিনি আমাকে বাড়ীতে ঢুকিতে দিবেন না।"

আমি। কেন?

বিজয়। আমার দাদা ভয়ানক গোঁড়া। তিনি শুচিবায়ুগ্রস্ত। তিনি দিনে তিনবার স্নান করেন। সাগরিকার পিতা বিলাত গিয়াছেন। এমত অবস্থায় আমি সাগরিকাকে বিবাহ করিলে আমার দাদাই সর্ব্বাগ্রে আমাকে সমাজে বদ্ধ করিবেন।

আমি। তুমি সেজন্য ভীত হইতেছ নাকি?

বিজয়। না। তাহা হইলে আমি বাড়ী ছাড়িয়া পলায়ন করিতাম না।

আমি। ওসম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও। আমি তোমার দাদাকে আমাদের মতাবলম্বী করিতে পারিব।

(২)

বিবাহকার্য্য কলিকাতায় অতি গোপনে সম্পন্ন হইল। কালীঘাটে পূজা দেওয়া ও গঙ্গাস্নান উপলক্ষ করিয়া সাগরিকাকে সঙ্গে করিয়া সাগরিকার মাতা ও মাতামহী কলিকাতায় গেলেন। কলিকাতায় তাঁহাদের যে বৃহৎ বাটী ছিল তাহাতেই অবস্থান করিলেন। তাঁহাদের কলিকাতা যাইবার পর দিবস হরকুমার ও আমি শ্যামনগর হইতে কলিকাতা গেলাম। সেই দিনই সরলপুর হইতে বিজয়নারায়ণকে সঙ্গে করিয়া যোগেশচন্দ্র, রমানাথ ও জাহ্নবীকান্ত কলিকাতায় রওয়ানা হইলেন। একটী নূতন বাসা ভাড়া করা হইল। তখন গ্রীষ্মাবকাশের জন্য স্কুল কলেজাদি বন্ধ হইয়াছে। সেজন্য কলিকাতার মফঃস্বলের ছাত্র ও শিক্ষকাদি বড় একটা কেহ নাই। দুই দিবসের মধ্যেই বিবাহের সমস্ত আয়োজন যথা-সম্ভব গোপনে সম্পন্ন করিয়া বিজয়নারায়ণের হস্তে সাগরিকাকে সমর্পণ করা হইল। সাগরিকাকে সাগরিকার মাতা দান করিলেন। পাত্রকর্ত্তা হইলেন আমার একজন সতীর্থ। তিনি কলিকাতাবাসী ও ন্যায়ালঙ্কার উপাধিধারী। কলিকাতায় আমাদের যে সকল পরিচিত আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধব ছিলেন তাঁহাদিগকে সেই বিবাহে নিমন্ত্রণ করা হইল। এই নিমন্ত্রণ করা হইল—যে রাত্রিতে বিবাহ সেই দিবস সন্ধ্যার সময়। এই সাবধানতা অবলম্বন করিবার কারণ এই যে, পাছে রায়বাহাদুর বা তাহার পক্ষীয় লোকেরা এই বিবাহের বিষয় জানিতে পারিয়া ইহাতে কোন-রূপ বাধা দেয় বা কোনরূপ গোলযোগ উপস্থিত করে। বিবাহ-বাটী সুরক্ষিত করিবার জন্য কয়েক জন বাঙ্গী লাঠিয়ালকেও শ্যামনগর হইতে সঙ্গে আনা হইয়াছিল। নির্ব্বিঘ্নে বিবাহকার্য্য নিষ্পন্ন হইল। সাগরিকার মাতা জামাতাকে দশহাজার টাকা নগদ দিলেন এবং তদুপযুক্ত দানসামগ্রী দিলেন। সাগরিকাকে যে কত অলঙ্কার দিলেন তা আর কি বলিব। রমানাথ, হরকুমার, যোগেশচন্দ্র, জাহ্নবীকান্ত ইঁহারা প্রত্যেকেই বিজয়নারায়ণ ও সাগরিকাকে বহুমূল্য যৌতুক দিলেন। আমিও যৎকিঞ্চিৎ দিলাম।

বিবাহান্তে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করিয়া বিদায় হইলেন। নির্ব্বিঘ্নে বিবাহের রাত্রি কাটিয়া গেল।

যথাবিধি কন্যাবিদায় হইল। কন্যাবিদায়ের সময় সাগরিকাকে বিজয়নারায়ণের হাতে সমর্পণ করিয়া দিয়া, মাতামহী কাঁদিতে কাঁদিতে জামাতাকে বলিলেন,

"বাবা, তোমার হাতে আমার সাগরিকাকে সঁপিয়া দিলাম। সাগরিকা বড় ভাল মেয়ে। ওকে আদর করিও। তুমি সুবোধ ছেলে, তোমাকে বেশী আর কি বলিব। তোমার নাকি বিলাত যাইবার ইচ্ছা আছে। বিলাত যাওয়ার কথা শুনিলে আমার ভয় হয়। বাবা, তুমি বিলাত যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ কর। তুমি এখন বিলাত গেলে আমি দুশ্চিন্তায় মরিয়া যাইব।"

বিজয়নারায়ণ তাহার শাশুড়ীর কথায় বিচলিত হইয়া বলিল, "না মা, আপনি চিন্তিত হইবেন না। আমার এখন আর বিলাত যাইবার ইচ্ছা নাই। সরলপুরের বিজ্ঞান-কলেজে যেরূপ উন্নত প্রণালীতে বিজ্ঞান শিক্ষার আয়োজন হইয়াছে তাহাতে আমার আর বিলাত যাইবার প্রয়োজন না-ও হইতে পারে। বিজ্ঞান শিক্ষার জন্যই আমার বিলাত যাওয়ার ঝোঁক ছিল। আমার ইচ্ছা আছে সরলপুরের বিজ্ঞান-কলেজে কয়েক বৎসর পড়িব।"

মালবিকা। বাবা, তোমার কথা শুনিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম।

(৩)

তারপর বিজয়নারায়ণ সাগরিকাকে লইয়া তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট বাসাবাটীতে আসিল। আমার ব্যারিষ্টার-বন্ধুর পত্নী, পুত্রবধূ ও কন্যারা, নববধূ সাগরিকাকে বরণ করিয়া লইয়া যাইবার জন্য বিজয়-নারায়ণের জন্য নির্দ্দিষ্ট বাসাবাটীতে পূর্ব্ব হইতেই আসিয়া ছিলেন। তাঁরা পরম আদরে নববধূ বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন। বিবাহের পরবর্ত্তী ফুলশয্যা পাকস্পর্শ প্রভৃতি অনুষ্ঠান সেই বাসাতেই সম্পন্ন হইল। পাঁচ ছয় দিবস অতিবাহিত হইল। তৎপর জামাতা বিজয়নারায়ণকে সাগরিকার সহিত কলিকাতার বাটীতে আনয়ন করা হইল। বিজয়নারায়ণ, সাগরিকা, সাগরিকার মাতা, সাগরিকার মাতামহী, কয়েকজন দাসী ও কয়েকজন ভৃত্য সহ আরও কিছুদিন কলিকাতার বাটীতে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আমরা আর সকলে কলিকাতা ত্যাগ করিলাম।

ক্রমে এই বিবাহের কথা সকলেই শুনিলেন। বিজয়-নারায়ণের দাদা এই সংবাদ পাইয়া চটিয়া আগুন হইলেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতাকে লিখিলেন, "তুমি আমার মত না লইয়া সমাজচ্যুত বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়ের পৌত্রীকে বিবাহ করিয়াছ। তোমার জাতি গিয়াছে, ধর্ম্মও গিয়াছে। যে ম্লেচ্ছদেশগত লোকের কন্যাকে বিবাহ করে সে আর হিন্দু থাকে না। সে ম্লেচ্ছ হইয়া যায়, তাহাকে খৃষ্টান্ বলিলে দোষ হয় না। ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলে, সে ব্যক্তি পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। আমাদের গ্রামের স্মৃতি-রত্ন মহাশয় আমাকে এই ব্যবস্থা দিয়াছেন। তুমি পৈতৃক সম্পত্তির এক কপর্দ্দকও পাইবে না। আজ হইতে তোমার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ রহিল না।"

(৪)

রায়বাহাদুর বিশ্বনাথ এই বিবাহের সংবাদ পাইয়া ক্ষ্যাপা কুকুরের মত হইলেন। তিনি কল্পনায় যে আকাশ-কুসুম রচনা করিতেছিলেন, যে সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, তাহা যেন ভোজবাজির মত কোথায় মিলাইয়া গেল। কিন্তু তিনি কিছুতেই দমিবার পাত্র নহেন। ম্যানেজার সিঙ্ক ও সরলপুরের কালেক্টারকে হাত করিয়া তিনি নানা রকমের এক চাল চালিলেন। "কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কর্ত্তৃপক্ষদিগের বিনা অনুমতিতে ও তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে এই বিবাহ সংঘটিত হওয়ার কথা শুনা যাইতেছে। এইরূপ বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকিলেও তাহা অসিদ্ধ।" সুতরাং কোর্ট অব ওয়ার্ড-সের কর্ত্তৃপক্ষের এই বিবাহ অসিদ্ধ করিবার উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সরলপুরের কালেক্টারকে রায়বাহাদুর বুঝাইলেন যে তাঁহার অজ্ঞাতসারে বিষ্ণু-বাবুর পৌত্রীর যাঁহারা বিবাহ দিয়াছেন, তাঁহারা প্রকারান্তরে কালেক্টর সাহেবেরই অপমান করিয়াছেন। কালেক্টারটী আনকোরা বিলাতী। অতি অল্পদিন হইল এদেশে আসিয়াছেন। তিনি রায়বাহাদুরের যুক্তির সারবত্তা বুঝিতে পারিয়া এসম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্য নবনিয়োজিত সরকারী উকিল অবলা বাবুকে ডাকিলেন।

অবলা বাবু তোষামোদের বলে সরকারী উকিল হইয়াছিলেন। তাঁর বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় বড় একটা ছিল না। সাধারণ লোকে তাঁকে "জল উঁচু" উকিল বলিত। রায়বাহাদুর অবলাবাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং অবলাবাবুর সরকারী উকিল নিযুক্ত হওয়া ব্যাপারে রায়বাহাদুর যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। রায়বাহাদুর অবলা বাবুকে পূর্ব্ব হইতেই তালিম করিয়া রাখিয়াছিলেন।

অবলাবাবুর পরামর্শ অনুসারে সরলপুরের সব জজ আদালতে, "বিষ্ণুবাবুর পৌত্রী সাগরিকার সহিত, বিজয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের যে বিবাহ কয়েক দিবস হইল কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সেই বিবাহ কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কর্ত্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে ও অজ্ঞাতসারে হওয়ায় তাহা অসিদ্ধ, ঐ বিবাহ দ্বারা পূর্ব্বোক্ত বিজয়নারায়ণের সহিত বিষ্ণুপদবাবুর পৌত্রী সাগরিকার স্বামীস্ত্রী সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই," এইরূপ অর্থে বিজ্ঞাপনী ডিক্রী পাইবার জন্য কোর্ট অব ওয়ার্ডসের পক্ষ হইতে ম্যানেজার বাদী হইয়া এক নালিশ রুজু করিলেন। বিষ্ণুবাবুর সম্পত্তি হইতে এই নালিশের ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। বিজয়নারায়ণ, হরকুমার, রমানাথ, যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জাহ্নবীকান্ত মালবিকা ও মালবিকার মাতা ও আমাকে এই মোকদ্দমায় প্রতিবাদী করা হইল।

এই মোকদ্দমা রুজু হওয়ার সংবাদ পাইয়া আমি কিছু উদ্বিগ্ন হইলাম। যোগেশচন্দ্র বলিলেন, "কোন চিন্তা নাই। এ মোকদ্দমার কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ পক্ষে গোহরে হইবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কৃপা

(১)

বিজয়নারায়ণের সহিত সাগরিকার বিবাহ অসিদ্ধ করিবার জন্য কোর্ট অব ওয়ার্ডসের পক্ষ হইতে ম্যানেজার স্বিড যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছেন সেই মোকদ্দমা সবজজ নবকান্ত বাবুর আদালতে রুজু হইয়াছে। এই নবকান্ত বাবু অতি ভয়ানক লোক। তাঁহাকে কলির চেলা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সংসারে এমন কোন দুষ্কর্ম্ম নাই যাহা তিনি করিতে দ্বিধা বোধ করেন। তাঁহার পিতা প্রথমে জজকোর্টের পেশকার ছিলেন। মুনিব জজদিগকে তিনি পিতৃসম্বোধন করিয়া তুষ্টিলাভ করিতেন। একবার এক জজের স্ত্রীবিয়োগ হয়। নবকান্ত বাবুর পিতা কিশোরকান্ত সেই জজের পেশকার ছিলেন। সেই জজটী ইংরেজ ও সিভিলিয়ান। জজ সাহেবের পত্নীবিয়োগের সংবাদ পাইয়া কিশোরকান্ত পেশকার কান্না গলায় দিয়া নগ্নপদে জজ সাহেবের কুঠীতে উপস্থিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। জজ সাহেব কিশোরকান্তের এইরূপ বেশ দেখিয়া সহানুভূতি-পূর্ণ-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিশোর বাবু, তুমি কাঁদিতেছ কেন? তোমার কি হইয়াছে?" কিশোরকান্ত ক্রন্দনের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া বলিলেন, "হুজুর, আমার মাতাঠাকুরাণীর মৃত্যু হইয়াছে।" এই বলিয়া দেওয়ালে মাথা ঠুকিতে লাগিলেন। জজ সাহেব কিশোরকান্তের উক্ত কার্য্যে বাধা দিয়া বলিলেন, "আহা! বড় দুঃখের বিষয়। তোমার মাতার কি পীড়া হইয়াছিল?" কিশোরকান্ত বলিলেন, "হুজুর, আমার সে মা বহুকাল হইল মারা গিয়াছেন। আমার মেম সাহেব মাতার মৃত্যুর জন্য আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। হুজুর এখন আপনিই আমার পিতা।" এতক্ষণে জজসাহেব কিশোরকান্তের রোদনের মর্ম্ম কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তা আর কাঁদিয়া কি হইবে? আর কাঁদিও না। তোমার কথা আমার চিরকাল মনে থাকিবে।" কিশোরকান্ত আভূমি প্রণত হইয়া সাহেবকে সেলাম করিয়া চলিয়া আসিলেন। এই ঘটনার কয়েক মাস পরেই সেই জজ সাহেব কিশোরকান্তকে জজ আদালতের সেরেস্তাদার নিযুক্ত করিলেন। এই জজ সাহেব কালে হাইকোর্টের জজ হইলেন। কিশোরকান্ত প্রতি বৎসর অন্ততঃ দুইবার করিয়া সেই জজ সাহেবের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে সেলাম বাজাইয়া আসিতেন। নবকান্ত বাবু কিশোরকান্ত বাবুর সাতটি পুত্রের মধ্যে পঞ্চম পুত্র। ইনি কোন পঙ্‌ক্তিকে অনেক চেষ্টা চরিত্র করিয়া, এক, এ, পাশ

করিবার পর কমিটীর ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উকিল হইলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে কিশোরকান্ত বাবুর অক্লান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও নবকান্তের বরাত ফুটিল না। তখন কিশোরকান্ত পুত্র নবকান্তকে সঙ্গে করিয়া একদিন কিশোরকান্তের সেই মুরুব্বী হাইকোর্টের জজবাহাদুরকে ধরিলেন। সেই সময় সেই জজ সাহেব বাহাদুরের হস্তে মুনসেফ নিয়োগের ভার ছিল। সুতরাং অল্পায়াসে অল্পদিনের মধ্যেই নবকান্ত মুনসেফে নিযুক্ত হইলেন।

মুনসেফ নিযুক্ত হইয়া নবকান্তের একমাত্র চেষ্টা হইল কেমন করিয়া উপরওয়ালাকে সন্তুষ্ট করিয়া চাকরী বজায় রাখা যায়। নবকান্তরা সাত ভাই। নবকান্ত ব্যতীত আর ছয়টিই গণ্ডমূর্খ। কাহারও একটি পয়সা উপার্জ্জন করিবার ক্ষমতা নাই। তাহাদের সকলেই বিবাহিত এবং সকলের প্রতিই মা ষষ্ঠীর কৃপার অভাব ছিল না। নবকান্ত বাবুকে সুবৃহৎ পরিবার প্রতিপালন করিতে হইত। ইহার উপর তাঁহার উপার্জনবিমুখ বা উপার্জনে অশক্ত সম্বন্ধী অর্থাৎ পত্নীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার পুত্র কন্যা পত্নী প্রভৃতি সহ নবকান্ত বাবুর স্কন্ধে ভর করিয়াছিলেন। এই সমস্ত সুপোষ্য ও কুপোষ্য দিগের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিতে, নবকান্ত বাবু মুনসেফী করিয়া যা বেতন পাইতেন তাঁর এক কপর্দ্দকও বাঁচিত না। মুনসেফ মহাশয়েরা অধিকাংশ স্থলেই কৃপণ হইয়া থাকেন। সেই জন্য কবি রজনীকান্ত মুনসেফ মহাশয়দিগের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে "বছরে বছরে বাড়ে মাইনে, সব জমা করি কিছু খাইনে।" কিন্তু নবকান্ত বাবুর যে মাইনেও কিছুই বাঁচে না তার কি হইবে ?

সম্বন্ধী মদনমোহনের পরামর্শ অনুসারে অবশেষে নবকান্ত বাবু অর্থ সঞ্চয়ের একটি অতি সুন্দর উপায় বাহির করিলেন। মদনমোহনকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া তিনি তাঁহার আদালতে মোকদ্দমাকারীদিগের নিকট উৎকোচ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এইরূপ কার্য্য অবাধে চলিতে লাগিল। মুনসেফদিগকে কোন স্থানে দুই তিন বৎসরের বেশী থাকিতে হয় না। সেই জন্য নবকান্ত বাবুর উৎকোচ গ্রহণ সম্বন্ধে বাজারে নানা কথা রটিলেও তাঁহাকে যাতে কলমে কেহ ধরিতে পারিল না। তবে সাধারণ লোকেরা এটা বেশ বুঝিয়া যে গরীব আর বড়লোকের মধ্যে মোকদ্দমা হইলে নবকান্ত বাবুর বিচারে বড়লোকের পক্ষ নিশ্চয়ই জয়লাভ করিবে। তোষামোদ বিদ্যায় নবকান্ত বাবু তাঁহার পিতা কিশোর-কান্তকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন।

কয়েক বৎসর হইল নবকান্ত বাবু সবজজ হইয়াছেন। তথাপি তাঁহার পূর্ব্বরোগের শান্তি হয় নাই। সুতার নাম্বার ম'লে। এক বৎসর হইল নবকান্ত বাবু সরলপুরের সবজজ হইয়া আসিয়াছেন। এই সবজজ বাবুর আদালতে পূর্ব্বোক্ত বিবাহ-রহের মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে।

(৩)

এই মোকদ্দমা রুজু হইবার পর দেশীয় লোকদিগের পরিচালিত সংবাদপত্রে এই বিষয়ের আন্দোলন হইতে লাগিল। সেই সকল সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা এইরূপ আগুবাক্য ও অসঙ্গত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার জন্য কোর্ট অব ওয়ার্ডসকে দোষ দিলেন এবং এই মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার আদেশ দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ঘ্যাংলোইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা জোর কলমে লিখিলেন যে, "এই বিবাহ যদি রদ না হয়, তাহা হইলে এ দেশে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের প্রতিপত্তি থাকিবে না। গবর্ণমেণ্টের আদেশ লঙ্ঘন করিতে কাহারও দ্বিধা বোধ হইবে না তাহা হইলে এ দেশ শাসন করা অসম্ভব হইয়া পড়িবে। দেওয়ানী মোকদ্দমা চলিতেছে চলুক। যাঁহাদের ষড়যন্ত্রে এই বিবাহ সংঘটিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা চলে কিনা, সেই বিষয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের আইন বিষয়ক পরামর্শদাতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হয়। ইত্যাদি ইত্যাদি।"

গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলিলেন না। মন্থর গতিতে মোকদ্দমা চলিতে লাগিল। এই মোকদ্দমা দায়েরের সঙ্গে সঙ্গে বাদীপক্ষ নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটি সাময়িক নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করিলেন :—'এই বিবাহ রদের মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত এই মোকদ্দমার

অন্যতম প্রতিবাদী বিজয়নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সাগরিকা দেবীর সহিত এক বাটীতে বাস করিতে পারিবেন না, বা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন না।' মোকদ্দমা যেমন অদ্ভুত, পূর্ব্বোক্ত প্রার্থনা আবার ততোধিক অদ্ভুত! কিন্তু হইলে কি হয়! নবকান্ত বাবুর এজলাসে কাকন বলো কি না হইতে পারে? তিনি এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া বিজয়নারায়ণের উপর নোটীশ জারী করিলেন। বিজয়নারায়ণ এই নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদ করিয়া তাহা রদ করিবার জন্য দরখাস্ত করিল। নবজজ মহাশয় বিজয়নারায়ণের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া সাময়িক নিষেধাজ্ঞার আদেশ বলবৎ রাখিলেন। এই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল হইল। হাইকোর্টের শ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টার ও শ্রেষ্ঠ উকিলকে বিজয়নারায়ণের পক্ষে নিযুক্ত করা হইল। তাঁহারা এই আপীল প্রধান বিচারপতির এজলাসে দাখিল করিয়া অতি শীঘ্র এই আপীল নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয়তা প্রধান বিচারপতিকে বুঝাইয়া বলিলেন। তদনুসারে এক সপ্তাহের পর আপীল শুনানীর দিন নির্দ্দিষ্ট হইল। অপর পক্ষের উপর রীতিমত নোটীশ জারী করা হইল। এই আপীলের শুনানীর সময় এড্‌ভোকেট জেনারেল কোর্ট অব ওয়ার্ডসের পক্ষে নিযুক্ত হইলেন। আপীল শুনানীর সময় আদালতে খুব হাসাহাসি হইল। প্রধান বিচারপতির সহিত একজন এদেশীয় হিন্দুজজ এই আপীল শুনিলেন। আপীলে বিজয়নারায়ণের জয় লাভ হইল। খরচাসহ আপীল ডিক্রী হইল। আপীলের রায়ে জজদ্বয় স্পষ্টবাক্যে বলিলেন, "মূল মোকদ্দমাই অচল। সাগরিকা কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে নাই। সুতরাং এই সাময়িক নিষেধাজ্ঞা টিকিতে পারে না। এইরূপ নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত করা নিম্ন আদালতের অত্যন্ত অবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে।" আমরা মনে করিলাম, হাইকোর্টের এই অভিমতের পর, কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কর্ত্তাদের বোধ হয় চৈতন্য হইবে, তাঁহারা এ মোকদ্দমা আর চালাইবেন না। কিন্তু ও বাবা! আপীলে হারিয়া তাঁহাদের জিদ্ অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। তাঁহারা মূল মোকদ্দমা ত ছাড়িলেনই না, উপরন্তু ঐ নিষেধাজ্ঞার আপীলের হুকুমের বিরুদ্ধে প্রিবি কাউন্সিলে আপীল হইতে পারে কিনা তৎসম্বন্ধে আইনজ্ঞগণের মত সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

এই সময় নবকান্ত বাবু সরলপুর হইতে বদলি হইয়া গেলেন।

সাগরিকার কথা

(১)

আমার বিবাহ রদের মোকদ্দমাটি আমার স্বামী জিতিয়াছেন। এই মোকদ্দমার কথা শুনিয়া আমি হাসি রাখিতে পারি নাই। নারায়ণ সাক্ষী করিয়া বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যে বিবাহ হইয়াছে, তাহা রদ হইবে কেমন করিয়া? সতী-সাবিত্রী-সীতা-দময়ন্তীর দেশে হিন্দুর মেয়ের বিবাহ ইংরেজ আইন-আদালতের রদ করার সাধ্য নাই। কমলা পিসি আমার মাতাকে বলিয়াছিলেন যে, পিসে মহাশয়ের মতে এ মোকদ্দমা টিকিবে না, কেহ যেন এজন্য চিন্তিত না হ'ন। আর কাহারও কোনরূপ চিন্তা হইয়াছিল কিনা জানি না, আমি এসম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিলাম। স্বামী মহাশয় যেন কিছু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। তা ছাড়া ভাসুর মহাশয় স্বামী মহাশয়ের উপর খড়্গ-হস্ত হইয়া তাঁহাকে পৈতৃক বিষয়ের অংশ দিবেন না প্রকাশ করায় এবং তাঁহার সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিবেন না বলায়, স্বামী মহাশয় বড় কম উদ্বিগ্ন হ'ন নাই। কিন্তু এখন সে সব আপদ চুকিয়াছে। ভাসুর মহাশয়ের একমাত্র পুত্র যোগেন্দ্র, তাহার পিতাকে না জানাইয়া, বিলাতে পলায়ন করিয়াছে। যোগেন বিলাত হইতে তাহার পিতাকে লিখিয়াছে যে, "আমি এখানে ডাক্তারী পড়িবার জন্য আসিয়াছি। আপনি দয়া করিয়া আমাকে পড়িবার খরচ দিবেন। যদি না দেন তাহা হইলে আমি পৃষ্ঠান হইব, না হয় চলন্ত রেলগাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিব। আপনি বা মাতা-ঠাকুরাণী আমাকে আর দেখিতে পাইবেন না।" এই পত্র পাইয়া ভাসুর মহাশয় খুব ভয় পাইয়াছেন। যোগেনের মাতার সহিত ভাসুর মহাশয়, পূর্ব্বে কোন প্রকার সংবাদ না দিয়াই হঠাৎ আমাদের কলিকাতার

বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আমার মাতা ও মাতামহী, আমার শ্বশুর মহাশয়ের ও মা ঠাকুরাণীর যে কেমন করিয়া আদর ও যত্ন করিবেন তাহা খুঁজিয়া পাইতেছেন না। তাঁহারা আনন্দে অধীর হইয়াছেন। শ্বশুর মহাশয় আমার বিবাহের সময় যেমন বিরক্ত হইয়াছিলেন, এখন আবার আমাদের উপর তেমনি সদয় হইয়াছেন। আমাকে যৌতুক স্বরূপে বহু মূল্যের বস্ত্র ও অলঙ্কার দিয়াছেন। আমার বড় মা আমাকে যে কত আদর করিতেছেন তা আর কি বলিব। তিনি স্বামী মহাশয়ের হাতে ধরিয়া বলিয়াছেন, "ঠাকুরপো, যোগেন বিলাত গিয়ে যাহাতে ভাল থাকে, তাহার উপায় কর। আমি জানি, বিলাতে তোমার শ্বশুরের অনেক আত্মীয় লোক আছেন। তাঁহাদিগকে লিখিয়া যোগেনের থাকিবার ও পড়াশুনার ভাল বন্দোবস্ত করিয়া দাও। তাহা না হইলে আমি বাঁচিব না। একালের ছেলেদের বিলাত যাওয়ার কি যেন ঝোঁক উঠিয়াছে। তোমাকে তোমার মার মৃত্যুর পর কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছি। তুমি "বিলাত যাইব" "বিলাত যাইব" বলিয়া তোমার দাদার সঙ্গে কগড়া করিয়া বাড়ী ছাড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছ। তোমার ভাইপোটি আবার তার খুড়ার চেয়ে এক কাটি বাড়া। সে একদম বিলাতে গিয়া হাজির হইয়াছে। তোমরা এই রকম করিয়া তোমার দাদাকে আচ্ছা জব্দ করিয়াছ। তুমি সাগরিকাকে বিবাহ করিয়াছ শুনিয়া ত তিনি রাগে মারমূর্ত্তি! আমি কত বোকাই, তা কি মানেন! অমন ভায়ের মুখ দেখিবেন না, তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখিবেন না, তার জাতি গিয়াছে। এখন দেখুন মজা! এইবার তোমার দাদার চৈতন্য হইয়াছে। এইবার তুমি তাঁকে সান্ত্বনা করিয়া যোগেনের বিলাতে থাকিবার ভাল বন্দোবস্ত করিয়া দাও। আর যত শীঘ্র পার তার কাছে টাকা পাঠাইয়া দাও।" স্বামী মহাশয় তাঁর ভাজ ঠাকুরাণীকে শান্ত করিয়া যোগেনের জন্য যা করা দরকার সে সমস্তই করিবেন বলিয়াছেন।

দিদি ঠিক বলিয়াছেন। এখনকার যুবকদের বিলাত যাওয়ার ঝোঁকটা যেন একটা রোগের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। তাঁদের ভাবগতিক দেখিয়া কথাবার্ত্তা শুনিয়া মনে হয়, যেন বিলাত না গেলে মানবজন্ম বৃথাই গেল। বিলাত এখন তাঁদের কাছে, গয়া গঙ্গা বারাণসী অপেক্ষাও যেন পবিত্রতর তীর্থ স্থান। আমার স্বামী মহাশয়কে ত এ রোগে পূরামাত্রায় ধরিয়াছিল, এখন যদিও রোগ সারিয়াছে তথাপি এখনও যেন একটু ঘোর রহিয়াছে। এখনও মধ্যে মধ্যে মাথা নাড়া দেন, নেহাৎ আমার মায়ের চক্ষের জলের ভয়ে এবং কতকটা আমার অনুনয় বিনয়েও বটে, ও বিষয়ে এখন ত কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। কাহারও বিলাত যাওয়ার কথা শুনিলে আমার মনে কেমন ভয় হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত।

প্রার্থনা

(পরলোকগত লেখিকার অপ্রকাশিত পুস্তক "বৈশাখী" হইতে)

১

আজি মান-অপমান, সকলি সমান,
যশঃ অপযশঃ তুল ;
স্নেহ-অনাদর, বিভব-অভাব
কাটুক মোহের ভুল।

(২)

আজি ধূলির মতন কর অবনত
সবারি চরণতলে,
সব মলিনতা ভাসাইয়া দাও
তাপিত নয়ন-জলে।

(৩)

আজি রবির মতন উজল আভায়
দাঁড়াও জীবন-পথে,
হৃদয়-বাহির হোক্ আলোকিত
তাহারি আলোক পাতে।

৪

আজি কর গো বিকাশ জীবন-মুকুল
ও পদ পূজার তরে,

বিফল জনম　　হউক্ সফল
তাহারি আশীষ বরে।

১৩২২।৯ই মাঘ, শনিবার।　　শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত।

মানরক্ষা

খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে রোম নগরে ভার্জ্জিনিয়াস নামে একজন উচ্চপদস্থ সৈনিক বাস করিতেন। তাঁহার অধীনে এক শত যোদ্ধা সর্ব্বদা সশস্ত্র থাকিত। ভার্জ্জিনিয়াস এই মুষ্টিমেয় সৈন্য দ্বারা অনেক অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেও দ্বিধা বোধ করিতেন না। কাজেই তাঁহার বীরত্বের কথা যে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে তাহাতে কিছুই বিচিত্রতা ছিল না। ভার্জ্জিনিয়াস এত করিয়াও জীবনে সুখী হইতে পারেন নাই। কারণ ভগবান তাঁহাকে পুত্রসন্তান হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। তবে সান্ত্বনার কথা, ভার্জ্জিনিয়াস একেবারে নিঃসন্তান ছিলেন না। ভার্জ্জিনিয়া নামে তাঁহার এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। এই কন্যাই অপুত্রক ভার্জ্জিনিয়াসের সমস্ত বুক খানি জুড়িয়া বসিয়াছিল। পিতা যাহা করিতেন সমস্তই এই কন্যাটির মুখের দিকে চাহিয়া করিতেন। ভার্জ্জিনিয়াকে তাঁহার অদেয় কিছু ছিল না।

ভার্জ্জিনিয়া ক্রমে শৈশব অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিল। এখন তাহার বিবাহ দিতে হইবে। লুসিয়াস্ নামে তথায় ভার্জ্জিনিয়াসেরই সমকক্ষ আর এক যুবক সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। ভার্জ্জিনিয়াস বহু দিন পূর্ব্ব হইতেই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সচ্চরিত্র সাহসী বীর লুসিয়াসের করে স্নেহের কন্যাকে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন। লুসিয়াসও তাহার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া মনে মনে ভার্জ্জিনিয়াকেই জীবনের সঙ্গী করিয়া লইবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহের দিনেই কন্যার দর্শন লাভে বঞ্চিত হইতে হইবে, এই ভাবনায় এ বিষয়ে ভার্জ্জিনিয়াসের কোন ব্যস্ততা ছিল না। দিন যাইতে লাগিল। এমন সময় এক দুর্ঘটনা সংঘটিত হইল।

ক্লডিয়াস (Claudius) তখন রোমের রাষ্ট্রনায়ক। পঞ্চাশীত, যৌবনমদমত্ত ক্লডিয়াস নায়কপদে উন্নীত হইয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করিত। একেই তখন অভিজাত বংশীয়দের (Patricians) প্রবল আধিপত্যের দিন; তাহাদের অত্যাচারে দরিদ্র Plob বা মধ্যবিত্ত জনসাধারণ ভীত, সন্ত্রস্ত ও দুঃশাগ্রস্ত। তাহার উপর ক্লডিয়াস যখন দেশনায়ক (Decemvir) হইলেন তখন দরিদ্র, হতভাগ্য 'প্লেব' (Plob) দিগের দুর্দ্দশা দেখে কে! কে তাহাদের করুণ ক্রন্দনে কর্ণপাত করে!

কুমারী ভার্জ্জিনিয়া এখন আর নিতান্ত বালিকা নহে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহলতা অপরূপ সৌন্দর্য্যপ্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। তখনকার সেই নবযৌবনা সুন্দরী ভার্জ্জিনিয়ার ঢল ঢল কুসুম-সুকুমার দেহখানি, তাহার সেই ব্রীড়ানত চঞ্চল সচপল অথচ মৃদু পাদক্ষেপ একবার যাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিত, সেই মুগ্ধ হইয়া পড়িত। ক্রমে তাহার এই অপরূপ রূপ লাবণ্যের কথা ক্লডিয়াসের কাণে গেল। তখন ভার্জ্জিনিয়াকে লাভ করিবার জন্য ক্লডিয়াস উন্মত্ত হইয়া উঠিল। প্রথমত সে বালিকার পিতার নিকট তাহার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিল, শেষে উৎকোচ ও অনেক প্রলোভন দ্বারা তাঁহাকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ভার্জ্জিনিয়াস তেমন লোক ছিলেন না। রাষ্ট্রনায়ক ক্লডিয়াস সম্ভ্রান্ত বংশীয়। তাঁহার সঙ্গে বিবাহে কোনই আপত্তি থাকিতে পারে না। বরং অনেকের পক্ষে এইরূপ সম্বন্ধ একটা সৌরবের বিষয়। তথাপি ভার্জ্জিনিয়াস ক্লডিয়াসের সমস্ত প্রস্তাব ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিলেন। তিনি জানিতেন, ক্লডিয়াসের মত দুশ্চরিত্র লোকের সহিত ভার্জ্জিনিয়ার বিবাহ কোন মতেই সুখের হইবে না। ক্লডিয়াস তখন জ্ঞানহারা—উন্মত্ত। পিতাকে কিছুতেই বশীভূত করা গেল না ভাবিয়া সে মনে মনে এক দুরভিসন্ধি করিল। রোমের ইতিহাসে পাপাত্মা ক্লডিয়াসের সেই ঘৃণিত নীচ আচরণের কথা অনন্ত অক্ষরে লিখিত আছে।

কুমারী ভার্জিনিয়া একদিন প্রাতে হাঁটিয়া স্কুলে যাইতেছে,—আর খানিক দূর গেলেই স্কুল। সঙ্গে এক-মাত্র পরিচারিকা। এমন সময় কোথা হইতে এক ব্যক্তি সহসা দৌড়িয়া আসিয়া ভার্জিনিয়ার হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে সবলে আকর্ষণ করিতে লাগিল, বলিয়া উঠিল "তবে রে চাঁদ, এখন যাও কোথা!" সহসা অতর্কিত আক্রমণে পরিচারিকা ভয় পাইয়া 'কে কোথায় আছ গো, রক্ষা কর' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তাহার চীৎকারে অনেক লোক জড় হইল। আক্রমণকারী যুবক তখন বলিতে লাগিল, "এ যে আমার দাসী-কন্যা।" বালিকা বলিল, "না তা নয়, আমি ভার্জিনিয়াসের কন্যা।" উত্তরে সেই লোকটি বলিল, "মিথ্যা কথা, ভার্জিনিয়াসের কখনও কোন সন্তান হয় নাই, এ আমার দাসী কন্যা। ভার্জি-নিয়াসের স্ত্রী নিঃসন্তান ছিলেন বলিয়া তাহাকে ইহার লালন পালনের ভার দেওয়া হইয়াছিল।" বাদানুবাদ-ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে, কেহই কিছু মীমাংসা করিতে পারিতেছে না। তখন সকলেই বিচারার্থ দেশ-নায়ক ক্লডিয়াসের নিকট যাইতে বলিল। আক্রমণ-কারী তখন ক্লডিয়াসের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহার পূর্ব্ব কথারই পুনরাবৃত্তি করিল। বলা বাহুল্য, এসমস্তই ক্লডিয়াসের চক্রান্ত। আক্রমণকারী আর কেহ নহে, ক্লডিয়াসের অনুগত কর্ম্মচারী মার্কাস। ক্লডিয়াসই তাহাকে এরূপ বলিবার জন্য শিখাইয়াছিল। সাধা-রণের মনে বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য সে আরও বলিল, 'আচ্ছা মেয়ে এখন আমার কাছেই থাক, ভার্জিনিয়াস উপস্থিত হইলে তাহার সমক্ষেই প্রমাণ উপস্থিত করিব।' কিন্তু পাছে বিচারে বিলম্ব হইলে ইত্য-বসরে বিদ্রোহ বা কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় এই ভয়ে ক্লডিয়াস বলিলেন, "আগামী কল্যই ইহার বিচার হইবে। ইত্যবসরে যদি ভার্জিনিয়াস উপস্থিত হইতে পারে ভালই, নতুবা তাহার জন্য বিচারে বিলম্ব করা যাইতে পারে না।"

তৎক্ষণাৎ ভার্জিনিয়াসের উদ্দেশে তাঁহার দুই বন্ধু তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন। ভার্জিনিয়াস তখন 'একুইয়ানদিগের' (Aquians) সহিত যুদ্ধার্থ রোম হইতে দূরে অবস্থান করিতেছিলেন। দুরাত্মা 'মার্কাস' জানিতে পারিয়াছে, ভার্জিনিয়াস রোমে নাই, নতুবা তাঁহার প্রিয়তমা কন্যাকে পথিমধ্যে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতে মার্কাস দূরে থাকুক, ক্লডিয়াসেরও সাহসে কুলাইত না। সন্ধ্যা হয় হয়, দুই বন্ধু ভার্জিনিয়াসের শিবিরে উপস্থিত হইলেন, এই দারুণ অপমানজনক বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ভার্জিনিয়াস ক্রোধে ক্ষোভে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে যেন অনল বিস্ফুরিত হইতে লাগিল। ভার্জি-নিয়াস আর কালবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ সেনা-পতির নিকট বিদায় লইয়া রোমে ছুটিলেন। ক্ষণ-পরে ক্লডিয়াসের আদেশ লইয়া এক দূত উপস্থিত হইল, মর্ম্ম এই,—'ভার্জিনিয়াসকে ছুটি দিও না।' কিন্তু ভার্জিনিয়াস তখন অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছেন।

আজ ভার্জিনিয়ার বিচারের দিন। রাত্রি প্রভাত হইতেই রোমের ফোরাম (Forum) লোকে লোকা-রণ্য হইয়া গেল। স্ত্রী পুরুষ যুবা বৃদ্ধ সকলেই অদ্ভুত বিচার দেখিবার দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিল। যথা-সময়ে পিতা পুত্রী ছিন্নবস্ত্র পরিহিত হইয়া প্রাঙ্গন-মধ্যে দাঁড়াইল। সকলের প্রাণেই একটা বিষম উৎ-কণ্ঠার ভাব লক্ষিত হইল। ভার্জিনিয়াস অতি বিনম্র স্বরে ক্লডিয়াসকে, সমগ্র জনসাধারণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে রোমকগণ, লম্পট, কুক্রিয়াসক্ত মার্কাস আমার কন্যাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইবে, তোমরা কি তাহার কোন প্রতিবিধান করিবে না? আজ এ অত্যাচার আমার উপর বটে, তোমাদের কাহারও কি কন্যা সন্তান নাই, কে জানে তাহাদিগের উপর ইহার পুনরভিনয় হইবে না! তখন কি তোমাদের আত্ম-সম্মানে আঘাত লাগিবে না, তখন কি তোমরা তাহার জন্য আমার মত বিচারপ্রার্থী হইবে না? আমার কাতর প্রার্থনা শ্রবণ কর, ভার্জিনিয়াকে দুরাত্মার হাত হইতে বাচাও, আমার পবিত্র কুলে কালিমা ফেলিতে দিও না।" সকলেই নির্ব্বাক। একটি হিন্নাও কম্পিত হইল না, শুধু স্ত্রীলোকগণ অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিতে

লাগিলেন। ভার্জ্জিনিয়াস যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহাই হইল। তাঁহার কাতরোক্তিতে ক্লডিয়াসের পাষাণ প্রাণ একটুও আর্দ্র হইল না। বিচারে ভার্জ্জিনিয়া মার্কাসেরই দাসীকন্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। 'রায়' শুনিয়া ভার্জ্জিনিয়াস কপালে করাঘাত করিয়া বসিয়া পড়িলেন। এত বড় একটা মিথ্যা কথা কিরূপে প্রমাণিত হইয়া গেল ভাবিতে গিয়া তাঁহার সংজ্ঞা লুপ্তপ্রায় হইয়া গেল। ভার্জ্জিনিয়াস এইরূপে কতক্ষণ বসিয়া রহিলেন, সহসা তাঁহার মনে এক খেয়াল চাপিল। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ যেন দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠিল। সাহসে ভর করিয়া ভার্জ্জিনিয়াস তখন ক্লডিয়াসের নিকট শেষ ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন, "দণ্ডধর, আমার ত সমস্তই গিয়াছে। আর আমার বাঁচিয়া থাকার সুখ কি? তবে অনুমতি হইলে ভার্জ্জিনিয়াকে পরিচারিকার নিকট ডাকিয়া দুটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জন্মের মত বিদায় হই।" ক্লডিয়াস মহান উদারতার পরিচয় দেখাইয়া সম্মতি দিলেন। তখন 'কি বলে' 'কি বলে' শুনিবার জন্য সকলের অন্তরে একটা উৎকণ্ঠা জাগিয়া উঠিল। ফোরামের প্রাঙ্গনে বিরাট জনসঙ্ঘের মহা ভিড়, একটা চড়াহড়ি হৈ চৈ পড়িয়া গেল। নায়কের ইঙ্গিত মতে সৈনিকগণ জনমণ্ডলীকে দূরে সরাইয়া দিল। পিতাকে শেষ আলিঙ্গন দিবার জন্য ভার্জ্জিনিয়া দুপদ বাহু প্রসারণ করিয়া যেই নিকটে অগ্রসর হইয়াছে অমনি ভার্জ্জিনিয়াস বসনাভ্যন্তর হইতে তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিলেন, মুহূর্ত্তের জন্য উহা ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল, মুহূর্ত্তের জন্য উহা সূর্য্যকিরণে চক্ চক্ করিয়া উঠিল। "কি কর ভার্জ্জিনিয়াস, কি কর"—দর্শকবৃন্দের কথা মুখে থাকিতেই "মা তবে এস, ইহা ভিন্ন তোমার মুক্তির অন্য উপায় ভার্জ্জিনিয়াসের নাই" বলিয়া প্রাণপ্রতিমা কন্যার বক্ষে সেই শাণিত ছুরিকা আমূল প্রোথিত করিয়া দিলেন। মান রক্ষা হইল। ভার্জ্জিনিয়াস তখন উন্মত্ত। তাঁহার দেহে মত্তহস্তীর বল। তাঁহাকে থামায় কে! সেই অবস্থায় সেই রক্তমাখা ছুরিকা হস্তে ফোরামের (Forum) বাহিরে ছুটিয়া আসিলেন; রোমকগণ সভয়ে তাঁহার পথ ছাড়িয়া দিল। তখনকার তাঁহার ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া সৈন্যগণ সকলেই তাঁহার সঙ্গে যোগদান করিল। ক্রমে ক্রমে (Plebs) প্লেবগণও আসিয়া মিলিত হইল। তখন সকলে রোম ত্যাগ করিয়া 'পবিত্র পাহাড়ে' (Sacred mount) চলিয়া গেল। দুরাত্মা ক্লডিয়াস যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিল তাহা সহজে নির্ব্বাপিত হইল না। সৈন্যগণ, প্লেবগণ সকলেই চলিয়া যায়। দেশ রক্ষা করে কে, কৃষি কার্য্যাদিই বা কে করে! ব্যাপার গুরুতর বুঝিয়া ভেলেরিয়াস ও হোরেসিয়াস (Valerius and Horatius) তাহাদিগকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া, প্লেবদিগকে অনেক নূতন রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করিয়া রোমে ফিরাইয়া আনিলেন। ভার্জ্জিনিয়াসও একজন প্লেব ছিলেন। তিনি এক জায়গায় বিচারকের পদ প্রাপ্ত হইলেন। ক্লডিয়াসের শোচনীয় পরিণামের কথা কি বলিব! সে যে শুধু পদচ্যুত হইল তা নয়। ভার্জ্জিনিয়াস কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার রাজদ্বারে অভিযুক্ত ও তদনুসারে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল। এখন তাহার প্রাণে দারুণ অনুতাপ হইতে লাগিল। ভার্জ্জিনিয়াস যেরূপ ভাবে তাহার পশ্চাতে লাগিয়াছেন কিছুতেই তাঁহার হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই। কাজেই অপমান নিশ্চিত জানিয়া পূর্ব্বেই কারাগৃহে আত্মহত্যা দ্বারা ইহ জীবনের পাপলীলার অবসান করিল। এতদিনে কুমারী ভার্জ্জিনিয়ার অপমানের সম্যক প্রতিশোধ হইল।

রোমের ইতিহাসে 'ভার্জ্জিনিয়ার' এই শোকগাথা একটি স্মরণীয় ঘটনা।

শ্রীনরেশচন্দ্র সরকার

মুখ ও বুক

মুখ পুরুষের;—

কি জটিল যুক্তি-তর্ক লয়ে জগতের
কেবলি গোলক-ধাঁধা করিছে সৃজন
অবিরাম অসঙ্কোচে! মধুর মোহন
অন্তঃসার-হীন হায় বাক্যের শৃঙ্খল

"বস্তুবিহে অনুক্ষণ ছলিতে কেবল
ঐন্দ্রজালিকের মত নিখিল ধরার
সুকোমল মনপ্রাণ! বিজিত সংসার
মুখের লাপট পাশে! সরলা হয় ভ্রম
কি মহান্ লক্ষ্য! জ্ঞান নিরুপম!
পুরুষ কি শক্তিধর! সব ভ্রান্তি হায়,—
বিষকুম্ভ পয়োমুখ' শুধু ছলনার
নিপুণ অভ্যস্ত জীব! বাহিরে সুন্দর
অন্তরালে ভরা আছে কঠিন অন্তর!

বৃক রমণীর:—

মৌন-তৃপ্তি-শান্তি লয়ে প্রেম ও প্রীতির
সাজাইয়ে অর্ঘ্যডালি নিরমম ভরে
জাগিতেছে নিশিদিন কি মাতৃ-গৌরবে
সহ্যসহা ধরিত্রীর মত! নাহি বাধা,
প্রাণ দিয়ে মুছাইয়ে হৃদয়ের গ্লানি
পীযূষ-সাগর কিবা দেয় মুক্তি করি'
তৃষিত চিত্তের পাশে—প্রাণ-পাত্র ভরি'
কি সুধা করায় পান! সাধনা-আশার
অক্ষয়-কল্যাণ সাথে ত্রিদিব-উচ্ছ্বাস
বহি আনে মর্ত্ত্যলোকে, ধন্য বসুন্ধরা
লভে নব ফুল-সাজ! কি লাবণ্যে গড়া
পুণ্যের তপস্যাভূমি, গভীর অতল,—
দেব-নিশ্বাসের হেন করুণা কমল!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

প্রমোদ কানন

রমণী ধীরপাদবিক্ষেপে প্রমোদকাননের সৌরভান্বিত, পুষ্পাবৃত পথে চলিতেছিল ও অঞ্জলী ভরিয়া পুষ্প চয়ন করিতেছিল। সহসা নির্ম্মল ও শুভ্রকান্তি কর্ত্তব্য সেই স্থানে উপনীত হইয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রমণীর মুখের দিকে তাকাইলেন। রমণী স্মিতমুখে, পুষ্পপূর্ণ হস্তে, সেস্থান হইতে উদ্যানের অপর প্রান্তে পলায়ন করিল বটে, কিন্তু পুষ্পচয়নের ইচ্ছা তাহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

কর্ত্তব্য পুনর্ব্বার ওষ্ঠতর মুখ লইয়া তাহার নিকটে আসিয়া রমণীর মুখের দিকে তাকাইলেন। রমণী প্রথমটা মুখ ফিরাইয়া লইলেও অবিলম্বেই কর্ত্তব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল এবং হস্তস্থিত পুষ্পগুচ্ছ হইতে শ্রেষ্ঠতম পুষ্পটি ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া সেস্থান পরিত্যাগ করিল।

কর্ত্তব্য তৃতীয়বার রমণীর নিকটস্থ হইলেন। রমণীর কণ্ঠ হইতে হৃদয়ভেদী অস্ফুট কাতরধ্বনি নির্গত হইল, সে মস্তক নত করিয়া উদ্যানের দ্বারদেশের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। যাইতে যাইতে একবার থামিল ও পশ্চাৎ ফিরিয়া বর্ণাকিরণপাত পত্র ও পুষ্পের মনোহর সৌন্দর্য্য দেখিয়া লইল। আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় চক্ষু হইতে অশ্রু বিসর্জ্জিত হইল। দ্বারদেশের বাহিরে আসিবা-মাত্র কাননপ্রবেশের দ্বার চির অবরুদ্ধ হইল। এখনও তাহার হস্তস্থ উদ্যানজাত পুষ্পকারকে পূর্ণ; এই পুষ্পকোরকগুলি জনমানববিহীন মরুভূমিকেও সুগন্ধে সৌরভান্বিত করিতেছিল।

কর্ত্তব্য এই স্থানেও নিষ্ফল মৃতবৎ পাণ্ডুর মুখ লইয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তাহার পুনরাগমনের কারণ বুঝিতে পারিয়া, রমণী হস্তমুষ্টি খুলিয়া সযত্নে রক্ষিত প্রিয় ফুলগুলি ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া, একবারও আর তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, শুষ্কনেত্রে, ব্যথিত হৃদয়ে সেস্থান পরিত্যাগ করিল।

কর্ত্তব্য কিন্তু পুনর্ব্বারও তাহার অনুসরণ করিলেন। রমণী তাঁহাকে শূন্য হস্ত দুইখানি দেখাইল; কর্ত্তব্য নির্নিমেষনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। রমণী ধীরে ধীরে স্বীয় অঙ্গাচ্ছাদন ঈষৎ খুলিল এবং বক্ষঃস্থল হইতে গোপনে রক্ষিত একটি ক্ষুদ্র পুষ্প বাহির করিয়া বালুকাপৃষ্ঠে রাখিয়া দিল। এইবার সে যথাসর্ব্বস্বই দিয়াছে, আর তাহার দিবার কিছুই রহিল না।

তৎপরে সে একাকী মরুভূমি পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইল, কেবল ধূসরবর্ণের বালুকারাশিই তাহার চতুষ্পার্শ্বে ঘূর্ণায়মান হইয়া তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল।

---

* কুমারী মাহিদী সেন এম.এ. কর্ত্তৃক ইংরাজী হইতে অনুবাদিত।

পশু-প্রকৃতি

সিংহ

সিংহের রাজা হইবার আন্তরিক ইচ্ছা থাকুক আর নাই থাকুক, সিংহ পশুর রাজা। মানুষ সিংহকে পশুর রাজা করিয়াছে, মানুষের সমবেত জনবলশক্তির ইহা এক প্রধান উদাহরণ। সিংহ বেচারাও সেই খাতিরে সাহসের মাত্রা একটু বাড়াইয়া ও শরীর গঠনকে একটু সাজাইয়া গুছাইয়া এবং স্বভাবেও খানিকটা মহত্ত্ব দেখাইয়া রাজা হইয়া বসিয়াছে। অতএব আমিও রাজারাজড়ার কথা লইয়া প্রবন্ধ আরম্ভ করিলাম।

আজকাল মনুষ্য-সমাজেই পারিবারিক বন্ধন শিথিল; পশু-সমাজে সেটা চিরকালই তথৈবচ গোছ। কিন্তু সিংহ রাজা হইয়া আপন পরিবারকে একটু সংঘত করিতে বোধ হয় চেষ্টা করিয়াছিল, আংশিক ফল যে না হইয়াছে তাহা নয়।

সিংহ চিরকাল পরিবারের প্রতি অনুরক্ত থাকে। বৃদ্ধ তরুণী ভার্য্যাকে যত না আদর করেন, সিংহ ততোধিক যত্নের সহিত সিংহীর সেবা করে। কিন্তু প্রথম যৌবন সময়ে সিংহী বড়ই যথেচ্ছাচারিণী, নির্ম্মমা ও পাপরতা থাকে। সন্তান-সন্ততি হইলেই কেবল সিংহী সন্তান স্নেহাধিক্য বশতঃ প্রথম যৌবনের দুষ্কার্য্য সকল ত্যাগ করিয়া স্বামীর সেবা ও গৃহকার্য্যে মনোনিবেশ করে।

সিংহকন্যা শৈশবাবস্থায় প্রথম তিন বৎসর পিতামাতা কর্ত্তৃক সাদরে প্রতিপালিত হয়, কিন্তু তাহার পর হইতেই যত্নের লাঘব হইতে থাকে। পিতামাতা তাহার খাদ্য-সংগ্রহের ভার-গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। কাজেই বাধ্য হইয়া তাহাকে আপন জীবন রক্ষার উপায় করিতে হয়। কন্যা কিন্তু এই সময়ে বড় অলস-প্রকৃতি থাকে, সুতরাং জীবনরক্ষার জন্য আত্মনির্ভর না করিয়া ভর্ত্তার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু কন্যা আধুনিক নবীনাদিগের ন্যায় বিশেষ একটু কোর্টশিপ-পরায়ণা, সহজে প্রায় কখনও তাহার পতি নির্ব্বাচিত হয় না।

সিংহ-কন্যার কোর্টশিপের প্রণালীটা বর্ণন করিবার পূর্ব্বে এস্থানে আর একটি কথার আভাস দেওয়া উচিত। দন্ত উদ্গমনের সময় পুংশাবক অপেক্ষা কন্যা শাবকের মৃত্যু অনেক অধিক হইয়া থাকে, সুতরাং পশু-জগতে সিংহীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক কম। কাজেই একটি সিংহীর অনেক ভালবাসার পাত্র (Suitors) জুটিবে, ইহাতে কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নাই। যেখানে উপাসকের সংখ্যা এত অধিক সেখানে কন্যা যে অচলা লক্ষ্মীর ন্যায় চিরকাল পূর্ব্ব মনোনীত পতির ঘর-সংসার করিবে ইহা ভাবাই অনুচিত। সিংহী সুযোগমতে এক পতি পরিত্যাগ করিয়া অন্য পতি গ্রহণে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। ইহাতে ব্যাপার কিরূপ গুরুতর হইয়া দাঁড়ায় ক্রমে বুঝা যাইবে।

প্রথম যৌবন সমাগমে সিংহকন্যা পিতামাতার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছায় একদিকে প্রস্থান করে। যদি কোন স্বল্পবয়স্ক পরিণতবয়স্ক ও স্বভার্য্যা-পরিত্যক্ত সিংহ প্রণয়োন্মুখ চিত্তে তাহার নিকট উপস্থিত হয়, সিংহী তৎক্ষণাৎ দশনপংক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক আশু তাহার মৃত্যু কামনা করিয়া চলিয়া যায়, বৃদ্ধ সিংহও আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার করিয়া অন্যদিকে প্রস্থান করে।

আবার প্রথম যে যুবক-সিংহের সহিত সাক্ষাৎ হয়, সিংহী তাহার প্রতিও অনুগ্রহ প্রদর্শন করে না। তবে কিছুমাত্র প্রণয় পূর্ব্বাভাস প্রকাশ না করিলেও তাহার প্রতি কোনরূপ রুক্ষ ব্যবহার করে না। যৌবন-গর্ব্বে গর্ব্বিতা সিংহী তাহার প্রতি একবার মাত্র অপাঙ্গ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই পূর্ব্ববৎ আপন মনে চলিতে থাকে, সিংহ বেচারিও নিতান্ত আজ্ঞাবহের ন্যায় তাহার প্রত্যনুগমন করে। আশা, যদি ভাগ্যবলে উপস্থিত অবজ্ঞা ভালবাসায় পরিণত হয়।

ক্রমে দুই তিনটি সিংহ আসিয়া জুটিয়া যায়। তখন তাহাদের মধ্যে পরস্পর প্রতিযোগিতা উপস্থিত হয়। অলস নয়নে একে অন্যের প্রতি তাকাইতে থাকে, এবং ঘন ঘন গর্জ্জনে প্রতিদ্বন্দ্বীকে সতর্ক হইতে পরামর্শ দেয়। কিন্তু কেহই সিংহীর প্রতি অনিষ্টাচরণ করিতে সাহসী হয় না। পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত বটে,

কিন্তু সিংহী দূরে গমন করিলেই সকলে দৌড়িয়া তাহার নিকটবর্ত্তী হয় এবং আজ্ঞার অপেক্ষা করিতে থাকে। সিংহী কিন্তু তখনও অনুগ্রহের কোন চিহ্ন প্রদর্শন করে না।

এইরূপ অভিনয় কিয়ৎকাল চলিতে থাকে। ক্রমে পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত, সুদৃঢ় দন্তপংক্তি-শোভিত ও সুদর্শন কেশরযুক্ত এক বলবান সিংহ আসিয়া আদরে উপস্থিত হয়। সিংহরাজ প্রতিযোগী সিংহ সকলের প্রতি একবার দৃকপাত না করিয়া প্রথমেই সিংহীর নিকটবর্ত্তী হইয়া স্নিগ্ধবদনে তাহার অভ্যর্থনা করে। সিংহীও আগন্তুকের সৌন্দর্য্য ও বিপুলকায় দর্শনে একবারে পরিতুষ্ট হয় এবং ইঙ্গিতে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া এক পার্শ্বে উপবেশন করে। সিংহরাজ মহোল্লাসে প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের সহিত যুদ্ধ নির্ব্বাহণে প্রবৃত্ত হয়। সিংহী দুই পক্ষের বিবাদ মহাসুখে দেখিতে থাকে। প্রতিপক্ষ শীঘ্রই পরাজিত হইয়া পলায়ন করে, সিংহীও তখন উঠিয়া রণবিজয়ীকে সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক গ্রহণ করে।

এই মুহূর্ত্ত হইতে সিংহ আপনার রাজোচিত স্বাধীনতা ভুলিয়া সঙ্গিনীর একান্ত বাধ্য হইয়া পড়ে। এবং অনুক্ষণ মহাযত্নে তাহার সেবাতে প্রবৃত্ত হয়। ক্ষুৎপীড়িতা হইলে সিংহী বসিয়া বিশ্রাম করে, সিংহ নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া তাহার জন্য খাদ্য সংগ্রহ করিয়া আনে। সিংহ নিহত পশু মাত্রই আনিয়া প্রথমে সিংহীর নিকট উপস্থিত করে, কখনও পূর্ব্বে আপনি ভক্ষণ করিয়া প্রণয়িনীর নিকট ভুক্তাবশিষ্ট স্থাপন করিতে সাহসী হয় না। সিংহী অমৃত-লভ্য পশুমাংস দ্বারা আপন উদর পূর্ণ করিয়া অবশিষ্টাংশ সিংহকে খাইতে অনুমতি করে, সেও কৃতজ্ঞ অন্তরে তাহাই গ্রহণ করিয়া মহা সন্তোষ প্রকাশ করে।

অবিরত এইরূপ সেবা করিয়াও সিংহ সঙ্গিনীর মন পায় না। সিংহী তাহা অপেক্ষা সুন্দর ও বলবান সিংহ দেখিলেই তৎক্ষণাৎ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে এবং হঠাৎ তাহার সুখের সংসার ভাঙ্গিয়া দেয়। সিংহীর এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে।

"এক জ্যোৎস্নাপুরিত রজনীতে একজন আরব হরিণ শীকার করিবার অভিপ্রায়ে অরণ্য-মধ্যস্থিত এক প্রকাণ্ড বৃক্ষে আরোহণ করিল। মধ্য রাত্রিতে একটী সিংহ ও একটী সিংহী আসিয়া সেই বৃক্ষতলে শয়ন করিল। কিছুক্ষণ পরে সিংহী হঠাৎ উঠিয়া সম্মুখস্থ সরু পথপার্শ্বে দাঁড়াইয়া মনোযোগের সহিত যেন কিছু লক্ষ্য করিতে লাগিল। আরব শীঘ্রই দূরে আর একটী সিংহের পদশব্দ শুনিতে পাইল। সিংহী নূতন প্রিয় সমাগমে উৎফুল্ল হইয়া প্রতিগর্জ্জন করিয়া তাহাকে আহ্বান করিল। তখন তাহার স্বামী নিতান্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধস্বরে প্রথমে সিংহীকে শাসাইল, পরে যুবসিংহকে ভীত ও তাড়িত করিবার জন্য এরূপ ভীষণ গর্জ্জন করিল যে বৃক্ষস্থিত ভয়ত্রস্ত আরবের বন্দুক হস্তচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল এবং সে বহু কষ্টে আপনাকে বৃক্ষচ্যুতি হইতে রক্ষা করিল।

"ক্রমে অন্যের পদশব্দ স্পষ্টতর ও নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। সিংহীও এক একবার প্রতিগর্জ্জন করিয়া আগন্তুককে ডাকিতে লাগিল। সিংহ তখন নিতান্ত অস্থিরচিত্তে একবার বৃক্ষপার্শ্বে আসিয়া সিংহীকে অনুযোগ ও মিনতি করিতে লাগিল, আবার পরমুহূর্ত্তেই উপস্থিত হইয়া গর্জ্জন করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী সিংহকে সতর্ক করিতে লাগিল।

"কিয়ৎকাল মধ্যে একটী চমৎকার কাল কেশরযুক্ত প্রকাণ্ড সিংহ জঙ্গলের অপর পার্শ্বে উপস্থিত হইল, সিংহীও উহার সমীপস্থ হইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। উহার স্বামী মনোভাব বুঝিতে পারিল, সিংহী ও আগন্তুক সিংহের মধ্যস্থলে লাফাইয়া পড়িল। এবং ভীষণ তেজে স্বভার্য্যাপহরণাভিলাষী সিংহকে আক্রমণ করিল। প্রথমবং ভীষণ গর্জ্জনে সমস্ত বনপ্রদেশ কম্পিত হইয়া উঠিল। সিংহী কিন্তু আনন্দিতমনে তাহাদের যুদ্ধ দেখিতে লাগিল। যুদ্ধ ক্রমে ভীষণতর হইয়া উভয় সিংহই ক্ষত বিক্ষত হইয়া রক্তাক্তকলেবর হইয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পরে একটী একবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল, অন্যটীও মৃতপ্রায় হইয়া দূরস্বরে আপনার জয় ঘোষণা করিল। সিংহী যুদ্ধ শেষ হইল বুঝিতে পারিয়া

একবার সিংহদ্বয়ের নিকটে আসিয়া উভয়কে আঘাত করিল এবং একটুও বিচলিত না হইয়া যথেচ্ছা প্রস্থান করিল।"

এণ্ডারসন নামক একজন শিকারী নিম্নলিখিত ঘটনাটী বর্ণনা করেন :—"আমি সবেমাত্র আহার করিতে বসিয়াছি, এমন সময় কয়েকজন দেশীয় লোক (Negroes) ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আমার তাঁবুতে উপস্থিত হইল। ভয়বিজড়িত স্বরে বলিল, এখনই একটী সিংহ নিকটে একটী ঘোড়া লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। আমি তাড়াতাড়ি আহার শেষ করিয়া শিকারের উপযোগী দ্রব্য সংগ্রহ করিলাম এবং আমার প্রিয় সহচর দোনালা বন্দুকটী সঙ্গে লইয়া সংবাদদাতৃগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। কিয়ৎকাল পরেই অভিপ্রেত স্থানে উপস্থিত হইলাম।

"সিংহ-অধ্যুষিত বনবিভাগের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া অনেকগুলি লোক অথবা গোলমাল করিতেছিল, কেহ কেহ বড় বড় দা ও অন্যেরা সাধারণ বন্দুক লইয়া সিংহকে কোপ হইতে বাহির করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। ভীরু ও শিক্ষিতপ্রবর বুঝিতে পারিয়া আমি তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া একত্র করিলাম। পরে দুইজন লোক ও কয়েকটী বন্দুক লইয়া নিজেই সেই প্রশস্ত কোপের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। কোপ এত ঘন ছিল যে সময় সময় হামাগুড়ি দিয়া যাইতে হইল। আমার এই আচরণ সঙ্গত হয় নাই, কারণ সিংহ এই সময় অনায়াসে আমার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িতে পারিত।

"এইরূপ কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর আমার নিকটেই অস্ফুট গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম, কুকুরগুলি তৎক্ষণাৎ লাঙ্গুল উঠাইয়া আমার পশ্চাদ্ভাগে পলায়ন করিল। মুহূর্ত্ত পরেই কোপের অপর পার্শ্বে 'সিংহ সিংহ' ধ্বনি উত্থিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের আওয়াজ হইল, কিন্তু সিংহ একবার দেখা দিয়াই পুনরায় কোপের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমি সিংহকে কোপের অন্যদিকে তাড়া করিলাম, কিন্তু লোকগুলি আমার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিল। তাহারা অনেকেই বন্দুক ছুড়িয়াছিল, কিন্তু একটীতেও কাজ হইল না। তখন আমি তাহাদের সহিত স্থান বিনিময় করিতে ইচ্ছা করিলাম কিন্তু তাহাতে কেহই রাজি হইল না।

"দিবা অবসান হইয়া আসিতেছিল, আমি একবার শেষ চেষ্টা করিব মনস্থ করিলাম। একজন দেশী লোককে সঙ্গে লইয়া পুনরায় কোপের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। প্রথম কিছুই দেখিতে পাইলাম না। পূর্ব্বে যে স্থানে অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, তথায় উপস্থিত হইলাম; তখন কিছু বলা কহা নাই হঠাৎ সিংহ আমার অতি নিকটে লাফাইয়া পড়িল। কিন্তু তখনও উহার আমার প্রতি তত আক্রোশ ছিল না। ঘন কোপের মধ্যে ঢুকিতেছে দেখিতে পাইয়া আমি বন্দুক ছুড়িলাম। আঘাত প্রাপ্তিমাত্র সিংহ ভীষণ গর্জ্জন করিয়া আমার দিকে ফিরিল এবং ক্রোধে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমার প্রতি ধাবিত হইল। কতিপয় পদ দূরে থাকিতে আক্রমণের আশায় ওৎ পাতিয়া বসিল।

"তখন বড়ই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা। সিংহটী অতি প্রকাণ্ড, স্কন্ধদেশের কাল কেশরগুলি ক্রোধে দাঁড়াইয়া উঠিয়াছে, চক্ষুদুইটি অগ্নিগোলকের ন্যায় জ্বলিতেছে। ভাবিবার সময় নাই, পলায়নের আশা নাই; মুহূর্ত্তমধ্যে সিংহ আমার উপর আসিয়া পড়িবে। শরীর হইতে স্বেদবিন্দু বহির্গত হইল। কিন্তু অবসন্ন হইলাম না। আমি তাড়াতাড়ি শীকারের বড় ছুরী বাহির করিয়া আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। এই ভীষণ মুহূর্ত্তে আমিই সিংহকে আক্রমণ করিতাম, কিন্তু উহার মস্তক অদৃশ্যপ্রায় ছিল এবং শরীরের অপর কোন অংশে গুলি করা মূর্খের কাজ হইত, কাজেই আমাকে আত্ম-রক্ষায় যত্ন করিতে হইল। আমি হাটু গাড়িয়া বসিলাম, এবং একমনে সিংহের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। মুহূর্ত্ত মধ্যে সিংহ আমার দিকে লাফ মারিল কিন্তু বড় বড় ঘাসের দ্বারা অর্দ্ধাবৃত থাকার দরুণই হউক কি আমার শরীর অপর পার্শ্বে নিক্ষেপ করার দরুণই হউক সিংহ তিন চারিপদ আমার পশ্চাতে যাইয়া পড়িল। না উঠিয়াই আমি তৎক্ষণাৎ

পুরিয়া বন্দুক ছুড়িলাম এবং তাহার স্কন্ধদেশে একটি গুলি ঢুকাইয়া দিলাম। দ্বিতীয়বার আহত হইয়া সিংহ প্রাণপণে আমার দিকে আসিতে লাগিল কিন্তু আঘাতের জন্য অপদার্থতা হেতু আমি উহার আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দিলাম। সিংহ আমার নিকট দিয়া কোপের মধ্যে ঢুকিয়া গেল। রাত্রি হইয়া যাওয়ায় সেদিন আর কিছু করা হইল না, পরদিনও বহুবারে উহাকে পাওয়া গেল না; কিন্তু কতিপয় দিবস পর সিংহের মৃত শরীর গলনোন্মুখ অবস্থায় দৃষ্ট হইয়াছিল।

পিট্ নামে একজন অভিজ্ঞ শিকারী একবার খুব সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হন। অনেক দিন অরে ভুগিবার পর তিনি বলদের পৃষ্ঠে চড়িয়া শিকারে বাহির হন। খানিকক্ষণ অরণ্যমধ্যে এদিক সেদিক বেড়াইবার পর দেখিতে পাইলেন, একটা বড় সিংহ তাহাকে আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে আসিতেছে। বলদটি সিংহকে দেখিবামাত্র ভীত হইয়া আরোহীকে পৃষ্ঠ হইতে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া উর্দ্ধপুচ্ছে পলায়ন করিল। পিট্ হতবুদ্ধি ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে পড়িয়া রহিলেন। তাহার পার্শ্বের থলিয়াতে একটি পিস্তল ও শীকারের অস্ত্র ছিল কিন্তু ভয়ের আতিশয্যবশতঃ সে কথা আদৌ মনে হইল না। কেবল সাহায্যের জন্য প্রাণপণে চীৎকার করিতে লাগিলেন। সিংহ ক্রমে নিকটে আসিয়া পড়িল, পিটের জ্যাকেটের কতকাংশ মাটিতে পড়িয়াছিল সিংহ তাহাতে একটি থাবা মারিল। নিরাপায় উন্মত্ত হইয়া পিট্ তখন এক হাতে জ্যাকেটের অপরাংশ ধরিয়া টানিতে লাগিলেন এবং অন্য হাতে সিংহের মস্তকে ঘুসি মারিতে লাগিলেন। এই প্রকার আক্রমণের প্রণালী দেখিয়া সিংহ বেচারা অবাক্ ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। পিট্‌কে আক্রমণ করিল না। পিটের একটি লোক চীৎকার শুনিতে পাইয়া সাহায্যার্থ দৌড়িয়া আসিল। তদ্দর্শনে সিংহ একটু পিছাইয়া গেল এবং বন্দুক ছুড়িবামাত্র পলায়ন করিল।

ডাক্তার লিভিংষ্টোনও সৌভাগ্যবশতঃ একবার সিংহ-গ্রাস হইতে রক্ষা পান। আফ্রিকার মেরোটের গ্রামে সিংহের বড়ই উপদ্রব হওয়ায় গ্রামস্থ লোকেরা ডাক্তারের শরণাপন্ন হইল। ডাক্তার জানিতেন, দলস্থ একটী সিংহ নিহত হইলে অন্যান্যগুলিও সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া যায়। এই উদ্দেশ্যে তিনি লোকজন সংগ্রহ করিয়া প্রায় অর্দ্ধ মাইল দীর্ঘ এক পার্ব্বতীয় জঙ্গল ঘেরিয়া ফেলিলেন। পরে সকলে চীৎকার ও উচ্চধ্বনি করিতে করিতে কেন্দ্রাভিমুখে আসিতে লাগিল। যে দেশী লোকটী ডাক্তারের সঙ্গে ছিল সে একখণ্ড প্রস্তরের উপর সিংহকে উপবিষ্ট দেখিতে পাইল এবং তৎক্ষণাৎ লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িল। কিন্তু গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া প্রস্তরে বিদ্ধ হইল। সিংহ ক্রুদ্ধ হইয়া যেখানে গুলি লাগিয়াছিল তথায় বারংবার থাবা মারিতে লাগিল; পরে লাফাইয়া কোপে প্রবেশ করিল।

একটু পরে ডাক্তার প্রায় ত্রিশ পঞ্চ দূরে আর একটি সিংহকে ঠিক পূর্ব্ব অবস্থায় উপবিষ্ট দেখিতে পাইলেন। তখন উহাকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুকের দুইটী গুলিই একত্রে নিক্ষেপ করিলেন। গ্রাম্য লোকেরা সিংহকে মৃত মনে করিয়া আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া দৌড়িল। কিন্তু ডাক্তার দেখিলেন, সিংহ তখনও বসিয়া রহিয়াছে, উহার চক্ষুগোলক অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ জ্বলিতেছে। সুতরাং যতক্ষণ না বন্দুক ভরা শেষ হইতেছে ততক্ষণ সকলকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। এই কথা বলিয়া তিনি বন্দুকে সবেমাত্র গুলি পুরিতেছেন এমন সময় একজন দেশী লোক ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া উঠিল। ডাক্তার মুখ উঠাইয়া দেখিতে পাইলেন তাহার অতি নিকটে আসিয়া সিংহ তাহার উপরে লাফাইয়া পড়িতে উদ্যত হইয়াছে।

ডাক্তার একটু উচ্চ স্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন। সিংহ লাফাইয়া তাঁহার ঘাড়ে পড়িল, সে স্থানটী অসমতল ও হেলান থাকায় ডাক্তার ও সিংহ উভয়েই ভূমিতে পড়িয়া গড়াইতে লাগিল। তৎপরে সিংহ গর্জ্জন করিয়া তাহাকে এরূপ ভাবে ঝাঁকিয়া দিল যে তিনি মৃতবৎ ও সংজ্ঞাহীনের ন্যায় পড়িয়া রহিলেন। সমস্ত তাহার নিকট স্বপ্নের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তখন

তাঁহার কোন কষ্ট কি ভয় হইতেছিল না, অথচ যাহা কিছু ঘটিতেছিল তাহা সমস্তই বুঝিতেছিলেন। সিংহ তাহার সম্মুখের থাবা সজোরে ডাক্তারের পৃষ্ঠে বিদ্ধ করিতেছিল এমন সময় একজন দেশী লোক বন্দুক হস্তে সাহায্যার্থ উপস্থিত হইল। সিংহও তখন ডাক্তারকে পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। লোকটী তৎপরতার সহিত গুলি করিল কিন্তু তাহা কার্য্যকর হইল না। সিংহ মহাক্রোধে তাহার উপর আসিয়া পড়িল এবং জঙ্ঘাতে আঘাত করিল। দ্বিতীয় আর একজন লোক বিপদ বুঝিয়া একটী বল্লম লইয়া সিংহ আক্রমণ করিতে আসিল; সিংহও তখন দ্বিতীয় ব্যক্তির পৃষ্ঠে লাফাইয়া পড়িল। কিন্তু সিংহ পূর্ব্বেই সাংঘাতিক ভাবে আহত হইয়াছিল এবং ক্রমেই উহার শক্তি শিথিল হইয়া আসিতেছিল। বল্লমধারীর স্কন্ধে লাফাইয়া পড়িয়াই সিংহ গড়াইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল ও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল।

ডাক্তার অনেক দিন ভুগিয়া সে যাত্রা রক্ষা পান। একখানা শরীরাস্থি একেবারে ভগ্ন হওয়ায় তাহা কৃত্রিম অস্থি দ্বারা পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ সিংহ-শিকারী গর্ডন কামিঙ্ একটী ঘটনা এইরূপে বর্ণনা করেন:—"আমি এক সময় কোনও গভীর বনমধ্যে রাত্রি যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম; আমার সঙ্গে হেন্‌ড্রিক্, ইকলাম প্রভৃতি অনেক অনুচর ছিল। আমি শকট গাড়ীতেই শয়ন করিলাম, আর সঙ্গের লোকেরা পার্শ্বে একটী অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া চারিদিকে অর্দ্ধ-শায়িতভাবে রহিল। রাত্রির প্রথম ভাগে একটী বলদ বন্ধনমুক্ত হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিতেছিল। হেন্‌ড্রিক্ উহার শব্দ লক্ষ্য করিয়া বলদটিকে ধৃত করিল এবং যথাস্থানে বন্ধন করিয়া পুনরায় ইকলামের পার্শ্বে আসিয়া শয়ন করিল।

"একটী সিংহ কিছু দূর হইতে হেন্‌ড্রিকের এই কার্য্যাবলি লক্ষ্য করিতেছিল। যখন সে বলদ বন্ধনার্থ উঠিয়া যায় তখন আক্রমণের সুবিধা হয় নাই বলিয়া সিংহ নিশ্চেষ্ট ছিল, কিন্তু একবারে ছাড়িবার পাত্র সে নয়, নর-শোণিতের তৃষ্ণা তাহাকে ব্যাকুল করিয়াছিল। সিংহ নিঃশব্দে অগ্নিকুণ্ডের নিকট যাইয়া এক ভীষণ গর্জ্জন করিয়া সমস্ত বনপ্রদেশ পরিপূর্ণ করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে লম্ফ প্রদান করিয়া হেন্‌ড্রিকের উপর পড়িল। ইকলাম আর কি করে, অগ্নিকুণ্ড হইতে এক জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড গ্রহণ করিয়া সিংহের মস্তকে বারংবার আঘাত করিতে লাগিল কিন্তু সিংহ কিছুতেই হেন্‌ড্রিককে পরিত্যাগ করিল না। বারংবার প্রহারিত হইয়াও তাহাকে লইয়া প্রস্থান করিল। তখন ইকলাম পাগলের ন্যায় 'সিংহ সিংহ' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সকলেই ক্রমে জাগরিত হইল, আমি চকিতের ন্যায় উঠিয়া এই কথা শুনিয়া একবারে মর্ম্মাহত হইলাম।

"আমি সমস্ত অবস্থা বুঝিতে বুঝিতেই সিংহ মৃতপ্রায় হেন্‌ড্রিককে লইয়া এক ঘন কোপের মধ্যে প্রবেশ করিল। ঘোর অন্ধকার রাত্রি, সে রাত্রিতে আর কিছুই করা সম্ভব হইল না। অনুচরদিগকে একত্র করিয়া সমস্ত রাত্রি চৌকি দিলাম। প্রভাত হইবামাত্র দুইজন লোক সঙ্গে লইয়া হেন্‌ড্রিকের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে চলিলাম। অনেক অনুসন্ধানের পর সিংহ যেখানে বসিয়া শিকার ভক্ষণ করিতেছিল, সে স্থানে উপস্থিত হইলাম। দুর্ভাগ্য হেন্‌ড্রিকের জানুর নিম্নে কর্ত্তিত একখানি পা পাওয়া গেল আর তাহার কোর্ত্তার ছিন্নাংশ সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখিতে পাইলাম। আমরা পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

সঙ্গের কুকুরগুলিকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। বন্ধন-মুক্ত হইবামাত্র উহারা লাফাইতে ও চীৎকার করিতে লাগিল। একটু পরেই শুষ্ক পত্রের মর্ম্মর শব্দ শুনিতে পাইলাম এবং ঝাপড়া বনের মধ্য দিয়া ভীষণ মনুষ্য-হন্তা পলায়ন করিতেছে— দেখিতে পাইলাম। সিংহ নদীতীর দিয়া যাইতে লাগিল এবং কতক দূরে অল্প অল্প আবৃত কোপের মধ্যে স্থান গ্রহণ করিল। শীঘ্রই কুকুরগুলি উহার নিকটস্থ হইল; সিংহও তখন ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। আমি বেগে অশ্ব চালনা করিয়া ত্রিশ গজ ব্যবধানে আসিলাম। সিংহ তখন মুখ ব্যাদান করিয়া উহার ভীমকান্তি প্রকাশ

করিতে লাগিল। সিংহকে দেখিবামাত্রই হেন্‌ড্রিকের মৃত্যুর জন্য আমার শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, আমি চীৎকার করিয়া কহিলাম 'ওরে দুর্বৃত্ত! এখনই তোর মনুষ্য-শোণিত তৃষ্ণা ঘুচাইতেছি'—আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে উহার পার্শ্বদেশ লক্ষ্য করিয়া গুলি নিক্ষেপ করিলাম। সিংহ ভূপাতী হইয়াও আবার উঠিল কিন্তু দ্বিতীয় গুলি বহুদূরে জীবনলীলা শেষ করিল।"

কাফ্রিদের সম্বন্ধে আর একটী ঘটনা এইরূপ :—"আমি একটী নদীর তীরে তাঁবু ফেলিয়াছি। পূর্ব্ব-রাত্রিতে নদীর তীরে একটী মহিষ শিকার করিয়াছিলাম। প্রাতে উহার মৃতদেহ আনিবার জন্য চারিজন অনুচরকে প্রেরণ করিলাম। তাহারা একটু পরে ব্যস্তসমস্ত ভাবে আসিয়া বলিল, 'একটী সিংহ মৃত মহিষের কতকাংশ ভক্ষণ করিয়াছে এবং এখনও নিকটে বিচরণ করিতেছে।' শুনিয়াই প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। অবিলম্বে কয়েকটী কুকুর ও কয়েকজন লোক সঙ্গে লইয়া সিংহের অভ্যর্থনার জন্য বহির্গত হইলাম। যথা-স্থানে উপস্থিত হইলে বিনা আয়াসে উহার সাক্ষাৎ ঘটিল। সিংহ কিন্তু আমাদিগকে দেখিয়াই নদীর তীর দিয়া প্রস্থানপর হইল। আমি কুকুরগুলিকে ছাড়িয়া দিলাম, উহারা চীৎকার করিয়া সিংহের পশ্চাৎ ধাবিত হইল, আমিও দ্রুতবেগে অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলাম। আক্রান্ত হইয়া সিংহ একটী নলকোপের ভিতর প্রবেশ করিল। একটী কুকুর সিংহের অনুসরণ করিয়াছিল, আমি নিকটস্থ হইবার পূর্ব্বেই তিনটী নিহত হইল।

"আমি নিকটে গেলেও কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তখন ঘোড়া হইতে নামিয়া পরম অনুসারে স্থান নিরূপণে প্রবৃত্ত হইলাম। আন্দাজে কয়েকবার গুলি ছুড়িলাম কিন্তু একটীও ফলপ্রদ হইল না। তখন সিংহের অভিমুখে মৃত্তিকা ও কাষ্ঠখণ্ড সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম। সিংহ ইহাতেও অপমান বোধ করিল না বা আবৃত স্থান পরিত্যাগ করিল না।

"ইতিমধ্যে আমার অনুচরবর্গ আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রায় দশ মিনিট পর্য্যন্ত উত্যক্ত হইয়া সিংহ অগত্যা সেস্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল কিন্তু কুকুর কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া নিকটস্থ আর একটী ঝোপে প্রবেশ করিল। কুকুরগুলি অবিরত চীৎকার করিয়া পশুরাজের শান্তিভঙ্গ করিতে লাগিল। খানিক পরে সিংহ অপমানিত বোধ করিয়া সদর্পে কুকুরগুলিকে আক্রমণ করিল। আমি অমনি প্রথম গুলি নিক্ষেপ করিলাম। আঘাতপ্রাপ্তি মাত্র ঘোরতর গর্জ্জন করিয়া সিংহ কুকুরকে সজোরে এক থাবা মারিল। আমি মস্তক লক্ষ্য করিয়া দ্বিতীয় গুলি ছুড়িলাম। সিংহ তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া নিকটস্থ নদীর মধ্যে কাপিয়া পড়িল। উহার শরীর হইতে অনর্গল রক্তধারা বহির্গত হইয়া নদীর জল রঞ্জিত করিতে লাগিল। রক্তের লোভে আকৃষ্ট হইয়া একটী কুম্ভীর সিংহের প্রতি ধাবিত হইল। একটী কুকুরও সিংহের পশ্চাৎ জলে লাফাইয়া পড়িয়াছিল। আমি আর বিলম্ব না করিয়া তৃতীয় গুলিতে সিংহের ইহজীবন শেষ করিলাম।"

ক্যাপ্টেন মণ্ডি একবার এই দেশে হস্তীপৃষ্ঠে শিকারে বহির্গত হন। অযাচিত ভাবে এক সিংহ আসিয়া শিকারীদলকে আক্রমণ করে। বোধ হয় স্বরাজ্য-শত্রু-বিদলিত দেখিয়া পশুরাজ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। যাহা হউক, দলস্থ একজন শিকারী সিংহ লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িল, ক্রুদ্ধ পশু তাহাতে আরও উত্তেজিত ও হিংসাপরায়ণ হইয়া উঠিল। সিংহ ভীষণ বেগে আসিয়া নির্ভয়ে গুলি নিক্ষেপকারীর হস্তে আক্রমণ করিল। সে তখন হাওদার সম্মুখ অংশে ঠেস্ দিয়া অবনতভাবে দাঁড়াইয়া সিংহকে পুনরায় লক্ষ্য করিতে লাগিল, দুর্ভাগ্যক্রমে অমনি সমস্ত হাওদা হস্তি-পৃষ্ঠ বিচ্যুত হইয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। সিংহও তখন হস্তীকে পরিত্যাগ করিয়া অনায়াসলব্ধ ভূপতিত শিকারীকে আক্রমণ করিল। পাছে সিংহের পরিবর্ত্তে লোকটী আহত হয় এই ভয়ে অন্য কেহই গুলি করিতে সাহস করিল না। শিকারীর জীবনের আশা আর রহিল না।

ঠিক এই সময়ে শিক্ষিত মাহুত হস্তীকে উত্তেজিত করিয়া সিংহের প্রতি ধাবিত হইতে ইঙ্গিত করিল। বুদ্ধিমান হস্তীও মাহুতের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিল।

একটী ক্ষুদ্র রন্ধ্রপথে ভয় করিয়া হস্তী তাহা সিংহের শরীরে প্রবেশ করাইয়া দিল। সিংহও তখন বাধ্য হইয়া আক্রান্ত শত্রুকে পরিত্যাগ করিল। পূর্ব্বেই মাহুত ও অধুনা হস্তীকর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া সিংহ সহজেই বিনষ্ট হইল। আহত শিকারী বিস্তর শুশ্রূষা ও বহু কষ্টভোগের পর সে যাত্রা বাঁচিয়া গেল। বিজ্ঞান)

হজরত রাবিয়া বসরী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তৎকালীন মহা তপস্বী মহর্ষি হোসেন বসরী হজরত রাবিয়াকে অতীব শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। তিনি সপ্তাহে এক দিবস সমবেত জনমণ্ডলীকে ওয়াজ নছিহত শুনাইতেন। হজরত রাবিয়াও সেই সভায় উপস্থিত থাকিতেন। একদিন তাঁহার সভায় আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল বলিয়া, তিনি উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত মহর্ষি হোসেন উপদেশ দিতে বিরত রহিলেন। সভার জনমণ্ডলী আগ্রহ প্রকাশ করিয়া আবেদন করিল—'সভাস্থলে কত জ্ঞানী ও আলেম উপস্থিত রহিয়াছেন, আপনি কেন শুধু এক বৃদ্ধা নারীর অপেক্ষায় নীরব রহিলেন?' মহর্ষি তদুত্তরে বলিয়া উঠিলেন, 'যে সরবত হস্তীর জন্য প্রস্তুত, তাহা ক্ষুদ্র পিপীলিকাকে দিতে পারি না।'

তাপসপ্রবর হোসেন যখন উপদেশ দিতে দিতে উন্মত্তের ন্যায় হইতেন, এবং তাঁহার মুখ দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় কথা বাহির হইতে থাকিত, তখন তিনি অতি শ্রদ্ধার সহিত রাবিয়ার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতেন,—'এ সমস্ত মহৎ বাক্যাবলী তোমারই হৃদয়ের তেজ হইতে উৎপন্ন হইতেছে।'

তিনি আরও বলিতেন—'সাধ্বী রাবিয়া কাহারও শিক্ষাধীন না হইয়া অন্তরে অলৌকিক ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন।' যাঁহাকে আল্লাহতায়ালা আধ্যাত্মিক জ্ঞান দানে কৃতার্থ করিয়াছেন, তাঁহার আর বাহ্যিক জ্ঞানের আবশ্যক কি? হজরত রাবিয়া দিব্য জ্ঞানে জ্ঞানী ছিলেন, সুতরাং কাহারও শিক্ষাধীন হওয়ার তাঁহার প্রয়োজন ছিল না।

অতঃপর সাধ্বী রাবিয়া কিছুকাল তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করেন। তিনি প্রথমে বসরা ত্যাগ করিয়া পবিত্র ভূমি মক্কা মওয়াজ্জমায় উপনীত হন। এই সময় তাঁহার সহিত বহু সাধু তপস্বীর সাক্ষাৎ লাভ ঘটিয়াছিল। হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার পবিত্র রওজা মবারকেও তিনি কিছুকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। মক্কা হইতে তিনি মদিনা শরীফে চলিয়া যান এবং জেরুসালেম প্রভৃতি পুণ্য ভূমিতে অবস্থান করিয়া জীবনের শেষ অংশটুকু কাটাইয়া দেন। এই সময় তাপস-কুলরাণী রাবিয়ার পুণ্যপ্রভা দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বহুদূর সুদূরান্তর হইতে তাঁহার দর্শন লাভের জন্য কত শত শত সাধু পুরুষেরা আসিতেন এবং তাঁহার উপদেশ শ্রবণে কৃতার্থ হইতেন।

একদিন দুইজন সাধু পুরুষ তাঁহাকে দর্শন করিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি আগন্তুক ব্যক্তিদ্বয়কে ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া তাঁহার সর্ব্বসাকুল্যে সম্বল দুইখানি রুটী তাঁহাদের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। এমন সময় আরও এক ক্ষুধার্ত্ত ভিক্ষুক আসিয়া সেই দুই খণ্ড রুটীর প্রার্থী হইলে, দেবী তৎক্ষণাৎ অম্লানচিত্তে রুটী দুইখানি ভিক্ষুককে দিয়া ফেলিলেন। সাধু পুরুষদ্বয় মনে মনে বিরক্তি বোধ করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কিছুক্ষণ পরে একটী দাসী কয়েকখানি রুটী লইয়া আসিয়া বলিল, 'আমার প্রভু আপনার সেবার জন্য এই কয়েক খণ্ড রুটী পাঠাইয়াছেন, আপনি ইহা গ্রহণ করুন।' তিনি গ্রহণ করিয়া উহা গণিয়া দেখিলেন ১৮ খণ্ড রুটী রহিয়াছে। রুটীগুলি ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, 'তোমাদের ভুল হইয়াছে, তোমার প্রভুর নিকট ফিরাইয়া লইয়া যাও।' দাসী বলিল, "না, ইহা আপনার জন্যই দেওয়া হইয়াছে, আপনি গ্রহণ করিয়া বাধিত করুন।" তিনি পুনরায় বলিলেন, 'ফিরাইয়া লইয়া যাও, তোমাদের ভুল হইয়াছে।' দাসী অগত্যা রুটীগুলি ফিরাইয়া

লইয়া গেল এবং তাহার প্রভুকে আদ্যোপান্ত সব কথা শুনাইল। প্রভু আরও দুই খণ্ড রুটী সংযোগ করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। এবারকার গণনায় ২০ খণ্ড হইল এবং তিনি তাহা সাধুদ্বয়কে খাইতে দিলেন। তাঁহারা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—'হাদিস শরিফে উল্লিখিত আছে, "যে ব্যক্তি খোদার নামে দীন, দুঃখী ও ক্ষুধার্তকে দান করিবে, সে তাহার দশগুণ প্রাপ্ত হইবে।" আমার, ঐ ভিক্ষুককে দুই খণ্ড দান করার পর যখন দাসী ১৮ খণ্ড রুটী লইয়া আসিল, জানিলাম, তাহাদের নিশ্চয় ভুল হইয়াছে; কেন না পবিত্র হাদিস-বাণী কখনও ব্যর্থ হইবার নহে। তাই রুটীগুলি ফেরত দিলাম, কিন্তু যখন ২০ খণ্ড আসিল, পবিত্র হাদিস-বাণী পূর্ণ হইয়াছে দেখিয়া গ্রহণ করিলাম।' কি আশ্চর্য্য খোদা-প্রেম! কি অদ্ভুত অটল, অচল বিশ্বাস! হজরত রাবিয়া যে প্রকৃত সাধ্বী রমণী-কুল-রত্ন ছিলেন, তাহা উপরোক্ত ঘটনাটী হইতে নিঃসন্দেহে অনুমেয়।

হজরত রাবিয়া এক অদ্বিতীয় খোদা ব্যতীত আর কাহারও উপর নির্ভর করিতেন না। এক দিন এক ব্যক্তি তাঁহার দুঃখ মোচন করিতে চাহিলে, তিনি তদুত্তরে বলিয়াছিলেন—"তোমরা নিতান্ত অবোধ, তোমরা কেহই আমার দীনতা মোচন করিতে পারিবে না। আমার কোনরূপ দুঃখ দীনতা নাই, আমি পরম সুখেই জীবন অতিবাহিত করিতেছি। যখন যে কোন বস্তুর প্রয়োজন হয়, তখন আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে চাহিয়া লই।" কথিত আছে, আর একবার কোনও এক ব্যক্তি তাঁহাকে একবলি স্বর্ণমুদ্রা দিতে আসিয়া তাঁহার এইরূপ আশ্চর্য্য উত্তর এবং কঠোর আত্মসংযম দর্শনে লজ্জিত হইয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল।

হজরত রাবিয়া সারাদিন ও সারারাত্রি উপাসনা আরাধনাতেই নিমগ্ন থাকিতেন, শুধু প্রাতঃকৃত্যাদির পর বসিয়া বসিয়া অল্পক্ষণ নিদ্রা যাইতেন এবং চেতনা পাইলেই বলিয়া উঠিতেন—"ওরে মন, কতদিন তুই ঘুমঘোরেই অচেতন থাকিবি? মৃত্যুর পর কবরে শুইবার জন্য অনন্ত কাল রহিয়াছে, এ দু'দিন জাগ্রত থাকিয়া পরকালের সম্বল লইয়া চল।"

সাধ্বী রাবিয়া চিরকুমারী ছিলেন। তিনি চরিত্রবলের অনন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া এ মর জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। ধীরে ধীরে তিনি বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলেন। রোগশয্যায় শায়িত থাকা অবস্থায় কোন এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনার কিছু খাইতে ইচ্ছা হয় কি?" তিনি তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "সুমিষ্ট খোর্মা ফল আমার অতি প্রিয়, তুমি জান ইহা এখানে কত দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু আমি এ পর্য্যন্ত তাহা খাইয়া দেখি নাই। আমি দাসী, আমার আবার ইচ্ছা অনিচ্ছা কি? ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা।" এইরূপে কৌমার্য্য ব্রতের আদর্শ, রমণীকুলের শিরোমণি, দীন দরিদ্রের আত্মীয়, পাপ-তাপ-নাশিনী দেবী হজরত রাবিয়া বসরী হিজরী ১৮৫ সনে (৮০১ খৃঃ অঃ) এই পাপপূর্ণ নশ্বর জগত পরিত্যাগ করিয়া অমর স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মাজার শরীফ জেরুসালমের পূর্ব্বাংশে 'অবলতুর' পাহাড়ে অবস্থিত। সেইস্থান এখন তীর্থে (Mount of Olives) পরিণত হইয়াছে। বৎসর বৎসর তথায় বহুসংখ্যক আওলিয়া দরবেশ ও সাধু পুরুষের সমাগম হয়।

হজরত রাবিয়া বাল্যাবধি ভ্রমপটু ছিলেন। তাঁহার ভ্রমলব্ধ অর্থ তিনি অকাতরে দীনদরিদ্রকে দান করিতেন। দুঃখীর দুঃখ মোচনে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ লাভ করিতেন। তিনি তাঁহার উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা বাগদাদ হইতে মদিনা শরীফ পর্য্যন্ত এক খাল খনন করিয়া দিয়াছিলেন।

কথিত আছে, দেবী রাবিয়ার আল্লা নাম্নী এক শিষ্যা ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিতেন। দেবীর মৃত্যুর এক বৎসর পরে আল্লা তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন—তিনি এক জ্যোতির্ম্ময় স্বর্ণ সিংহাসনে বসিয়া আছেন, পরিধানে অতি উজ্জ্বল ও কোমল সাটীন বস্ত্র। তাঁহার মুখ খানি বসন্তের পূর্ণশশীর ন্যায় দীপ্তিমান, পরিচারিকাগণ চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তিনি তাঁহার মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি

বলিলেন—"আত্মা, সর্ব্বদা খোদার ধ্যান করিও, কবরে শান্তি পাইবে।"

মঙ্গলময়ী মাতা হজরত রাবিয়ার উপদেশাবলীর কয়েকটি মাত্র নিয়ে প্রদত্ত হইল,—"তিল তিল করিয়া তোমার আয়ু ক্ষয় হইতেছে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তুমি মৃত্যুর দিকে ধাবিত হইতেছ। মানব, তাহা কি তুমি চিন্তা করিয়া দেখিতেছ? যিনি ভবের কাণ্ডারী, যাঁহার করুণায় জগৎ আনন্দময়, সূর্য্য দীপ্তিময়, শস্য শ্যামল, ফুল হাস্যময়, যাঁহার নামে হৃদয়ে আনন্দের উৎস বহে, প্রাণ পুলকিত হয়, সময় থাকিতে সেই অনাথনাথ প্রভু গফুর রহিমের নাম লও। যে বিশ্বপিতার আশ্রয় গ্রহণ করে, ত্রিভুবনে তাহার কিসের ভয়? যাঁহার কৃপায় জীবের অনুষ্ঠান, যিনি সর্ব্বত্রই বিরাজমান, হায়! কবে ঘরে ঘরে তাঁহার নাম জপ হইবে।"

"হে প্রভু! তোমার অনন্ত লীলা ক্ষুদ্র মানব কেমনে বুঝিবে? তুমি এ সংসারটাকে এক আজব চিড়িয়াখানা সাজাইয়াছ! মূর্খ মানব স্ব-ইচ্ছায় পথ করিয়া এই চিড়িয়াখানায় পশু সাজিতেছে। হায়, মানব কি নির্ব্বোধ! কেহ সামান্য একটা পদমর্য্যাদের জন্য শত শত লোকের সর্ব্বনাশের ষড়যন্ত্র করিতেছে, কেহ নিজকে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচয় দিতে কতই না শত শত কৌশলজাল বিস্তার করিতেছে! কেহ গোপনে একটু সৎকার্য্য করিয়া ভাবিতেছে, দশজনের সামনে হইলে বেশ বাহবা লওয়া যাইত! আবার কেহ সামান্য একটু দয়ার কাজ করিয়াই মনে মনে ভাবিতেছে, একটা সভায় যদি আমার এই দয়ার কথা প্রচার হইত! কেহ যদি কাহারও কোন উপকার করে আর সে যদি জন্মের মত তাহার গোলাম না হয়, তাহা হইলে তখন তাহার চক্ষুদ্বয় রাগে রক্তজবা হইয়া উঠে এবং অকৃতজ্ঞ, বেইমান বলিয়া কতই না গালি দেয়।

"ওহে জ্ঞানী, ওহে পণ্ডিত, তুমি হয়ত মনে মনে গৌরব লইতেছ যে, তুমি কিছু জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছ; কিন্তু মন কি তোমার বশে রহিয়াছে? তোমার মন কি তোমার অসুখের কাজে ঘুরিয়া ফিরিতেছে না? সুতরাং ইহারই নাম যদি জ্ঞান হয়, তবে মানব মাত্রই জ্ঞানী। দুষ্ট মন সর্ব্বদাই ফাঁকি দিতেছে, আর মানব জানিয়া শুনিয়া সেই অসুখের কাজ করিতেছে। হায়, মানব কি নির্ব্বোধ! অসুখের নামে তাহারা শিহরিয়া উঠিতেছে, আবার সেই অসুখকেই টানিয়া বুকে লইতেছে! কখনও মনের গোলাম হইও না। মন যাহা ইচ্ছা হয় ভাবুক, তুমি একবার বসিয়া পড়। একবার যদি মন বুঝিতে পারে যে, এ আমার মতে চলিবে না, অমনি দেখিবে সে তোমার বশ হইয়া গিয়াছে; তখন মনকে যে দিকে চালাও সেদিকেই চলিবে, যাহা করিতে বল তাহাই করিবে।

"হায়, মানবজাতি কি দুর্ব্বল! সর্ব্বদা মনের বশীভূত হইয়া চলে, আর দুষ্ট মন সর্ব্বদাই ফাঁকি দিয়া ঘুরাইয়া মারে! বিপদ যখন তাড়না দেয়, পীড়া যখন সঙ্কট হইয়া দাঁড়ায়, তখন নিরুপায় হইয়া দয়াময় রহিম রহমানকে ডাকিতে থাকে; আর যখন রোগ আরোগ্য হয়, তখন হয় ডাক্তারের না হয় কবিরাজের, না হয় ঔষধের গুণের প্রশংসা আরম্ভ করে! মানব কি নির্ব্বোধ! বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলেই দয়াময় আল্লাহতায়ালাকে ভুলিয়া যায়, তাঁহার অতুলনীয় করুণার কথা আর মনে থাকে না! পরওয়ারদেগার, কখন তাহাদের এই ভ্রম দূরীভূত হইবে? কখন তোমার সৃষ্ট মানব তোমার মহিমা ও তোমার করুণা বুঝিতে পারিবে এবং তোমার নামে বিভোর হইবে?

"আমার দয়ালু প্রভুর পবিত্র নামে পাপগ্লানি ঘুচিয়া যায়। হে পাপী, তুমি কেন মিছা ভাবনায় ভয়াতুর হইয়া পড়িয়াছ? তবে আর ভাববাদী পয়গম্বর আসিয়াছিলেন কেন? কার জন্য তিনি এত দুঃখ, যন্ত্রণা ও অপমান তুচ্ছ করিয়া সত্য সনাতন ইসলাম ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন? তিনি কি পাপীকে সাদরে অভয় প্রদান করিয়া বলেন নাই:—"আয়, আমার করুণাময় পবিত্র খোদাকে ডাক, তোর পাপ তাপ থাকিবে না।" হে দুর্ব্বল, কি ভাবিতেছ? খোদাকে ডাকিতে কি তোমার সাহস হইতেছে না? তিনি যে গফুর, গাফ্ফার রহিম, রহমান একথা কি জান না?

তিনি সকলকেই ভালবাসেন। যে তাঁহাকে সাধ করিয়া ডাকে, সেই তাঁহাকে পায়। হায়, যিনি বিশ্ব দুনিয়ার মালিক, ডাকিলেই যাঁহাকে পাওয়া যায়, তাঁহাকে ডাকিলাম কোথায়? তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিলাম কোথায়? যাঁহার শস্যশ্যামল, ফল-ফুল পরিশোভিত জগতকাননে এত সুখের সহিত বাস করিতেছি, যাঁহার অন্নে উদর ভরিয়া প্রাণ বাঁচাইতেছি, আমরা তাঁহাকে ভালবাসি না! তাঁহার পবিত্র ও মধুর নাম মুখে লই না? তাঁহার আদেশ মানিয়া চলি না। ধিক্, আমরা কি অকৃতজ্ঞ, কি পামর! আমাদের কপালে নরক।

"অবোধ মানব, তুমি শত দিকে তোমার মন দৌড়াইয়া হয়রান হইয়া মরিতেছ, কিন্তু তুমি যাঁহার কৃপায় জীবন ধারণ করিয়া মহানন্দে কালাতিপাত করিতেছ, তাঁহার প্রিয় হইতে পারিলে না। হইবেই বা কিরূপে? একবার তোমার মন ধন-ঐশ্বর্য্যের দিকে ধাবিত হইতেছে, একবার দৌড়াইতেছে প্রতিহিংসা সাধনায়, আবার দৌড়াইতেছে ধর্ম্মলাভের অন্বেষণে। সামান্য দুর্জ্জন ও ক্ষুদ্র মানব যারা কি এতটা চলিতে পারে? মনকে স্থির কর। যদি তুমি ভাব, ধন সম্পত্তি তোমার অতি প্রিয়, ইহাই তোমার একমাত্র সম্বল; অমনি দেখিবে, তোমার মন ধনের মায়ায় ধনাগারে পড়িয়া থাকিবে। আর যদি ভাব যে, ধনসম্পত্তি তোমার পরমশত্রু, তোমাকে বৃথা মায়ায় ভুলাইয়া রাখিয়াছে, তাহা হইলে দেখ দেখি তোমার মনটা কি বলে? নানাপ্রকার কুচিন্তা করিয়া মনের পোলামে হইয়া বসিয়াছ! পাপ-সাগরে ডুবিয়া নির্ম্মল রত্ন-সিংহাসনে অপবিত্র অশান্তির আসন পাতিয়াছ! একবার একমনে তিন দিন বসিয়া আল্লা আল্লা করিয়া দেখ দেখি, মন তোমার অনুগত হয় কি না? জগত পিতার পবিত্র প্রেমের বেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলেই উহা বশীভূত হইয়া পড়িবে।

"হে দুর্ব্বল, বুঝিয়া দেখ, সাধ করিলেই হাসি আসে; আবার সাধ করিলেই কান্নাও আসে। ভোগ, লালসা, কলহ, বিদ্বেষ, অহঙ্কার, পরিতাপ, সাধ করিয়াছিলে, তাই পাইয়াছ; আবার দুঃখের সাধ করিয়াছিলে, দুঃখ পাইতেছ। কিন্তু প্রকৃত সাধের বস্তু বিশ্বপিতাকে পাইবার জন্য সাধ করিয়াছিলে কি? মনপ্রাণ দিয়া তাঁহার আদেশ মানিয়া চলিয়াছিলে কি? তাঁহাকে পাইবার জন্য সাধ কর নাই, সে সাধের অপূর্ব্ব স্বাদও পাও নাই।

"তুমি বলিতে পার, আমরা খুঁজিয়াছি, সাধের জিনিষ পাই নাই। আমি বলি, খুঁজিবার মত খোঁজ নাই; তাই পাও নাই। খুঁজিয়াছিলে বড় হইবার আশায়। শুনিয়াছিলে, তাঁহাকে পাইলে মানুষ বড় হয়, সম্মান বাড়ে, তাই তাঁহাকে খুঁজিয়াছিলে। সাধ করিয়াছ বড় হইবে, সুতরাং বড় হইয়াছ। তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু, প্রাণ ভরিয়া নিষ্কাম ভাবে সাধ করিয়া যদি শুধু তাঁহাকেই পাইতে ইচ্ছা কর, পাইবে। পাপী, তোমার ভয় কি? তিনি পাপ-তাপহরণকারী বিশ্ব-পিতা। পাপীর পাপ হরণ, তাপীর তাপ বিনাশই তাঁহার কাজ। ভাবনা চিন্তাকে পিছনে ফেলিয়া প্রথমে বিশ্বাসী হও; বিশ্বাস বড়ই সোজা পথ। সোজা পথ পরিত্যাগ করিয়া কণ্টকাকীর্ণ বাঁকা পথে যাইও না। সরল মনে, সরল ভাবে তাঁহাকেই ডাক, অচিরেই তোমার সিদ্ধিলাভ হইবে।

"কেন তাঁপী বসিয়া আছ? আমার কথা কি তোমার বিশ্বাস হইতেছে না? বুঝিয়াছি, তুমি ভয় ও ভরসার মধ্যস্থলে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছ। ভয় ও ভরসা উভয়ই যে মানুষের শত্রু! সুতরাং ভয় ও ভরসা পরিত্যাগ করিয়া শুধু খোদা খোদা কর, সন্দেহের কোনই কারণ নাই। ভাববাদী মহাত্মা হজরত এব্রাহীম* খলিলুল্লাহ কি আল্লার পবিত্র নামে পাপাত্মা ক্রুরস্ত রাজা নমরুদের প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড হইতে উদ্ধার পান নাই? পুণ্যাত্মা হজরত ইউনুস কি খোদার নামে সমুদ্রস্থিত মৎস্যগর্ভ হইতে রক্ষা পান নাই? ধর্ম্মাত্মা হজরত নুহ কি বিপ্লাবক জলের তরঙ্গ হইতে, শুধু আল্লারই নামে বাঁচিয়াছিলেন না? তোমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা কর, তাঁহার কাজ তিনি করিবেন।" (আল ইসলাম)

মিসেস এম, আহমদ

যক্ষ্মারোগ ও সমাজসংস্কার

ডাক্তার আর্থার ল্যাঙ্কেষ্টার বর্ত্তমান সময়ে এদেশে যক্ষ্মারোগের প্রসার ও নিবারণ সম্বন্ধে তত্ত্বালোচনায় নিযুক্ত আছেন। তিনি যক্ষ্মারোগ ও সমাজসংস্কার নামে ইংরেজীতে সম্প্রতি বিবিধ তথ্যপূর্ণ একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সেই প্রবন্ধটীর সারমর্ম্ম আমরা সংকলন করিয়া দিলাম।

যক্ষ্মারোগের বিস্তার সম্বন্ধে আলোচনা করিলে আমরা এদেশে সমাজ ও পারিপার্শ্বিক নানা বিষয়ক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বস্থানে এখন এই রোগ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে যে সকল স্থানে যক্ষ্মারোগ ছিল না, এখন সেই সকল স্থানেও ইহা দেখা দিয়াছে। পৃথিবীতে যত মৃত্যু ঘটে তাহার প্রায় এক সপ্তমাংশ এই রোগের ফল বলিয়া অভিজ্ঞদের ধারণা।

সভ্যতার কতকগুলি ফল—মনুষ্যের বিবিধ দুর্গতি। তন্মধ্যে যক্ষ্মারোগই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা তিক্ত ফল। সভ্যতার ফল বলিতে আমরা সাধারণতঃ ভাল দিকটাই মনে করি: বনবাসের অসভ্য অবস্থা হইতে এই সভ্যতার গুণেই মানুষ মনুষ্যপদবাচ্য হইয়াছে; সভ্যতার ফলেই মানুষের মন ও আত্মার বিকাশ হইয়াছে, এবং সে নানা সুখ সুবিধা ভোগ করিতেছে। কিন্তু সভ্যতা শুধু নগর ও প্রাসাদেরই সৃষ্টি করে না, নগরের উপকণ্ঠস্থ অতি জঘন্য পল্লী এবং কুটীরেরও সৃষ্টি করে। আরাম-দায়ক উত্তাপ, উৎকৃষ্ট বস্ত্র, সুখের নানা উপকরণ—কয়লার খনি ও নানাপ্রকার কলকারখানার সাহায্যেই আমরা পাইয়া থাকি। সভ্যতার এই যে শেষোক্ত অন্ধকার দিক, যক্ষ্মারোগের বিস্তৃতি ওতপ্রোত ভাবে তাহারই সহিত সংযুক্ত। অসভ্য জাতিগুলিকে যখনই অস্বাভাবিক উপায়ে তাড়াতাড়ি সভ্য করিয়া লইবার চেষ্টা করা হইয়াছে তখনই তাহাদের মধ্যে এই ভীষণ ব্যাধি দেখা দিয়া জাতিগুলিকে ধ্বংসের পথে লইয়া গিয়াছে। আমেরিকার রেড্‌ইণ্ডিয়ান, নিউজিলাণ্ডের মাওরী, অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীগণ, ইউরোপীয়দিগের সংস্পর্শে সভ্যতার সংস্রবে আসিয়া প্রধানতঃ যক্ষ্মারোগেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

সভ্যতার সঙ্গে যক্ষ্মারোগের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অতি সাবধানে চলিলে তবে ইহার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। প্রথমে ইংলণ্ডের কথাই আলোচনা করি। সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার আমলে উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর ইংরাজ-মহিলাদের মধ্যে যক্ষ্মারোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল। সে সময়ে স্ত্রীশিক্ষার অর্থ ছিল—বিবিধ কলাবিদ্যা-শিক্ষা—যাহাতে শারীরিক পরিশ্রম মোটেই নাই। শারীরিক পরিশ্রম ছোট লোকের মেয়েদেরই উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইত। ক্লান্তি ও ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে ব্যায়াম ও পরিষ্কার বায়ুসেবন মেয়েদের নিকট একবারে নিষিদ্ধ ছিল বলিলেই হয়। কিন্তু এখন সেই অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইংরেজ নারীর স্বাস্থ্য ও পরিশ্রমসহিষ্ণুতা এখন প্রায় ইংরেজ পুরুষের সমতুল্য। এখন ইংলণ্ডে যক্ষ্মারোগে বরং পুরুষই বেশী আক্রান্ত হয়।

এখন ভারতবর্ষের কথা আলোচনা করা যাউক এবং যক্ষ্মারোগ এদেশে সামাজিক কি কি সমস্যা উপস্থিত করিয়াছে দেখা যাউক। বোম্বাই, কলিকাতা এবং ভারতের অন্যান্য বড় বড় সহরে গরীব লোকদের থাকিবার অংশের অবস্থা সর্ব্বাংশে যক্ষ্মারোগ বিস্তৃত হইবার অনুকূল। ঘরগুলি বায়ুশূন্য, অপরিষ্কার। রাত্রিকালে এক ঘরে বহু লোক নিদ্রা যায়, সেই সকল ঘরে হয় ত জানালা নাই, থাকিলেও রাত্রিকালে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হয়। একজনের যক্ষ্মারোগ হইলে তাহার আত্মীয়গণ নিতান্ত অসতর্ক ভাবে তাহার সহিত মিশিয়া থাকে। যাহারা দুর্ব্বল এই রোগ সহজেই তাহাদিগকে আক্রমণ করে। শুধু যে রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরাই এই রোগের বীজাণু বিস্তার করে তাহা নয়। ভূস্বামীদের অর্থগৃধ্নুতা, মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তব্যশৈথিল্য, একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা,—এই সকল কারণেও রোগের বীজাণু চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়। ভূস্বামীগণ অর্থলোভে স্বাস্থ্য-রক্ষার বিধানের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া গৃহনির্ম্মাণ করেন, দরিদ্র লোকেরা দলে দলে তাহাতে বাস করিয়া যক্ষ্মা-

গ্রস্ত হয়। সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য জনাকীর্ণ স্থানে ভূমি গ্রহণ করিয়া তাহাতে রাস্তা খোলা ও উদ্যান প্রতিষ্ঠা মিউনিসিপালিটীগুলির কর্ত্তব্য, কিন্তু অতি অল্প মিউনিসিপালিটীই তাহা করিয়া থাকে। একান্নবর্ত্তী পরিবারে রুগ্ন ব্যক্তির সম্বন্ধে পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের অসাবধানতা এই রোগ বিস্তারের এক প্রধান কারণ।

কতকগুলি খাদ্য দ্রব্যের দুর্মূল্য এই রোগ বিস্তৃতির আর এক কারণ। আর্য্যাবর্ত্তে শীত বেশী, শরীরের উত্তাপবর্দ্ধক খাদ্যের এখানে বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু গত ২০ বৎসরে দুগ্ধের মূল্য তিন গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গরীবের শিশুরা দুধ পায়ই না, যাহা পায় তাহাতে এত ভেজাল যে তাহা পানে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই বেশী। উপযুক্ত পরিমাণ দুগ্ধ ও চিনির অভাবে দুর্ব্বল শিশুরা যক্ষ্মারোগে যত আক্রান্ত হয় তত আর কিছুতেই নহে।

স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে শারীরিক ব্যায়াম ও বিশুদ্ধ বায়ুর আবশ্যকতার কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। এদেশের স্ত্রীলোকদের অবরোধপ্রথা যক্ষ্মারোগ বিস্তারের বিশেষ সাহায্য করে। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে শারীরিক পরিশ্রমের অভাবে ইংলণ্ডের নারীগণ যক্ষ্মারোগে কিরূপ আক্রান্ত হইত আমরা ইতিপূর্ব্বে তাহার আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু এখন সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে; শারীরিক শ্রম ও বিশুদ্ধ বায়ুর উপকারিতা তাহারা বেশ বুঝিয়াছে, তাহাদের স্বাস্থ্যেরও আশ্চর্য্য উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ সম্ভ্রান্ত মহিলা, যাঁহাদের সমাজে নেতৃস্থান গ্রহণ করিবার কথা, এবং নিজেদের দৃষ্টান্ত দ্বারা অপেক্ষাকৃত অল্প ভাগ্যবতী ভগ্নীদিগকে স্বাস্থ্যরক্ষার বিধান শিক্ষা দিবার কথা—তাঁহারা সামাজিক শাসনে গৃহকোণে আবদ্ধ। সবল শরীর লাভ এবং দেশের নানা কল্যাণ সাধনের অধিকারে তাঁহারা বঞ্চিত। এই সামাজিক কুপ্রথার ফল যেরূপ হওয়া উচিত, জন্মমৃত্যুর হিসাব দেখিলে দেখা যায় ঠিক তাহাই ঘটিতেছে। ভারতবর্ষের বড় বড় নগরগুলিতে যে সকল শ্রেণীর মধ্যে এই অবরোধ প্রথা বর্ত্তমান সেই সকল সম্প্রদায়ে যক্ষ্মায় পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতির মৃত্যু দ্বিগুণ, কোন কোন স্থানে তিন গুণ! কিন্তু যে সকল সম্প্রদায়ে অবরোধ নাই, সেই সকল সম্প্রদায়ে এই রোগে স্ত্রীপুরুষের মৃত্যুসংখ্যা সমান। ব্রহ্মদেশে অবরোধপ্রথা নাই,—সেখানে যক্ষ্মারোগে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষই বেশী মারা পড়ে!

কি ভারতবাসী কি ইউরোপীয় এবিষয়ে মত প্রকাশের যাঁহাদের ক্ষমতা ও অধিকার আছে তাঁহারা একবাক্যে স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়ে অবরোধ প্রথার অনিষ্টকারিতার সাক্ষ্য দিয়াছেন। যাঁহারা নিতান্তই এই প্রথা রক্ষা না করিয়া পারেন না, তাঁহাদের উচিত অবরোধবাসিনীদের শরীর চালনা ও বায়ুসেবনের সুব্যবস্থা করিয়া দেওয়া।

এদেশের স্ত্রীদিগের মধ্যে যক্ষ্মার প্রবলতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞগণ আর একটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—অল্প বয়সে বিবাহ। দেহের সম্পূর্ণ বিকাশের পূর্ব্বেই বিবাহ হওয়ায় বিবাহিত জীবন যাপন ও সন্তান গর্ভে ধারণ, প্রসব ও পালন দ্বারা তাহাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। এদেশের জঘন্য সূতিকাগৃহ প্রসূতিদের যক্ষ্মারোগে আক্রমণের এক প্রধান কারণ। সন্তান প্রসবের পর মেয়েদের জীবনীশক্তি অতি ক্ষীণ থাকে, সংক্রামক রোগের বীজাণু শরীরে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার এই প্রশস্ত সময়। এমন সময়ে তাহারা স্যাতসেতে বায়ু চলাচলহীন রোগবীজাণুপূর্ণ সূতিকাগৃহে বাস করে। এদেশের একটী সহরে ৬৪টী যক্ষ্মাগ্রস্ত স্ত্রীলোকের রোগের মূলানুসন্ধান করিতে গিয়া দেখা গিয়াছিল তাহাদের ২০জন সূতিকাগৃহে এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল।

পুরুষদের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ব্যবসায় এই রোগ বিস্তারে সাহায্য করে। দরজি, জোলা, কাপড়ের কলের মজুর—যাহাদের শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু নাসিকার সাহায্যে ফুসফুসে প্রবেশ করিয়া থাকে, তাহারা এই রোগে বেশী আক্রান্ত হয়। পল্লীগ্রামের বিশুদ্ধ বায়ু হইতে সহরে আসিয়া যাহারা বাস করে তাহারা সহজে এই রোগে আক্রান্ত হয়। অনেক ছাত্র কদর্য্য অভ্যাস দ্বারা অল্প বয়সেই স্বীয় দেহে এই রোগের ভিত্তি স্থাপন করে।

এই রোগের সহিত সংগ্রাম করিতে হইলে দুইটী বিষয় স্মরণ রাখা বিশেষ আবশ্যক। প্রথম—যাহারা এই রোগে আক্রান্ত হয় তাহারা নানাপ্রকার পেটেণ্ট ঔষধ সেবন না করিয়া যদি বিশুদ্ধ বায়ু সেবনাদি স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ বিধিগুলি পালন করে তবে আরোগ্য লাভ করিতে পারে। দ্বিতীয়—রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের সংস্রব পরিত্যাগের চেষ্টা না করা। যাহারা এই রোগে আক্রান্ত হয় তাহারা আমাদের সহানুভূতিরই পাত্র, সর্ব্বপ্রকারে তাহাদের সঙ্গ বর্জ্জনের চেষ্টা এই সকল রোগীর প্রতি অতি নৃশংস ব্যবহার! এই রোগ আরোগ্য হইতে পারে, এবং ইহার আক্রমণও নিবারণ করা যায়।

দাম্পত্য শাসন

বিদেশী গল্প

স্ত্রী রান্না করিতেছিল, স্বামী দ্বিতীয় বার চীৎকার করিয়া বলিল, "জুতা খুলে দাও!" স্ত্রী রান্না ঘরের দরজা একটু খুলিয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিল। স্বামী ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল, "বাড়ী আসিলে জুতা খুলিয়া দিবার জন্য যদি তোমাকে এমন করিয়া আবার বলিয়া দিতে হয়, তবে তোমার হাতখরচের টাকা হইতে আমি পাঁচ সিকা কাটিয়া রাখিব।" স্ত্রী কোন উত্তর করিল না। স্বামী বলিতে লাগিল, "আমি ঠিক করিয়াছি, আমাদের পরিষ্কার বুঝিবার জন্য এবিষয়ে একটা লেখা পড়া থাকা ভাল। দোয়াত কলম আন ত!" এই বার স্ত্রী উত্তর করিল, "তুমি নিজে দোয়াত কলমটা আনিলে হয় না!" স্বামী স্ত্রীর এইরূপ স্পর্দ্ধা দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বলিল, "তোমার দেখিতেছি বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। আচ্ছা, এখনই একটা পরিষ্কার মীমাংসা করিয়া ফেলিতেছি। (কাগজ কলম লইয়া লিখিতে লাগিল এবং পড়িয়া বলিয়া যাইতে লাগিল:—) ডাকিলে উত্তর না দিবার জন্য আট আনা,—বুঝিলে ত!"

স্ত্রী। হাঁ বুঝিলাম।

স্বামী। খারাপ রান্নার জন্য কত কাটা যাইবে?

স্ত্রী। তোমার যাহা ইচ্ছা।

স্বামী। বটে! আট আনা। আর যখন চাহিব তখন পরিষ্কার জামা না পাইলে চার আনা।

স্ত্রী। এমন করিয়া কাটিলে আমার হাত খরচ ত কিছুই থাকিবে না!

স্বামী। তাহা তোমারই উপর নির্ভর করে। দেখিও আমার এই সকল নিয়ম যেন কখনো ভঙ্গ না হয়। আমি এই নিয়মগুলি নিজেই নকল করিব এবং বসিবার ঘরে টাঙ্গাইয়া রাখিব।

স্ত্রী। হাঁ, আর আমার আত্মীয় স্বজন আসিলে দেখিবে, আমি স্বামীর কাছে কেমন সম্মান পাইতেছি!

স্বামী। ভাল কথা! তোমার দু জন আত্মীয় স্বজনের বেশী যদি আসে তবে প্রত্যেক আত্মীয়ের জন্য চার আনা। নেও, লিষ্টখানা পড়িয়া শোনাও; তারপর হাটু গাড়িয়া বসিয়া পায়ের জুতা খুলিয়া দেও, তোমাকে কতবার একটা কথা বলিতে হইবে!

স্ত্রী লিষ্টখানা স্বামীর হাত হইতে লইয়া তাহা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া চুল্লিতে নিক্ষেপ করিল। তারপর ভিতরের জামা হইতে মনিব্যাগ খুলিয়া ৫ খানা হাজার টাকার নোট বাহির করিল এবং স্বামীকে বলিল, "দেখ উইলিয়াম, আমি এখনই পোষ্ট অফিসে যাইয়া এগুলি জমা করিয়া আসিতেছি।

স্বামী। একি?—তুমি এগুলি কোথায় পাইলে?

স্ত্রী। তোমার কথার উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই। আর বলিলেও বলিতে পারি। আমার কাকা মৃত্যুকালে উইল করিয়া এইগুলি আমায় দিয়া গিয়াছেন। আমার দুই ভগ্নীকেও পাঁচ হাজার করিয়া দিয়াছেন।

স্বামী। তোমার কাকা ত তোমাকেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসিতেন। তাঁর টাকা আছে তাহা ত জানিতাম না। তাঁর টাকা তোমাকেই ত সব দিয়া যাওয়া উচিত ছিল। আমি উইল খানা দেখিতে চাই, উইলে আপত্তি করিতে হইবে, সমস্তটা টাকা যাহাতে তুমি পাও সেই চেষ্টা করিতে হইবে।

স্ত্রী। না,—এসব কিছুই তোমাকে করিতে হইবে না।

স্বামী। যা হোক, আমাদের পক্ষে এও বেশ!—নিতান্ত কম টাকা ত নয়!

স্ত্রী। "আমাদের" পক্ষে নয়, এই টাকা "আমার," ইহাতে তোমার কোন দাবী দাওয়া নাই।

স্বামী। হঠাৎ অনেক টাকা পাইলে গরীব লোকের মাথা খারাপ হইয়া যায়, শুনিয়াছিলাম,—এই প্রথম দৃষ্টান্ত দেখিলাম। (এই বলিয়া স্বামী নিজেই চতার ফিতা খুলিতে লাগিল) আচ্ছা, অন্য সময় এই বিষয় কথাবার্ত্তা হইবে। (পুনরায় জুতার ফিতা বাঁধিয়া) কিন্তু দেখ দেখি বাহিরে কি ঠাণ্ডা, এমন শীতে তুমি ডাকঘরে গেলে সর্দ্দি লাগিয়া মারা যাবে যে! আমাকে নোটগুলি দেও, আমিই ডাকঘরে জমা দিয়া আসি। টাকা পয়সা নাড়াচাড়ার অভ্যাস তোমার চেয়ে আমার বেশী আছে।

স্ত্রী। এতদিন তাই হইয়াছে, এখন আমাকেও এই অভ্যাসটা করিতে হইবে। তুমি বসিয়া আরামে চুরুট খাও, আমি টাকাটা জমা দিয়া আসি, তারপর আমার সঙ্গে তোমার কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তার আলোচনা করিব।

স্বামী। বা! তোমার ভগ্নীদের কাছে এসব শিক্ষা হইয়াছে বুঝি!

স্ত্রী। না, কাকার অনুগ্রহে।

এতদিন স্বামী সকাল বেলা বাহিরে যাইবার সময় সদর দরজায় দাঁড়াইয়া পাড়াপ্রতিবেশীদের শুনাইয়া স্ত্রীকে নানা হুকুম করিয়া বাড়ীর বাহির হইত, এর পর দিন এসব কিছুই করিল না, বরং স্ত্রীর প্রতি আদরপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

মধ্যাহ্নে স্বামী বাড়ী ফিরিয়া বেতনের টাকা স্ত্রীর সম্মুখে রাখিল, জরিমানার বাবত কিছুই কাটিল না, অথবা এই টাকায় অনেক দিন চালাইতে হইবে—অন্যান্য বারের মত এ হুকুমও করিল না। বরং স্ত্রীকে বৃথাকার্য্যে সাহায্য করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল! কিন্তু অনেক অনুনয় করিয়া স্ত্রী তাহাকে থামাইল—কারণ স্বামীর সাহায্যে সব কাজেই বরং দেরী হইতেছিল। স্বামী কোন দিন সিনেমায় যাইত না, পরদিন স্ত্রীর সঙ্গে সেও সিনেমায় গেল। রাস্তায় ২।৩ জন বন্ধু তাহাদের সঙ্গে তাহাকে মিলার জন্য চেষ্টা করিল, কিন্তু স্ত্রীকে একাকী ফেলিয়া যাইতে কিছুতেই সে সম্মত হইল না। দুজনে সিনেমার উপদেশ ও সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে চলিল। ফিরিবার সময় স্বামী একখানা সংবাদ-পত্র কিনিয়া লইল, এবং রাত্রির আহার কালে তাহা পড়িলে স্ত্রীর কোন অসুবিধা হইবে কিনা, জিজ্ঞাসা করিল।

কাগজ পড়িতে পড়িতে স্বামী স্ত্রীকে বলিল, "ওগো দেখ, ঘোড় দৌড়ের বাজি শীঘ্রই হইবে। ৬।৭ টা ঘোড়া দৌড়ান হইবে, যে ঘোড়াটা জিতিবে বলিয়া তোমার বিশ্বাস, তুমি সেই ঘোড়াটার নাম করিয়া যত টাকা দিবে, যদি সত্য সত্যই সেই ঘোড়া জিতে তবে তুমি তার ত্রিশ গুণ টাকা পাইবে।"

স্ত্রী। সত্য নাকি!—তুমি বল ত কোন্ ঘোড়াটা জিতিবে বলিয়া তোমার বিশ্বাস!

স্বামী। কাল ট্রামে যাইতে যাইতে শুনিলাম, দুইজন অভিজ্ঞ লোক পরস্পর বলাবলি করিতেছে যে এবার ভিনোলিয়া ঘোড়াটা নিশ্চয়ই জিতিবে।

স্ত্রী। তবে আমরা এই টাকা হইতে চার হাজার টাকা ভিনোলিয়ার নামে বাজিতে দি!

স্বামী। না না, আমি এসব পছন্দ করি না। ভাবিয়া দেখ যদি ভিনোলিয়া বাজি জিতিতে না পারে তবে এক হাজার টাকাই লোকসান।

স্ত্রী। দেখ, আমার মন বলিতেছে, নিশ্চয় ভিনোলিয়া জিতিবে, আমি বাজি রাখিব।

স্বামী অনেকক্ষণ স্ত্রীকে বুঝাইল, কিন্তু অবশেষে স্ত্রীর মতই প্রবল হইল। ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বামী বাজিতে টাকা দিতে চলিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

---

* মহাত্মা রিচিটর একটী গল্প অবলম্বনে

ভারত মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। (মনু)
The woman's cause is man's : they rise or sink
Together, dwarfed or God like, bond or free :
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall man grow ? (TENNYSON.)

বঙ্গানুবাদ :—স্ত্রী-পুরুষের উন্নতি অবনতি একসূত্রে গ্রথিত। নারী অবনত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে পুরুষ কখনই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। (টেনিসন)

"I will be as harsh as truth, and as uncompromising as Justice ; I am in earnest—I will not equivocate, I will not retreat a single inch——and I will be heard."(WILLIAM LLOYD GARRISON.)

মর্ম্মানুবাদ :—আমি সত্যের ন্যায় কঠোর ও ন্যায়ের মত অনমনীয় হইব। আমি দৃঢ়সংকল্প, আমি কিছুতেই এক তিলও পশ্চাৎপদ হইব না। আমি নিশ্চিত জানি, তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। (লয়ড গ্যারিসন)

১৩শ ভাগ } অগ্রহায়ণ—পৌষ, ১৩২৩। { ৮ম ও ৯ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ।

সমগ্র নারীজাতির প্রতি আবেদন।

সবিনয় নিবেদন,

যিনি একান্তভাবে অসম্প্রদায়িক, মানব-মনের বিচিত্র ভাবরাশি মূলে সত্যের যে অখণ্ড স্বরূপ বিদ্যমান—ভগবৎকৃপালব্ধ সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি-দ্বারা সেই স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করিয়া যিনি ধন্য হইয়াছিলেন, যে ক্ষেত্রে সর্ব্বধর্ম্মের নিত্যকাল আপনা আপনিই সমন্বয় হইয়া রহিয়াছে, ধর্ম্মসমন্বয়ের জন্য যেখানে মানব-চেষ্টার অপেক্ষা নাই, মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য,—আত্মার সেই বিশুদ্ধ স্বরূপ যাঁর জীবনের একমাত্র প্রতিষ্ঠাভূমি এবং সেই ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়াই যিনি সমগ্র জগতের নরনারীকে এক অভেদ মিলনক্ষেত্রে আহ্বান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ভারতের চিরন্তন ইষ্টদেবতা আত্মার মহামহিমান্বিত ভাবকে পরিস্ফুট আকারে লোক-সমক্ষে প্রচারিত করিয়া বর্ত্তমান যুগে ভারতকে যিনি স্বপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন, যাঁর আত্মার অমোঘ-শক্তি-প্রভাবে ভারতের তৎকালীন বিক্ষিপ্ত ও আচ্ছন্ন দৃষ্টি নিজের লক্ষ্য-স্থানকে দেখিতে বা চিনিতে পারিয়াছে ; অতীত, বর্ত্তমান ও ভাবী মানব-শিক্ষার ফল একাধারে যাঁহাতে ফলবান বলিলেই হয়, সেই সাধ-কোত্তমের অবতার, আত্মার স্বাধীনতা-ঘোষণাকারী, পরম জ্ঞানী, সাধকশ্রেষ্ঠ, বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের আদি কর্ত্তা, নিরভিমান, নির্ভীক, উন্নতিশীল, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি অন্তরের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য দেশবাসীরা তাঁহার জন্মস্থান হুগলী জেলার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে তাঁহার স্মৃতি উদ্দেশ্যে

একটী মন্দির নির্ম্মাণ ও তদানুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যবস্থা বিধানে উদ্যোগী হইয়াছেন।

বিরাট পুরুষের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের বিরাট আয়োজনে উদ্যোক্তা মহাত্মাগণ নারীজাতিকে বাহিরে রাখা দূরে থাকুক, এ-কার্য্যে নারীর অধিকারই তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে স্বীকার করিতেছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, এই মহাপুরুষের কার্য্যে নারী ব্যতীত একাম্ব অসম্ভব।

রাজা রামমোহন রায়ের কার্য্যে নরনারীর অধিকার তুল্যরূপে স্বীকৃত হইলে রাজার স্মৃতি সর্ব্বাঙ্গীন উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, এই বিবেচনায় তাঁহারা নারীজাতিকে উচ্চস্থান দান করিয়া—শুধু বাক্যে নয়, ভাবে নয়, পরন্তু কার্য্যে—রাজার পরাক্রান্তুসরণ করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেছেন। এই ব্যাপারে দেশ-মধ্যে যে একটী নবশক্তির উদ্বোধন অনুভূত হইতেছে, তাহাতে আর ভুল নাই। রাজার অশরীরী আত্মার শক্তি যেন আজ এই কার্য্যের কর্ণধার হইয়া এই কর্ণধারকে কূলে উত্তীর্ণ করিবার জন্য সত্বরমান হইয়াছে। কে জানে পরিণামে ইহা কি ফল প্রসব করিবে?

যিনি দেহ ধারণ করিয়া এক সময় সমগ্র ভারতকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন, আজ দেহমুক্ত হইয়া তাঁহার অদৃশ্য শক্তি যে আবার কি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কে তাহা জানেন? দিব্য-প্রভাব-সম্পন্ন রাজা রামমোহন রায়ের আত্মাতে পরমাত্মার যে ইচ্ছা প্রকাশিত হইয়াছিল, সে ইচ্ছা আজ রাজার স্মৃতি উপলক্ষ্য করিয়া আবার কোন্ অভূতপূর্ব্ব মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কে জানে? পরমাত্মার লীলা বুঝিতে মানবের সাধ্য কোথায়? রাধানগর যে শীঘ্রই ভারতের একটী পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইবে, তাহাতে আমাদের আদৌ সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান যুগে নরদেবতার পূজা, বোধ হয় রাধানগরেই প্রথম আরম্ভ হইবে। যাঁহাকে আমরা যুগপ্রবর্ত্তক বলিয়া সম্মান করিতেছি, তাঁহার পূজার উপযুক্ত স্মৃতিমন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্যে যে অর্থের অভাব হইবে তাহা মনে হয় না।

এক্ষণে রাজার কার্য্যে সমগ্র নারীজাতিকে আহ্বান করিবার জন্য এই আবেদন পত্র লিখিত হইতেছে। হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, শিখ, পার্সী, জৈন, য়িহুদী প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের নারীগণ রাজার কার্য্যে অগ্রসর হউন, এই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। অর্থ, সামর্থ্য, বুদ্ধি, বিদ্যা যিনি যাহা দিয়া পারেন, রাজার কার্য্যের সহায়তা করুন। রাজার স্মৃতিরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নারীজাতির গৌরব রক্ষিত হইবে, সন্দেহ নাই।

অথচ আত্মার পূজায় অসমর্থ জ্ঞানে চিরদিন পশ্চাৎপদা নারী আজ যাঁহার প্রসাদে, যাঁহার কল্যাণে, আত্মার স্বাধীনতায় অধিকারিণী হইয়াছেন, মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অনধিকারিণী নারী আজ যাঁহার প্রসাদে, যাঁহার কল্যাণে উক্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছেন, সেই মহাত্মার প্রতি অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এই তাঁহাদের এক মহা সুযোগ উপস্থিত। এই শুভ মুহূর্ত্ত সকলের জীবনে আসে না। রাজার কার্য্যে সহায়তা করিয়া নারীজাতি একণে আপনাদিগকে যে প্রকার শ্রেষ্ঠ কার্য্যের অধিকারিণীরূপে সমগ্র জগতের সম্মুখে স্বীকার করুন। যিনি যাহা দিতে পারেন, তিনি তাহাই দিন, যিনি যতটুকু শক্তি প্রয়োগ করিতে পারেন, তিনি ততটুকু প্রয়োগ করুন, এই আমাদের নিবেদন। এই কার্য্যের সহায়তায় একটী পয়সা হইতে লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা—যিনি যাহা প্রদান করিবেন, সমান আদরে গৃহীত হইবে।

বিনা অর্থে এত বড় মহৎ অনুষ্ঠান কখনই সুসম্পন্ন হইতে পারে না; অতএব আমাদিগের ভরসা আছে যে, ভারত-রমণীগণ আমাদিগের এই আবেদন পত্র একেবারে অগ্রাহ্য করিবেন না। যে কোন মহদন্তঃকরণা মহিলা যাহা কিছু দিতে ইচ্ছা করেন, নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত ও বাধিত করিবেন।

বিনীতা—

শ্রীহেমলতা দেবী,

পোঃ আঃ—শান্তিনিকেতন, বোলপুর।

শ্রীঅবলা বসু,
১৩ নং অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।
শ্রীকল্যাণিনী দাস,
৪ নং উইলিয়ম লেন, কলিকাতা।
হেড আফিস :—৫৩ নং, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বঙ্গে ও অন্যান্য প্রদেশে নারী-জীবন।

"প্রবাসী" লিখিয়াছেন :—মোটের উপর বাংলাদেশে নারীর জীবন অন্যান্য কোন কোন প্রদেশের নারী জীবন অপেক্ষা, বোধ হয়, অধিক দুঃখপূর্ণ। একথা আমরা পূর্ব্বেও মধ্যে মধ্যে বলিয়াছি। বঙ্গে নারীর আত্মহত্যার সংখ্যাধিক্যের প্রতিও আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি, কিন্তু পূর্ব্বে ঠিক সংখ্যার উল্লেখ করি নাই। এখন তাহা করিতেছি।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে বাংলা দেশের স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় সরকারী রিপোর্টে কি কি পীড়ায় ও অন্যান্য কারণে কত স্ত্রীলোক ও কত পুরুষের মৃত্যু হইয়াছে তাহা লিখিত আছে। এই রিপোর্টে দেখা যায় যে ঐ বৎসর ১৪১২ জন পুরুষ এবং ২০১৮ জন স্ত্রীলোক যে আত্মহত্যা করিয়াছে, তাহার নিশ্চয়ই কারণ আছে। জীবন নিতান্ত দুর্বহ না হইলে লোকে আত্মহত্যা করে না।

এখন আমরা ১৯১৫ সালের চারিটী প্রদেশের পুরুষ ও নারীর আত্মহত্যার সংখ্যা সরকারী রিপোর্ট হইতে সংকলন করিয়া দিতেছি।

১৯১৫ সালের আত্মহত্যার সংখ্যা।

প্রদেশ	মোট বাসিন্দা	আত্মহত্যাকারী পুরুষ	নারী
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১,৩৯,১৬,৩০৮	৪৪১	৫২৩
বিহার ওড়িশা	৩,৪৪,৯০,০৩৮	৬০৪	১১০৫
আগ্রা-অযোধ্যা	৪,৬৮,২০,৪৫৬	৬৬৪	১৭৯৯
বাংলা দেশ	৪,৬৩,২৯,২৪৭	১৪৪২	২০১৮

এই তালিকায় দেখা যায় যে সব প্রদেশেই পুরুষ অপেক্ষা নারীরা অধিক আত্মহত্যা করিয়াছে; সুতরাং সর্ব্বত্রই শিক্ষা দ্বারা নারীর মনকে দৃঢ়তর করিবার, স্বাস্থ্যের উন্নতি করিবার, এবং নারীর পক্ষে দুঃখজনক সামাজিক প্রথার সংস্কার ও অন্য উপায়ে নারীর জীবনকে অধিকতর আনন্দপূর্ণ করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। অন্য তিনটি প্রদেশের সহিত, বাংলা দেশের অবস্থা তুলনা করিলে দেখা যায় যে, আগ্রা-অযোধ্যার লোকসংখ্যা অপেক্ষা বাংলা দেশের লোকসংখ্যা কম; অথচ বঙ্গে আগ্রা-অযোধ্যা অপেক্ষা অধিক স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করিয়াছে। বঙ্গের লোকসংখ্যা মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের লোকসংখ্যার তিনগুণের কিছু বেশী, চারিগুণ অপেক্ষা অনেক কম। কিন্তু বঙ্গে মধ্য প্রদেশে ও বেরারের অতি সামান্য-কম-চারিগুণ স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করিয়াছে। বাংলার লোকসংখ্যা বিহার ওড়িশার লোকসংখ্যার দেড়গুণ অপেক্ষা অনেক কম; কিন্তু আত্মঘাতিনী বঙ্গ-নারীর সংখ্যা আত্মঘাতিনী বিহার উড়িশাবাসিনীদের প্রায় দ্বিগুণ—দেড়গুণ, অপেক্ষা অনেক বেশী। অতএব, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে অন্য তিনটি প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গে নারীদের আত্মঘাতিনী হইবার গুরুতর কারণ রহিয়াছে। এই সব কারণ আবিষ্কার করিয়া, ব্যাধির প্রতিকার করা প্রত্যেক দেশহিতৈষীর কর্ত্তব্য।

তালিকা হইতে ইহাও দেখা যায় যে, মোটবাসিন্দা-সংখ্যার অনুপাতে আগ্রা অযোধ্যা এবং বিহার উড়িশা অপেক্ষা আত্মঘাতী পুরুষের সংখ্যাও বঙ্গে অধিক। ইহার কারণ নির্ণয় করিয়া প্রতিকারের চেষ্টা করা উচিত। দেশের রাষ্ট্রীয়, স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয়, সামাজিক ও আর্থিক দুরবস্থা নরনারী উভয়ের জীবনকে ক্লেশকর করিতে পারে। কোন কারণে পুরুষের, কোন কারণে নারীর দুঃখ অধিক হয়। এবং মোটের উপর যে নারীর দুঃখই সর্ব্বত্র বেশী তাহা তো দেখাই যায়।

বিলাতে পুরুষ ও নারীর আত্মহত্যা।

কেহ যেন মনে না করেন, পৃথিবীর সকল দেশেই পুরুষ অপেক্ষা নারী বেশী আত্মহত্যা করে। প্রমাণ স্বরূপ আমরা ইংলণ্ডে আত্মহত্যার একটি তালিকা দিতেছি।

বৎসর	আত্মঘাতী পুরুষ	আত্মঘাতিনী নারী
১৯০১	২৩১৮	৮০৩

১৯০২	২৮৬০	৮০৭
১৯০৩	২৬৪০	৮৭১
১৯০৪	২৫২৩	৮৭২
১৯০৫	২৬৮৩	৮৬২

পুরুষ বা নারী যে জাতিই বেশী আত্মহত্যা করুক, উহা একটি সামাজিক ব্যাধি; উহার চিকিৎসা চাই। ইউরোপের সকল দেশের গড় ধরিলে আত্মঘাতীর সংখ্যা আত্মঘাতিনীর সংখ্যার ৩।৪ গুণ। এইজন্য সেখানকার অবস্থা ও ভারতবর্ষের অবস্থা বিভিন্ন বলিয়া, চিকিৎসাও ভিন্ন ভিন্ন রকমের হইবে। কেহ কেহ মনে করেন, বাঙ্গালীর মেয়েরা উপন্যাস পড়ে বলিয়া আত্মহত্যা করে! কিন্তু ইউরোপের মেয়েরা যে শতগুণ বেশী উপন্যাস পড়ে?

সৌজন্যের শক্তি।

প্রবাসী পত্রে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সৌজন্য সম্বন্ধে কয়েকটী সুন্দর সুন্দর কথা সংকলন করিয়া দিয়াছেন। আমরা তাহার কয়েকটী কথা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

শিষ্টাচার করতে মানুষের কোনোই কষ্ট নেই, ইচ্ছা করলে সকলেই শিষ্ট হতে পারে। মুখের দুটো মিষ্ট কথায় শক্তি বা কিছুই অর্থ ব্যয় হয় না, অথচ এর সাহায্যে মানুষকে যথেষ্ট খুশী করা যায়। স্বার্থের দিক দিয়া দেখলেও এর প্রয়োজন কম বলে' মনে হয় না। মিষ্ট কথায় তুষ্ট করে' লোকের কাছ থেকে প্রচুর কাজ আদায় করা যায়, রূঢ় কথা বলে' হাঁকডাক করে' যে যায় না এমন কথা নেই,—তাতে করে' যেকাজ আদায় হয় তা অনিচ্ছাকৃত কাজ—তা আনন্দের কাজ নয়। আর যে কাজের উৎপত্তি আনন্দে নয় তা কখনো সুসম্পন্ন হতে পারে না।

শুনতে পাই একবার রাণী ভিক্টোরিয়া স্বামীর সঙ্গে প্রভুত্বের স্বরে কথা কওয়ায় তিনি মনে আঘাত পেয়ে নিজের ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করে বসেছিলেন।

মিনিট পাঁচেকের পর দরজায় ঘা পড়লো।

ভিকটোরিয়ার স্বামী প্রিন্স আলবার্ট জিজ্ঞাসা করলেন "কে?"

গর্ব্বিতভাবে রাণী বল্লেন—"আমি ইংলণ্ডের রাণী! দরজা খোল!"

ঘরের মধ্যে থেকে আর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। অনেকক্ষণ পরে দরজায় মৃদু করাঘাত হল, তারপর শোনা গেল নরম গলায়—"আমি ভিকটোরিয়া, তোমার স্ত্রী।" দরজা তারপর আর বন্ধ রইল না, ঝগড়াও মিটে গেল।

রমণীর যেমন সৌন্দর্য্য, মানুষের তেমনি ভব্যতা। ভব্যতার কাছে মুহূর্ত্তে মানুষ হার মানে।

পুরুষের মনে নারীসম্মানবোধ জাগাতে হলে নারীর যথার্থ মার্জ্জিত ও নম্র হওয়া প্রয়োজন। মানুষকে সুখী করতে হলে নিজেও সুখী হওয়া দরকার। বিনয়ী বা ভব্য হওয়া মানে নিজের প্রতি এবং অন্যের প্রতিও সজাগ থাকা।

ফ্রাঙ্কলিন রাল্‌ফ প্রেসিডেন্ট আর্থারের মাছধরার বিবরণ টেলিগ্রাফ করে' রাত দুটোর সময় হোটেলে ফিরে দেখলেন, সব দরজা বন্ধ। চাকরদের জাগাবার জন্যে তিনি ও তাঁর দুই বন্ধু মিলে একটা পাশের দরজায় ঘা দিতে লাগলেন। অল্পক্ষণ পরেই দ্বার খুলে দিলেন স্বয়ং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আর্থার!

রাল্‌ফ বড়ই কুণ্ঠিত হয়ে ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন। প্রেসিডেন্ট বল্লেন—তাতে কি হয়েছে। আমি না এলে আপনাদের যে সকাল পর্য্যন্ত রাস্তাতেই কাটাতে হোত। আমি ছাড়া কেউ জেগে নেই। আমার কাফ্রি ছোকরাটিকে পাঠাতে পারতুম, কিন্তু সেও ঘুমিয়ে পড়েছে, তাকে জাগাতে ইচ্ছা হল না।

মাদাম ডি স্তেল মোটেই রূপসী ছিলেন না। কিন্তু তাঁর মধ্যে এমন কিছু ছিল যার সামনে রূপ সঙ্কোচে লজ্জায় এতটুকু হয়ে যায়। পুরুষের মনের উপর তাঁর আশ্চর্য্য প্রভাব ছিল। তারা ছিল তাঁর ইচ্ছার দাস এবং তিনি সর্ব্বশক্তিমতীর মত লোকের জীবনের কাজ গড়ে' তুলতেন। ফ্রান্সের লোকের ওপর তাঁর যে প্রভাব ছিল তাকে নেপোলিয়নও এত ভয় করতেন যে তিনি তাঁর লেখা জোর করে ফ্রান্স থাকে তাঁকে বিতাড়িত করেন।

ভব্যতা পরম সম্পদ। ভব্য লোকেদের প্রচুর অর্থ না থাকলেও চলে, কারণ তাদের কাছে সকল স্থানেই দ্বার অবারিত।

সকলেই তাদের আদর করে, সকলেই তাদের চায়। কারণ তারা সূর্য্যালোকের মত; তারাই সর্ব্বত্র আনন্দ ও আলো বিতরণ করে। ঈর্ষা ও দ্বন্দ্ব অভিপ্রায়কে পরাজিত করে, কারণ তারা মনে ওরকম ভাব পোষণ করে না। মাথামোটা মানুষকে মৌমাছি কামড়ায় না, এ কথা কে না জানে?

দু'হাজার বছর আগে আরিসটটল্ ভদ্রলোকের যে বর্ণনা দিয়েছেন আজও ভদ্রলোক বলতে তাই বোঝায়। তিনি বলেছেন—"ভালো মন্দ সকল অবস্থাতেই তিনি সংযমের সঙ্গে চলবেন। নিজকে খুব উচ্চ বলে ভাববেন না, হীন তুচ্ছ বলেও নয়। সার্থকতার আনন্দে তিনি আত্মহারা হবেন না, বিফলতার শোকে মুহ্যমান হবেন না। নিজের কথা বা পরের কথা তিনি বলে বেড়াবেন না। নিজেকে প্রশংসা করা হোক বা পরকে দোষ দেওয়া হোক কোনটারই পক্ষপাতী তিনি হবেন না।

সর্ব্বহারা দরিদ্রও ভদ্রলোক, যদি তাঁর আশা আনন্দ আত্মসম্মান ও সাহস থাকে। সে-ই প্রকৃত ধনী। দুর্ভাগিনী মেরি দুইন অক্ষ স্কটস্ যখন ফাঁসির মঞ্চে উঠছিলেন তখন কারাধ্যক্ষ তাঁকে সাহায্য করবার জন্যে নিজের হাতখানি এগিয়ে দিলেন। মেরি হাতখানি গ্রহণ করে বল্লেন—"ধন্যবাদ মশায়—এই শেষ, আর আপনাকে কষ্ট দেব না!" আমাদের ব্যবহার যেমন, আমরাও তার ফলে তেমনি, হয় বিরক্তি নয় সান্ত্বনা পাই; হয় উন্নত নয় নীচ হই; হয় বর্ব্বর নয় মার্জ্জিত ও ভদ্র হই। পরের ওপর যে ব্যবহার করি তা নিজেদের ওপরও অদম্য প্রভাব বিস্তার করে; সে প্রভাব বাতাসের মতই নিত্য প্রবাহিত এবং সদাজাগ্রত।

প্রেসিডেন্ট জেফারসন একদিন তাঁর নাতির সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে' বেরিয়েছেন। পথে এক ক্রীতদাসের সঙ্গে দেখা—সে তার টুপি তুলে অভিবাদন করলে। প্রেসিডেন্ট টুপি তুলে প্রতিনমস্কার করলেন, কিন্তু নাতিটি কাজির মমতায় কেয়ারে না। প্রেসিডেন্ট বল্লেন—"টমাস, তুমি ক্রীতদাসকে তোমার চেয়ে বেশী ভদ্র হতে দিলে?"

কাজি ফ্রেড্ ডগ্লাস বলেছিলেন—"আমেরিকার যুক্তরাজ্যে লিংকলন হলেন প্রথম বড় লোক যাঁর সঙ্গে আমি মন খুলে কথা কয়েছি। তাঁর ও আমার মধ্যে যে রংএর অশেষ প্রভেদ তিনি তা একবারও আমার মনে পড়তে জানলি।"

"রাজার সঙ্গে যেমন করে' থাকে নিজের বাড়ীতেও তেমনি করে' থাও"—চীনা ঋষি কনফুসিয়াসের এ একটি খাঁটি উক্তি। পিতামাতা বাড়ীতে ছেলেপুলের ব্যবহারের ওপর নজর রাখলে বাহিরেও তাদের ব্যবহার সুন্দর শোভন থাকে।

তাড়াতাড়ি লণ্ডনের একটা রাস্তার বাঁক ঘুরতে গিয়া এক যুবতী মহিলা সজোরে এক ধূলিমলিন ভিক্ষুক ছোকরার গায়ের ওপর পড়লেন। ছেলেটি প্রায় পড়ে গিয়েছিল আর কি। তাড়াতাড়ি থেমে মুখ ফিরিয়ে মহিলাটি মধুর স্বরে বল্লেন—"আমায় মাপ কর ভাই; আমি বড় দুঃখিত হয়েছি।" বিস্মিত ছোকরাটি তাঁর পানে ক্ষণেক চেয়ে টুপিটা তুলে মাথা নত করে' অভিবাদন করে' বল্লে—সারা মুখ তার আনন্দের হাসিতে তখন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—"আমি আপনাকে খুসী হয়ে মাপ করছি, খুব খুসী হয়ে! এর পরের বার যখন আপনি আমার ঘাড়ে এসে পড়বেন, তখন আমাকে একদম উল্টে ফেলে দিলেও কথাটি কইব না।" মহিলাটি এগিয়ে গেলে সঙ্গীর দিকে ফিরে সে বল্লে—"ভাখ জিম্, আজ এই প্রথম আমার কাছে একজন ক্ষমা চাইলে—মাথা একেবারে ঘুরিয়ে দিয়েছে!"

ভারতবর্ষে জাতীয় জীবনের অনুভূতি।

বহু ভাষা ভাষী, শত সম্প্রদায়ে বিভক্ত এই ভারতবর্ষে জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিবার জন্য একদল সাধক দীর্ঘকাল সাধনা করিয়া আসিতেছেন। অনেক নিরাশা, অনেক সংগ্রাম, অনেক অপমান লাঞ্ছনা সহিয়াও তাঁহারা সাধনপথ হইতে বিচ্যুত হন নাই। হিন্দু মুসলমান, শিক্ষিত অশিক্ষিত, সম্প্রদায় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ জাগ্রত করিয়া রাখিবার চেষ্টার অভাব এ দেশে হয় নাই,

কিন্তু ধীরে ধীরে সকল বাধা অতিক্রম করিয়া সাংগঠনের সাধনা সিদ্ধিলাভের পথে অগ্রসর হইতেছে। গত ডিসেম্বর মাসে লক্ষ্ণৌ নগরে জাতীয় মহাসমিতি ও তাহার মোসলেম লিগের অধিবেশনে এ কথার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

সুরাট কংগ্রেসের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া গত কয়েক বৎসর কংগ্রেসের দুই দল লোকের মধ্যে একটা বিরোধের ভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। এক দল এতদিন কংগ্রেসে যোগ দেন নাই। সেই ভাব এখনও সম্পূর্ণ দূর হইয়াছে বলিতে পারা যায় না, কিন্তু এইবার কংগ্রেসে লোকমান্য তিলক মুখ দিয়া কংগ্রেসকে শক্তিশালী করিয়াছেন। এবার সভাপতি হইয়াছিলেন ফরিদপুরের উকীল শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার। তাঁহার বক্তৃতা অতি সুন্দর হইয়াছিল। তিনি অতি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশরূপে, ব্রিটিশ উপনিবেশ সমূহের ন্যায় স্বায়ত্তশাসন লাভ করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

শ্রীযুক্ত মহম্মদআলী জিন্নার সভাপতিত্বে ভারতীয় মোসলেম লিগের অধিবেশনে ভারতীয় মুসলমানগণও এই প্রকার স্বায়ত্তশাসন তাঁহাদের লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

এই উভয় সম্প্রদায়ের লক্ষ্যের এই একতা ঘোষণা ভারতের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা।

স্বায়ত্তশাসন বর্ত্তমান যুগের বিশেষত্ব। ইংরেজ জাতি এই স্বায়ত্তশাসনের আদর্শের সর্ব্বপ্রধান পৃষ্ঠপোষক। তাঁহাদের অধীনে শিক্ষা দীক্ষা লাভ করিয়া ভারতবাসী যে ধীরে ধীরে স্বায়ত্তশাসনের পথে অগ্রসর হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এতদিনে উভয়ের গন্তব্য তীর্থ যখন স্থির হইল, তখন যাত্রীদল শত বিরোধ মীমাংসা করিয়া শত সাম্প্রদায়িক বিবাদ বিসংবাদ তুচ্ছ করিয়া ধীরে ধীরে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইবে, এরূপ আশা করিতে পারা যায়। তাই বলিতেছিলাম ভারতের রাজনৈতিক সাংগঠনের সাধনা সিদ্ধির পথে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। ভারতে জাতীয়তার অনুভূতি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে।

পাপ ও ধর্ম্মান্তরাগ।

অল্পবয়স্কা বালিকাদিগকে পাপ কার্য্যে নিয়োগ নিবারণ সম্বন্ধে একটী আইন বহুদিনের পূর্ব্বে ভারত-গবর্ণমেণ্টের আইন সভায় উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল অনাথা বালিকা কুস্থান হইতে উদ্ধার পাইয়া যাইবে কোথায়? হিন্দু সমাজে তাহাদের স্থান নাই, হিন্দুদলের এরূপ কোন প্রতিষ্ঠানও নাই যাহাতে ইহারা আশ্রয় পাইতে পারে। সুতরাং উদ্ধারপ্রাপ্ত প্রায় সকল বালিকাই—অন্ততঃ অধিকাংশ, খৃষ্টান ধর্ম্ম-প্রচারকদিগের উদ্ধারাশ্রম বা অনাথ আশ্রমে স্থানলাভ করিবে। হিন্দু সমাজের ইহাতে আপত্তির কারণ, এই সকল বালিকা যে সেবে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবে! ইংরেজ গবর্ণমেণ্টও এই আপত্তিতে কর্ণপাত করিয়া বহুদিন আইনটার আলোচনা অবাঞ্ছনীয় বোধে আইন পাশ করা স্থগিত রাখিয়াছেন। নিজ নিজ ধর্ম্মের লোক-সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি পায় সকল সম্প্রদায়ের লোকেরই সেই ইচ্ছা থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু পতিতা নারী হইয়াও হিন্দু থাকুক, তথাপি খৃষ্টান হইবার ভয়ে তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে দেওয়া হইবে না, এ কেমন ধর্ম্মানুরাগ! গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে আর ইতস্ততঃ না করিয়া অবিলম্বে আইনটী পাশ করিয়া শত শত নারীকে পাপের পথ হইতে রক্ষা করুন।

গৃহ-শিল্প।

শিল্প না হইলে সংসার চলে না। ভারতে এমন একদিন ছিল—যে যেন এই গৃহ-শিল্পেই ভারতবাসীর সকল অভাব মোচন হইত। এদেশে পূর্ব্বকালে কখনই ধূমোদ্গারী বা পবন-পরিচালিত শিল্পকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, বিদ্যুৎচালিত মোটর যন্ত্রপরিচালনে নিযুক্ত হয় নাই। এ দেশের গৃহ শিল্প সত্য সত্যই গৃহ-শিল্প। এ দেশের শিল্প পল্লীবাসীর ছিল, পল্লীগ্রামে চালের ঘরে শিল্পীর হাতে অতি সামান্য আড়ম্বরে,—ভারতবাসীর আবশ্যক শিল্পজ পণ্য প্রস্তুত হইত। পল্লীগ্রামই তখন ভারতবাসীর আশ্রয় ও কর্ম্মভূমি ছিল, সহরে ও গঞ্জে কেবল পণ্যবীথিকার ও ক্রয়বিক্রয়ের কোলাহল শ্রুত

হইত। এখন আর দেখিনা নাই। এখন সহরেই শিক্ষিত ভারতবাসীর আড্ডা হইয়াছে,—তথায় বিদেশীর বিপণিতে সহকারী আপিসে শিক্ষিত ভারতবাসী লেখনীপেষণে উদরান্নের সংস্থান করে এখন নানা-কারণে পল্লীগ্রামের শিল্পীর কারখানা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

আমাদের গৃহ-শিল্প বলিতে আমরা একেবারে ঘরের শিল্প গৃহস্থের প্রয়োজনমত গৃহস্থের হাতে গড়া শিল্পই বুঝিতাম। এখন গৃহশিল্প ইংরাজী Home Industryর বাঙ্গালায়—অনেকটা ছোট খাট উটজ স্বদেশী শিল্পই বুঝায়। পূর্ব্বকালে লোক বেশ বড় মানুষ না হইলে আর ঘরের পয়সা দিয়া পরের নিকট বিলাসদ্রব্য কিনিত না; পূর্ব্বে লোক খাইবার জন্য গোলা ধরাইয়ে ধান রাখিত, পরিধান করিবার জন্য গৃহপ্রাঙ্গণে রোপিত দেব-কার্পাস হইতে চরকার সূতা কাটিয়া তাঁতি-জোলার দ্বারা সেই সূত্রনির্ম্মিত বস্ত্র বয়ন করিয়া লইত। আসবাবের মধ্যে চাটি, আল্‌না, শিকা, মুড়, প্রভৃতি আপনারাই প্রস্তুত করিত,—আর সেই শিল্পকার্য্যে তাহারা অসাধারণ দক্ষতা দেখাইত। ঐ সকল শিল্পই গৃহ-শিল্প নামে কথিত হইত।

সম্প্রতি লেডী কার্ম্মাইকেলের যত্নে ও চেষ্টায় বেঙ্গল হোম ইণ্ডাষ্ট্রীজ অ্যাসোসিয়েশন নামক একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ডালহাউসী ইনষ্টিটিউটে উহার বোধন-বৈঠক বসিয়াছিল। এই সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন স্বয়ং বঙ্গের শাসনকর্ত্তা লর্ড কার্ম্মাইকেল। বাঙ্গালীর সংসারযাত্রানির্ব্বাহের জন্য মোটামুটি যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন, এদেশে তাহা প্রস্তুত ও তাহার উন্নতিসাধন, তাহার কাটতি-বৃদ্ধি প্রভৃতিই এই সমিতির উদ্দেশ্য। এই সম্বন্ধে লর্ড কার্ম্মাইকেল একটি অতি সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছেন। লর্ড কার্ম্মাইকেল তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন যে, যাঁহাদের উদ্যোগে এই সমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে,—তাঁহাদের সহিত তাঁহার যথেষ্ট সহানুভূতি বর্ত্তমান। এদেশে আসিয়া অবধি তিনি গৃহশিল্পের তথ্য জানিতে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। মাদ্রাজে ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউট প্রথমেই তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট করে,—ইনষ্টিটিউটের সংলগ্ন একটি প্রদর্শনীতে প্রস্তুত নানাবিধ গার্হস্থ্য-শিল্প প্রদর্শিত হইয়া থাকে। তাহাতে গার্হস্থ্য-শিল্পের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। লর্ড কার্ম্মাইকেল বলিয়াছেন, বাঙ্গালাতেও গার্হস্থ্য-শিল্প আছে,—সে শিল্পগুলিও সুন্দর ও প্রয়োজনসাধক,—তবে এখন তাহাদের অবস্থা বড় ভাল নহে। তাহাদের যেরূপ অবস্থা হওয়া উচিত—সেরূপ অবস্থা ত নহেই, পরন্তু অনেকগুলির অস্তিত্বই থাকিবে কি না,—আর তাহাদের এখন যে অস্তিত্ব আছে, তাহা নামমাত্র,—অর্থাৎ নাই বলিলেও চলে। লর্ড কার্ম্মাইকেল বলিয়াছেন যে, এদেশে গৃহ-শিল্পের বিস্তার ও উন্নতি হইলে অনেক উপকার হইবে। আমাদের দেশের লোক এই বিষয়ে অবহিত হইলে ভাল হয়।

লর্ড কার্ম্মাইকেল বলিয়াছেন, যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ব্যবসাদারের মত কাজ না করিয়া মহাজনের মত কাজ করিয়াছিলেন। শিল্পীদিগকে দাদন দিয়া এমন ভাবে কাজ আদায় করিয়াছেন, যে তাতটা অধিকাংশই কোম্পানীর পেটে গিয়াছে, শিল্পীদের কেবল হাড়ভাঙ্গা খাটুনিই সার হইয়াছে। সে ইতিহাসের বিস্তৃত বিবরণ সকলেই জানেন। ইহা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এবং মোগল বাদশাহিগের অবসানে বাঙ্গালার উটজ শিল্পের অবনতির অন্য কারণ। কারণ, মোগল বাদশাহরাই ভাল ভাল পণ্য খরিদ করিতেন। কিন্তু বিদেশী বণিক-দিগের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতাই যে, দেশীয় উটজ শিল্পনাশের প্রধান কারণ তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যেখানেই বাষ্পতড়িৎ পণ্য প্রস্তুত কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে সেই খানেই হাতের কাজ বা গার্হস্থ্য শিল্প বিপন্ন হইয়াছে।

যাহা হউক, এখন গৃহপ্রস্তুত শিল্প যদি বাজারে কাটে, তাহা হইলে কেবল পরিবার কেন, অনেক মধ্য-বিত্ত লোকের দারুণ অন্নকষ্ট-সমস্যার একটা সমাধান হইবে। গার্হস্থ্য শিল্পজ পণ্য যদি বিকায়, তাহা হইলে যে সময় চাষীদের মাঠের কাজ থাকিবে না—সে সময় তাহারা ঘরে বসিয়া এই জাতীয় পণ্য প্রস্তুত করিতে পারিবে। গরীব অবীরা বিধবা প্রভৃতির ইহাতে একটা

জীবনোপায় হইবে। সেদিনকার সভায় অধ্যাপক হ্যামিল্টন বলিয়াছেন যে জাপানের লোক ইউরোপ শিল্প দ্বারা তাহাদের প্রকৃত আয়ের অর্দ্ধেক বৃদ্ধি করে,—নতুবা তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা অসম্ভব হইয়া পড়ায়। এ দেশে অনুবিপর্য্যয়ে কৃষির যেরূপ ঘোর ঘটে, কৃষীবলের যেরূপ দুর্গতি ঘটে ;—তাহাতে তাহা যদি গৃহ-শিল্পের সেবা করিয়া কিছু পায়, তাহাতে সেই দুর্গতি কতকটা নিবারিত হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ এ দেশে একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা যেরূপ ভগ্ন হইয়া যাইতেছে,—জীবনসংগ্রামের তীব্রতা যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে লোক বিধবা ও শিশুদিগের জন্য কিছুই সঞ্চিত রাখিয়া যাইতে পারিতেছে না এরূপ ক্ষেত্রে গৃহশিল্প-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক বলিয়াই মনে হয়।

রায় শ্রীযুত যামিনীমোহন মিত্র বাহাদুর বলিয়াছেন, বাঙ্গালায় ৩৪ লক্ষ ২০ হাজার লোক এখনও উচ্চ-শিল্পদ্বারা গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করে,—তন্মধ্যে ১৬ লক্ষ ৬০ হাজার কর্ম্মী, অবশিষ্ট তাহাদের পোষ্যবর্গ। কিন্তু যদি এ দেশে ঐরূপ পণ্যের অধিক কাটতি হইত, তাহা হইলে আরও অধিক লোক গৃহশিল্পের দ্বারা প্রতিপালিত হইত। যাহা হউক, আমরা দেশী কার্য্যকারকদের প্রতিষ্ঠিত এই নূতন সমিতির নিকট অনেক আশা করি। সমিতির সদস্যগণ যদি সত্য সত্যই উচ্চ শিল্পের উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করেন তাহা হইলে প্রভূত উপকার হয়। (বসুমতী)

নারীর ধর্ম্মপ্রচারাধিকার।

আমাদের দেশে বৌদ্ধযুগে ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষিণী মহিলাগণ সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিয়া দেশে বিদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বেড়াইতেন। মহারাজ অশোকের কন্যা সঙ্ঘমিত্রা সুদূর সিংহলে ধর্ম্মপ্রচারে গিয়া সিংহল রাজবংশ ও অনেক সিংহলী স্ত্রীলোককে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্ম-মহিলাদের মধ্যে যাঁহারা ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর তাঁহারা সমাজ-মন্দিরের বেদী হইতে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু ইংলণ্ডের রাজানুমোদিত খ্রীষ্টান-সম্প্রদায়ে (Church of England) নারীগণের ধর্ম্ম-প্রচারে অধিকার নাই। অন্যান্য খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ে কদাচিৎ নারীদিগকে প্রচারাধিকার দেওয়া হয় বটে কিন্তু চর্চ্চ অব ইংলণ্ডে নারীগণ এখনও এই অধিকার পান নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দুই এক জন বিশপ নারীদিগকে এই অধিকার দিয়াছিলেন যে, বেদী হইতে নয়, কিন্তু উপাসকগণের দাঁড়াইবার স্থান হইতে মিশনারী মহিলাগণ স্ত্রীলোক ও বালিকাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে পারিবেন—বয়স্ক পুরুষ দূরে থাকুক, বালকদিগকেও তাঁহারা উপদেশ দিতে পারিবেন না। কিন্তু এই সামান্য অধিকারের বিরুদ্ধেও এমন প্রবল প্রতিবাদ হইতে লাগিল যে, বিশপগণ তাহা প্রত্যাহার করিলেন। নারীগণ ধর্ম্মভাবে যতই অনুপ্রাণিত হউন,—তাঁহাদের জীবন যতই উন্নত হউক,—ধর্ম্ম-মন্দিরে তাঁহারা ধর্ম্মোপদেশ দিবার অধিকার পাইবেন না।

সুসভ্য ইংলণ্ডে নারীশক্তির কি অবমাননা! ইংরেজ-জাতি কি ঘোর রক্ষণশীল! দেখিয়া শুনিয়া, জানিয়া বুঝিয়াও তাহারা প্রাচীন কুপ্রথার পরিবর্ত্তন করিতে সহজে প্রস্তুত হয় না।

আপনী।

আজকাল স্ত্রীপাঠ্য পুস্তকের অভাব নাই। সুমুদ্রিত সুচিত্রিত, সুপঠিত অসংখ্য পুস্তক সর্ব্বদা প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু এই সকল পুস্তকের মধ্যে উচ্চ-শ্রেণীর পুস্তক অতি অল্পই দেখিতে পাই। নারীর আত্মার মূল্য, নারীর প্রকৃত শক্তির মূল কোথায়, নারীকে বুঝাইয়া দেয় এমন পুস্তক কয়খানি দেখিতে পাওয়া যায়? আমরা শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত প্রণীত "আপনী" নামক পুস্তকখানি পড়িয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। পুস্তকখানি পড়িলে আত্মচিন্তা জাগ্রত হয়, ঈশ্বরের সহিত আত্মার প্রকৃত সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। পুস্তকখানি বঙ্গভাষার এক অমূল্য সামগ্রী হইয়াছে। বর্ত্তমান সংখ্যায় আমরা এই পুস্তক হইতে একটী প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

শ্যামনগরের জমিদার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২)

আর তিন মাস পরেই আমার পিতার নিরুদ্দেশ হওয়ার বার বৎসর পূর্ণ হইবে। এই সময়ের মধ্যে যদি পিতা ফিরিয়া না আইসেন তাহা হইলে তাহার পর হইতে আমার মাতাকে বিধবার নিয়ম পালন করিতে হইবে। সে কথা মনে করিতেও গা শিহরিয়া উঠে। কিছু দিন হইতে মা আমার কেমন সকল বিষয়েই অন্যমনস্ক হইতেছেন। থাকিয়া থাকিয়া চমকিত হ'ন। আমার বুদ্ধি হওয়া অবধি মার মুখে কখন হাসি দেখি নাই। মা যেন আমার মূর্ত্তিমতী বিরহব্যথা। মায়ের আমার এ দুঃখের রাত্রির কি অবসান হইবে না! বিদ্যালঙ্কার দাদা সাধার কোষ্ঠীর ফল বিচার করিয়া বলিয়াছেন যে বাবা অতি ঐশ বাড়ীতে ফিরিয়া আসিবেন। বাবার কোষ্ঠী আর একবার খুব তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবার জন্য তিনি লইয়া গিয়াছেন। দেখি এবার কি বলেন।

একদিন আমি একলা একটী ঘরে বসিয়া বাবার কথা ভাবিতেছি। এমন সময় বিদ্যালঙ্কার দাদা বাবার কোষ্ঠিখানি হাতে করিয়া আমার কাছে আসিয়া বলিলেন, "সাগরিকা, এই কোষ্ঠী তোর মায়ের কাছে রাখিয়া আয়। এবার আমি খুব ভাল করিয়া কোষ্ঠীর ফল বিচার করিয়াছি। এখন বৈশাখ মাস। এই বৎসর আষাঢ় মাসের মধ্যে যদি রুদ্রপদ বাবাজী বাড়ী ফিরিয়া না আইসে তাহা হইলে জ্যোতিষ শাস্ত্র মিথ্যা। আমার নাম রামকমল বিদ্যালঙ্কার নয়। সে নিশ্চয়ই আসিবে। শাস্ত্র কখনই মিথ্যা নয়।" একথা শুনিয়া আমি খুব খুসী হইয়া বলিলাম, "ঠাকুর্দ্দা, তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। বাবা ফিরিয়া আসুন। তারপর আমি তোমায় সোণার কলম করিয়া দিব, আর ঠানদিদির জন্য আমার গলায় যে এই নেকলেস দেখিতেছ এর চেয়ে ভাল নেকলেস গড়াইয়া দিব। সে শুভ দিন কবে আসিবে?" বিদ্যালঙ্কার দাদা বলিলেন, "ওরে, সে দিন অতি শীঘ্র আসিবে। তখন আমি তোমার বর মহাশয়ের জন্য একটী সোণার দাঁত গড়াইতে দিব।" এই কথা শুনিয়া আমি বিদ্যালঙ্কার ঠাকুর দাদাকে বলিলাম, "যান আপনার সব কথাতেই ঠাট্টা।" এমন সময় অদূরে কাহার পদধ্বনি শুনিতে পাইলাম। সে দিকে তাকাইয়া দেখি স্বামী আসিতেছেন। আমি তাঁকে দেখিয়া আস্তে আস্তে সে ঘর হইতে পলায়নের উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "এই যে মেঘ না চাইতে জল। সাগরিকা, পালাস নে। একটু থাম। তোর সাক্ষাতেই ও বিষয়ের কথাবার্ত্তা ঠিক করিয়া ফেলি।" আর সাগরিকা? আমি সেস্থান হইতে চম্পট দিলাম।

ভবানীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের কথা

(১)

বিলাতে আসিয়া এক বৎসর রুদ্রপদ বাবাজীর বাসায় বসিয়া বাধ্য নিয়মে থাকিয়া নিয়মিত রূপে ব্যারিষ্টারীর জন্য পড়িয়াছিলাম। তার পর আমার মাতুলালয়ে আমার মাতা, স্ত্রী, পুত্র ও কন্যার মাত্র দিবস মধ্যে ভীষণ কলেরা রোগে মৃত্যু হওয়ার সংবাদ পাইয়া আমার মনে কেমন নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়। তখন আর কিছুই ভাল লাগিত না। সে সময় মনে হইল যে নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলে মনের গতি ভাল হইবে। তাই করিতে সংকল্প করিলাম। এক ভ্রমণকারী থিয়েটারের দলে প্রবেশ করিলাম। অভিনয়ের দিকে আমার বরাবর ঝোঁক ছিল এবং স্কুলে থাকিতে অনেক দলের দলে অনেক বার সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলাম।

আমাদের বিলাতের বাসার আর সকলে কিন্তু আমার মনের প্রকৃত ভাব বুঝিতে পারিল না। তাহারা মনে করিল আমার সখের প্রাণ, তাহাদের বাসার বরাবাঁধা নিয়মের মধ্যে থাকিয়া হাঁপাইয়া উঠিয়াছে, তাই আমি পিঞ্জর কাটিয়া উধাও হইয়া আকাশে উড়িতেছি।

সার্কাসের দলে যোগ দিয়া প্রথম বছর দুই ইংলণ্ডের নানা স্থান ভ্রমণ করিলাম। তারপর সেই দল আফ্রিকায় চলিল। আমিও সেই সঙ্গে আফ্রিকা চলিলাম। সেখানে গিয়া থিয়েটারের দল ছাড়িয়া এক সার্কাসের দলে ঢুকিলাম। এক সার্কাসের দলে কতকগুলি প্রকাণ্ডকায় সিংহ ও বাঘ ছিল। প্রায় এক বৎসরের চেষ্টায় আমি ভীষণপ্রকৃতির সিংহ ও বাঘগুলিকে বশ করিতে শিখিয়াছিলাম। অবশেষে এমন হইল যে অল্প কয়েকটি সেই দলের আর কেহ দর্শকদিগের সম্মুখে সিংহ ও বাঘের সহিত খেলিতে অগ্রসর হইত না। সিংহ ও বাঘ কোথা মানিয়াও মানে না। বেশ শান্তভাবে আছে, হঠাৎ অকারণে বা অতি সামান্য কারণে তাহাদের মেজাজ বিগড়াইয়া যায়। তখন তাহাদিগের রক্ষকারী বা তাহাদিগের সহিত যে খেলা দেখায় এমন লোকের জীবন বিপন্ন হয়। এইরূপে সিংহ ও বাঘের হস্তে বহুবার আমার জীবন বিপন্ন হইয়াছে। কিন্তু আমার কৌশলে ও ভগবানের কৃপায় আমি রক্ষা পাইয়াছি। এই দুঃসাহসিক কার্য্যে আমার কৃতিত্ব দেখিয়া সেই সার্কাসের দলের কর্ত্তা আমাকে খুব খাতির করিতেন এবং মোটা মাহিনায় আমাকে তাঁর দলের ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। এই সার্কাসের দলে আমি প্রায় তিন বছর ছিলাম।

এই সময়ের মধ্যে আমাদের সেই সার্কাসের দল একবার আমেরিকায় যায়। এবং আমেরিকার নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে মেক্সিকো দেশে উপস্থিত হয়। আমাদের দল প্রায় এক বৎসর ধরিয়া মেক্সিকো দেশের নানা স্থানে বাজী দেখাইয়া বেড়ায়। এই সময় মেক্সিকো দেশে অন্তর্বিদ্রোহ হইল।

আমাদের সার্কাসের দল ভাঙ্গিয়া গেল। আমাদের দলের কয়েক জন লোক বিদ্রোহীদিগের দলভুক্ত হইল। আমি সেই দেশের গবর্ণমেণ্টের অধীনে সৈনিকের পদ গ্রহণ করিলাম। যুদ্ধ ব্যবসায়ে তৎপূর্ব্বে আমার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। কিন্তু অল্পদিনের শিক্ষাতেই যুদ্ধের কৌশল আয়ত্ত করিয়া ফেলিলাম। এক বৎসরব্যাপী যুদ্ধ চলিল। যুদ্ধে বিদ্রোহীরা পরাজিত হইল। সেই যুদ্ধে আমার সাহস ও বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া মেক্সিকো-গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষেরা আমার পদ-বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। এইরূপে ভারতবর্ষত্যাগের পর আট বৎসর কাটিয়া গেল।

মেক্সিকো দেশে আমার সম্মান দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া সেই দেশের প্রধান সেনাপতির এক কন্যা আমাকে বিবাহ করিতে চাহিল। সে যে কেন আমাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিল বলিতে পারি না। সে তুষারশুভ্র, আমি কৃষ্ণবর্ণ, তার উপর পত যুদ্ধে আমার একটী চক্ষু নষ্ট হইয়াছে। তখন বিবাহ করিবার ইচ্ছাও ছিল না। আমি দারিদ্র্যমুক্ত জীবন, পরম আরামে যাপন করিতেছিলাম। সুতরাং সেনাপতির কন্যার বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলাম। ইহাতে সেনাপতি মহাশয় আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া অতঃপর আমার সকল কার্য্যেই খুঁৎ ধরিতে লাগিলেন। আমি বিরক্ত হইয়া পদ-ত্যাগ করিয়া ইউনাইটেড্ ষ্টেট ভ্রমণ করিয়া পুনরায় ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিলাম। সে সময় আমার হাতে কিছু অর্থ জমিয়াছিল।

(২)

ইংলণ্ডে আসিয়া কয়েক মাস বিশ্রাম করিবার পর এক মাসিক পত্রে আমার ভ্রমণবৃত্তান্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করিতে লাগিলাম। তজ্জন্য সেই মাসিক পত্রের পরিচালকগণ আমাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে লাগিলেন। আমার লিখিত ভ্রমণবৃত্তান্ত সেই মাসিক পত্রের পাঠকেরা আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। এই সময়ে একদিন হঠাৎ আমি সর্ব্বপ্রথমে যে থিয়েটারের দলে প্রবেশ করি সেই দলের ম্যানেজার মিঃ ডিক্‌সের সহিত সাক্ষাৎ হইল।

মিঃ ডিক্স আমাকে দেখিয়া অত্যন্ত খুসী হইয়া আমি এখন কি করিতেছি জানিতে চাহিলেন। আমি তাঁহার কথার উত্তর দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার দল কেমন চলিতেছে?" মিঃ ডিক্স বলিলেন, "সে দল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমাদের সাবেক দলের কয়েক জনে মিলিয়া বছর তিন হইল আমরা

এখানে একটী নূতন থিয়েটার খুলিয়াছি। সে থিয়েটারের নাম হইয়াছে সেক্সপিয়ার থিয়েটার। আমরা সংকল্প করিয়াছি যে প্রতি বৎসর অন্ততঃ দুইখানি করিয়া মহাকবি সেক্সপিয়ার বিরচিত নাটকের অভিনয় করিব। এমনি করিয়া আমরা সেই মহাকবির সকল নাটকগুলির অভিনয় করিব। এবৎসর আমরা ওথেলো নাটকের অভিনয় করিব মনে করিয়াছি। কল্য অভিনয় দেখান আরম্ভ হইত। কিন্তু যিনি ওথেলোর ভূমিকা গ্রহণ করিতেন, তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু সম্পত্তি পাইয়া আমাদের দল ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। তিনি পনের দিন পূর্ব্বে নোটীশ দিয়াছিলেন কিন্তু এই পনের দিনের মধ্যে আমরা উপযুক্ত লোক সংগ্রহ করিতে পারি নাই। আপনার সঙ্গে দেখা হইল, ভালই হইল। আপনার অভিনয়ের আমি অত্যন্ত পক্ষপাতী। আপনি যদি পুনরায় আমাদের থিয়েটারে আইসেন তাহা হইলে আমি অত্যন্ত সুখী হই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিতেছে যে আপনার দ্বারা ওথেলোর ভূমিকার অভিনয় অতি সুন্দর হইবে। আপনি ত বলিতে গেলে ওথেলো সাজিয়াই রহিয়াছেন। রংটি স্বভাবতঃই কাল, সুতরাং রং মাখিয়া আপনাকে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতে হইবে না।" আমি মিঃ ডিক্সের প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। তার পর মিঃ ডিক্সের অফিসে তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বেতন ঠিক করিয়া সেই দিন হইতে রিহার্সালে যোগ দিলাম। মিঃ ডিক্স রিহার্সালের সময় আমার অভিনয়-নৈপুণ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া পনের দিবস পরে খুব জোরের সহিত ওথেলোর অভিনয় দেখাইবেন বলিয়া বিজ্ঞাপনে লণ্ডন ছাইয়া ফেলিলেন। আমি প্রাণপণ যত্নের সহিত প্রস্তুত হইলাম। ক্রমে প্রথম অভিনয়ের রাত্রি আসিল। পাশ্চাত্য দেশের লোকদিগের সকল বিষয়েই আমাদিগের অপেক্ষা উৎসাহ বেশী, তা কাজ কর্ম্মেই বল, আর আমোদ আহ্লাদেই বল।

প্রথম অভিনয়-রজনীর দুই দিবস পূর্ব্বেই এত টিকেট বিক্রয় হইল যে থিয়েটার-গৃহে স্থান সংকুলান হইবে না বলিয়া টিকেট বিক্রয় বন্ধ করিতে হইল। অবশেষে অভিনয় আরম্ভ হইল। রঙ্গমঞ্চে আমি এই প্রথম অবতীর্ণ হইতেছি না। তথাপি এবার ওথেলোর বেশে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে মানসিক উদ্বেগে সেই শীতপ্রধান দেশের রাত্রিকালেও আমি ঘামিতে লাগিলাম। যাহা হউক কোন প্রকারে মানসিক চাঞ্চল্য দমন করিয়া, রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া অভিনয় আরম্ভ করিলাম। তারপর যেন স্বয়ংচালিতের মত নিজের ভূমিকার অভিনয় করিলাম। কেমন করিয়া কোন্ দিক দিয়া যে সময় কাটিল আমার কিছুই ঠিক থাকিল না। অবশেষে যবনিকা পতন হইলে বুঝিলাম অভিনয় শেষ হইয়াছে। অভিনয় শেষ হইলে মিঃ ডিক্স সজ্জাগৃহে আমার নিকট আসিয়া আমার করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন, "মিঃ চ্যাটার্জ্জি, আপনার অভিনয় অতি চমৎকার। আমি যেরূপ আশা করিয়াছিলাম আপনার অভিনয় তার চেয়েও ভাল হইয়াছে। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, ইহার পূর্ব্বে আর কোন অভিনেতাই ওথেলোর ভূমিকা আপনার মত সুন্দর রূপে অভিনয় করিতে পারেন নাই। ডেস্‌ডেমোনার ভূমিকাও অতি সুন্দর রূপে অভিনীত হইয়াছে।" একটি কথা ইতি পূর্ব্বে বলা হয় নাই। দর্শক প্রবেশে থিয়েটারের দলে প্রবেশ করিয়া আমি ভবানীচরণ চট্টোপাধ্যায় এই নামের পরিবর্ত্তে "বব চ্যাটার্জ্জি" এই নামে পরিচিত হইয়াছিলাম এবং এখন পর্য্যন্ত সকলের নিকট বব চ্যাটার্জ্জি নামেই পরিচিত হইতেছি।

সপ্তাহে দুই রাত্রি "ওথেলোর" অভিনয় হয় এবং আমাকে ওথেলো সাজিতে হয়। এইরূপে এক বৎসর কাটিয়া গেল, তথাপি লণ্ডনের লোকের "সেক্সপিয়ার থিয়েটারে" ওথেলোর অভিনয় দেখিবার সখ মিটিল না। মিঃ ডিক্স ওথেলোর অভিনয় দেখাইয়া দুইহাতে টাকা লুটিতে লাগিলেন।

(৩)

এমন সময় "সেক্সপিয়ার থিয়েটারের" প্রতিযোগী আর একটী থিয়েটারের ম্যানেজার-আমাদের থিয়েটারের যে ডেস্‌ডেমোনা সাজিত তাহাকে বেশী বেতন দিতে স্বীকৃত হইয়া আমাদের দল হইতে ভাঙ্গাইয়া লইল।

মিঃ ডিক্স যখন একথা জানিতে পারিলেন, তখন আর উপায় নাই। মিঃ ডিক্স ললাটে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। আর দুই দিবস পরে ওথেলোর অভিনয় হইবে, এইরূপ বিজ্ঞাপন পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। আজ ডেস্‌ডেমোনার ভূমিকার অভিনয়কারিণী থিয়েটার ছাড়িয়া চলিয়া গেল, এই অল্প সময়ের মধ্যে নূতন লোক দ্বারা ডেস্‌ডেমনার অভিনয় হইবে কেমন করিয়া? এই সব চিন্তায় মিঃ ডিক্স পাগলের মত হইলেন। তিনি আমাকে তাঁর অফিসে ডাকাইয়া বলিলেন, "দেখুন মিঃ চাটার্জ্জি, আমি কেমন বিপদে পড়িয়াছি। আমার শত্রুরা আমার সফলতায় ঈর্ষান্বিত হইয়া আমাদের দলের ভাল অভিনেত্রীটিকে ভাঙ্গাইয়া লইয়াছে। আমি যদি তাহাদের দলের ভাল অভিনেতাকে ঐ রকম করিয়া ভাঙ্গাইয়া লই, তা হইলে কেমন হয়? কিন্তু আমি ঐরূপ নীচ উপায় অবলম্বন করিয়া আমার দলের উন্নতি করিতে ইচ্ছা করি না। আমি ন্যায়-পথে থাকিয়া কার্য্য করিব, ইহাতে যাইতে পাই, উত্তম, না পাই, উপায় নাই। না খাইয়া মরিব তাহাও স্বীকার, তথাপি কোন নীচ অন্যায় উপায় অবলম্বন করিতে পারিব না। এখন পরশ্ব রাত্রির অভিনয়ের কি করিব বলুন দেখি, যদি কোন কারণ দেখাইয়া অভিনয় বন্ধ রাখি তাহা হইলে, আমার থিয়েটার একবারে মাটী হইবে। লণ্ডন অপূর্ব্ব স্থান, এখানে উঠিতেও দেরী লাগে না, আবার পড়িতেও দেরী লাগে না।" আমি বলিলাম যে, "চিন্তার বিষয় বটে। তবে আমার মনে হয় যে চেষ্টা করিলে মিস্ এমিলির দ্বারা ডেস্‌ডেমোনার ভূমিকা অভিনীত হইতে পারে।" মিঃ ডিক্স বলিলেন, "তা আমি ঠিক বলিতে পারি না।" আমি বলিলাম, "আমি এই কয়দিন ধরিয়া একবার পরিশ্রম করিলে মিস্ এমিলিকে কাজ চালাইবার উপযুক্ত করিয়া লইতে পারিব মনে হয়।"

মিঃ ডিক্স। মিস এমিলি কি, মিস ডোরার মত অভিনয় করিতে পারিবে?"

মিস্ ডোরা পূর্ব্বে ডেস্‌ডেমোনার ভূমিকা অভিনয় করিত। আমি বলিলাম, "মিস্ ডোরার অভিনয় অতি সুন্দর স্বীকার করি। তাই বলিয়া সে ছাড়া আর কাহারও দ্বারা ডেস্‌ডেমোনার ভূমিকা অভিনীত হইতে পারিবে না এমন হইতে পারে না। আপনি যদি সাহস করেন, তাহা হইলে আমি মিস্ এমিলির দ্বারা সম্পূর্ণ নূতন প্রণালীতে ডেস্‌ডেমোনার ভূমিকার অভিনয় করাইতে পারি।" মিঃ ডিক্স বলিলেন, "যখন উপায়ান্তর নাই তখন আপনার কথায় সম্মত না হইয়া আর কি করি। আচ্ছা, মিস্ এমিলিকে না হয় এইখানেই একবার ডাকাই।" মিঃ ডিক্সের কথা সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই অফিসের ভৃত্য আসিয়া বলিল, "হুজুর, আপনার সহিত একজন স্ত্রীলোক দেখা করিতে চাহিতেছেন।" মিঃ ডিক্স বলিলেন, "আচ্ছা তাকে এইখানেই লইয়া আইস।" ভৃত্য চলিয়া গেল। আমিও সেই কক্ষ ত্যাগ করিবার উপক্রম করিতেছি দেখিয়া মিঃ ডিক্স বলিলেন, "মিঃ চাটার্জ্জি, আপনি যাইবেন না, বসুন। দেখুন না, আগন্তুক ব্যক্তিটি কে?" এই কথা বলিতে বলিতে এক অলোকসামান্যা সুন্দরীকে সঙ্গে করিয়া ভৃত্য সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া মিঃ ডিক্সের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সেই সুন্দরীকে বলিল, "উনি মিঃ ডিক্স, ম্যানেজার।" সেই সুন্দরীকে দেখিয়া মনে হইল যেন পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা।

মিঃ ডিক্স ও আমি টেবিলের যে ধারে দুইখানি চেয়ার দখল করিয়া বসিয়াছিলাম, তাহার বিপরীত দিকে একখানি খালি চেয়ার ছিল। আমি আগন্তুক সুন্দরীর মতমত ভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে বলিলাম, "আপনি ঐ চেয়ারে বসুন। বলিবা মাত্র রমণী সেই চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। কয়েক মিনিট আমরা কেহই কোন কথা কহিলাম না। অবশেষে মিঃ ডিক্স সেই রমণীকে বলিলেন, "আপনি কি জন্য আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন? রমণী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "আপনার থিয়েটারে কি কোন অভিনেত্রীর প্রয়োজন আছে?"

মিঃ ডিক্স। হাঁ আছে।

রমণী। আমি আপনার থিয়েটারে অভিনেত্রী নিযুক্ত হইতে ইচ্ছা করি।

মিঃ ডিক্স। আপনি ইতিপূর্ব্বে কখন অভিনয় করিয়াছেন ?

রমণী। কোন ব্যবসাদারী থিয়েটারে আমি কখন অভিনয় করি নাই, কিন্তু সখের থিয়েটারে আমি বহুবার অভিনয় করিয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছি।

মিঃ ডিক্স। আপনি ইতিপূর্ব্বে সখের থিয়েটারে কোন্ নাটকের কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন জানাইলে বাধিত হইব।

রমণী। সেক্‌সপিয়রের ম্যাকবেথে লেডি ম্যাকবেথ তিনবার সাজিয়াছিলাম। মার্চ্চেণ্ট অব ভিনিসে দুই বার পোর্শিয়ার ভূমিকা লইয়াছিলাম। কিং লিয়ারে একবার কর্ণেলিয়া ও একবার গণেরিল সাজিয়াছিলাম। কিং জনে দুইবার লেডি কন্‌স্টান্‌স্ আর একবার লেডি ব্লাঞ্চের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলাম। ড্রাইডেন প্রণীত—

মিঃ ডিক্স। আর বলিতে হইবে না। আপনি ওথেলো নাটকের কোন পাত্র বা পাত্রীর ভূমিকা কখন গ্রহণ করিয়াছিলেন ?

রমণী। না, আপনার থিয়েটারে কয়েকবার ওথেলোর অভিনয় দেখিয়াছি। ওথেলো নাটকের আগাগোড়া আমার মুখস্থ আছে। মিস্ ডোরার ডেস্‌ডেমনার অভিনয় দেখিয়া দর্শকবৃন্দ আহ্লাদে আটখানা হইতে দেখিয়াছি ; কিন্তু আমার নিকট মিস্ ডোরার অভিনয় কেমন একঘেয়ে বোধ হইত।

মিঃ ডিক্স। বলেন কি ! আচ্ছা বলুন দেখি ওথেলোর অভিনয় কেমন লাগিত ?

রমণী আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমার বোধ হয় ইঁহাকে ওথেলোর ভূমিকায় দেখিয়াছি। ইঁহার অভিনয়-নৈপুণ্য প্রশংসনীয় ; কিন্তু দুই একস্থলে একটু পরিবর্ত্তন করিলে ভাল হয়।"

মিঃ ডিক্স। আপনাকে যদি আমাদের দলে অভিনেত্রী নিযুক্ত করিয়া বলি যে আগামী পরশু আপনাকে আমাদের ওথেলো নাটকে ডেস্‌ডেমোনা সাজিতে হইবে, তাহাতে আপনি প্রস্তুত আছেন ?

রমণী। হাঁ। তাহা হইলে এই দুই দিন অন্য সব কাজ ছাড়িয়া ঐ বিষয়ের রিহার্সাল দিতে হইবে। এই যিনি ওথেলো সাজেন তাঁর সঙ্গে রিহার্সাল দিলেই চলিবে।

"আপনাকে ওথেলো নাটকের এই অংশ পড়িতে হইবে।" এই বলিয়া মিঃ ডিক্স সেই রমণীর সম্মুখে একখানি ওথেলো নাটক খুলিয়া ধরিয়া সেই পুস্তকের একটী স্থান দেখাইয়া দিলেন। রমণী সেই স্থানে একবার চোক বুলাইয়া পুস্তকখানি বন্ধ করিয়া পুস্তকের সেই স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া দুই পৃষ্ঠা অনর্গল অভিনয়ের ভঙ্গিতে আবৃত্তি করিলেন। তাঁর স্পষ্ট উচ্চারণ শুনিয়া ও অঙ্গভঙ্গি দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইলাম।

মিঃ ডিক্স একটু মুরুব্বিয়ানা ভাবে বলিলেন, "হাঁ, ইহাতে চলিতে পারে। আপনি কত পারিশ্রমিক চাহেন ?

রমণী। পারিশ্রমিক কত চাই ? তা, মাসিক ত্রিশ পাউণ্ডের কমে আমার চলিবে না।

মিঃ ডিক্স। আচ্ছা আমি আপনাকে মাসিক ত্রিশ পাউণ্ড হিসাবে দিতে স্বীকৃত হইলাম। কিন্তু আপনাকে লিখিত অঙ্গীকার করিতে হইবে যে এক বৎসরের পূর্ব্বে আপনি আমার থিয়েটার ছাড়িতে পারিবেন না, এবং এক বৎসরের পর আমাদের থিয়েটারের সংস্রব ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলে আপনাকে ছয়মাস পূর্ব্বে নোটীশ দিতে হইবে।

রমণী। তাহা হইলে বেতন ব্যতিরেকে পঞ্চাশ পাউণ্ড অগ্রিম দিতে হইবে এবং—

মিঃ ডিক্স। আবার কি করিতে হইবে ?

রমণী। সে অতি সামান্য ব্যাপার। অনেক থিয়েটারে অভিনয়ের সময় বা রিহার্সালের সময় পয়সাওয়ালা লোকেরা সজ্জাগৃহে (গ্রিণরুমে) আসিয়া অভিনেত্রীদের সঙ্গে নানাপ্রকার ঠাট্টা তামাসা করিয়া থাকেন শুনিয়াছি। সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রে প্রকাশিত দু-একজন অভিনেত্রীর আত্মকাহিনী পাঠ করিয়া জানিয়াছি যে, কোন অভিনেত্রী ঐরূপ ঠাট্টা তামাসা পছন্দ না করিলে, থিয়েটারের কর্ত্তারা সেই অভিনেত্রীর উপর বিরক্ত হ'ন্ এবং তাঁহাকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে

হয়। আমার মিনতি এই যে বাহিরের কোন লোক ত নয়ই, আপনাদের দলের কোন লোকও যেন আমার সঙ্গে কোন প্রকার ঠাট্টা তামাসা না করে।

মিঃ ডিক্স আমাদের থিয়েটারে বাহিরের কোন লোককে সঙ্গীতগৃহে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। আর আপনি যদি পছন্দ না করেন, আমাদের দলের কেহ আপনার সহিত ঠাট্টা তামাসা করিবে না। আমি তাহাদিগকে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিব। আপনি আজই নিযুক্ত হইলেন। এই আপনার অগ্রিম পঞ্চাশ পাউণ্ড গ্রহণ করুন, এই আপনার নিয়োগ-পত্র গ্রহণ করুন।

এই কথা বলিয়া মিঃ ডিক্স সেই রমণীকে পঞ্চাশ পাউণ্ড ও একখানা নিয়োগ পত্র দিলেন। এবং অঙ্গীকার পত্র সই করিয়া দিবার জন্য সেই রমণীর সম্মুখে এক খানি ছাপান অঙ্গীকার পত্র দিলেন। রমণী সেই অঙ্গীকার পত্রখানি পড়িয়া তাহাতে প্রয়োজনীয় দু চারটী কথা বসাইয়া তাহাতে সই করিয়া তাহা মিঃ ডিক্সের হাতে দিলেন। মিঃ ডিক্স সেখানি লইয়া আমাকে বলিলেন, "মিঃ চ্যাটার্জ, আপনি এখন হইতেই ইঁহাকে তালিম করিতে সুরু করুন।" সেই রমণীর নাম মিস্ সিসিলিয়া। (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল গুপ্ত।

সেণ্ট এলিজাবেথ

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জন্ম ও বাল্যকাল।

এলিজাবেথ হাঙ্গেরীর রাজকন্যা। তিনি ১২০৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার স্নেহময় পিতা আন্দ্রু হাঙ্গেরীর রাজা হইয়া রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার পবিত্র চরিত্র ও সহিষ্ণুতাগুণের জন্য সকলেই তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিত। রাণীর জীবন ধর্মভূষণে ভূষিত ছিল এবং তাঁহার চরিত্রে নানা সদ্‌গুণ লক্ষিত হইত। এই রাজবংশে কয়েক জন সাধুপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজপ্রাসাদের বায়ু-হিল্লোলে এখনো তাঁহাদের জীবনকুসুমের সৌরভ প্রাপ্ত হওয়া যাইত। সেই সকল সাধুপুরুষের পুণ্যফলেই যেন এলিজাবেথ হৃদয়ে স্বর্গের মাধুরী লইয়া কোন এক পবিত্রতার দেশ হইতে নামিয়া আসিয়াছিলেন।

রাজকুমারীর জন্মবিষয়ে একটী বড় আশ্চর্য্য গল্প প্রচলিত আছে। ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে সাক্সনীর রাজসভায় একজন পণ্ডিত উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন মানুষের অলৌকিক বিষয়ে অত্যন্ত বিশ্বাস ছিল। সকলেই মনে করিতেন, এই পণ্ডিত অনেক রকম অদ্ভুত কথা বলিতে পারেন। তাই রাজ্যের বিস্তর লোক একটা আশ্চর্য্য নূতন কথা শুনিবার জন্য পণ্ডিতের কাছে উপস্থিত হইল। পণ্ডিত গম্ভীরস্বরে কহিলেন—"আমার কাছে তোমরা কোন নূতন সংবাদ শুনিতে চাহিতেছ? শুন তবে, একটা নূতন কথাই বলি। হাঙ্গেরীতে একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিবে, তাঁহার আলোকে তোমাদের সমস্ত দেশ আলোকিত হইবে। আর কিছুদিন পরেই রাজা আন্দ্রুর গৃহে একটী বালিকা জন্মগ্রহণ করিবেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক-শক্তির কথা দেশ-বিদেশে রাষ্ট্র হইয়া পড়িবে। তিনি আপনার ধর্মজীবনের দ্বারা খ্রীষ্টীয় জগৎকে আলোক, আনন্দ, আশা ও সান্ত্বনা দান করিবেন।"

এই পণ্ডিতের ভবিষ্যদ্বাণীর পরেই এলিজাবেথ জন্ম-গ্রহণ করিলেন। তাই তাঁহার পিতা ও মাতার হৃদয় বিস্ময়ে ও পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহারা খুব ঘটা করিয়া কন্যার নামকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিলেন। রাজকুমারীর নাম এলিজাবেথ রাখা হইল। রাণী ছোট মেয়েটিকেই অতিশয় যত্নের সহিত ধর্ম্মের সহজ কথাগুলি শিখাইতে লাগিলেন। অন্য ছেলেমেয়েরা গল্প শুনিয়া যে রকম খুসী হয়, রাজকুমারী বাইবেলের সুমিষ্ট উপদেশ ও যীশুর জীবনের পবিত্র কাহিনী শুনিয়া সেই রকমই খুসী হইতেন। এই সময়েই তাঁহার সরল হৃদয়টুকু করুণায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। তিনি কাহারও দুঃখ সহিতে পারিতেন না। ভিখারীরা রাজকুমারীর কাছে আসিয়া করুণ স্বরে তাঁহাদের দুঃখের কথা বলিত, আর বালিকার দুই চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রুধারা

করিয়া যাইত। বালিকা অতি অল্প বয়সেই দুখানি হাত যোড় করিয়া আধ আধ স্বরে প্রার্থনা করিতেন। লোকেরা এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে ভাবিত, তবে কি সত্য সত্যই রাজকুমারী এলিজাবেথ একটী দেব-বালিকা?

আমরা সাক্সনীরাজ্যের উল্লেখ করিয়াছি। হারমেন সেই রাজ্যের শক্তিশালী ও ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। হাঙ্গেরীর রাজকুমারীর বিষয়ে সম্ভব ও অসম্ভব নানা কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি তাঁহাকে পুত্রবধূরূপে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। রাজকুমার দুই নির্ম্মল ও মধুর স্বভাবের জন্য রাজ্যের সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে এলিজাবেথের বিবাহ হইলে, মণি ও কাঞ্চনের যোগের ন্যায় বিবাহ-মিলনটি যে অতীব সুশোভন হইবে, সে বিষয়ে রাজার কোন সন্দেহ রহিল না। তাই তিনি নৃপতি আন্দ্রুর নিকট বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিবার জন্য কয়েকজন সম্ভ্রান্ত লোককে হাঙ্গেরীতে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহা-দের সঙ্গে কয়েকটি বড়ঘরের মেয়েকে পাঠানো হইল। বিবাহ ঠিক হইলে, তাঁহারা রাজকুমারীকে সমাদরের সহিত সাক্সনীতে লইয়া আসিবেন। এই সময়ে বোধ হয় রাজপরিবারে বিবাহের এক অদ্ভুত রীতি প্রচলিত ছিল। রাজকুমার ও রাজকুমারীদের অল্প বয়সে বিবাহ ঠিক হইলে, প্রথমে বাগ্দান হইত। তাহার পর রাজ-কুমারী ভাবী শ্বশুরের পরিবারেই বাস করিতেন। যখন পাত্র ও পাত্রীর বিবাহের উপযুক্ত বয়স হইত, তখনই বিবাহ হইয়া যাইত।

রাজা হারমেনের প্রেরিত পুরুষ ও মহিলাগণ হাঙ্গেরী রাজ্যে উপনীত হইয়া সেখানকার রাজা ও রাণীর নিকট বিবাহের প্রস্তাবটি উপস্থিত করিলেন। এটি যে একটি উত্তম প্রস্তাব, সাক্সনীর রাজকুমারই যে এলিজাবেথের যোগ্য পাত্র, সে বিষয়ে রাজার দ্বিধা করিবার কোন কারণ রহিল না। কিন্তু হায়, স্নেহমুগ্ধ পিতা কোন্ প্রাণে শিশু কন্যাকে মাতৃবক্ষচ্যুত করিয়া নিতান্ত অপরিচিত লোকের কাছে পাঠাইয়া দিবেন? স্নেহের প্রতিমা বালিকা যে তাঁহার হৃদয়ের অনেকখানি জায়গা অধিকার করিয়া বসিয়াছে। তিনিই বা কন্যাকে না দেখিয়া, সুস্থির থাকিবেন কেমন করিয়া? যে বীরের হৃদয় রণক্ষেত্রে শত্রুর শাণিত তরবারি দেখিয়াও বিচলিত হয় নাই, আজ কন্যাকে দূরে পাঠাইবার কথা চিন্তা করিয়া তাঁহার হৃদয় বিষাদে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল। কিন্তু বুদ্ধিমতী রাণী রাজাকে কহিলেন,—"এই প্রস্তাবটি কিছুতেই প্রত্যাখ্যান করা যায় না। এলিজাবেথের জন্য এ রকম একটি রাজপুত্র ও রাজপরিবার আর কোথাও পাওয়া যাইবে না।"

রাণীর একান্ত অনুরোধে রাজা বিবাহের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। এই উপলক্ষে রাজপরিবারে কয়েক দিন ভোজ ও আনন্দোৎসব হইল। তাহার পর রাজা রত্নমণি-ভূষণে সজ্জিতা কন্যাকে সাক্সনীর একজন প্রধান লোকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া কহিলেন—"আমি আমার জগতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্নটি আপনার হস্তে অর্পণ করিতেছি।"

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মাথা নত করিয়া রাজকুমারীকে গ্রহণ করিলেন। তিনি ও তাঁহার সঙ্গের মহিলাদিগের অন্তরে আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা কুমারীকে লইয়া আপনাদের রাজ্যে উপনীত হইলেন।

ক্ষুদ্র বালিকা এলিজাবেথকে রাজা হারমেন ও রাণী সোফিয়ার নিকট উপস্থিত করা হইল। তাঁহারা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়া সমাদরের সহিত রাজকুমারীকে গ্রহণ করিলেন। রাজা উৎসুকনয়নে সরলা বালিকার করুণ ও রুচি মুখখানির দিকে চাহিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি বালিকাকে কোলে লইয়া হৃদয়ের সমস্ত মমতা তাঁহার অন্তরে ঢালিয়া দিলেন। ইহার একদিন পরেই রাজ্যের বিশুর মান্যগণ্য লোক রাজপ্রাসাদে সমবেত হইলেন। রাজকুমার দুইয়ের সঙ্গে এলিজাবেথের বিবাহের বাগ্দান ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া গেল।

বৃন্তচ্যুত কুসুম যেরূপ বৃক্ষের স্নেহ হইতে বঞ্চিত হয়, বালিকা এলিজাবেথ পিতৃমাতৃ স্নেহ হইতে সেই রকমই বঞ্চিত হইলেন বটে, কিন্তু তিনি রাজা হার-মেনের হৃদয়ের অনেকখানি অধিকার করিয়া বসিলেন।

দিকে রাজা দিনের পর দিন এই রাজকুমারীর সরলতা, স্বাভাবিক ধর্মবিশ্বাস, ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা ও গভীর প্রার্থনা দেখিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতে লাগিলেন এবং স্বয়ং এবং তাঁহার আত্মীয় পোলাণ্ডের রাণীকে বালিকার অন্তরে ধর্মভাব ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন। এলিজাবেথ পিতৃরাজ্য ত্যাগ করিয়া আসার দুই বৎসর পরে তাহার জননীর মৃত্যু হইল। সেই সাধ্বী নারী, স্বামীকে ঘরভেদকারী শত্রুর হস্ত হইতে বাঁচাইতে গিয়া নিজেই আততায়ীর তরবারির আঘাত বুকে পাতিয়া গ্রহণ করিলেন। জননীর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া বালিকার মনটুকু একেবারে উদাস হইয়া গেল। এই সময় হইতেই তিনি ধর্মের জন্য অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন; সকলের চেয়ে ঈশ্বরকেই বেশী ভালবাসিবেন, ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প হইয়া দাঁড়াইল।

তখন বড় ঘরের সাতটি মেয়ে এলিজাবেথের সঙ্গিনী হইয়া তাঁহার সহিত খেলাধূলা ও আমোদ-প্রমোদ করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু এলিজাবেথ তাঁহাদের সঙ্গে কি আর খেলাধূলা করিবেন? তিনি ঐ সকল মেয়েদের সঙ্গে বেড়াইতে বেড়াইতে গোরস্থানে উপস্থিত হইয়া বলিতেন—"যাঁহাদের দেহ এই কবরের মধ্যে আছে তাঁহারা ত আমাদের মতই ছিলেন। আমরাও তাঁহাদের ন্যায় পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইব। এস, এখানে নত জানু হইয়া প্রার্থনা করি।" এই কথার পরেই বালিকা প্রার্থনা করিতেন—"হে প্রভু, আমাদিকে পাপ হইতে রক্ষা কর।"

পূর্বকালে খ্রীষ্টানগণ মহাত্মা যীশুর বারজন প্রেরিত শিষ্যের মধ্যে একজন সাধুকে জীবনের রক্ষক বলিয়া মনে করিতেন। এলিজাবেথ সাধু জনকে আপনার রক্ষক বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন। তাই তিনি জনের স্বর্গীয় আত্মার প্রিয়পাত্রী হইবার জন্য আপনার হৃদয়কে পবিত্র রাখিতে, অন্তর বিশ্বাসে ও প্রেমে পূর্ণ করিতে ও দয়াবতী হইতে সর্বদাই চেষ্টা করিতেন। মহাত্মা যীশু বলিয়াছেন, "দয়াবানেরা ধন্য, কারণ তাহারাই ঈশ্বরের করুণা প্রাপ্ত হইবে।" যীশুর এই বাণী মহামন্ত্রের ন্যায় এলিজাবেথের হৃদয়ের উপর আশ্চর্য্য শক্তি বিকাশ করিত। বালিকা মূর্তিমতী দয়া হইয়া উঠিতেন। এক দিন ত তিনিই রাজ্যের রাণী হইবেন; তবুও রাজবাড়ী হইতে খাদ্যসংগ্রহ করিয়া নিঃসঙ্কোচে দরিদ্রদিগের কাছে যাইতেন, এবং ক্ষুধার্তদিগকে আহার করাইয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিতেন।

এলিজাবেথের এই সময়ের ধর্মভাব সম্বন্ধে তাঁহার একজন জীবনচরিত লেখক বলিতেছেন—"বাল্যজীবনেই তিনি পূর্ণ আত্মত্যাগ ও ঈশ্বর-নির্ভরতার বীজ আপন চরিত্রে রোপন করিয়া রাখিলেন এবং ইহা দেখিয়াই ভবিষ্যতে বহু ব্যক্তিগণ ও প্রসিদ্ধ সাধুগণ মোহিত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রাণী।

এলিজাবেথের বয়স এখনো অতি অল্প। কিন্তু তবুও তিনি জানিতেন, ঈশ্বর নিরন্তর প্রাণে থাকিয়াই তাঁহাকে ভালবাসিতেছেন এবং করুণা বিতরণ করিতেছেন। তাহা ছাড়া রাজা হারমেন আপনার প্রাণভরা ভালবাসায় এই পরের মেয়েটিকে ঘরের কন্যা করিয়া লইয়াছিলেন। এজন্য বালিকা একটি অপরিচিত রাজপরিবারে আসিয়াও আপনার মুখের হাসি ও মনের প্রসন্ন ভাব রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁহার পিতৃতুল্য রাজা হারমেনের মৃত্যু হইল। এই ঘটনায় বালিকার হৃদয় বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। এখন স্বর্গীয় রাজার পত্নী রাণী সোফিয়া এলিজাবেথের ভার গ্রহণ করিলেন। বালিকা যে ধর্ম ধর্ম করিয়া মাতিয়া উঠেন, তাহা তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন না। এলিজাবেথ ত আর কিছুদিন পরেই একটি রাজ্যের রাণী হইবেন। সেই জন্য সোফিয়া তাঁহাকে সুচতুরা হাস্যকৌতুকময়ী রাজালঙ্কার-ভূষিতা সৌভাগ্যগর্বিতা রাজরাণীর মতই দেখিতে চাহিতেন।

এলিজাবেথ কিছুতেই রাজপরিবারের রমণীদিগের মনের মত হইতে পারিলেন না। ঈশ্বর তাঁহাকে ত রাণী হইবার জন্য সংসারে পাঠান নাই; তিনি সাধন করিয়া ভক্তিলাভ করিবেন, তাঁহার প্রীতি ও করুণায় দুঃখীর দুঃখ দূর হইবে, শান্তিহারা নরনারীর

হৃদয় জুড়াইয়া যাইবে, এই জন্যই তাঁহার জন্ম। অথচ তাঁহার প্রকৃতিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া মড়িয়া পিটিয়া তাঁহাকে রাণী বানাইবার চেষ্টা হইতে লাগিল। কিন্তু লোকের বৃথা চেষ্টা। এলিজাবেথ লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহিয়া ঈশ্বরকে আরো বেশি করিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। তাঁহার এই সময়ের অবস্থা সম্বন্ধে রেভারেণ্ড এলবান বাটলার সেণ্টদিগের জীবন চরিতের মধ্যে লিখিয়াছেন, অসহায়া এলিজাবেথ বড়ই নির্য্যাতন সহ্য করিতেন। তখন রাজকুমার শিক্ষার জন্য বিদেশে বাস করিতেছিলেন; কেই বা বালিকার মুখের পানে ফিরিয়া চাহিবে? কেই বা অত্যাচার নিবারণ করিবে? রাজকুমারী দুঃখ কষ্টের মধ্যে, ঈশ্বরের সঙ্গে গভীরভাবে আত্মাকে মিলিত করিতেন ও তাঁহার মধ্যে মগ্ন হইয়া থাকিতেন। তাহা ছাড়া (১) শান্তভাব (২) বিনয় (৩) সহিষ্ণুতা (৪) মৈত্রী—এই চারিটি তাঁহার সাধনের বিষয় ছিল। তিনি উহা লাভ করিবার জন্য নিরন্তর ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন। এই সময় যে সকল ঘটনা ঘটিত, তাহার দুই একটির উল্লেখ করিতেছি।

একবার একটি খ্রীষ্টীয় পর্ব্ব উপস্থিত হইল। সেদিন রাণীর আদেশে তিনি বসনভূষণে সুসজ্জিতা হইলেন। তাঁহার অঙ্গে স্বর্ণখচিত মূল্যবান পরিচ্ছদ ও মস্তকে মণিমুক্তাশোভিত মুকুট শোভা পাইতে লাগিল। তিনি ঠিক রাণীর মতই উপাসনামন্দিরে প্রবেশ করিলেন। তখন হঠাৎ খ্রীষ্টের মৃত্যুমুখ একখানি ছবির দিকে তাঁহার চোখ পড়িল। তিনি তৎক্ষণাৎ মুকুট খুলিয়া রাখিয়া মস্তক নত করিয়া, সজলনয়নে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুবিন্যস্ত সুদীর্ঘ কেশরাশি পৃষ্ঠে, ললাটে ও মুখের উপর ছড়াইয়া পড়িল। রাণী দেখিয়া এই দৃশ্য কর্কশস্বরে কহিলেন—"তুমি কি মুকুটের ভার বহিতে পার না নাকি? অমন করিয়া খালিমাথায় চুলগুলি ছড়াইয়া দিয়া বসিয়া পড়িলে কেন? এই সব দেখিয়া লোকেরা যে কত নিন্দা করে, তাহা কি তুমি শুনিতে পাও না?"

এলিজাবেথ নম্রমুখে বিনীতভাবে কহিলেন—"আমাদের প্রভু যিশুর মাথায় কাঁটার মুকুট, আর আমি তাঁহারই সেই ছবির সামনে সোণার মুকুট পরিয়া উপাসনায় বসিব? তাহা হইলে কি প্রভুর অপমান করা হইবে না? আমি তাহা পারিব না, আমাকে মার্জ্জনা করিবেন।"

বালিকা এই কথা বলিয়াই খ্রীষ্টের মৃত্যুকালের যন্ত্রণার কথা স্মরণ করিয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন। রাণীর কন্যা রাজকুমারী আগ্‌নেস এলিজাবেথের এই সকল কার্য্য মোটেই পছন্দ করিতেন না। তিনি একদিন বালিকার মুখের সাম্‌নেই বলিলেন—"তুমি আর আমার ভায়ের স্ত্রী হইবার আশা করিও না। এই রাজবাড়ীর চাকরাণী হইলেই তোমাকে বেশ মানাইবে।"

কিন্তু রাজকন্যার এই সমস্ত কথা একেবারেই বাজে খরচ হইতে লাগিল। রাজকুমার দুই বিদেশে শিক্ষা লাভ করিয়া, গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি বীর, ধীর, উদার ও নির্ভীক। অথচ তাঁহার মহৎ হৃদয় স্নেহ ও করুণায় পরিপূর্ণ। রাজবাড়ীর মেয়েরা তাঁহার কাণের কাছে ক্রমাগত এলিজাবেথের নিন্দা আরম্ভ করিত, আর তাঁহার হৃদয় অসহায়া বালিকার দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িত। তিনি মনে মনে বলিয়া উঠিতেন—"আমার প্রাণের বালিকা, আমি যেমনটি চাই, তুমি ঠিক সেই রকম হইয়াই ফুটিয়া উঠিতেছ। তোমার জীবনকুসুমের সৌরভ একদিন আমার হৃদয় পুলকিত করিবে এবং রাজসিংহাসনের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে।"

রাজকুমার রাজ-পরিবারের মেয়েদের বলিতেন—"পৃথিবী আমাকে স্বর্ণমণ্ডিত মণিমাণিক্যের পর্ব্বত দান করিতে পারে; কিন্তু আমি তাহার চেয়ে এলিজাবেথের ধর্ম্মভাবকেই অধিক মূল্যবান মনে করি।" তিনি একদিন বহুমূল্য প্রস্তরখচিত একখানি কাচ এলিজাবেথের নিকট প্রেরণ করিলেন। ঐ কাচের একটি দিক খুলিলেই তন্মধ্যে যিশুর একটি সুন্দর মূর্ত্তি দেখা যাইত। রাজকুমার এলিজাবেথের ম্লান মুখখানি চিন্তা

ছিল সকল সময় দূরে থাকিতে পারিতেন না। এক এক দিন প্রেমোচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইয়া বালিকার কাছে গিয়া দাঁড়াইতেন। এবং মনের প্রীতি মুখের ভাষায় মিশাইয়া কহিতেন—"একটিন অপেক্ষা কর, তোমার এ দুঃখ আর থাকিবে না।"

কে বলিবে স্নেহবঞ্চিতা বালিকা এই অল্প কয়েকটি কথার ভিতরদিয়া রাজকুমারের কতখানি প্রেম অনুভব করিতেন এবং তাঁহার কোমল হৃদয়ে কতটা প্রীতি ও সম্ভ্রমের উদয় হইত?

১২১৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজকুমার দূরের নাবালকত্ব চলিয়া গেল। ঐ সময়ে তাঁহার বয়স উনিশ বৎসর। ১২২০ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াইমার প্রাসাদের গির্জ্জায় খুব ঁাকজমকের সহিত দুই ও এলিজাবেথের বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। তখন রাজকুমারের বলিষ্ঠ দেহ, উন্নত ও প্রশস্ত ললাট এবং সুন্দর মুখচ্ছবি দেখিয়া তাঁহাকে একজন তেজস্বী ও বীর ও সুপুরুষ বলিয়া মনে হইত। তাঁহার সাহস, ধীরত্ব, বিনয় এবং হৃদয়ের মহত্ত্ব ও গম্ভীরভাবের সহিত অনেক সদ্গুণের সমাবেশ হইয়াছিল। তিনি পাপকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। পাছে বা কোনরূপ অপরাধ হয় সেজন্য রাজকুমার কখনই বেশী কথা বলিতেন না।

অনেক দুঃখ নির্য্যাতনের পর, এলিজাবেথ ধার্ম্মিক হৃদয়ে স্বামীর সহিত মিলিত হইলেন। সরলা বালিকা মনের আনন্দোচ্ছ্বাস আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। তাঁহার নিকট স্বামীর প্রেম এমন পূর্ণ, এমন পবিত্র এমন প্রাণের সামগ্রী বলিয়া মনে হইল যে, এখন যেন পৃথিবীর কাছে বালিকার আর পাইবার এবং চাহিবার কিছুই নাই; একমাত্র স্বামীর প্রীতির মধ্যদিয়া, ঈশ্বর যেন তাঁহাকে পার্থিব ঐশ্বর্য্যই দান করিয়াছেন। লতা যেমন বৃক্ষকে আশ্রয় করে, তেমনি এলিজাবেথ স্বামীকে আশ্রয় করিয়া আপনাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। রাজকুমার দুই ধর্ম্মশীলা নারীর ভক্তিকুসুমসুরভিত সুপবিত্র হৃদয়টুকু অধিকার করিয়া এক অপার্থিব সুখ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। সে সুখের কাছে রাজপ্রাসাদের রত্নমণি সকলই তুচ্ছ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। একটি শক্তিশালী ধার্ম্মিক যুবকের সহিত ভক্তিমতী ও প্রেমময়ী নারীর মিলন হইলে, তাঁহাদের দাম্পত্য জীবন যে এইরূপ আনন্দে ও অমৃতে পূর্ণ হইয়া উঠিবে, সে বিষয় আর সন্দেহ নাই!

কিছুদিন পরেই রাজকুমার দুই এবং ধর্ম্মশীলা এলিজাবেথ রাজা ও রাণী হইলেন। তাঁহাদের চরণস্পর্শে স্বর্ণসিংহাসন যেন পবিত্র হইয়া গেল। এই সময়ে এলিজাবেথ সর্ব্বদাই স্বামীকে সুখী করিতে চেষ্টা করিতেন। রাজকর্ম্মে স্বামী ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, পত্নীর সেবায় তাঁহার শরীর সবল ও হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিত। দুই স্থানান্তরে গমন করিলে, এলিজাবেথ বেশভূষা করিতেন না, ভাল খাবার জিনিষটি খাইতেন না, কোন কোন দিন একেবারে উপবাস করিতেন। তখন শুধুই উপাসনা ও প্রার্থনা তাঁহার সম্বল হইয়া দাঁড়াইত। এজন্য রাজপরিবারের মেয়েরা কতই উপহাস ও নিন্দা করিত, কিন্তু এলিজাবেথ সকলই হাস্যমুখে সহিয়া যাইতেন।

এলিজাবেথের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মন যেন সংসারের উপরে উঠিয়া যাইতে লাগিল। খ্রীষ্ট বলিয়াছেন—"তোমার সমস্ত হৃদয়, সমস্ত প্রাণ সমস্ত শক্তি দিয়া ঈশ্বরকে প্রীতি করিবে। তোমার প্রতিবেশীকে আপনার মত প্রেম করিবে। এই দুই আজ্ঞা হইতে আর কোন শ্রেষ্ঠ আদেশ নাই।"

বিভুর এই দুইটি আদেশ পালন করিবার জন্য এলিজাবেথের চিত্ত অধীর হইয়া উঠিল। তিনি ঈশ্বরের প্রেম লাভ করিয়া তাঁহাকে প্রীতি অর্পণ করিবার জন্য, উপাসনা ও প্রার্থনাকেই জীবনের সম্বল করিলেন। রজনীতে তাঁহার স্বামী শয়ন করিয়াই ঘুমাইয়া পড়িতেন; কিন্তু এলিজাবেথের চোখে নিদ্রা কোথায়? তিনি ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন হইয়া থাকিতেন। ভক্তিমতী নারী ধর্ম্মের উন্নত অবস্থা লাভ করিবার জন্য তৎকালের খ্রীষ্টান ধর্ম্মের কঠোর রীতিনীতি নিষ্ঠার সহিত পালন করিতেন। এজন্য তিনি কোন রকম কষ্টকে কষ্ট বলিয়া মনে করিতেন না। রেভারেণ্ড এলবান বাটলার লিখিয়াছেন, তাঁহার কৃচ্ছ্রসাধন সন্ন্যাসিনীদিগের তপস্যার চেয়েও কঠোর ছিল। তিনি রাজপ্রাসাদে অতিথি-

দিগের সহিত স্বামীর পাশেই খাইতে বসিতেন। তাঁহার উৎকৃষ্ট সামগ্রী আহার করিতেন; কিন্তু এলিজাবেথ মাংস খাইতেন না, কোন রকম উত্তেজক দ্রব্য খাইতেন না; শুধুই রুটি আর একটু মধু খাইতেন। স্বামীকে এবং অতিথি-দিগকে সুমধুর গল্পে এমনই মুগ্ধ করিয়া রাখিতেন যে, তিনি নিজে কোনরূপ উত্তম সামগ্রীই যে খাইতেছেন না, তাহা তাঁহারা লক্ষ্য করিতেই পারিতেন না। এলিজাবেথ স্বামীর অনুরোধেই দুই এক দিন রাণীর পোষাক পরিতেন; নচেৎ সামান্য পরিচ্ছদই তাহার অঙ্গে শোভা পাইত। সাধ্বী নারীর পবিত্র মূর্ত্তি দিব্য-লোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত; সেজন্য সেই সামান্য পোষাকেই তাঁহাকে অসামান্যা নারী বলিয়া মনে হইত। "এলিজাবেথ" গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ের একটি জায়গায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—

"প্রেমে এখন এলিজাবেথের হৃদয় ভরপুর হইল। হৃদয়ের সেই সব প্রেম এলিজাবেথ ঈশ্বরে অর্পণ করিলেন। তাঁহার বালাকালের দীনতা এখন দিনের পর দিন আরও গভীরতা লাভ করিতে লাগিল। তিনি সকলকে অকাতরে প্রেম অর্পণ করিতেন; কিন্তু সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বরকেই প্রেম অর্পণ করিতেন: ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার শিশুর ন্যায় সরল বিশ্বাস ছিল। আবার ধর্ম্মমণ্ডলীর সকল উপ-দেশ ও আদেশ একান্ত বাধ্যতার সহিত পালন করি তেন। • • গির্জ্জার ঘণ্টা বাজিলে, আনন্দের সহিত এলিজাবেথ গির্জ্জায় উপস্থিত হইতেন এবং ভক্তিভাবে পবিত্র চিত্তে প্রভুর অর্চ্চনা করিতেন। তিনি পর্ব্বদিনে বিশেষতঃ, বিশুর দুঃখভোগের সপ্তাহে ধর্ম্মের কঠোর নিয়ম বিধি সমস্তই পালন করিতেন। বৃহস্পতিবারে বারজন কুষ্ঠীর পদধৌত করিতেন; তৎপরে ভিখারিণী বেশ ধারণ করিয়া অতি দীনভাবে, নগ্নপদে হাঁটিয়া গির্জ্জায় যাইতেন। রাত্রি উপস্থিত হইলে, খ্রীষ্টের দুঃখভোগের কোন প্রতিকৃতির সম্মুখে নতজানু হইয়া ধ্যান ও প্রার্থনায় রাত্রি যাপন করিতেন। পুণ্য-শুক্র-বার প্রভাতে তিনি আপন পরিচারকদিগকে বলিতেন—

'আজ সকলের পক্ষেই বিশেষ দীনতার দিন; তোমরা কেহই আজ আমার প্রতি সামান্য সম্মানও দেখাইও না।' • • • ইহার পর তিনি সহরের মধ্যস্থ প্রশস্ত স্থানে গিয়া চতুর্দ্দিকস্থ অসংখ্য ভিক্ষুককে দান করিতেন।" দুঃখী দরিদ্রের প্রতি এই করুণাময়ী নারীর যে কি ভালবাসা ছিল, তাহা স্মরণ করিলেও বিস্ময়ের উদ্রেক হয়। এলিজাবেথের অন্তর হইতে যেন ঝরণার করুণা নামিয়া যাইত; সেই নির্ঝরিণীধারায় শত শত নরনারীর উত্তপ্ত হৃদয় শীতল হইত। এই জন্য তাঁহার নাম হইয়াছিল দরিদ্রের বন্ধুস্বরূপা।"

এলিজাবেথ এখন ত একটি রাজ্যের রাণী; তবুও তিনি অম্লানবদনে রাজপ্রাসাদের বাহিরে গিয়া দরিদ্র ও পীড়িত-লোকদিগের সন্ধান করিতেন। তিনি ঐ সকল লোকের ক্ষুদ্র কুটীরে গমন করিয়া, তাহাদিগকে ভালবাসা অর্পণ করিতে এবং তাহাদের চোখের জল মুছাইতে একটুকু সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। বরঞ্চ দুঃখীর সেবাতেই তাঁহার চিত্ত সুখে পূর্ণ হইয়া উঠিত, এলিজাবেথ শুধু যে তাহাদের দেহের সেবা করিতেন, তাহা নয়। ঐ সকল নরনারীর আত্মার কল্যাণের জন্য তিনি তাহাদের নিকট খ্রীষ্টের জীবনের কাহিনী সরল ভাষায় বর্ণনা করিতেন। এলিজাবেথ এক এক সময় নিজেই রাজবাড়ী হইতে খাদ্যসামগ্রী লইয়া দরিদ্রের কুটীরে উপস্থিত হইতেন। কুষ্ঠরোগীর কথা শুনিলেই ত আমাদের ভয় হয়; পাছে বা তাহাদের ছোঁয়া আমাদের অঙ্গ স্পর্শ করে, সেজন্য সঙ্কুচিত হইয়া দূরে সরিয়া যাই। কিন্তু এই রাণী প্রেমে হৃদয় পূর্ণ করিয়া কুষ্ঠরোগগ্রস্ত লোকের পাশে গিয়া বসিতেন। তাঁহার সুমধুর সান্ত্বনাবাক্যে হতভাগ্যদিগের জ্বালাময় হৃদয় ক্ষণকালের জন্য জুড়াইয়া যাইত। স্নেহময়ী রাণী স্বামীর অনুমতি গ্রহণ করিয়া রাজবাড়ীর নিকটেই একটী হাসপাতাল স্থাপন করিলেন। সেখানে আটাশ জন অসহায় রুগ্নব্যক্তি আশ্রয় লাভ করিল। রাণী তাহা-দিগকে খাওয়াইয়া, তাহাদের সেবা করিয়া অন্তরে অনু-পম তৃপ্তি লাভ করিতেন।

১২২৩ খ্রীষ্টাব্দে এলিজাবেথের একটি পুত্রসন্তান জন্ম-গ্রহণ করিল। সেদিন রাজপ্রাসাদে আনন্দোৎসবের আর সীমা রহিল না। কিন্তু এলিজাবেথ শুধু আমোদ-

প্রমোদে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি একদিন গোপনে শিশুটিকে লইয়া গেট ক্যাথেড্রাল গির্জায় প্রবেশ করিলেন। সেখানে শিশুকে ঈশ্বরের চরণে উৎসর্গ করা হইল। এলিজাবেথ প্রার্থনা করিলেন—"হে আমার ঈশ্বর, তুমি আমাকে এই শিশুটি দিয়াছ, আমি ইহাকে তোমারই চরণে অর্পণ করিতেছি। তুমি আমার এই শিশুকে গ্রহণ করিয়া, তোমার ভৃত্য করিয়া লও। ইহাকে তোমার স্বর্গের আশীর্ব্বাদ দান কর।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জীবনের আর এক অঙ্ক।

আমরা এলিজাবেথকে সরলহৃদয়া, সেবাপরায়ণা, সদাব্রতী ও ভক্তিমতী নারী বলিয়াই জানি। প্রয়োজন হইলে তিনি যে রাণীর আসনে বসিয়া দৃঢ়তার সহিত আপন-কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন, সে বিষয়ে বড় বড় রাজকর্ম্মচারিদিগের ভ্রূকুটি দেখিয়াও ভয় পান না, —পূর্ব্বে তাহা জানিতে পারি নাই, এবার জানিতে পারিব। ১২২৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজা দুই যুদ্ধের জন্য দূর-দেশে যাত্রা করিলেন। কিছুদিন পরেই রাজ্যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। বিস্তর লোক অনাহারে শীর্ণ হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। কিন্তু রাজকর্ম্মচারিগণ বধির হইয়াই রহিলেন। তাঁহারা যে বিপন্ন লোকের সাহায্য করিবেন, তাহার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। কাজেই "দরিদ্রের রক্ষয়িত্রী" এলিজাবেথ আর সুস্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি রাজ্যের রাণীরূপে আপনার শক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার আদেশে রাজকোষের ও রাজার শস্যভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত হইল। এলিজাবেথ রাজপুরুষগণকে অগ্রাহ্য করিয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগকে শস্য ও রাজকোষের সঞ্চিত অর্থ বিতরণ করিতে লাগিলেন। বিপন্ন লোকেরা রাণীকে "ঈশ্বর প্রেরিত স্বর্গের দূত" বলিয়া মনে করিতে লাগিল। কিন্তু রাজার ভ্রাতা হেনরী ও রাজপুরুষগণ রাণীর ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ ও বিরক্ত হইলেন, তাঁহারা রাণীর কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। যখন দেখিলেন, তাঁহাদের প্রতিবাদ একেবারেই নিষ্ফল, রাণী কাহারো কথায় কর্ণপাতই করেন না; তখন ঐ সকল লোক রাণীকে ভয় দেখাইয়া বলিলেন—"আপনি যে কি অন্যায় কাজ করিতেছেন, একবার কেন তাহা ভাবিয়া দেখিতেছেন না? এই অন্যায় কাজের কথা রাজার কর্ণে কি প্রবেশ করিবে না? তিনি কি এজন্য অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইবেন না? তখন কি আপনাকে দুঃখ ও মনোবেদনা সহ্য করিতে হইবে না?"

এলিজাবেথ কাহারো কথার কোন উত্তর দিতেন না, শুধুই হাস্য করিতেন এবং যাহা করিবার, তাহা নিঃসঙ্কোচে করিয়া ফেলিতেন। অল্পেই রাণীর অর্থে ওয়াটবার্গ রাজপ্রাসাদের সন্নিকটে একটী হাসপাতাল নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সময়ে তিনি শিশুদের জন্য উহার একটি স্বতন্ত্র বিভাগ খুলিয়া দিলেন। অনেক-গুলি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে আসিয়া ঘরখানি পূর্ণ করিল। স্নেহময়ী এলিজাবেথ সেই ছেলে মেয়েদের আদর করিয়া এক একটি দ্রব্য উপহার দিতেন। অসহায় শিশুগুলি তাঁহাকে "মা" "মা" বলিয়া ডাকিত। তিনি জননীর ন্যায় তাহাদিগকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিতেন।

রাণী শুধু এই কাজটুকু করিয়াই তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। ঋণের জন্য যে সকল গরীব লোক কারাগারে বন্দী ছিল, তিনি তাহাদের মুক্তির চেষ্টা করিতেন। কয়েকগুলি কয়েদির পায়ে ভীষণ লৌহশৃঙ্খল ছিল সেজন্য তাহাদের পায়ের স্থানে স্থানে ঘা হইয়াছিল। রাণী স্বহস্তে তাহাদের ঘা ধুইয়া, পরিষ্কার করিয়া কাপড় দিয়া বাঁধিয়া দিতেন। ঐ সকল লোকের পাপের জন্য তাঁহার অন্তর হইতে প্রার্থনা উত্থিত হইত। এজন্য কয়েদিরা তাঁহাকে "দয়ার দূত" বলিয়া মনে করিত।

রেভারেণ্ড এলবান বাটলার লিখিয়াছেন,—"প্রতি-দিন নয় শত লোক রাজপ্রাসাদের দ্বারে উপনীত হইত, এলিজাবেথ তাহাদিগকে খাদ্যসামগ্রী দান করিতেন। তাহারা পেট ভরিয়া আহার করিত। রাণী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যত অসহায় লোকেরই যে আহারের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, কে তাহার সংখ্যা নিরূপণ করিবে? তাঁহার এই দয়া ও আশ্চর্য্য ধর্ম্মভাব দেখিয়া রাজার

মন মুগ্ধ হইয়াছিল ; তিনি রাণীর উন্নত জীবনকে আদর্শ করিয়া স্বীয় জীবনকে গঠন করিতে চেষ্টা করিতেন। এজন্য ইতিহাসে তিনি ধার্ম্মিক নরপতি বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।"

অনেক দিন পরে রাজা লুই আবার আপনার রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। প্রজারা তাঁহাদের দয়ালু রাজাকে পাইয়া নিশ্চিন্ত হইল। রাজকর্ম্মচারিগণ রাজাকে অভ্যর্থনা করিয়া প্রাসাদে লইয়া আসিলেন। কিন্তু রাণীর উপর এখনো তাঁহাদের বিষম ক্রোধ। তিনি যে রাজপুরুষদিগকে মোটেই গ্রাহ্য করেন নাই, রাজকোষের সঞ্চিত অর্থ দুই হাতে প্রজাদিগকে বিতরণ করিয়াছেন ;—সর্ব্বাগ্রে তাঁহার নামে এই অভিযোগই উপস্থিত হইল। রাজা অভিযোগের কথা শুনিয়া হাস্যমুখে কর্ম্মচারিদিগকে কহিলেন—

"রাণী কি করিয়াছেন ? রাজস্ব ত দরিদ্রদিগকে দান করেন নাই ?

কর্ম্মচারিগণ নীরব রহিল। তাহার পর রাজা বলিলেন—"রাণী ঈশ্বরের নামে যে কিছু ভাল কাজ করিতে চাহিবেন, তাঁহাকে তাহাই করিতে দিবে। এ বিষয়ে বাধা না দিয়া বরং তাঁহার সাহায্য করিবে। দরিদ্রকে ভিক্ষা দান করিলে কখনই রাজ্যের সর্ব্বনাশ হইবে না। আমরা ঈশ্বরের নামে মানুষকে অর্পণ করিব, ঈশ্বর তাহার চেয়ে অনেক বেশি আমাদিগকে প্রত্যর্পণ করিবেন।"

রাজা লুই এলিজাবেথের নিকট গমন করিলেন। তাহার পর হাস্যমুখে ও মধুরস্বরে বলিলেন—"দয়াময়ী, এই দুর্দ্দিনে তোমার গরীব লোকেরা কেমন আছে—বল ত ?"

চন্দ্রোদয়ে রজনী যেমন সৌন্দর্য্যময়ী হইয়া উঠে, তেমনি স্বামীর আগমনে এলিজাবেথের মূর্ত্তি অতিশয় মনোহারিণী হইয়া উঠিল। রাজা লুই রাণীর প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় সুন্দর মুখখানি বারংবার দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনপ্রাণ আনন্দে আপ্লুত হইয়া গেল।

কিন্তু হায়, পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর পরে যেমন অমাবস্যার নিবিড় অন্ধকার আসিয়া উপস্থিত হয়, তেমনি এলিজাবেথের সুখের দিনের পরে দুর্দ্দিন ঘনাইয়া আসিল।

১২২৭ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপের অধিকাংশ রাজা মুসলমানদিগের হস্ত হইতে যীশুখ্রীষ্টের তীর্থ উদ্ধারের জন্য যুদ্ধে যাত্রা করিলেন। রাজা লুইয়ের মনে হইল ইহা ধর্ম্মযুদ্ধ, এ যুদ্ধের জন্য খ্রীষ্টই তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতেছেন ; সুতরাং তাঁহার যুদ্ধে যাওয়াই একান্ত আবশ্যক। তিনি রণক্ষেত্রে যাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই কথা পতিব্রতা এলিজাবেথের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি ক্ষুদ্র বালিকার মত কাঁদিতে লাগিলেন। একদিন রাজা লুই যীশুশত্রু-যাত্রী যোদ্ধাদের মত ক্রুশ ধারণ করিলেন। এলিজাবেথ এই দৃশ্য দর্শন করিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না ; একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। জ্ঞানলাভ করার পর সরলা রমণী স্বামীর প্রীতিমাখা মুখখানির দিকেই চাহিয়া রহিলেন। এই এলিজাবেথই অতি অল্প বয়সে পিতা-মাতার স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়া শ্বশুর-গৃহে বাস করিয়াছিলেন। আর আজ তাঁহার এই অবস্থা ! তিনি স্বামীকে না দেখিয়া শূন্য রাজপুরীতে বাস করিবেন কেমন করিয়া ? স্বামী যদি রণক্ষেত্র হইতে আর ফিরিয়া না আসেন ? সে কথা ভাবিতেও যে এলিজাবেথের প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। রাণী শুধুই অশ্রুজলে নয়ন-পল্লব সিক্ত করিতে লাগিলেন। রাজা লুই আজ কোন্ কথা বলিয়া পত্নীকে সান্ত্বনা দান করিবেন ? তিনি অনেক চিন্তা করিয়া কেবল একটি কথা খুঁজিয়া পাইলেন। রাজা কহিলেন—

"আমি যে যীশুর প্রেমে আকৃষ্ট, তাঁহার ধর্ম্মরক্ষার জন্যই যুদ্ধে যাইতেছি। ইহা ত ঈশ্বরেরই কার্য্য।"

এলিজাবেথ বলিলেন—"স্বয়ং ঈশ্বরই যদি তোমাকে তাঁহার কাজের জন্য মনোনীত করিয়া থাকেন, তবে আমি আর কেমন করিয়া তোমাকে এখানেই থাকিতে বলিব ? তুমি ঈশ্বরের সেবা কর, তিনি তোমাকে শক্তি দান করুন। আমি তোমাকে ও আমাকে ঈশ্বরের নিকট উৎসর্গ করিয়াছি। তাঁহার করুণা যেন তোমার

সঙ্গে সঙ্গেই থাকেন। আমি সর্ব্বদাই ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিব। যাও তবে, ঈশ্বরের নামে চলিয়া যাও, তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।"

রাজা যুদ্ধের জন্য যাইবার দিন স্থির হইল। তিনি রাজকর্ম্মচারী ও প্রজাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন, আত্মীয় স্বজনের নিকটও বিদায় গ্রহণ করিলেন; এইবার তাঁহাকে জননী ও পত্নীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। কি এক অব্যক্ত বেদনায় তাঁহার বুক যে ভরিয়া উঠিল, তাহা কে বর্ণনা করিবে? তিনি গম্ভীর ভাবে জননী ও পত্নীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাহার পর একখানি হস্ত মাতার স্কন্ধের উপর এবং অপর হস্তখানি পত্নীর স্কন্ধের উপর রাখিলেন। তাঁহার বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ হইতে অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে একটি কথাও বাহির হইল না। কিয়ৎকাল পরে তিনি আত্মসম্বরণ করিয়া জননীকে কহিলেন—

"মা, তোমাকে দেখা-শুনার ভার, আমার দুই ভাইয়ের উপর রহিল। কিন্তু এলিজাবেথকে তোমার হস্তেই অর্পণ করিতেছি। তাহার মর্ম্মস্থানে যে কি বেদনা, তুমি ভিন্ন আর ত কেহই তাহা বুঝিবে না, আর কাহারো কাছে তাহার একটু স্নেহ পাইবারও আশা নাই।"

রাজা দুইয়ের সন্তানেরা পিতার সম্মুখেই দণ্ডায়মান ছিল। তাহারা সকলেই খুব ছোট। তিনি পুনঃ পুনঃ সন্তানদিগকেও দেখিতে লাগিলেন। তাহাদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। এলিজাবেথ রাজপ্রাসাদে থাকিতে পারিলেন না; তিনি স্বামীর সঙ্গে রাজ্যের প্রান্তসীমা পর্য্যন্ত গমন করিলেন। অবশেষে বিদায়ের শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইল। তখন রাজা দুই বলিলেন—

"এলিজাবেথ, ঈশ্বর তোমার রক্ষক। তিনি তোমার সহায় হউন। তিনি তোমাকে ধৈর্য্য ও সাহস দিন। তিনি সন্তানদিগকেও আশীর্ব্বাদ করুন। বিদায় হই, আমাদের পবিত্র প্রেমের স্মৃতি রক্ষা করিও; তোমার প্রার্থনার মধ্যে আমাকে ভুলিও না। তবে বিদায়—বিদায়।"

রাজা দুই চলিতে লাগিলেন। কিন্তু এলিজাবেথের চলিবার শক্তি কোথায়? তিনি প্রস্তর-মূর্ত্তির ন্যায় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার যত দূর দৃষ্টি যায়, ততদূর চাহিয়া চাহিয়া শুধু স্বামীকেই দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে স্বামী অনেকদূরে চলিয়া গেলেন। দৃষ্টির সীমা অতিক্রম করিলেন; তখন এলিজাবেথকে রাজপ্রাসাদে ফিরিয়া আসিতে হইল। সাধ্বী নারী আপনার অট্টালিকায় উপস্থিত হইয়াই, একে একে অঙ্গের আভরণ উন্মোচন করিলেন, মূল্যবান পরিচ্ছদ খুলিয়া রাখিলেন; বিধবার সাদাসিদা পোষাকেই তাঁহার দেহ আচ্ছাদিত হইল। ইহার পরে তিনি যে কখনো জমকালো পোষাক পরিয়াছেন ও রত্নভূষণে সুশোভিত করিয়াছেন, এমন শুনা যায় না।

রাজা দুই জাহাজে উঠিলেন। কে বলিবে কোথায় তাঁহার শরীরে বিষ প্রবেশ করিল? তিনি কয়েক দিন জ্বরে শয্যাশায়ী হইলেন। দুই বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার আসন্নকাল উপস্থিত। তাই তিনি স্ত্রী ও সন্তানদিগের জন্য একটি উইল তৈরী করিয়া, আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের হস্তে অর্পণ করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে বিশ্বাসের আলোকে তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—

"দেখ দেখ, শ্বেত কপোতেরা আমার চারিদিকে উড়িতেছে। আমার আত্মা ইহাদের সঙ্গে উড়িয়া যাইবে। ইহারা ত আমার জন্যই অপেক্ষা করিতেছে।"

মুখের কথা ফুরাইবার সঙ্গে সঙ্গেই সব শেষ হইয়া গেল। রাজা দুই ১২২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর পরলোকে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার প্রিয় সৈন্যগণ প্রভুকে হারাইয়া শোকে অভিভূত হইয়া পড়িল।

হায় পতিপ্রাণা এলিজাবেথ! তিনি কিরূপে এই নিদারুণ শোক সহ্য করিবেন? তাঁহাকে যখন স্বামীর মৃত্যুসংবাদ শুনানো হইল, তখন তিনি কেমন এক অস্বাভাবিক স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"হে আমার প্রভু পরমেশ্বর, আজ তবে কি সংসার আমার নিকট মৃত?" তাহার পর পতিপ্রাণা নারী উন্মাদিনীর ন্যায় আপনার অট্টালিকার চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

তাঁহার মুখ হইতে শুধুই একটি কথা বাহির হইতে লাগিল—

"তাঁহার কি মৃত্যু হইয়াছে—তাঁহার কি মৃত্যু হইয়াছে?"

রাণীর সহচরীগণ তাঁহাকে শান্ত করিবার জন্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেখিতে দেখিতে এলিজাবেথের দেহের স্পন্দন যেন থামিয়া গেল; তিনি ছিন্নলতার ন্তায় একটি মহিলার কোলের উপর পড়িয়া গেলেন।

কিয়ৎকাল পরে শোকার্ত্তা রমণী বলিতে লাগিলেন, —"আমার ঈশ্বর, দাও আমাকে সান্ত্বনা—আমাকে সান্ত্বনা দাও, আমার মনকে দৃঢ় কর।"

এই সময়ে ধর্ম্মশীলা নারী ঈশ্বরের স্বরূপের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া তাঁহার প্রেমপূর্ণ বাণী শুনিতে পাইলেন। তিনি বলিলেন—"আমি যাহা করিয়াছি, তাহার গূঢ় রহস্ত এখন বুঝিতে পারিবে না, পরে বুঝিতে পারিবে।"

এলিজাবেথ এখনো তরুণী রমণী। তাঁহার এই শোকে ভাঙ্গিয়া পড়িবার কথা। কিন্তু তাঁহার প্রাণের দেবতা ঈশ্বরই তাঁহার শোক হইতে রক্ষা করিলেন। শুধুই বিশ্বাসের শক্তিতে ও ঈশ্বরের প্রেমে এই ভক্তিমতী নারীর চিত্ত স্থির হইল। তিনি দিনের পর দিন ঈশ্বরের প্রেমে ডুবিয়া, সংসার ভুলিয়া যাইতে লাগিলেন। এখন ধ্যান, প্রার্থনা ও দুঃখীদের সেবাতেই তাঁহার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। এই সময়ে রাজমাতা সোফিয়া বধূকে আর ঘরে রাখিতে পারিলেন না। পুত্রশোকে তাঁহারও হৃদয় জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছিল। তিনি বধূকেই হৃদয়ের কাছে টানিয়া লইয়া একটুকু সান্ত্বনা লাভ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কারাগ্নিনী।

ঈশ্বর এলিজাবেথের জন্ত সংসারে আর কিছুই রাখিবেন না, তাঁহাকে রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির করিয়া সম্পূর্ণরূপে আপনার দাসী করিবেন, ইহাই যেন তাঁহার ইচ্ছা। তাই রাজা লুইয়ের ভ্রাতা হেনরীর ও রাজকর্ম্মচারিদিগের মন পাষাণে পরিণত হইল। এলিজাবেথ স্বামীকে আপনার মন্ত্রশক্তিতে ভুলাইয়া রাজকোষের সঞ্চিত অর্থ দরিদ্রদিগের সেবায় উড়াইয়া দিয়াছেন। তাঁহারা এই কথা বলিয়াই রাণীর বিরোধী হইয়া উঠিলেন। তাহার পর সকলেই কাপুরুষের মত বিধবা রাণীর প্রতি অত্যাচার করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরেই এই অত্যাচার চরম সীমায় গিয়া দাঁড়াইল। হেনরী বলপূর্ব্বক রাজসিংহাসন অধিকার করিলেন। তাহার পরই ভ্রাতৃবধূর উপর তাঁহার দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হইল। এলিজাবেথকে নিঃসম্বল অবস্থাতেই রাজপুরী ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। শুধু তাহাই নহে। রাজ্যের মধ্যে কেহ এলিজাবেথকে আশ্রয় দিলে, তাহাকেও কঠিন শাস্তিভোগ করিতে হইবে।

এই আদেশ প্রচারিত হইবার পরে, যমদূতের মত হেনরীর দুই জন অনুচর অসহায়া এলিজাবেথের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা বিধবা নারীকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিল—"রাণী এলিজাবেথ রাজা লুইকে বঞ্চনা করিয়া রাজ্যের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। আজ তাহার জন্তই রাজকোষ অর্থশূন্ত। এই অপরাধের কঠিন শাস্তি তাঁহাকে মাথা পাতিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহার সম্পত্তি সমস্তই রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। এখন এই মুহূর্ত্তেই বিধবা রাণীকে শূন্তহস্তে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে।"

রাজমাতা সোফিয়া অনুচরদিগের স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি এলিজাবেথকে আপনার বাহুর দ্বারা বেষ্টন করিয়া কহিলেন—"এ যে আমারই পুত্রবধূ, আমার কাছেই আছে; আমার নিকট হইতে কে ইহাকে কাড়িয়া লইবে? এমন সাহস কাহার?"

হেনরীর দুই অনুচর বৃদ্ধা রাণীর সম্মানের কথা একবার মনেও ভাবিল না। তাহারা পর্ব্বতের উপরিস্থিত প্রাসাদদুর্গ হইতে এলিজাবেথকে পর্ব্বতের নিম্নে লইয়া গেল। এলিজাবেথ দেখিলেন, সেখানে তাঁহার দুই পরিচারিকা ছেলেদের লইয়া ম্লানমুখে বসিয়া আছে। হায়, হেনরী আজ নির্ম্মম হইয়া পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রীদিগকে রাজপ্রাসাদ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন।

কয়েকদিন পূর্ব্বে এই রাণী এলিজাবেথই স্বামীর শোকে উন্মাদিনী হইয়াছিলেন; কিন্তু আজ এই দুর্দ্দিনে তাঁহার দুঃখ কোথায়? তাঁহার অশ্রুজল কোথায়? তাঁহার করুণ ও মধুর মুখখানি প্রশান্ত, নয়ন স্থির; তিনি ধীরভাবে এই অভাবনীয় ঘটনার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ত কোনই অপরাধ নাই, তাঁহার সন্তানেরা ত একেবারে নির্দ্দোষ; তবুও এমন অচিন্তনীয় ঘটনা কেন ঘটিল? নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে তাঁহার প্রেমের দেবতার গূঢ় অভিপ্রায়ই প্রচ্ছন্ন আছে। হেনরী আবার কে? সে ত উপলক্ষ্য মাত্র। পবিত্রহৃদয়া নারী হেনরীর উপর কোনরূপ দোষ প্রকাশ করিলেন না, তাঁহার কাহারো বিরুদ্ধেই কিছু বলিতে ইচ্ছা হইল না; তিনি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন—"আমার প্রভু, তুমি আমাকে শান্তি দান কর। আমি যেন তোমারই নামে এই দুঃখ বহন পারি।"

এলিজাবেথ তিনটি সন্তান লইয়া রাজপথে বাহির হইলেন। ছোট মেয়েটি তাঁহার কোলে। আর দুইটি সন্তান ধীরে ধীরে মাতার সঙ্গেই চলিতে লাগিল।

সংসারে মানুষের জীবনখেলা এই রকমই বিচিত্র। কাল হয় ত এই সময়ে এলিজাবেথ রাণীর সন্তানই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুবৃহৎ অট্টালিকার সুরম্য প্রকোষ্ঠে তাঁহার সন্তানদিগের শয়নের জন্য, দুগ্ধ-ফেন-নিভ-শুভ্র-শয্যা রচিত হইয়াছিল। কত দাস দাসী তাহাদের সেবা করিয়াছিল। আর আজ সেই রাজরাণী পথের কাঙ্গালিনী! আপনার আশ্রয় নাই, সন্তানদিগেরও মাথা রাখিবার একটু জায়গা নাই! রাণীর এই অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া একজন ধর্ম্মযাজক লিখিয়াছেন, তাবিয়া দেখিলে, একমাত্র ঈশ্বরই সত্য, তাঁহার করুণাই সম্বল. তিনিই আমাদের, আমরাই তাঁহার। মরণে আর কোন পদার্থকে সত্য বলিতে পারি না। কিই বা আমার চিরদিনের সম্বল? কেই বা আমাদের চিরদিনের আপনার?

দুরন্ত শীত। রাত্রিকাল। এলিজাবেথ শুধু হাতে দ্বারে দ্বারেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কে তাঁহাকে আশ্রয় দিবে? হেনরীর চর পুরিয়া বেড়াইতেছে। কেহ বিধবাকে আশ্রয় দান করিলেই সে কথা রাজপুরুষদের কাণে উঠিবে, রাজার তলোয়ার তাহার মাথায় পড়িবে।

এলিজাবেথ নিরুপায় হইয়া এক সরাইখানায় একটি সামন্ত লোকের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। তিনি বলিলেন—"সংসারের সমস্ত সহায় হইতেই আমি বঞ্চিত হইয়াছি, এখন প্রার্থনাই আমার একমাত্র সম্বল হইয়াছে।"

অসহায়া নারীর কথাগুলি কি মর্ম্মস্পর্শী! তনিয়া মানুষটির মন একেবারে গলিয়া গেল। একখানি ঘরে শকর থাকিত; লোকটি সেই ঘরখানি খালি করিয়া এলিজাবেথকে ছাড়িয়া দিল। বিপন্না জননী সন্তানদিগকে শীতের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সেই জঘন্য ঘরের মধ্যেই প্রবেশ করিলেন। ছেলেদের ক্লান্ত দেহ। তাহারা শুইয়াই ঘুমাইয়া পড়িল। এলিজাবেথের চোখে আর নিদ্রা কোথায়? তিনি ছেলেদের পাশে বসিয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন। এ দুঃখের রজনীতেও উপাসনার মধ্যদিয়া তাঁহার অন্তরে আনন্দ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

যখন অনেক রাত্রি, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, তখন একটি গির্জ্জার ঘণ্টা বাজিতে লাগিল। একদিন এলিজাবেথের ইচ্ছাতেই এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনিই মন্দির নির্ম্মাণের জন্য প্রচুর অর্থ দান করিয়াছিলেন। বিধবা নারী এখন সন্তানদিগকে লইয়া সেই গির্জ্জাঘরেই প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মর্ম্মস্থান ভেদ করিয়া প্রার্থনা উত্থিত হইল। সেই প্রাণস্পর্শী প্রার্থনাটি "এলিজাবেথ" গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"প্রভু, তোমার পবিত্র ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। কাল আমি রাজরাণী ছিলাম, আমার কত সহায় সম্পদ ছিল। আজ আমি পথের ভিখারিণী, কেহ আমাকে একটু আশ্রয় দিতেও প্রস্তুত নয়। আমার শক্তি সম্পদের দিনে যদি আমি আরো তোমার সেবা করিতাম, তাহা হইলে এখন আমার কত সুখই হইত। দুর্ভাগা আমার!"

ছেলেরা ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িয়াছিল তাহারা করিল—

"মা, আমাদের কিছু খাবার দেও।"

দুঃখিনী নারী কোথায় খাদ্যসামগ্রী পাইবেন? তিনি ছেলেদের জন্য প্রার্থনাই করিলেন। তখন আর কিছুই করিবার শক্তিও ছিল না, সুবিধাও হইল না। দুঃখের প্রথম রাত্রি এই ভাবেই কাটিয়া গেল। পরদিন সকাল বেলায় ক্ষুধার্ত শিশুরা বলিতে লাগিল—

"মা, এখানে কেন? আমরা বাড়ী যাইব। আমাদের রাজবাড়ীতে লইয়া চল।"

মা সন্তানদের কিছুই বলিতে পারিলেন না। তিনি দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিলেন; কিন্তু কে তাঁহাকে আশ্রয় দিবে? অবশেষে আশ্রমের ধর্মযাজকই সাহস করিয়া দুঃখিনী রাণীকে একটু স্থান দান করিলেন। এলিজাবেথের সঙ্গে টাকা কড়ি কিছুই ছিল না, কেবল দুই একখানি গহনা ছিল মাত্র। তিনি সেই গহনা বন্ধক দিয়াই খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করিলেন। তিনটি সন্তানও একটি পরিচারিকা খাদ্যসামগ্রী পাইয়া বড়ই খুসী হইল।

কিন্তু এ আশ্রমেও এলিজাবেথের থাকিবার সুবিধা হইল না। ধর্মযাজকেরা এ স্থান হইতেও তাঁহাকে তাড়াইয়া দিল। তিনি আর সন্তানদিগের দুঃখ সহিতে পারিলেন না; তাই তিনটি ছেলেমেয়েকেই দূর দেশের বন্ধুদিগের হস্তে অর্পণ করিলেন। তাহারা আশ্রয় লাভ করিল। এখন আর এলিজাবেথের তপস্যা ব্যতীত কিছুই করিবার রহিল না। তাই তিনি কৃচ্ছ্রসাধন আরম্ভ করিলেন। এক একদিন ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া ঈশ্বরের স্বরূপের মধ্যে আত্মহারা হইয়া যাইতেন। তাঁহার মর্মস্থান হইতে প্রার্থনা উত্থিত হইত—'হে আমার প্রিয়, এ কি! তুমি সম্পূর্ণরূপে আমার? আমি সম্পূর্ণরূপে তোমার? হে আমার ঈশ্বর, আমি যেন সমস্ত বস্তু অপেক্ষা তোমাকেই অধিক ভালবাসিতে পারি। আমার সমস্ত হৃদয় দিয়া, সমস্ত শক্তি দিয়া, সমস্ত দিয়া তোমাকেই ভালবাসিতে চাও।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সেবা।

এলিজাবেথের মামা একজন নৃপতি। ভাগিনেয়ীর দুঃখের কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি এলিজাবেথকে আপনার এলেকায় লইয়া আসিলেন। সেখানে একটি অট্টালিকায় বিধবা নারীর বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। সন্তানবৎসলা জননী আবার ছেলেমেয়েকে আপনার কাছেই লইয়া আসিলেন। তখন মামুল একদিন মমতাপূর্ণ হইয়া ভাগিনেয়ীকে কহিলেন—"এখন তোমার অল্প বয়স। তুমি নিরাশ্রয়। তাই কোন সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত তোমার বিবাহ ঠিক করিতে চাই। এই প্রস্তাবে তুমি প্রসন্নমনে সম্মত হও।"

সাধ্বী নারী মামুলের কথা শুনিয়া মোটেই সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি কহিলেন—"আমার স্বামী আমাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তিনি আমার অতিশয় বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন। আমি তাঁহার শক্তি, মান-সম্ভ্রম ও ধনসম্পদ সকলই সম্ভোগ করিয়াছি। কিন্তু আপনি জানেন, আমি তখনও এই সাংসারিক সুখ-ভোগকে অসার মনে করিতাম। এখন সংসার ত্যাগ করিয়া, ঈশ্বরের যাহা, আমি ঈশ্বরকেই তাহা অর্পণ করিতে চাই। সংসারের ভোগসুখে কেবল দুঃখযাতনা ও আত্মার মৃত্যুই আনয়ন করে। এজন্য আমার প্রভু ও পবিত্রাত্মার সহবাসেই আজীবন যাপন করিব, সঙ্কল্প করিয়াছি।"

এলিজাবেথের বাসস্থানের চতুর্দ্দিকের দৃশ্য অতিশয় মনোহর। কোথাও বা গগনস্পর্শী গিরিশৃঙ্গ রজতশুভ্র তুষাররাশিতে শোভা পাইতেছে, নির্ঝরিণী সঙ্গীত গাহিয়া বহিয়া যাইতেছে। কোথাও বা হ্রদের নিরুপম সৌন্দর্য্য সুশ্যামল শস্যক্ষেত্রের হরিদ্বর্ণ শোভা। কোন স্থানে কুসুমোদ্যানে তরু সকল পুষ্পপল্লবে ভূষিত হইয়া উঠিয়াছে, বায়ুহিল্লোলে কুসুমের সৌরভ ছড়াইয়া পড়িতেছে। এলিজাবেথ প্রকৃতির এই মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে অসীমসুন্দর সত্যপুরুষের রূপের মধ্যে ডুবিয়া যাইতেন; তাঁহার অন্তরে প্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। তিনি প্রায় প্রতিদিনই ছেলেমেয়েদের লইয়া ধরণীর

করিতে দেখিতে ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করিতেন।

এলিজাবেথের স্বামীর মৃত্যুর পরেও সংসারে একটু-খানি বন্ধন ছিল। এখন আর এই বিপুল বিশ্বে তাঁহার কোনই বন্ধন নাই, আসক্তি নাই, কোন কামনার লিপ্সাও নাই;—তিনি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিয়া "চির সতীত্ব" লাভ করিবার জন্য—অর্থাৎ ঈশ্বরকেই স্বামীরূপে বরণ করিয়া, আপনার সমস্ত তাঁহারই পাদপদ্মে অর্পণ করিবার নিমিত্ত উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইলেন।

আমরা পূর্ব্বেই রাজা দুইবের মৃত্যুর কথা লিখিয়াছি; কিন্তু তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার বিষয় কিছুই লিখি নাই। বিলেসেই তাঁহার সমাধি হইয়াছিল। কবরের মধ্যে তাঁহার দেহ প্রোথিত ছিল। এতদিন পরে ওল্ডামীর দিগুর সম্ভ্রান্ত লোক কবর হইতে রাজার দেহ-কঙ্কাল উত্তোলন করিয়া দেশে লইয়া আসিলেন। তাঁহারা রাজধানীতে যাইবার অগ্রেই শব লইয়া এলিজা-বেথের কাছে উপস্থিত হইলেন। নানা দেশের বড় বড় সম্ভ্রান্ত পরিবারের নাইট উপাধিধারী ব্যক্তিগণ এবং বীরপুরুষ ও সৈন্যগণ মৃতদেহের সঙ্গে সঙ্গেই বিধবা রাণীর সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। এলিজাবেথ কিয়ৎকাল স্বামীর শবাধারের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার প্রাণে শোক উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল তিনি কিছুতেই অশ্রুজল রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলেন না। নাইট উপাধিধারী বড় বড় লোকেরা রাণীকে সান্ত্বনা দান করিতে লাগিলেন। তাহার পর রাজার দেহ উপাসনামন্দিরে লইয়া যাওয়া হইল এবং শবাধার খোলা হইল। রাজার দেহ-কঙ্কালের দিকে চাহিয়া সকলেই অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এলিজাবেথ প্রথমে রোদন করিলেন; তৎপরে তাঁহার আত্মা ঈশ্বরের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গেল। তিনি নীরবে ঈশ্বরের আবির্ভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। অবশেষে বিধবা নারী ঈশ্বরকে "মহারাজ" সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—"তুমিই আমার স্বামীকে অনন্ত শান্তিরাজ্যে লইয়া গিয়াছ, তোমাকে ধন্যবাদ করি।"

রাজার মৃতদেহের কয়েকদিন এলিজাবেথের কাছেই রাখা হইল। প্রতিদিনই গভীর ভাবে উপাসনা হইত। বিশ্বাসী উপাসকগণ ঈশ্বরের আবির্ভাবের মধ্যে বাস করিয়া পরকালের অস্তিত্ব অনুভব করিলেন। এই সময়ে হেনরীর অত্যাচারের কথা নানা স্থানের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের ও তেজস্বী বীরদিগের কর্ণে প্রবেশ করিল। তাঁহারা উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। এলিজাবেথ নানা কথা বলিয়া তাহাদিগকে শান্ত করিলেন।

সম্ভ্রান্ত লোকেরা শব লইয়া রাজধানীতে গমন করিলেন। রাজার সঙ্গে যে সকল সৈন্য ও সেনাপতি ধর্ম্ম-যুদ্ধের জন্য পূর্ব্বদেশে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া প্রভুর মৃতদেহের সঙ্গে সঙ্গেই রাজবাটীর প্রাসাদদুর্গে উপনীত হইলেন। হেনরী সিংহাসন অধিকার করিয়া এলিজাবেথের প্রতি যে অত্যাচার ও দুর্ব্যবহার করিয়াছেন, সেজন্য তাঁহারা মর্ম্মাহত হইয়াছেন। এখন রাজপ্রাসাদের দিকে চাহিয়া ও হেনরীকে দর্শন করিয়া দুঃখে, শোকে, ঘৃণায় ও ক্রোধে তাঁহাদের চিত্ত অধীর হইয়া উঠিল। তাঁহারা হেনরীর দুষ্কার্য্যের প্রতিকারের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহার অন্যায়াচরণের তীব্র প্রতিবাদের নিমিত্ত একটি দিন স্থির হইল। সেদিন চারিজন বীরপুরুষ সকল সৈন্যের প্রতিনিধি হইয়া হেনরীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তাহাদের মধ্যে সাহসী ও নির্ভীকচিত্ত লর্ড ভেরিলা গম্ভীর স্বরে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম "এলিজাবেথ" গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"মহারাজ, এই রাজ্যের একদল যোদ্ধার অনুরোধেই অদ্য আমাকে আপনার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে হইল। তাঁহাদের বক্তব্য প্রকাশ করিবার ভার আমার উপরেই অর্পিত হইয়াছে। আমিই আপনার নিকট তাঁহাদের নিবেদন জ্ঞাপন করিব। আমরা আপনার বিরুদ্ধে কত-গুলি গুরুতর দোষের কথা শুনিতে পাইয়া দুঃখে ও ক্রোধে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছি। একজন রাজা যথার্থই কি এইরূপ অধর্ম্ম ও বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে অপ-রাধী হইতে পারেন? আপনি কোন্ লোকের কুপরামর্শে এই অন্যায় কার্য্য করিতে সাহসী হইয়াছেন? একজন

সুপ্রসিদ্ধ রাজার কন্যা, আপনার ভ্রাতৃবধূ—তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ও তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করাই কি আপনার কর্ত্তব্য নয়? তাহা না করিয়া, পতিতা স্ত্রীলোকের মত তাঁহার অপমান করিয়া, আপনি তাঁহাকে রাজপ্রাসাদ হইতে তাড়াইয়া দিলেন? আজ সেই বিধবা নারীর গৃহ নাই, অর্থ নাই, মানমর্য্যাদা নাই, তিনি পথের ভিখারিণী। আপনার যে ভ্রাতা ঈশ্বরের কার্য্যের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন, আপনিই না তাঁহার অনাথ শিশুসন্তানদিগের অভিভাবক? তাহাদিগকে প্রতিপালন করা ত দূরের কথা, আপনি সেই অসহায় শিশুদিগকে রাজপ্রাসাদ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। আপনি কি আপনার পুণ্যবান ভ্রাতার নিকট এই শিক্ষাই লাভ করিয়াছেন? আপনার ভ্রাতা তাঁহার অতি দরিদ্র, অতি হীন প্রজার প্রতিও এরূপ নিষ্ঠুরাচরণ করিতেন না। আমরা ভবিষ্যতে আপনার কর্ত্তব্যজ্ঞান ও বিশ্বস্ততাতে কিরূপে আস্থা স্থাপন করিব? আপনি ত একজন যোদ্ধা; বিধবা ও অনাথদিগকে রক্ষা করাই যোদ্ধার ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া আপনার ভ্রাতৃবধূ ও ভ্রাতার শিশুসন্তানদিগের প্রতি কি না অত্যাচার করিয়াছেন? আপনার এই আচরণ অধর্ম্ম নয়? প্রতিহিংসার ঘোপা নয়?"

তাবোজ্ঞানে লর্ড হেরিলার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। রাজমাতা সোফিয়া দুঃখে ও শোকে কাঁদিতে লাগিলেন। হেনরীর রাজমুকুটশোভিত মস্তক লজ্জায় নত হইয়া পড়িল। লর্ড হেরিলা আবার অগ্নিময়ী ভাষায় বলিতে আরম্ভ করিলেন—"একজন অসহায়া, বন্ধু ও সহায়হীনা বিধবার নিকট হইতে আপনি কি আশঙ্কা করিতেছিলেন? সেই পুণ্যশীলা নারী এই দেশের রাজপ্রাসাদের কর্ত্রী হইলেই বা আপনার কি অমিষ্ট হইত? এখন বিদেশের লোকেরা আমাদিগকে কি ধিক্কার দিবে না? আপনি কি বুঝিতে পারিতেছেন না যে, আপনি ঈশ্বরের বিরাগভাজন হইয়াছেন? আপনি কি দেশ ও আপনার গৌরবান্বিত বংশের উপর কলঙ্ক অর্পণ করেন নাই? আপনি যদি ঈশ্বরের কাছে অনুতপ্ত না হন, আপনার ভ্রাতৃবধূর সহিত যদি সদ্ভাব সংস্থাপন না করেন, আপনার ভ্রাতার সন্তানদিগকে তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য ফিরাইয়া না দেন, তবে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের ক্রোধ এই দেশের উপর পতিত হইবে।"

লর্ড হেরিলার এই একটি কথা যেন আগ্নেয়গিরির অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত হেনরীর হৃদয়ের উপর গিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি আর সুস্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। ভয়ে, অনুতাপে, লজ্জায় ও দুঃখে অধীর হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তৎপরে বলিতে লাগিলেন—"আমার অপরাধের জন্য আমি যথার্থই অনুতপ্ত হইয়াছি। আর কখনই কাহারো কুপরামর্শে কর্ণপাত করিব না। আপনারা আমাকে বন্ধুর মত বিশ্বাস করুন। আমার ভ্রাতৃবধূ রাজ্য সম্পদ যাহা চাহিবেন, তাহাই তাঁহাকে অর্পণ করিব। তবে আপনাদের কাছে একটি কথা বলা আবশ্যক। আমার ভ্রাতৃবধূকে সমস্ত দেশের অধিকার দান করিলেও, তিনি তাহা সমস্তই ঈশ্বরের সেবায় অর্পণ করিবেন।"

লর্ড হেরিলা কহিলেন—"ঈশ্বরের ক্রোধ হইতে রক্ষা পাওয়ার উহাই একমাত্র উপায়।"

হেনরী কয়েকজন সৈন্যকে এলিজাবেথের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা বিধবা রাণীর কাছে উপস্থিত হইয়া কহিল—"আপনি রাজ্যের কোন্ অধিকার পাইলে, রাজা হেনরীর সঙ্গে বিবাদ নিষ্পত্তি করিবেন?"

এলিজাবেথ কহিলেন—"বৃহৎ অট্টালিকা, ধনরত্ন, রাণীর অধিকার—এ সকল কিছু চাহি না। উহাতে আমার চিত্ত চঞ্চল হইবে। আমি ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারিব না।"

সৈন্যগণ হতাশ হইয়া হেনরীর নিকট ফিরিয়া গেল, কিন্তু হেনরী তাহার ভ্রাতৃবধূকে মোটেই চিনিতে পারেন নাই। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এলিজাবেথের অন্তরে বৈর-নির্য্যাতনস্পৃহাই বলবতী হইয়া উঠিয়াছে। তাই হেনরী কতকটা ভয়ে, কতকটা অনুতাপের জ্বালায়, সুস্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি জননী সোফিয়া ও ছোট ভাই ফর্ণরাধকে সঙ্গে লইয়া এলিজাবেথের কাছে উপস্থিত হইলেন এবং বিনীতভাবে কহিলেন—"আমাকে মার্জ্জনা

একদিন আমি আমার সমস্ত ধনরত্নের জন্য প্রাণ-ত্যাগ করিতে সম্মত আছি।"

সরলা ও প্রীতিময়ী এলিজাবেথের প্রাণে স্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি হেনরীর গলা জড়াইয়া ধরিলেন। ভাবোচ্ছ্বাসে তাঁহার মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না। এলিজাবেথ শুধুই কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রাণের প্রেম ও স্বর্গীয় ক্ষমার ভাব দর্শন করিয়া, লোকের আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সকলেই ভাবিতে লাগিল—

"এলিজাবেথ মানবী না দেবী?"

এইবার দেবীর প্রেমে যথার্থই পাষাণ গলিয়া গেল, মরুভূমির মধ্যে প্রীতির উৎস উৎসারিত হইল, হিংসা বিদ্বেষ সকলই ভাসিয়া চলিল। হেনরী ভ্রাতৃবধূর ব্যবহারে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তিনিও বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন। রাজমাতা দেখিয়া বধূর চোখের জলের সহিত আপনার চোখের জল মিশাইয়া দিলেন। এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিয়া বীর-পুরুষ যোদ্ধগণও চোখের জল থামাইতে পারিলেন না। আজ নয়নের জলের ভিতর দিয়াই সকলের সঙ্গে মিলন হইয়া গেল। এলিজাবেথের শাশুড়ীর, দেবরের ও স্বামীর অনুগত সৈন্যদিগের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া ওয়ার্টবার্গের রাজপ্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি ছেলেমেয়েদিগকে লইয়া সেই অট্টালিকায় বাস করিবেন, ইহাই স্থির হইল। এলিজাবেথ রাণী হইয়া যে সকল অধিকার পাইয়াছিলেন, তাঁহাকে সেই সমস্ত অধিকারই দেওয়া হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রেমে পাগলিনী।

এলিজাবেথ পুনর্ব্বার রাজপুরীর সুরম্য হর্ম্ম্যতলে বাস করিতেছেন। তাঁহার সন্তানেরা পিতৃগৃহেই ফিরিয়া আসিয়াছে। আবার তাহাদের জন্য নানা রকম সুখের আয়োজন হইতেছে। এই সময়ে হেনরী ভ্রাতৃবধূকে রাজবাড়ীর প্রত্যাবর্ত্তনোৎসবে ও নৃত্যগীতে মাতাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাঁহার বিফল প্রয়াস! যে নারীর প্রাণ স্বয়ং ঈশ্বরই আনন্দের কণিকা দান করিয়াছেন কে তাঁহাকে অসার আমোদ-প্রমোদে মুগ্ধ করিয়া রাখিবে? এলিজাবেথ এখন আর কোনরূপ ক্রীড়া-কৌতুকে যোগদান করিতেন না। নাচগানের আসরেও যাইতেন না। তিনি তাঁহার প্রেমের দেবতা ঈশ্বরের ধ্যানে ডুবিয়া থাকিতেন। তাঁহার হৃদয় আনন্দে ও অমৃতে পূর্ণ হইয়া উঠিত। তদ্ভিন্ন দয়াময়ী নারী দরিদ্রকে অর্থ, ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দান করিতেন; তাঁহার দুখানি হাত পীড়িত লোকদিগের সেবাতেই নিযুক্ত থাকিত।

কিন্তু এত করিয়াই বা তাঁহার তৃপ্তি কোথায়? সংসারের শত শত ধার্ম্মিক লোক যেরূপ ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে পারিলে, জন্ম সার্থক মনে করেন, এলিজাবেথ সেইরূপ ধর্ম্মজীবন ত লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তবুও তাঁহার প্রেমের দেবতা তাঁহাকে সন্তুষ্ট হইতে দিলেন না। তিনি চাহেন, তাঁহার দাসী এলিজাবেথ প্রেমে পাগলিনী হইয়া আপনার সর্ব্বস্ব তাঁহারই চরণে ঢালিয়া দিবেন। তাই তিনি প্রেমের বীণা বাজাইয়া এলিজাবেথকে আপনার দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কাজেই এলিজাবেথের মন আর ধৈর্য্য মানিল না, কোন তপস্যা, জীবনের কোন অবস্থা, ব্রতের কোন কার্য্যই তাঁহার মনের মত হইল না। তিনি প্রেমে পাগলিনী হইয়া গৃহ হইতে বাহির হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। রাজপ্রাসাদের ধনরত্ন, শাশুড়ী দেবরের স্নেহ, আর তাঁহাকে রাজপুরীতে আকর্ষণ করিয়া রাখিতে পারিল না। তিনি সন্ন্যাসিনীর মত নির্জ্জনে ধ্যান ও প্রার্থনা করিবেন, আপনার রক্ত, মাংস, দেহের অণু-পরমাণু, আত্মার সমস্ত শক্তি, প্রাণের সমস্ত প্রেম—ঈশ্বরকেই অর্পণ করিবেন;—পীড়িত লোক-দিগের সেবায় আপনাকে তিল তিল করিয়া বিলাইয়া দিবেন; সেই জন্য তিনি আর ঐশ্বর্য্যপূর্ণ রাজপুরীতে থাকিতে চাহিলেন না। বিজয়ী লোকেরা রাণীর এই মতিগতি দেখিয়া বলিতে লাগিলেন—

"রাণী পাগল হইয়া গিয়াছেন।"

এলিজাবেথ রাজবাড়ী হইতে রুটি, মাংস, মিষ্টান্ন ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী লইয়া প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া

দরবারের কুটীরে গমন করিতেন; তখন অনেক দুঃখী ও রোগাক তাঁহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিত—

"রাণী পাগল—একেবারে পাগল হইয়া গিয়াছেন।"

এই সকল কথা শুনিয়া এলিজাবেথের একটুও কষ্ট হইত না। এখন তাঁহার মুখে সর্ব্বদাই একটি আনন্দের জ্যোতি প্রস্ফুটিত হইয়া থাকিত।

কিছুদিন পরেই স্থির হইল, এলিজাবেথ মারবার্গ সহরের একটি নির্জ্জন ও মনোরম স্থানে গমন করিয়া চিরদিন সেইখানেই বাস করিবেন। সেই জায়গায় তাঁহার তপস্যা ও সেবা দুয়েরই সুবিধা হইবে। এলিজাবেথ যে দিন রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন, সেদিন তাঁহার অন্তরে যেন ভাবের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল। তিনি হৃদয়ের আবেগে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। প্রেমময়ী নারী সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিবার সময়ে বলিলেন—

"আপনারা আমাকে ভালবাসিয়াছেন—আমাকে দয়া করিয়াছেন। আমার প্রতি এই দয়া কেন? আমি কি এই করুণার যোগ্যপাত্রী? বলুন ত আমি আপনাদের জন্য কি করিয়াছি? আজ সকলে আমাকে ক্ষমা করুন, আমার জন্য প্রার্থনা করুন; আমাকে প্রফুল্লমনে বিদায় দিন। আপনাদের প্রার্থনায় ও প্রভু পরমেশ্বরের করুণায় আমার সর্ব্বস্ব যেন তাঁহাকেই সমর্পণ করিতে পারি। তাঁহার সেবাতেই যেন এ দেহের রক্ত, মাংস সকলই অর্পিত হয়।"

এলিজাবেথ রাজপুরী ত্যাগ করিয়া মারবার্গ সহরে উপস্থিত হইলেন। ঐ সহরের সমস্ত অধিকার তাঁহাকেই অর্পণ করা হইয়াছে। সে জায়গার সকল পুরুষ ও নারী তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। কিন্তু এ রকম অভ্যর্থনা ও জনকোলাহল এলিজাবেথের মোটেই ভাল লাগিল না। তিনি সহরের তিন মাইল দূরে একটি নির্জ্জন স্থানে গমন করিলেন। সেখানে নানা জাতীয় বৃক্ষলতার ভিতর ক্ষুদ্র একখানি কুটীর ছিল। কুটীরের ছাদটি তৃণ; তবে তরুশাখায় ও সবুজপত্রে আচ্ছাদিত বটে।

এলিজাবেথ এই নির্জ্জন-কুটীরেই বাস করিয়া প্রভু ঈশ্বরের তপস্যা ও দুঃখীর সেবা করিতে লাগিলেন। তিনি স্বহস্তেই রন্ধন করিতেন। নিজে সামান্য কিছু আহার করিয়া, প্রচুর খাদ্য দরিদ্রদিগকে বিলাইয়া দিতেন। কিছুদিন পরে তাঁহার কুটীরের নিকটে একটি কাষ্ঠের গৃহ নির্ম্মিত হইল। সেই গৃহে তপস্বিনীর ছেলেমেয়েরা বাস করিতে লাগিলেন।

এলিজাবেথের অপূর্ব্ব জীবনের কাহিনী এখন প্রায় সকলেই জানিতে পারিয়াছেন। রোমের পোপ নবম গ্রেগরি তাঁহাকে উত্তমরূপেই জানিতেন। তিনি রীতিমত সন্ন্যাসিনী হন, ইহাই পোপের একান্ত ইচ্ছা। সেজন্য পোপ স্বয়ংই এলিজাবেথের নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করিলেন। এলিজাবেথ ত সন্ন্যাসিনীদের চেয়েও অধিক ক্লেশ সহ্য করিয়া কৃচ্ছ্রসাধন করেন, তাঁহার আত্মা ঈশ্বরের আবির্ভাবের মধ্যেই বাস করে, তাঁহার পক্ষে সন্ন্যাসিনী হওয়া ত কিছুই কঠিন কার্য্য নহে। কিন্তু এলিজাবেথের চির-হিতৈষী ধর্ম্মাচার্য্য কনরাড বলিলেন—"আপনার সন্ন্যাসিনী হইবার কোনই প্রয়োজন নাই। যে সকল অর্থসম্পদ আছে, আপনি তাহাই বা কেন ত্যাগ করিবেন? উহা ত ঈশ্বরের নামেই উৎসর্গ করিয়াছেন। ঐ সকল অর্থসম্পদের দ্বারা দীন-দুঃখিদের অভাব মোচন করুন।"

তপস্বিনী ধার্ম্মিক কনরাডের সুপরামর্শ কখনই অগ্রাহ্য করিতেন না, এখনো করিলেন না। তিনি বাহিরের একটা অনুষ্ঠান করিয়া সন্ন্যাসিনী হইলেন না বটে; কিন্তু অন্তরে সন্ন্যাসিনীর ব্রতই গ্রহণ করিলেন। সাধিকা নারী একদিন উপাসনা-মন্দিরের বেদীতে হস্ত রাখিয়া পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য্যই ত্যাগ করিলেন। এখন তাঁহার অর্থসম্পদ সকলই ঈশ্বরের হইয়া গেল, তাঁহার নিজের আর কিছুই রহিল না। তিনি আপনার বিষয় সম্পদের একটি পয়সাও স্পর্শ করিতেন না। তাঁহার সমস্ত অর্থই ঈশ্বরের কার্য্যে অর্থাৎ দুঃখীদিগের সেবায় ব্যয় হইতে লাগিল। রাণী স্বহস্তেই উলের সূতা কাটিতেন, সেই সূতা বিক্রয় করিয়া কিছু টাকা পাইতেন, সেই টাকাতেই তাঁহার জীবনির্ব্বাহ হইত। তিনি

ভবে জিনিষটি খাইতেন না, ভাল পোষাকটি পরিতেন না; অতি অল্প দামের জামা গায় দিতেন; কেহ ঘরের বাহিরে গিয়াই হয় ত দেখিতে পাইতেন, একটি গরীব লোক ভয়ঙ্কর শীতে অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছে। দয়াময়ী রাণী তৎক্ষণাৎ গায়ের জামাটি দরিদ্রকে বিলাইয়া দিতেন; নিজে গৃহে আসিয়া আগুনের উত্তাপে শীত নিবারণ করিতেন।

এতদিন তাঁহার পুত্রকন্যা কাছেই ছিলেন, এখন আর তাঁহাদিগকে কাছে রাখিতে পারিলেন না। তাঁহাদের ভুবারশুভ্র সুকুমার মূর্ত্তি দর্শন করিলেই মাতৃ-হৃদয়ে স্নেহ উদ্বেলিত হইয়া উঠিত। তাঁহারা দূরে চলিয়া যাওয়াতে, রাণীর অন্তরে কোন প্রকার আসক্তিই রহিল না। এখন এই বিপুল বিশ্বে একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন, তাঁহার আর কেহই নাই—কিছুই নাই। তাপসী নারী প্রথম জীবনে প্রেমে অধীর হইয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

"হে আমার আত্মার প্রিয়তম স্বামী, আমি তোমাকেই ভালবাসিব। আর কোন জিনিষকে ভাল বাসিতে দেও না। যে সকল সামগ্রী আমাকে তোমার দিকে লইয়া যাইবে না, তাহা আমাকে বেদনা দিউক, আমার পক্ষে বিষাক্ত হউক। একমাত্র তোমার ইচ্ছাই আমার পক্ষে সুমিষ্ট হউক। সর্ব্বদা তোমার ইচ্ছাই যেন আমার ইচ্ছা হয়। যেমন [illegible] সকল বস্তু প্রিয়তমের হস্তেই অর্পণ করিতে চায়; তেমন আমার জন্য কিছু না রাখিয়া আমার সমস্ত সামগ্রী, আমার সমগ্র আত্মা সম্পূর্ণরূপে তোমাকেই অর্পণ করিতে চাই। আমি ঐশ্বর্য্যলাভের আকাঙ্ক্ষা একেবারে হৃদয় হইতে দূর করিতেছি। আমার যদি অনেক জগৎ থাকিত, আমি সমস্তই ত্যাগ করিয়া আমার দৈন্য ও দারিদ্র্য লইয়া তোমাতেই ডুবিয়া থাকিতাম। হে আমার হৃদয়ের স্বামী, তোমার প্রতি আমার প্রেম এতই বেশি, যে সে প্রেমের জন্য আমি দারিদ্র্যব্রতকে পবিত্র মনে করি। আমার যাহা কিছু, তাহা তোমার জন্যই ত্যাগ করিতেছি; আমি যেন তোমাতেই রূপান্তরিত হইতে পারি।"

এলিজাবেথ যে অন্তরের এই উচ্চ প্রার্থনা এতদিন পরে আজ পূর্ণ হইল, তিনি যথার্থই ঈশ্বরের প্রেমে রূপান্তরিত হইয়া গেলেন। তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইত, যেন স্বর্গই নরদেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়াছে। এই সময়ে ধর্ম্মাচার্য্য কনরাড মারবার্গেই বাস করিতেন। তিনি বলিয়াছেন, "এলিজাবেথ নিভৃতে ঈশ্বরের সঙ্গে বাস করিতেন। তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইত। তাহার পর তিনি যখন আমাদের সম্মুখে আসিতেন, তখন তাঁহার অনুপম মূর্ত্তি হইতে জ্যোতি নির্গত হইত।"

এই সময়ে সাধিকা নারী সমাধিতে মগ্ন হইয়া থাকিতেন। তাঁহার সমাধির অবস্থায় যে সকল ব্যাপার ঘটিত, তদ্বিষয়ে একটি ঘটনা বিবৃত করিব। একদিন এলিজাবেথ প্রার্থনা করিতে বসিয়া, ঈশ্বরের চিন্তা করিতে করিতে ধ্যানে আত্মহারা হইয়া গেলেন। তখন কন্যার আগুনে তাঁহার কাপড় পুড়িতে লাগিল। তিনি কিছুই জানিতে পারিলেন না। কিন্তু বাহিরের লোকেরা কাপড় পুড়িতেছে দেখিয়া তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিল এবং আগুন নিবাইয়া দিল। তখন তাপসী নারী চোখ মেলিয়া ব্যাপারটা যে কি, তাহা বুঝিতে পারিলেন।

এলিজাবেথ একটি হাসপাতাল খুলিয়াছিলেন। সেখানকার রোগীর সেবাতেই তাঁহার অনেক সময় কাটিয়া যাইত। পীড়িত লোকেরা তাঁহার মধুর স্নেহে মুগ্ধ হইত, তাঁহাকে জননী বলিয়া মনে করিত। তিনি বিস্তর কুষ্ঠ রোগীর সেবা করিতেন। মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার মনে ঘৃণা অথবা ঘৃণার উদ্রেক হইত না। একবার একটি অল্পবয়স্ক বালকের কুষ্ঠরোগ জন্মিল। তাহার আত্মীয় স্বজন তাহাকে ত্যাগ করিল। এলিজাবেথ তাহার কাতর মুখখানি দেখিয়া, মাতার ন্যায় স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি আর তাহাকে হাসপাতালে রাখিতে পারিলেন না, তাহাকে নিজের গৃহে রাখিয়াই, তাহার সেবা করিতে আরম্ভ করিলেন। এলিজাবেথের জীবনে এই সকল ঘটনা অঙ্কন করিয়া মনে হয়, ঈশ্বর যেন নবনীর কোমলতা, কুসুমের

পবিত্রতা ও শিশুর সরলতা দ্বারা তাঁহার হৃদয়টি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। "এলিজাবেথ" গ্রন্থ-প্রণেত্রী এক পুণ্যশ্লোকা নারীর সেবা ও সাধন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন।—

"তিনি সমস্ত দিন মানবের সেবার ভিতর দিয়া প্রভুর পূজা করিতেন। রাত্রিতে শ্রান্তি ক্লান্তি অগ্রাহ্য করিয়া স্বীয় প্রভুর পদতলে নতজানু হইয়া, ঘণ্টার পর ঘণ্টা উপাসনায় কাটাইয়া দিতেন; তাঁহার প্রসাদ ও দয়া লাভের জন্য প্রার্থনা করিতেন।"

এলিজাবেথের আশ্চর্য্য জীবন দেখিয়া, বিস্তর লোক তাঁহাকে দেবীর মত ভক্তি করিত। অনেক পুরুষ ও রমণী তাঁহাকে দেখিবার জন্য ভিড় করিয়া দাঁড়াইত। তাপসী নারীর সান্ত্বনাবাক্যে বহু লোকের জ্বালাময় হৃদয় জুড়াইয়া যাইত। কোন পাপী পাপযন্ত্রণায় কাতর হইয়া এলিজাবেথের কাছে উপস্থিত হইলে, তাঁহার অন্তরে করুণা উচ্ছলিত হইয়া উঠিত। কারণ মানুষের পাপের চেয়ে আর যে কোন রকম ভয়ানক দুঃখ আছে, বা হইতে পারে, তাহা তিনি মনে করিতেই পারিতেন না। তাই তিনি পাপভারাক্রান্ত লোকের জন্য কাতর-স্বরে প্রার্থনা করিতেন। সেই প্রার্থনার মধ্য দিয়াই যেন পাপীর হৃদয়ে আলোক ও শক্তি নামিয়া আসিত এবং মন পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত।

এলিজাবেথ যখন কুটীরে ভিখারিণীর মত বাস করিতেছিলেন, তখন তাঁহার পিতৃরাজ্যের দূত কাউণ্ট বেনি আসিয়া হেনরীকে কহিলেন—"আমরা শুনিতেছি, আমাদের রাজকন্যা দুঃখিনীর ন্যায় দিন যাপন করিতেছে। ইহার কারণ কি?"

হেনরী কহিলেন—"আমার ভ্রাতৃবধূ এখন পাগলিনী। আপনি তাঁহার কাছে গমন করুন এবং তাঁহাকে গিয়া দেখুন, তাহা হইলে আমার কথার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারিবেন।"

রাজদূত মাল্টবর্গ সহরে উপস্থিত হইয়া, একটি লোকের নিকট তাঁহাদের রাজকন্যার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। লোকটি বলিল—"তিনি ত মানুষ নহেন, স্বর্গের দূত।' আমাদের আত্মার কল্যাণের জন্যই এখানে আসিয়াছেন।"

কাউণ্ট বেনি যখন এলিজাবেথের কাছে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার অঙ্গে সামান্যবস্ত্র, তিনি সূতা কাটিতে ব্যস্ত। দূত তাঁহার প্রভুর কন্যার এই অবস্থা দেখিয়া দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। তিনি বলিলেন—"কে আপনাকে পথের ভিখারিণী করিয়াছে?" এলিজাবেথ কহিলেন—"কোন মানুষ ত আমার কিছুই করে নাই। প্রভু পরমেশ্বরের ভক্তই আজ আমার এই অবস্থা।"

দূত তাঁহাদের রাজকন্যাকে পিতৃরাজ্যে লইয়া যাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু চেষ্টায় কোনই ফল হইল না। তিনি ঈশ্বরের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাকে ভুলাইয়া, মায়ার ফাঁদে জড়াইয়া, আর কি সংসারে ফিরানো যায়?

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পরলোক-যাত্রা।

১২৩১ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাস। এলিজাবেথের জ্বর হইয়াছে। তিনি শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। এই অবস্থায় নিশাকালে একটি উজ্জ্বল আলোক তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইল। তিনি শুনিতে পাইলেন, তাঁহার জীবনদেবতা সুমিষ্টস্বরে বলিতেছেন—"প্রিয় এলিজাবেথ, তুমি এস। তোমার জন্য নিত্যনিবাস প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। সেখানে তোমাকে লইয়া যাইব।"

এলিজাবেথ বুঝিতে পারিলেন, এইবার তাঁহার জীবনলীলা শেষ হইয়া যাইবে। তিনি প্রভুর আহ্বানে তাঁহার চির-বাঞ্ছিত-রাজ্যে চলিয়া যাইবেন। আলোকে পুলকে তপস্বিনীর হৃদয় ভরিয়া উঠিল। তিনি হর্ষোৎফুল্ল মুখে পরলোক-যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। শরীরের যন্ত্রণায় কিছুতেই তাঁহার আনন্দ হ্রাস করিতে পারিল না।

এলিজাবেথ মৃত্যুর পূর্ব্বে বন্ধু-বান্ধব ও দীনদুঃখী, রুগ্নভগ্ন সকল শ্রেণীর লোকের নিকটই একে একে বিদায় গ্রহণ করিলেন। এখন তিনি শান্ত-সমাহিত হইয়া জীবনের অবশিষ্ট সময়টুকু ঈশ্বরের সঙ্গেই বাস করিবেন। পাছে বা তাঁহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়, এজন্য

১৮ শোক দূরে চলিয়া গেল। একজন ধর্মযাজক [illegible]কে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার সম্পত্তির ব্যবস্থা করিবেন।"

এলিজাবেথ বলিলেন—"আমার যে কিছু পার্থিব [illegible]ছি, তাহা ত ঈশ্বরের চরণেই উৎসর্গ করিয়াছি। [illegible]ক দিন হইতেই উহা পরিষদের সম্পত্তি হইয়াছে। তাহাদিগকে সমস্তই অর্পণ করিবেন। প্রভু যিশুখ্রীষ্ট [illegible]তীত আমার অন্য কেহই উত্তরাধিকারী নাই।"

এলিজাবেথের সহসা মনে হইল, যেন স্বর্গীয় সঙ্গীতে গৃহ পরিপূর্ণ। স্বর্গের দূতেরাই যেন তাঁহার [illegible]নার জন্য আনন্দ-সঙ্গীত গাহিতেছেন। তিনি এক একবার উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাহার পরেই কণ্ঠ নীরব হইল। তখন অনেকে কাঁদিতে [illegible]লেন। এলিজাবেথ কহিলেন—

"চুপ কর, চুপ কর, আমার কর্ণে স্বর্গের সঙ্গীত আসিয়া পৌঁছিতেছে। তোমরা কোলাহল করিও না।"

১৯ শে নবেম্বর রাত্রিকালে তপস্বিনী এলিজাবেথ পরলোক-যাত্রা করিলেন। সমাধির জন্য মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া যাইবার সময় যাজকগণ ধর্মসঙ্গীত গাহিতে লাগিলেন। কিন্তু শত শত দীনদুঃখীর ক্রন্দনের মধ্যে সেই সঙ্গীত বিলীন হইয়া গেল।

এলিজাবেথের প্রতি যাঁহাদের অতিশয় ভক্তি ছিল, অত্যন্ত ভালবাসা ছিল, তাঁহারা পুণ্যশীলা নারীর মৃত্যুর পরে তাঁহার মুখে বসিয়া অনুভব করিতে লাগিলেন, যেন সেই তপস্বিনী নারীর জীবনকুসুমের সৌরভে [illegible]ন্দর পরিপূর্ণ; যেন এখনো তিনি গাহিতেছেন—

আমার প্রভুর তরে,
রাজ্য ও সৌরব মোর,
ত্যাগ করিয়াছি ভবে তুচ্ছ ও অসার।
আমি তাঁরে দেখিয়াছি,
তাঁরে ভাল বাসিয়াছি,
বিশ্বাস করেছি তিনি সর্বস্ব আমার।"

(ঈষৎ পরিবর্তিত অমৃতলাল গুপ্ত প্রণীত "তাপসী" হইতে গৃহীত)

* হেক্কারেথ এলিজাবেথের ঘটনার ইংরেজী "সাধু চরিত" ৫ম খণ্ড দেখিয়া জানা যায়, এলিজাবেথের মৃত্যুর তারি বৎসর পরে, রোমের পোপ তাঁহাকে "সেণ্ট" বলিয়া ঘোষণা করেন। ১৩৩৬ সালে এলিজাবেথের সমাধি স্থানে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। সম্রাট্ দ্বিতীয় ফ্রেডারিক স্বয়ং তাঁহার সমাধির উপরে একটি মহামূল্য স্বর্ণমুকুট স্থাপন করেন। ঐ সময়ে এলিজাবেথের পুত্র রাজকুমার হারমেন, কন্যা সোফিয়া ও জামাতৃগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। কবিয়া কন্যা জননীর পুণ্যস্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া সন্ন্যাসিনী হইয়াছিলেন।

সুপ্রিয়া

শাস্তা (বুদ্ধদেব) তখন জেতবন বিহারে বাস করিতেছিলেন।

সে বৎসর শ্রাবস্তীর ন্যায় ধন-জন-পরিপূর্ণ সমৃদ্ধশালী সহরের অধিবাসীগণ অন্নহীন, দুর্ভিক্ষের করাল কবলে কবলিত। শস্যক্ষেত্র শস্যহীন; দেশবাসিগণ রোগজীর্ণ, কঙ্কালময়।

অর্থহীন অনাথ ক্ষুধিতের করুণ ক্রন্দন ধনীর উচ্চ-শির সৌধরাশি বিদীর্ণ করিয়া অনন্ত বায়ুস্তরে লীনমান। কেহই তাহার প্রতিকার করিল না, কেহই তাহার প্রতিকারের চেষ্টাও করিল না। সে বিষম দুর্দিনে দুঃস্থ পরিবারগণের সাহায্য করিবার জন্য ধনীর হৃদয়ে একটুও সহানুভূতি ফুটিয়া উঠিল না।

শ্রাবস্তীতে ধনশালী ধন কু-বেরের সংখ্যা যদিও নিতান্ত কম ছিল না, কিন্তু সে দুর্দিনে তাঁহারা অনেকেই অর্থের প্রকৃত সদ্ব্যবহারে কৃপণতা প্রকাশ করিলেন। দুর্ভিক্ষ-পীড়িতগণের সাহায্য করা দূরে থাক, বরং তাহা-দের হস্তাৎ আক্রমণের হাত হইতে নিজে রক্ষা পাই-বার জন্য, ধন রত্নাদি রক্ষা করিবার জন্য, ধনীগণ বিশেষরূপ ব্যবস্থায় যত্নবান হইলেন।

সকলেই সেই সময় আপনার পরিবারবর্গের ভাবনায় ব্যতিব্যস্ত। অপরের কথা কে ভাবে? হায় সংসার! তুমি এমনই স্বার্থপর, এমনই স্বজনপ্রিয়।

সে দিন প্রভাতে বিহারদ্বারে একটী অনাথ-হীন শিশুকে মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত দেখিয়া ধর্ম্ম-সেনাপতি আনন্দ নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। অনাথ শিশুর জীবন রক্ষার বিষয়ে বিশেষ রূপ চিন্তা করিয়া ভগবান সমীপে গমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি পুটে তিনি নিবেদন করিলেন "ভগবন! বর্ত্তমান সময়ে এই আসন্নমৃত্যুর কবল হইতে অসহায়দিগকে রক্ষা করিবার জন্য এই ভিক্ষুসঙ্ঘ কি উপায় অবলম্বন করিতে পারে?"

শাস্তা সে কথা শুনিয়া একটু চিন্তিত হইলেন। তাহার পর আপনার প্রশান্ত বদনে একটু হাসি আনিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "এ সময় তোমরাই তোমাদের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লও।"

আনন্দ স্থবির কিছু বুঝিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ তিনি ভগবানের মুখের দিকে স্থিরভাবে দৃষ্টি সংস্থাপন করিয়া পরে সে দৃষ্টি ঊর্দ্ধে নীল আকাশের পানে সংস্থাপিত করিলেন।

নীল আকাশ তখন মার্ত্তণ্ডের প্রখর কিরণে সমুদ্ভাসিত। আনন্দ স্থবির কিছুক্ষণ স্থির অপলক নেত্রে সেই সূর্য্যালোকের পানে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইল। আর্ত্ত জীবগণকে রক্ষা করিবার জন্য সে হৃদয় সহসা চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে অল্প একটা সহানুভূতির তীব্র জ্যোতিতে বিকাশিত হইয়া উঠিল।

সমবেত ভিক্ষুগণ সকলেই তাঁহার সেই মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিল। আনন্দ স্থবির তাহাদের পানে একবার স্নেহদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন।

তাঁর পর তিনি শাস্তার নিকট হইতে বিদায় প্রার্থনা করিলেন।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় বিহারে সমবেত ভক্তগণের মধ্যে ভগবান তথাগত 'জীবের দুঃখ ও তাহার কারণ' সম্বন্ধে সুমধুর দেশনা প্রদান করিলেন। তাঁর পর সভাভঙ্গের অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি কথাপ্রসঙ্গে শ্রাবস্তীর সেই দুর্ভিক্ষের বিবরণ বর্ণনা করিয়া সকলকে তাহার প্রতিকারের উপায় করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

ভগবান তথাগত আনন্দের ভক্ত সেবকগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 'তোমাদের মধ্যে ও অনেকে সঙ্গতিপন্ন ধনকুবের। আমার বিশ্বাস তোমাদের মধ্যে যে-কোনও একজনের অথবা তোমাদের সমবেত শক্তির চেষ্টায় এই দুর্ভিক্ষ অবশ্যই প্রশমিত হইবে।'

ধনকুবের রত্নাকর শ্রেষ্ঠী ভগবান তথাগতের নিকটবর্ত্তী হইয়া করযোড়ে বলিলেন, 'ভগবান! বিশাল শ্রাবস্তী নগর দুর্ভিক্ষের করাল কবলে। এ নগরের লোক-সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। এত লোকের অন্নদান করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব।'

শাস্তা সামন্তরাজ জয়সেনকে বলিলেন, 'আমি আশা করি, রত্নাকর শ্রেষ্ঠী যে বিষয়ে অক্ষম তুমি তাহাতে সমর্থ হইবে।'

জয়সেন নত মস্তকে বলিলেন 'ভগবান! আপনার নিকট কিছুই অবিদিত নাই। আমার গৃহেই অন্নের অভাব। কেমন করিয়া দেশের অভাব পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিব?'

শাস্তা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—ভাল।

তার পর তিনি ধনকুবের ধর্ম্মপালকে বলিলেন, 'বৎস! বোধ হয় তোমার চেষ্টায় এই দুর্ভিক্ষ প্রশমিত হওয়া সম্ভব।'

ধর্ম্মপাল বিনীত ভাবে বলিলেন, 'ভগবান! বোধ হয় আপনি বিশেষরূপ জানেন যে বর্ত্তমান বৎসরে আষাঢ়িরিক্ত শস্যোৎপাদন না হওয়াই এই দুর্ভিক্ষের মূল কারণ। আমার বহুদূর বিস্তীর্ণ শস্য ক্ষেত্র একেবারেই শস্যহীন। রাজকর প্রদান করাই আমার পক্ষে দুষ্কর। আমি কেমন করিয়া এই বিশাল নগরের ক্ষুধিত অধিবাসীবৃন্দকে অন্নপ্রদান করিব?'

ভগবান বলিলেন, 'তবে কি এ সভায় এমন কেহই নাই, যিনি চেষ্টা করিলে এই দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশবাসিগণকে রক্ষা করিতে পারেন?'

কেহই সে প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলেন না।

ভগবানের প্রিয়তম শিষ্য ভাগ্যবান ধনকুবের অনাথপিণ্ডদ সে সময় সে সভায় উপস্থিত ছিলেন না। শাস্তা একবার সভার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

বোধ হইল যেন তাঁহার সেই উজ্জ্বল অশ্রুত লোচন দুইটী ভাগ্যবান অনাথ পিণ্ডদের অনুসন্ধান করিবার জন্য সেই সমবেত জনসঙ্ঘের মধ্যে ব্যস্ত ভাবে বিচরণ করিতেছিল। কিন্তু তাহা বিফল হইল।

শাস্তা বিমর্ষ ভাবে আপনার আসনে উপবেশন করিয়া রহিলেন। সভায় সকলেই ভগবানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিল। পার্শ্বস্থ ভিক্ষুগণও শাস্তার অপর আদেশ বাণী শ্রবণের জন্য নিতান্ত উদ্বিগ্ন ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন।

শাস্তা আর একবার সেই সভার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, 'তবে এ সভায় এমন কেহই উপস্থিত নাই যিনি চেষ্টা করিলে এই দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশবাসিগণকে রক্ষা করিতে পারেন?'

"আছে!"

সভায় সকলের প্রীতিবিস্ফারিত নেত্র সেই কণ্ঠস্বরের প্রতি লক্ষ্য করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। শাস্তা নিতান্ত পুলকিত ভাবে বলিলেন, 'কে আছে?'

"আমি ভগবান! আপনার দীনা সেবিকা আপনার আদেশ পালন করিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত।"

একটী ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা ধীরে ধীরে ভগবানের সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া ধীর স্বরে বলিল—"ভগবান! আমি, আমি আছি। এই ক্ষুদ্র সেবিকা আপনার আদেশ পালনের জন্য জীবন দানেও বিমুখ হইবে না।"

সহসা একটা বিদ্রূপের হাসি সমস্ত সভাখানি মুখরিত করিয়া তুলিল। আনন্দ স্বামী ধীর ও গম্ভীর স্বরে সকলকে নিরস্ত করিলেন। তারপর শাস্তা সেই কিশোরীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ধীর স্বরে বলিলেন 'বৎসে! তুমি বালিকা, তোমার চেষ্টায় কি বিশাল নগরের অন্নাভাব দূর হইবে?'

"অবশ্যই।" বালিকা তেজোগর্ব্বিত স্বরে বলিল, "ভগবানের দয়া থাকিলে অবশ্যই এই বালিকা নগরবাসিগণকে রক্ষা করিতে পারিবে।"

বালিকা কিছুক্ষণ স্থিরনেত্রে ভগবানের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পরে বলিল, "বলুন প্রভু! যদি লোকের দুঃখ দূর করিতে ধনীর চেষ্টার অভাব হয়, তাহা হইলে কি দেশের কষ্ট দূর হইবে না? যদি অন্নের দয়া না হয় তাহা হইলে কি জননীও ক্ষুধিত সন্তানকে দয়া দানে বিরত হইবে?"

শাস্তা স্নেহোচ্ছ্বসিত স্বরে বলিলেন, "বালিকা! এ ত একটী সন্তান পালন করা নয়। দেশবাসী কোটী কোটী সন্তান বুভুক্ষু। এক মায়ের চেষ্টায় এত সন্তানের অন্নাভাব কি দূর হইতে পারে?"

বালিকা পূর্ব্বের ন্যায় দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "নিশ্চয়ই হইবে।" তার পর আপনার হস্তস্থিত ভিক্ষাপাত্র দেখাইয়া শাস্তাকে বলিলেন, "প্রভু! যদি আপনার দয়া থাকে তাহা হইলে আমার এই ভিক্ষাভাণ্ড সর্ব্বদাই পূর্ণ থাকিবে। আপনার আজ্ঞাপালনবিমুখ ধনবানের ভাণ্ডারে আমার এ ভিক্ষাভাণ্ড পূর্ণ হইবার উপকরণের অভাব নাই। আমি ধনীর গৃহ হইতে ভিক্ষা করিয়া সেই ভিক্ষান্নে অন্নহীনের অন্নাভাব দূর করিব।"

আনন্দ স্বামী আনন্দে অধীর হইয়া সহসা আসন হইতে উঠিলেন। তিনি বালিকাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, 'মা! ভগবান অমিতাভ তোমার বাসনা পূর্ণ করুন।"

শাস্তা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন। সে দিনকার মত সভা ভঙ্গ হইল।

বালিকার অক্লান্ত চেষ্টার ফলে শ্রাবস্তীর দুর্ভিক্ষপীড়িত অন্নহীনগণের অন্নের উপায় হইয়াছিল।

সেই অন্নদায়িনী মাতৃস্বরূপা বালিকা আর কেহ নহেন। ইনি ভাগ্যবান শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয়ের অনাথ পিণ্ডদের প্রিয়তমা কন্যা সুপ্রিয়া। স্বীয় ভক্তি প্রভাবে সুপ্রিয়া ভগবানের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন। সেই জন্য অতুল ঐশ্বর্য্যপতি পিতার কন্যা হইয়া দরিদ্রের অন্নাভাব দূর করিবার জন্য তিনি যে ভিক্ষাভাণ্ড হাতে করিয়াছিলেন, ভগবানের কৃপায় সেই ভিক্ষাভাণ্ডই তাঁহার মাতৃনামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিল। ভগবানের শক্তিপ্রভাবে সেই ক্ষুদ্র ভিক্ষাভাণ্ড সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ থাকিয়া শ্রাবস্তীর সকল অন্নহীনের অন্নের সংস্থান করিয়া দিয়াছিল; সেই ক্ষুদ্র ভিক্ষাভাণ্ডই দুর্ভিক্ষপীড়িত

মনের অভাব দূর করিয়াছিল আর তাহার সেই চেষ্টা, সেই অধ্যবসায় মুদ্রিতাকে আজও বৌদ্ধ ইতিহাসে বৌদ্ধনারীগণের মধ্যে দয়াবতী নামে পরিচিতা করিয়া তাঁহাকে জগতে চিরস্মরণীয়া করিয়া রাখিয়াছে।

(বৌদ্ধ বন্ধু)

শ্রীসত্যভারণ বসু।

অন্তরময়ী।

(১)

আমার প্রাণের তালে তালে
আজকে তুমি গাওগো গান,
আঁধার-ঘেরা হৃদয় কোণে
কর প্রেমের আলোক দান।
অনেক দিন অনেক সুরে
গেয়েছি তব অন্তঃপুরে
জাগেনি মোর বীণার তারে
মনের মত মধুর তান!
আজকে মোর প্রাণের তালে
গাওগো দেবী তোমার গান!

(২)

বিশাল ধরা নিঠুর বড়
দীনের প্রতি চিরটী দিন,—
ব্যথিত জনে বেদনা দিতে
নিরত রয় বিরাম-হীন!
তাই যে তারে হেলায় ভরে
চাইনি কভু ভিলেক তরে—
সকল ছেড়ে আসিনু সরে
হতে তোমার চরণ-লীন!
বিশাল ধরা নিঠুর বড়
দীনের প্রতি চিরটী দিন।

(৩)

করুণাময়ী করুণা করে
হাস্ত-মুখে আজকে চাও,
মরু-কঠোর বক্ষে মম
কুসুম-কলি ফুটিয়ে দাও!
আমার 'আমি' পুলকে হরি'
আমায় লও তোমার করি—
হৃদয়ে মোর আসন তব
আপনি তুমি পাতিয়ে নাও!
করুণাময়ী, করুণা করে
হাস্ত-মুখে আজকে চাও।

(৪)

সারা জীবন হউক মম
গানের তব একটী সুর,
গগন চুমি' লহর তুলি'
বিশ্ব-সৃষ্টি করুক দূর!
দেবী আমার, প্রিয়া আমার,
বিরহ-ব্যথা নাহিক আর—
তোমার রূপে উঠেছে ভরি'
আমার সারা মানস-পুর!
জীবন মম হউক আজ
শুধু তোমার গানের সুর!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

ছাত্রজীবনের স্মৃতি

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত লিখিত "পুরাতন প্রসঙ্গ" পুস্তকাকারে বাহির হইবার অল্প দিন পরেই পুস্তকখানি পড়িবার সুযোগ ঘটিল। সেখানি পড়িতে পড়িতে আমরা যখন কলিকাতার কলেজে পড়িতাম সেই সময়কার আমাদের দেশের বিখ্যাত লোকদিগের সম্বন্ধে কত কথা মনে পড়িল। সে প্রায় কুড়ি বৎসর হইতে চলিল। আর কুড়ি বৎসর পরে সেই সব কথাই "পুরাতন প্রসঙ্গে" পরিণত হইবে। এই কুড়ি বৎসরের মধ্যেই কত বিষয়ের কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

১৮৯৪ হইতে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই চারি বৎসর কলেজ খোলা সময় আমাকে বি. এ ও বি. এল পাশ উপলক্ষে কলিকাতায় থাকিতে হয়।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বি. এ. পড়িবার জন্য কলিকাতায় যাই সেই বৎসরের জুন কি জুলাই মাসে রিপন কলেজে ভর্ত্তি হই। তখন দেশপূজ্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রিপন কলেজের স্বত্বাধিকারী (Proprietor) এবং পূজ্যপাদ পণ্ডিতবর কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য অধ্যক্ষ (Principal)। সুরেন্দ্র বাবু ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতেন। কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় বি, এ, ক্লাসে সংস্কৃত ও মনোবিজ্ঞান (Psychology) পড়াইতেন এবং রিপন কলেজের আইন বিভাগে হিন্দু আইন পড়াইতেন। রিপন কলেজে ভর্ত্তি হইবার প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে বড়দিন উপলক্ষে আমি একবার দুই তিন দিনের জন্য কলিকাতায় যাই। সে সময় কয়েকজন কলিকাতার জানাশুনা লোকের সঙ্গেই গিয়াছিলাম, কাজেই কোন অসুবিধা হয় নাই। আর যখন বি. এ, পড়িতে কলিকাতা গেলাম তখন একাকী যাইতে হইল। সেই সময় আমার আশৈশব সুহৃদ্ দুর্গাদাস কলিকাতার ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে পড়িতেন। তিনি ছকুখান সাবার গলির ছাত্রনিবাস অর্থাৎ মেসে থাকিতেন। আমি দুর্গাদাসের মেসে প্রথমে উঠি। সেই মেসে গিয়াই কিন্তু হরিভক্তি উড়িয়া গেল। বাসাটী বড় অপরিষ্কার এবং তাহার অধিবাসিগণের অধিকাংশেরই প্রকৃতি আমার নিকট তরল বলিয়া মনে হইল। প্রায় ১৫।১৬টী ছাত্র সে মেসে থাকিতেন। দুর্গাদাস ও আমার পূর্ব্বপরিচিত রাধাচরণ এই দুই জন ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে পড়িতেন। আর বক্রীগুলি কলিকাতার কোন না কোন বেসরকারী মেডিক্যাল স্কুলে পড়িতেন। সে সময় সাধারণের মনে এইরূপ একটা ধারণা ছিল যে যাহাদের কোন দিকে কিছু হয় নাই, সেইরূপ অভাগাপ্রকৃতির ছেলেরাই অধিকাংশ স্থলে বেসরকারী মেডিক্যাল স্কুলে পড়িয়া থাকে। কাজেই, বেসরকারী মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রবর্গ দ্বারা অধ্যুষিত হোটেলে প্রথম আসিয়া আমাকে যেন কিছু বিপন্ন হইতে হইল। কিন্তু তখন অল্প সময়ে ঠিক করিতে না পারিয়া এবং দুর্গাদাসের অনুরোধে কতকটা আশ্বস্ত হইয়া পূজার ছুটি পর্য্যন্ত সেই মেসে থাকিতে বাধ্য হইলাম। এই মেসে আমি যে ঘরে থাকিতাম তাহাতে প্রায় কয়াগত হইয়াছিল।

রিপন কলেজে ভর্ত্তি হইলাম। সুরেন্দ্র বাবু "মলি" প্রণীত "বার্কের জীবনী" পড়াইতেন। তাঁহার পড়া আমার খুব ভাল লাগিত। তাঁহার কাছে পড়িলে অনেক বিষয় শিখিতে পারা যাইত, কিন্তু পরীক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট পুস্তকের পড়া বেশী অগ্রসর হইত না। পণ্ডিতবর কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য "কুমার সম্ভব" ও "মিল" প্রণীত মনোবিজ্ঞান (Mill's Psychology) পড়াইতেন। পণ্ডিতবরকে এখন হইতে আমি ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিব। চতুষ্পাঠির ছাত্রেরা তাঁহাদের অধ্যাপককে ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিয়া থাকেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের তখনকার মূর্ত্তিটি আমার বেশ মনে পড়িতেছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মুখ চোখ দেখিলেই তাহা বিলক্ষণ প্রতিভাব্যঞ্জক বলিয়া মনে হইত। কিন্তু ইহাও মনে হইত যে তাঁহার শরীরে বোধ হয় জোর নাই। তিনি অতি ধীরে ধীরে চলিতেন। মাষ্টারের আমলের একটী ছাতা মাথায় দিয়া ক্লাসের চেয়ারের নিকট পর্য্যন্ত আসিয়া ছাতাটী বন্ধ করিতেন। অতি সন্তর্পণে চেয়ারে বসিতেন এবং তদ্রোধিক সন্তর্পণে পুস্তকের পাতা খুলিয়া পড়াইতেন। কথাগুলি অতি ধীরে ধীরে বলিতেন। টানা পাখা যদি একটু থামিত তাহা হইলেই তিনি অস্থির হইয়া পড়িতেন। তাঁহার শরীরের অবস্থা দেখিয়া আমার মনে হইত যেন পড়াইতে তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে, এখন তাঁর অবসর লওয়ার সময় হইয়াছে। তিনি তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে প্রথমে কুমার সম্ভব পড়াইতে লাগিলেন। সংস্কৃত বেশ পড়ান হইতে লাগিল। ব্যাকরণের সংস্কৃতসূত্রের তিনি অতি সুন্দর ইংরেজী অনুবাদ করিয়া দিতেন। কিন্তু আমি তাঁর মনোবিজ্ঞান পড়ান কিছুই বুঝিতে পারিতাম না।

সেই সময় আমাদের সঙ্গে একটী বোবা ছাত্র

পড়িতেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেই ছাত্রটীর উপর অতি সদয় ব্যবহার করিতেন। ছাত্রটী প্রথম বিভাগে এফ. এ পাশ করিয়া ২০ টাকা মাসিক বৃত্তি পাইয়াছিলেন। তখনকার কালে প্রথম বিভাগে এফ. এ পাশকরা ছাত্রের এখনকার কালের প্রথম বিভাগে আই. এ বা আই. এস্ সি পাশকরা ছাত্র অপেক্ষা গৌরব অনেক বেশী ছিল। বোবা ছাত্রটি শুনিতে পাইতেন না। তাঁহার কোন বিষয় জিজ্ঞাস্য থাকিলে তিনি তাহা কাগজে লিখিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে দিতেন, ভট্টাচার্য্য মহাশয় অতি যত্নের সহিত সেই প্রশ্নের উত্তর দিতেন। বোবা ছাত্রটি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অতি নিকটেই বসিতেন। বর্ত্তমান সময়ের রুচিবিরুদ্ধ শ্লোক ভট্টাচার্য্য মহাশয় পড়াইতেন না। একদিন কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে এখনকার বাংলা সাহিত্যে "নীতি" কথাটি "Morality" এই অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ঐরূপ অর্থ যে কেমন করিয়া হইল তাহা তিনি বুঝিতে পারেন না। ভট্টাচার্য্য মহাশয় দেখিতে তালপাতার সেপাই হইলেও অত্যন্ত রাশভারী লোক ছিলেন। তাঁর মুখ দেখিলে আমার মনে হইত যেন তিনি পৃথিবীর সমস্ত বিষয়ের প্রতিই বিরক্ত হইয়াছেন। স্কুল ও কলেজের ক্লাসে পড়ান আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ছেলেরা যতখানি গোলমাল করিয়া থাকে, তেমনি টিফিনের ছুটির আধ ঘণ্টাও ছোট ছেলেদের কলরবে কান পাতিবার যো থাকে না। এইরূপ কোলাহলের সময় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইলে মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত নিস্তব্ধ হইয়া যাইত। অথচ কলেজের অধিকারী সুরেন্দ্রবাবু ছেলেদের হট্টগোলের মধ্যে দিয়া গেলে ছেলেরা তেমন তটস্থ হইতই না বরং অতি অল্প বয়স্ক ছেলেরা টিফিনের সময় ছুটাছুটি করিতে করিতে কতবার সুরেন্দ্রবাবুর গায়ে যেন দিয়া চলিয়া যাইত। সুরেন্দ্রবাবু সে দিকে দৃক্‌পাতও করিতেন না, বরং ছেলেদের ছুটাছুটি দেখিয়া তিনি যেন আমোদ বোধ করিতেন এবং কোন ছেলে তাঁর গায়ের উপর পড়িলে সস্নেহে তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া তাহাকে সরাইয়া দিতেন।

সে সময় রিপণ কলেজের বাড়ীটা মোটেই সুদৃশ্য ছিল না। মির্জাপুর ষ্ট্রীটের একটী প্রকাণ্ড পুরাতন বাড়ী; কিন্তু তাহাও রিপণ কলেজের ও কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্রদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। স্থানাভাবে ছাত্রদিগকে বড় অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। স্থানাভাবে রিপণ কলেজের আইন ক্লাস আলবার্ট কলেজের গৃহে হইত। এ অসুবিধায় ছেলেরা মধ্যে মধ্যে যার পর উত্তেজিত ও উত্তেজিত হইত এবং উহা নিবারণ করিবার জন্য সুরেন্দ্রবাবুকে আবশ্যক বোধ করিলে কড়া কথা শুনাইয়া দিতে প্রস্তুত হইত। কিন্তু সুরেন্দ্রবাবুর অসাক্ষাতে তাঁহার বিরুদ্ধে যিনি যতই আলোচনা করুন না কেন তাঁর সাক্ষাতে গিয়া তাঁর মিষ্ট কথা শুনিয়া, ছেলেদের সঙ্গে তাঁর অমায়িক ব্যবহার দেখিয়া তাহারা যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া যাইত, তেমন কিছুই বলা হইত না। এইরূপ একটি ঘটনার কথা মনে হইতেছে। আইন ক্লাসের ছেলেরা একবার সুরেন্দ্রবাবুকে গিয়া বলেন যে আলবার্ট কলেজে গিয়া পড়িতে তাঁহাদের বড় অসুবিধা হয়। রিপণ কলেজের বহুদিন হইল প্রস্তাবিত কলেজগৃহ শীঘ্র নির্ম্মিত না হইলে আর চলিবে না। ইহাতে সুরেন্দ্রবাবু বলেন যে, "ওরে বাপরে! এতগুলি গ্রাজুয়েটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এভাবে কথা বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। তবে কলেজগৃহ অতি শীঘ্রই নির্ম্মিত হইবে।" এই কথায় আইন ক্লাসের ছেলেরা একবারে জল হইয়া গেলেন।

সেই সময় রিপণ কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে শকুন্তলা পড়াইতেন শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য। ইনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রপলিটান কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক। তবে সেই সময় কিছুদিনের জন্য মেট্রপলিটান কলেজ সুরেন্দ্রবাবুর তত্ত্বাবধানে ছিল বলিয়া মেট্রপলিটান কলেজের কোন কোন অধ্যাপক রিপণ কলেজেও কোন কোন বিষয়ের অধ্যাপনা করিতেন। শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় অতি গম্ভীরপ্রকৃতির লোক। ইনি এত খুঁটিনাটি করিয়া পড়াইতেন যে আমার মনে হইত যে বুঝি বা প্রাণ গেল। ইঁহার

নিকট কোন কথার কোন বিষয়ই ফাঁক যাইবার যো ছিল না। ইনি যা বলিতেন ছেলেদের তাহা লিখিয়া লইতে বলিতেন। শকুন্তলার নান্দীর শ্লোক "যা সৃষ্টি স্রষ্টুরাদ্যা" হইতে এইরূপ "অভ্যাসের" আরম্ভ হইল। আমি কয়েক দিন নোট লিখিয়া হতাশভাবে হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। তবে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে যে ছাত্র শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অধ্যাপনা মন দিয়া শুনিতেন সংস্কৃত সাহিত্যে ও ব্যাকরণে তাঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি হইত। ইঁহার এবং অন্যান্য মহাশয়ের সংস্কৃত পড়িবার সময় উচ্চারণের কোন বিশেষত্ব ছিল না। সাধারণতঃ বাংলা দেশের পণ্ডিতেরা যেমন সংস্কৃত শ্লোকাদির উচ্চারণ করেন তাঁহারাও তেমনি করিতেন। আমাদিগকে সেই সময় "মাঘ" বিরচিত "শিশুপালবধ" পড়াইতেন পণ্ডিত উমানাথ কবিরত্ন। ইঁহার নাম ঠিক মনে হইতেছে না, বোধ হয় উমানাথ কিংবা উমাচরণ। ইঁহার "শিশুপাল বধের" শ্লোক পাঠ শুনিতে বড় ভাল লাগিত। ইনি আমাদের দেশীয় অধ্যাপকদের মত নির্জ্জীব ভাবে সংস্কৃত শ্লোক পড়িতেন না। ইঁহার সংস্কৃত শ্লোক পাঠ শুনিয়া মনে হইত যে সংস্কৃত ভাষার মধ্যে বাস্তবিক একটা তেজ ও গাম্ভীর্য্য আছে। মনে হইত যেন শিশুপাল বধের অনেক শ্লোকই ইঁহার কণ্ঠস্থ আছে। ইনি ক্লাশে আসিয়াই কোন্ শ্লোকটী হইতে সেদিনকার পড়া আরম্ভ হইবে দেখিয়া লইতেন। তার পর পুস্তক বন্ধ করিয়া ৪০টি শ্লোক অনর্গল আবৃত্তি করিয়া যাইতেন। শিশুপাল বধের প্রথম সর্গে যে কয়েকটি শ্লোকে নারদের বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা অতি সুন্দর। শ্রীযুক্ত উমাচরণ পণ্ডিত মহাশয়ের সেই শ্লোকগুলির আবৃত্তি এখনও যেন আমার কানে বাজিতেছে। তাঁহার এইরূপ উচ্চারণ হইবার কারণ জানিবার জন্য আমার কৌতূহল হয়। পরম্পর শুনিতে পাই যে তিনি কাশীতে কয়েক বৎসর থাকিয়া সংস্কৃত পাঠ করেন। আমার বোধ হয় তাঁহার সংস্কৃত উচ্চারণ প্রকৃত সংস্কৃত উচ্চারণের প্রায় হওয়ার কারণ তাঁহার কাশীতে অধ্যয়ন। তবে ইহা আমার শোনা কথা, এ সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছুই বলিতে পারি না।

যাদ যাদবের বেশী আমার রিপণ কলেজে পড়া ঘটিল না। তাহার কারণ দুইটি। প্রথম কারণ এই যে, সে সময় রিপণ কলেজে ইংরেজী অধ্যাপনার ভাল বন্দোবস্ত ছিল না। এমন সপ্তাহও গিয়াছে যে একেবারেই ইংরেজী পড়ান হইত না। যে ঘণ্টায় ইংরেজী পড়ানের কথা সেই ঘণ্টায় ইংরেজীর বদলে সংস্কৃত পড়ান হইত। দ্বিতীয় কারণ বর্দ্ধমান রাজকলেজে আমার সতীর্থ ও পরমসুহৃদ্ বিজয় ও শৈলেন্দ্র জেনেরেল এসেম্‌ব্লিজ ইনষ্টিটিউশনে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। রিপণ কলেজে আমার বিজয় ও শৈলেন্দ্রের অভাব বড় বেশী বোধ হইত। কারণ রিপণ কলেজে আমাদের ক্লাসের ছাত্রদের মধ্যে দুইজন ছাড়া আর একেবারেই আমার অপরিচিত ছিলেন। যে দুইজন পরিচিত ছিলেন তাঁদের সঙ্গেও তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না। সেই জন্য বিজয় ও শৈলেন্দ্রের সহিত এক কলেজে পড়ার লোভ সংবরণ করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। ইহার উপর শুনিলাম যে জেনেরেল এসেম্‌ব্লিতে তখন পড়াশুনার বন্দোবস্ত রিপণ কলেজ অপেক্ষা মন্দ ত নয়ই, বরং ভালই। রিপণ কলেজ হইতে Transfer লওয়ার সংকল্প করিতেছি এমন সময় একবার বাড়ী যাওয়ার দরকার পড়িল। তখন মনে করিলাম Transfer লইয়া বাড়ী যাই, বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া একেবারে জেনেরেল এসেম্‌ব্লিতে ভর্ত্তি হওয়া যাইবে। Transfer Certificate এর জন্য দরখাস্ত করিলাম। রিপণ কলেজের সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট অম্বিকাবাবু Transfer Certificate দিতে নানারূপ আপত্তি করিতে লাগিলেন। বলিলেন যে "কেন যাইবে? ইংরেজী পড়া এখন হইতে খুব ভাল হইবে। কুচবিহার কলেজের কাজ ছাড়িয়া ললিত বাবু (অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়) এখানে আসিতেছেন। এই দেখ এফ্‌ এ ক্লাশ, আগামী কল্যই তিনি আসিয়া ক্লাশে পড়াইবেন।" আমি কোন রকমে তাঁর সে সকল কথা কাটাইয়া অনেক ধস্তাধস্তির পর Transfer Certificate লইয়া বাড়ী

চলিয়া যেতাম। বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া জেনেরেল এসেম্‌ব্লিতে ভর্ত্তি হইয়া বিজয় ও শৈলেন্দ্রের সহিত একত্র পড়িতে লাগিলাম। সেই সময় ললিত বাবু কুচবেহার কলেজের কাজ ছাড়িয়া রিপণ কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

জেনেরেল এসেম্‌ব্লিতে আমাদিগকে "কুমারসম্ভব" পড়াইতেন শ্রীযুক্ত বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি সংস্কৃত কলেজের এম, এ। তিনি কোন শ্লোকই বাদ দিয়া পড়াইতেন না। একদিন আমাদের মধ্যে একজন একটী শ্লোক পড়ানোতে আপত্তি করায় অধ্যাপক মহাশয় বলিলেন যে, "আমি বার বৎসর সংস্কৃত কলেজে পড়িয়া এম এ পাশ করিয়াছি, আমার অধ্যাপকেরা কোন শ্লোক অশ্লীল বলিয়া পড়াইতে বিরত হন নাই। তোমরা সকলেই প্রাপ্তবয়স্ক, আমি আমার গুরুদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সকল শ্লোকই পড়াইব। যদি কোন শ্লোক তোমাদের কাহারও নিকট আপত্তিকর মনে হয়, সেই শ্লোক পড়াইবার সময় তাহারা ক্লাশ হইতে উঠিয়া যাইতে পারে, কাণে অঙ্গুলি দিয়া থাকিতে পারে।" ইহার উপর আর কথা চলে না। তবে সত্যের অনুরোধে একথাও বলিতে হইবে যে, আমরা যে সকল শ্লোক বা অংশ আপত্তিকর মনে করিতাম এরূপ কোন শ্লোকাদি পড়াইবার সময় অধ্যাপক মহাশয় কখনই চপলতা প্রকাশ করিতেন না, বেশ গম্ভীর ভাবে পড়াইয়া যাইতেন।

জেনেরেল এসেম্‌ব্লি কলেজ খৃষ্টান পাদরীদের কলেজ, কাজেই সে কলেজে প্রতিদিন প্রায় আধ ঘণ্টা করিয়া বাইবেল পড়ান হইত। এই সময় কোন ছাত্র ক্লাশে না থাকিলে পাদরী অধ্যাপকেরা বড়ই বিরক্ত হইতেন এবং বলিতেন যে কোন ছাত্র বাইবেল ক্লাশে—তাঁহাদের ভাষায় বলিতে গেলে Religious Instruction Class এ—রীতিমত উপস্থিত না থাকিলে তাহার পরীক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে গোলমাল ঘটিতে পারে। সুতরাং দায়ে পড়িয়া আমরা বাইবেল ক্লাশে উপস্থিত থাকিতাম। প্রথম প্রথম দুই একদিন আমাদের মধ্যে কেহ কেহ বাইবেলের কোন কোন বিষয় সম্বন্ধে পাদরী অধ্যাপকদের সহিত তর্ক বিতর্ক করিয়াছিলেন। তাহাতে পাদরী অধ্যাপকেরা অসন্তুষ্ট হন বুঝিয়া আমরা ঐরূপ তর্ক বিতর্ক হইতে বিরত হই এবং 'বোবার শত্রু নাই' এই প্রবাদ বাক্যের অনুসরণ করিয়া বাইবেল ক্লাশের সময়টা নীচের দেওয়ালের দিকে তাকাইয়া কাটাইয়া দিতে থাকি। অধিকাংশ ছাত্রদের সম্বন্ধে এই কথা। তবে ক্লাশের মধ্যে দুই চারজন মনোযোগী ছাত্র মন দিয়া বাইবেল পড়ান শুনিতেন এবং বোধ হয় বাইবেলের পরীক্ষা দিয়া, পুরস্কারও পাইয়াছিলেন। আমরাও বাইবেলের পরীক্ষা দিয়াছিলাম, কিন্তু বোধ হয় যে একটী প্রশ্নেরও সদুত্তর দিতে পারি নাই। তখনকার জেনেরেল এসেম্‌ব্লিজ কলেজে ডফ কলেজ মিলিয়া এখনকার স্কটিশ চর্চ্চ কলেজ হইয়াছে।

জেনেরেল এসেম্‌ব্লিতে মধ্যে মধ্যে স্কটলাণ্ড ও আমেরিকা হইতে পাদরী সাহেবেরা আসিয়া বক্তৃতা করিতেন। একদিন স্কটলাণ্ড নিবাসী ব্রাদোয়ারেভেরেণ্ডলাল প্রাংকুর্মহাভুজং' এক পাদরী বক্তৃতা করিতে আসিলেন। বাংলার ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট স্যার ষ্টুয়ার্ট বেলিকে এবং রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বর ওল্ডহাম সাহেবকে যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত পাদরী সাহেবের আকৃতি কেমন ছিল তাহা অনুমান করিতে পারিবেন। এই পাদরী সাহেবের বক্তৃতার ভঙ্গিটীও বড় মজার; যেন অভিনয় করিতেছেন। এক একবার ভয়ানক চীৎকার করিয়া হাত পা ছুড়িতেছেন, আবার এক একবার অতি মৃদুস্বরে কথা বলিতেছেন। ইঁহার বক্তৃতার সময় আমরা দেখিলাম যে আমাদের কলেজের সংস্কৃতের সিনিয়র প্রফেসার পণ্ডিত বীরেশ্বর ভট্টাচার্য্য নির্নিমেষ নয়নে বক্তৃতাকারীর দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। আমরা জানিতাম যে উনি ইংরেজী মোটেই জানেন না। নিবিষ্টচিত্তে তিনি পাদরীর বক্তৃতার কি শুনিতেছেন বা কি বুঝিতেছেন জানিবার জন্য আমাদের কৌতূহল জন্মিল। পরদিবস ক্লাশে তাঁহাকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি হাসিয়া বলিলেন যে, "ওর নাম কি বাপু, আমি তো পাদরীর বক্তৃতা শুনতে যেতে চাচ্ছিলাম না, তা প্রিন্‌সিপাল সাহেব ছাড়লেন না, তাই গেলাম। আমি

তো ওর নাম কি বাপু ইংরেজী মিংরেজী বুঝি না। আমি পাদরীর অভিনয় দেখিতে ছিলাম। বেশ অভিনয় করিছিল।"

সে সময় রবি বাবুর নাম জাহির হইয়াছে। কিন্তু আমাদের ক্লাশের ছেলেদের মধ্যে যাঁহারা খাস কলিকাতার তাঁহাদের মধ্যে অনেককেই রবি বাবুর উপর বিরূপ বলিয়া মনে হইত। সেই সময় রবি বাবুর "কড়ি ও কোমলের" সমালোচনা "মিঠে কড়া" বাহির হইয়াছে। রবি বাবুর বিরুদ্ধবাদীরা "মিঠে কড়ার" অনেক পদ্য মুখে মুখে আওড়াইয়া আমোদ অনুভব করিতেন। যথা "একবার রাধে রাধে ডাক্ বাঁশী মনোসাধে, দেখে ব্যাকরণ কাঁদে, হেন সন্ধি দেখি নাই।" "বাক্সে ওরে পাচরা কবি খোঁপের ভিতর বাক্ ঢাকা" "ওরে বাঁধ পোঁতা কিরে, পোঁকা বসে কাঁদে, ঠাকুর বাড়ীর কবির কথার তুলনাই হারে।" ইত্যাদি। তৎপূর্ব্বে আমি রবি বাবুর কবিতা যৎসামান্য পড়িয়াছিলাম। তাঁর "গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা," এই কবিতার সমালোচনা "সাহিত্যে" পড়িয়া কবিতাটির মানে বুঝি আর না বুঝি, কবিতাটি খুব ভাল লাগায় সেটীকে মুখস্থ করিয়া ফেলি। "মিঠে কড়ার" বোল্ চাল্ শুনিয়া "মিঠে কড়া" এক খণ্ড "হিতবাদী," কার্য্যালয় হইতে কিনিয়া পড়িলাম এবং তাহার ফলে রবি ঠাকুরের কবিতার নিতান্ত ভক্ত হইয়া পড়িলাম এবং সেই ভক্তি উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল।

জেনেরেল এসেম্‌ব্লি হইতে যথা সময়ে বি, এ পাশ করিয়া বি, এল পড়িবার জন্য রিপণ কলেজে ভর্ত্তি হইলাম। বিজয় ও আমি একসঙ্গেই "রিপণ" কলেজে ভর্ত্তি হইলাম। শৈলেন্দ্রনাথ "বঙ্গবাসী কলেজের" বি, এল ক্লাশে ভর্ত্তি হইলেন। তার কারণ, বঙ্গবাসী কলেজের আইন বিভাগের এক রকম মালিক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী শৈলেন্দ্রনাথের মাতুল, "ভারত উদ্ধার" "কল্পতরু" প্রভৃতির লেখক পরিহাসরসিক বিখ্যাত ইন্দ্রবাবুর বন্ধু এবং ইন্দ্রবাবু বঙ্গবাসীর পৃষ্ঠপোষক; "বঙ্গবাসী কলেজ" "বঙ্গবাসী" কাগজের মালিক যোগীনবাবুর দাদা বিপিন বাবুর। শৈলেন্দ্রনাথ কিন্তু যান যাদবের বেষ্ট বঙ্গবাসী কলেজে আইন পড়িতে যা রলেন না। আমি যে কারণে রিপণ কলেজ ছাড়িয়া জেনেরেল এসেম্‌ব্লিতে ভর্ত্তি হই কতকটা সেই কারণে শৈলেন্দ্রনাথ রিপণ কলেজের বি, এল ক্লাশে, আসিয়া ভর্ত্তি হইয়া আমাদের সঙ্গে বি, এল পড়িতে লাগিলেন। পড়িতে লাগিলেন বলিলে ঠিক কথা বলা হয় না—আইন শ্রেণীতে হাজিরা দিতে লাগিলেন। তখনকার আইন শ্রেণীর ছাত্রদিগের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জন ক্লাশের পড়ানতে কিছুমাত্র মন দিতেন বলিয়া বোধ হয় না। হাজিরা দেওয়ার সময় অধিকাংশ ছাত্র ক্লাশে ঢুকিয়া Present sir, here sir, ইত্যাদি বলিয়া হাজিরা দেখাইতেন।

এই হাজিরা দেখান ব্যাপারে কখন কখন আইন ক্লাশের ছেলেদের মধ্যে কেহ কেহ এমন কাজ করিতেন যাহা উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদের পক্ষে নিতান্ত নিন্দার কথা। ব্যাপারটী এইরূপ। আইন ক্লাশের কোন কোন ছাত্র কার্য্যবশতঃই হউক বা আলস্যবশতঃই হউক, আইন ক্লাশে একেবারেই উপস্থিত হইতেন না। তাঁহাদের হইয়া তাঁহাদিগের বন্ধুরা ক্লাশে তাঁহাদের হাজিরা দেখাইতেন। আমি একজনকে জানি, তিনি তাঁর নিজের ছাড়া আরও তিন চার জনের হাজিরা দেখাইতেন এবং প্রত্যেক বার ভিন্ন স্বরে Present sir, here sir, প্রভৃতি বলিতেন। শৈলেন্দ্রনাথ লোকটী কিছু উগ্র প্রকৃতির। এই অন্যায় তাঁহার যেন অসহ্য হইল। এই ব্যাপার তিনি প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের গোচর করিবেন বলিলেন। আমি অনেক বলিয়া কহিয়া শৈলেন্দ্রকে এই ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত করিলাম। বলিলাম যে "তুমি নিজের চড়কায় এখন তেল দাও। জানিয়া শুনিয়া যদি কেহ জাহান্নামে যাইতে চায় তুমি কিছুতেই বাঁচাইতে পারিবে না।

This above all : to thine ownself be true,
And it must follow as the night the day,
Thou canst not then be false to any man.

শৈলেন্দ্র ত নিবৃত্ত হইলেন। কিন্তু অন্যায় মহাশয় (কৃষ্ণ কমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়) কেমন করিয়া যেন এই ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। এবং একদিন তিনি বোধ হয়

এই আশার উল্লেখ করিয়া ছাত্রদিগকে বলিলেন, "You will have enough of dishonesty in order to earn your livelihood in future; but it is rather beginning too early."

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ভট্টাচার্য্য মহাশয় হিন্দু কলেজের আইন-ক্লাসে হিন্দু আইন পড়াইতেন। আমি আইন পুস্তক কিছুই কিনি নাই। অধ্যাপকদের পড়ানও বড় একটা শুনিতাম বলিয়া বলিয়া মনে হয় না। পেছনদিকের একটা বেঞ্চে বসিয়া শৈলেন্দ্রনাথ, বিনয় ও আমি প্রায়ই গল্প করিতাম। অধিকাংশ ছাত্রেরই এই দশা। তবে আমার মনে হইতেছে যে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের হিন্দু আইন পড়ান আমি কিছু কিছু মন দিয়া শুনিতাম। পড়াইতে পড়াইতে জজ দ্বারিকানাথ মিত্রের কথা উঠিলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় শতমুখে দ্বারিকানাথ মিত্রের প্রশংসা করিতেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পড়ান একটু মন দিয়া শুনাতে আমার এই উপকার হইয়াছিল যে, এল পরীক্ষা দিবার সময় হিন্দু আইনের জন্য আমাকে একটুকু বেগ পাইতে হয় নাই। ভট্টাচার্য্য মহাশয় দেখিলেন তিনি যখন পড়ান অধিকাংশ ছেলে বাহিরে বাহিরে দাঁড়াইয়া গল্প করেন। একদিন তিনি ছাত্রদিগকে তাহা জানাইলেন। ছাত্রেরা বলিলেন ক্লাসে সকলের বসিবার জায়গা নাই। এই অভিযোগ আংশিক সত্য। আর একদিন ভট্টাচার্য্য মহাশয় পড়াইতেছেন, তাঁহার নিকটে সম্মুখের বেঞ্চে কয়েকজন অতি মনোযোগী ছাত্র বসিয়া নোট লিখিতেছেন। আমাদের মত কয়েকটী অমনোযোগী ছাত্র পেছনদিকের বেঞ্চে বসিয়া কতক বা পড়ান শুনিতেছেন, কতক শুনিতেছেন না, অনুচ্চস্বরে গল্প করিতেছেন। ক্লাসের মধ্যে ৩০।৪০ জন ছাত্র রহিয়াছেন, আর প্রায় সমসংখ্যক ছাত্র বাহিরে দাঁড়াইয়া জটলা করিতেছেন। ক্লাসের মধ্যে অন্ততঃ আরও ১০।২০ জন ছাত্রের বসিবার উপযুক্ত স্থান রহিয়াছে। হঠাৎ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আসন ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন। যাঁহারা ক্লাসের মধ্যে ছিলেন তাঁহারা বিস্মিত হইয়া যুগপৎ দাঁড়াইলেন, যাঁহারা বাহিরে কোলাহল করিতেছিলেন তাঁহারাও ততোধিক বিস্মিত হইলেন। সহসা তাঁহাদের সেই চির কোলাহল নীরব হইয়া গেল। সকলেই কেমন একটা অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাহিরের ছাত্রদিগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "ভিতরে অনেক জায়গা আছে, অমুখেরা ক'রে এসে বসুন।" বাহিরের ছাত্রদের ত মাথা হেঁট। কি করেন, সকলেই নীরবে ক্লাসের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন।

আইন ক্লাসের ছেলেদের পড়াশুনায় মনোযোগী করিবার জন্য একদিন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন যে, যে ছাত্র উপর্য্যুপরি তিনটী প্রশ্নের উত্তর না পারিবে তাহার একদিনের হাজিরা কাটা যাইবে। তদনুসারে ছাত্রদিগকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইতে লাগিল। অধিকাংশ ছাত্রই কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন যে, "আচ্ছা বই দেখিয়া উত্তর বল।" তাহাতে অধিকাংশ ছাত্র পরাঙ্মুখ হইলেন। তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মত গম্ভীর প্রকৃতির লোকও ছাত্রদের এই কাণ্ড দেখিয়া একটু না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তার পর তিনি বোধ হয় হাল ছাড়িয়া দিয়া আপন মনে পড়াইতে লাগিলেন। যার ইচ্ছা হয় শুনুক। তখন বি, এ, পাশ করার দুই বৎসর পরেই বি, এল পরীক্ষা দেওয়া চলিত।

এই সময় প্রসিদ্ধ বাগ্মী কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রিপণ কলেজের আইন বিভাগের একজন অধ্যাপক ছিলেন। প্রয়োজনীয় অংশে তিনি ছাত্রদিগকে নোট দিতে বলিতেন। তিনি কঠিন কঠিন ধারাগুলি এমন করিয়া পড়াইতেন যে তাহাতে অর্থবোধের পক্ষে অনেকটা সুবিধা হইত। সকলেই তাঁকে বিলক্ষণ শ্রদ্ধা করিত। তাঁর মূর্ত্তিতে কেমন একটা সৌম্য ভাব ছিল। তিনি খুব ভাল বাগ্মী ছিলেন। কিন্তু তিনি বক্তৃতা করিতে উঠিয়া প্রথম দুই এক মিনিট ধীরে ধীরে থামিয়া থামিয়া কথা বলিতেন, মনে হইত যেন কি ভাবিতেছেন, যেন বক্তৃতা করিতে তাঁহার কষ্ট হইতেছে, কিন্তু এইরূপ ভাব দুই এক মিনিট পরেই দূর হইত।

তাঁর চক্ষু দুইটী উজ্জ্বল হইত, এবং বক্তৃতার স্রোত অব্যাহত গতিতে চলিয়া শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করিয়া রাখিত। তাঁর বক্তৃতায় বাজে কথা প্রায়ই থাকিত না। তবে মনে হইতেছে তাঁর কোন কোন বক্তৃতায় পৃষ্টানী গোঁড়ামী একটু অধিকই লক্ষ্য করিয়া কখন আমাদিগকে ক্ষুণ্ণ হইতে হইয়াছে। একবার ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজীতে সাহিত্য সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতায় তিনি বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসের বর্ণিত কয়েকটী চরিত্রের সমালোচনা করেন। তার পর কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে দেশীয় ভাষা না হইলে প্রাণের কথা বলা যায় না, বা প্রাণে প্রাণে কোন ভাব অনুভব করা যায় না, এবং তিনি সেই প্রসঙ্গে বলেন যে হোমারের ইলিয়াডের এক জায়গা পড়িয়া তাঁর চক্ষু দিয়া জল বাহির হইয়াছিল, তাহা ছাড়া ইংরেজী আর কোন বহি পড়িয়া তিনি কাঁদেন নাই, কিন্তু বাংলা অনেক বহি পড়িয়া তিনি অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই। যুবকগণকে যত্ন সহকারে বাংলা সাহিত্য আলোচনা করিবার জন্য উৎসাহিত করেন। গুরুদাস বাবুর বক্তৃতার সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসের বর্ণিত চরিত্রগুলি ভাল কি মন্দ, কোন্ উপন্যাস ছেলেদের পড়া উচিত কোন্ উপন্যাস ছেলেদের পড়া উচিত নয়, সে সম্বন্ধে তিনি কোন কথাই বলিতে পারেন না, যেহেতু তিনি তখন পর্য্যন্ত কোন ভাষায় লিখিত কোন উপন্যাস পাঠ করেন নাই। আমরা তাঁর এই কথা শুনিয়া একেবারে আকাশ হইতে পড়িলাম।

সেই সময় রিপণ কলেজের আইন বিভাগে সুরেন্দ্র বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যারিষ্টারও একজন অধ্যাপক ছিলেন। ইনি বিলাতের নানারকম গল্প করিতেন। উচ্চারণ সম্বন্ধে ইনি বলিতেন যে, যে ভাষার কথা উচ্চারণ করি সেই ভাষা যাঁহাদের মাতৃভাষা তাঁহারা যে ভাবে সেই কথা উচ্চারণ করেন সেই কথা সেই ভাবে উচ্চারণ করাই উচিত। কথাটা উঠিয়াছিল মাইকেল মধুসূদনের বাংলা উচ্চারণ সম্বন্ধে মত লইয়া। মাইকেল মধুসূদন বলিতেন, বুঝি যে ইংরেজী বলিবার সময় যদি বাংলা নাম কি বাংলা কোন কথা থাকে তাহাও ইংরেজ আড়' দিয়া উচ্চারণ করা উচিত। যেমন, বিধু ভূষণ দত্ত ইংরেজীতে উচ্চারণ করিবার সময় বলিতে হইবে দে বিধু ভূষণ ডাট্টা; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবিণ্ড্র নাথ টেগোর ইত্যাদি। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিনসিপাল ই. বি. কাউয়েল সম্বন্ধে একটী হাসির গল্প বলিতেন। জিতেন্দ্রবাবু সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন। কাউয়েল সাহেবের বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করিবার সখ ছিল এবং সেই বক্তৃতা করিবার সময় তিনি সাধু-ভাষা ব্যবহার করিতেন। একবার কোন ব্যাপার উপলক্ষে সংস্কৃত কলেজে একটী বড় গোছের সভার অধিবেশন হয়। সেই সভায় কিছু স্থানাভাব ঘটিয়াছিল। বক্তৃতার সময় সেই স্থানাভাবের উল্লেখ করিয়া কাউয়েল সাহেব বলিয়াছিলেন—"সংস্কৃত কলেজে এমন কোন শালা নাই—(শ্রোতৃবৃন্দ একথা শুনিয়া বিস্মিত) যাহাতে এইরূপ মহতী সভার অধিবেশন হইতে পারে (শ্রোতৃবৃন্দ তখন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন)।

জিতেন ব্রাদু খুব বলবান বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। অল্পের নিকট আমরা জিতেন বাবুর সামর্থ্যের অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনিতাম। একবার তিনি হাওড়ার অতি নিকটবর্ত্তী কোন ষ্টেশনে যাইবার জন্য ধুতি চাদর পরিয়া হাওড়া ষ্টেশনের রেলগাড়ীর একখানি সেকেণ্ড্ ক্লাশ কামরায় উঠিয়াছিলেন। হাওড়া হইতে গাড়ী ছাড়িবার অতি অল্প সময় পূর্ব্বে দুইটী সাহেব (ইংরেজ) একটী মেম লইয়া সেই কামরায় উঠিয়া পড়িলেন। ধুতিচাদর পরা বাঙ্গালী সেই কামরায় বসিয়া রহিয়াছে, তায় আবার সাহেবদের সঙ্গে মেম, সাহেব অবজ্ঞতা অনুভব করিতে লাগিলেন এবং জিতেনবাবুকে সেই গাড়ী হইতে নামিয়া যাইতে বলিলেন। জিতেন বাবু কোন কথায় কান দিলেন না। এমন সময় গাড়ী ছাড়িয়া দিল। জিতেন বাবু ভাল মানুষটীর মত একটী বেঞ্চের কোণে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। সাহেবদ্বয়

জিতেন বাবুর সম্মুখস্থ বেঞ্চ থেকে জিতেন বাবুর মুখোমুখী বসিয়া জিতেন বাবুর শূন্যে পা তুলিয়া দিতে লাগিলেন। জিতেন বাবু কয়েকবার কিছু না বলিয়া সাহেবদের পা আস্তে আস্তে সরাইয়া দিতে লাগিলেন। কিন্তু সাহেবদ্বয় কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না, নানা প্রকারে জিতেন বাবুকে উত্যক্ত করিতে লাগিলেন। মেমটী জিতেন বাবুর পশ্চাদ্বর্ত্তী বেঞ্চের অপর কোণে বসিয়া জিতেন বাবুর নিগ্রহ দেখিয়া বড়ই আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন। জিতেনবাবু বিদ্যুৎগতিতে মেম সাহেব যে বেঞ্চের কোণে বসিয়া সেই বেঞ্চের সম্মুখস্থ অপর বেঞ্চের সেই কোণে গিয়া মেমসাহেবের মুখোমুখী বসিয়া মেমসাহেবের পার্শ্বেই পা দুখানি স্থাপন করিলেন। আর কোথায় যায়! সাহেবদ্বয়ের যুগপৎ ঘুঁসি জিতেন বাবুর উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। জিতেন বাবু যেন এরূপ প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর নাকি কুস্তিগিরদের নানারকম কসরৎ জানা ছিল, সেই কসরতের সাহায্যে তিনি মুহূর্ত্তে মধ্যে সাহেব দুইটীকে ধরাশায়ী অথবা কাবুশায়ী করিয়া তাঁহাদের বুকের উপর বসিয়া তাঁহাদের নাকে মুখে এমন ঘুঁসি মারিতে লাগিলেন যে তাঁহাদের নাক মুখ দিয়া বন্ বন্ করিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল। তাঁহারা চক্ষে সরিষার ফুল দেখিতে লাগিলেন. মেমটী কাঁদিতে কাঁদিতে জিতেন বাবুকে অনুনয় বিনয় করিয়া বলিতে লাগিলেন, "Oh Babu, have mercy on them." জিতেন বাবু সাহেবদ্বয়কে ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহারা অন্তরালে গিয়া জল দিয়া মুখ ও নাকের রক্ত ধুইয়া আসিলেন। খানিক পরেই যে ষ্টেশনে জিতেন বাবু নামিবেন সেই ষ্টেশনে গাড়ী থামিল। জিতেন বাবু নামিলেন, সাহেবদ্বয় ও মেমটিও নামিলেন। জিতেন বাবুর প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হইতে লাগিল এইবার বুঝি পুলিশে গিয়া উহারা নালিশ করিবে, আর একটা গোলমাল বাঁধিবে। কিন্তু সাহেবদ্বয় তাহা না করিয়া জিতেন বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাঁর নাম কি ও তিনি কোথায় যাইতেছেন। জিতেন বাবু এ প্রশ্ন শুনিয়া মনে করিলেন বুঝি বা পুলিশে খবর দিবার জন্য নাম ধাম জানিতে চাহিতেছে। যাহাই হউক জিতেনবাবু সাহসী পুরুষ। তিনি তাঁহার নাম ধাম ও কোথায় যাইতেছেন সে সমস্তই বলিলেন। সাহেবদ্বয় তাঁর নাম শুনিয়া চমকিত হইয়া বলিলেন, "ও! আপনি জিতেন বাড়ুয্যে, আমরা তা জানিতাম না। ক্ষমা করিবেন। আপনি যেখানে যা দেখিতে যাইতেছেন আমরাও সেইখানে সেই উদ্দেশ্যে যাইতেছি। যা হইয়াছে সে সব ভুলিয়া যাউন। আপনি যদি মনে কিছু না করেন তাহা হইলে আপনি আজ হইতে আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু হইলেন।" এই বলিয়া সাহেবদ্বয় জিতেন বাবুর দিকে হাত বাড়াইয়া দিলেন, জিতেন বাবু পুলিশ প্রহরীর পরিবর্ত্তে সাহেবদ্বয়কে বন্ধুরূপে পাইয়া সকলই বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন এবং সাহেবদের প্রসারিত হাত ধরিয়া ইংরেজী কেতায় হাত নাড়িয়া দিলেন।

সেই সময়ে একবার সিটিকলেজগৃহে রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিসভা হইয়াছিল। তাহাতে রবিবাবু একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেই বৎসর আরও কয়েকজন বক্তা ইংরেজী ও বাংলায় বক্তৃতা করেন। সিটিকলেজের উপর তলায় এত বেশী লোকের সমাগম হয় যে, স্থান সংকুলান হয় না; সকলেই রবিবাবুর প্রবন্ধপাঠ শুনিবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়েন। রবিবাবু কেমন এক প্রকার সুর করিয়া তাঁহার গদ্য প্রবন্ধ পাঠ করিতেন, তাঁহার সেই লেখা বক্তৃতা পাঠ ও তদন্তে তাঁর গান শুনিবার জন্য এত লোকসমাগম। বক্তৃতা পাঠান্তে রবিবাবুকে গান গাহিবার জন্য সকলে অনুরোধ করিলেন। রবি বাবু প্রথমে নানা প্রকার আপত্তি করিয়া শেষে তাঁহার রচিত "কে যায় অমৃতধাম যাত্রী, আজি এ গহন তিমির রাত্রি" এই গানটী গাহিলেন। রবিবাবু সচরাচর তাঁহার নিজের রচিত গানই গাহিতেন। তার পর লোকের এত বেশী ভিড় হইল যে কলেজের কর্তৃপক্ষেরা কলেজগৃহের নীচে আর একটি সভার ব্যবস্থা করিলেন। সেই নীচের খোলা জায়গার সভায় রবিবাবুকে আসিয়া তাঁহার প্রবন্ধটী আর একবার পড়িতে হইল। একবার কলিকাতা ইউনিভার্সিটির আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় বিচারকরূপে গুরুদাস বাবু প্রভৃতি যে কয়েকজন

ছিলেন, রবিবাবুও তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন। এই সভায় কয়েকজন বক্তার ছাত্র বাংলার বিখ্যাত লেখকদের উৎকৃষ্ট গদ্য ও পদ্যের অংশবিশেষ আবৃত্তি করেন। সেই দিনের আবৃত্তির বিষয় ছিল—হেমবাবুর ভারত ভিক্ষার "যবন হৈমিনী সর্গ পাঠ করি, মম অন্তর্মুখ শোভায় উর্ব্বশি" ইত্যাদি। নবীনবাবুর প্রভাসের "আজ যা করবো মা তুই তাই মা আমার" ইত্যাদি। এবং রাজা বাবুর "বিদ্যাসাগর" প্রবন্ধের খানিকটা। আবৃত্তির পর বিচার শেষ হইলে বিচারক রবিবাবুকে সকলে গান গাহিতে অনুরোধ করিলেন। রবিবাবু প্রথমে অনেক আপত্তি করিয়া অবশেষে গাহিলেন—

"অয়ি ভুবন মনোমোহিনী,
অয়ি নির্ম্মল সূর্য্যকরোজ্জ্বল ধরণী
জনক-জননী জননী।
নীল সিন্ধুজল ধৌত চরণতল
অনিল বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল,
অম্বর চুম্বিত ভাল হিমাচল
শুভ্র তুষারকিরীটিনী।" ইত্যাদি।

এই গানটী ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে "সাধনা" মাসিক পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। "অয়ি ভুবন মনোমোহিনী" গানটী আজকাল অনেকেই জানেন। কিন্তু সেই সময় গানটী অতি অল্প দিন বাহির হইয়াছে। অতি অল্প লোকেই তাহা পড়িয়াছেন এবং তদ্ভিন্ন অল্প লোকে গানটি গাহিতে বিশেষতঃ স্বয়ং রবি ঠাকুরের কণ্ঠে গীত হইতে শুনিয়াছেন। কাজেই সেদিন অপরাহ্নে এই গানের ভাব ভাষা ও গায়কের মধুর কণ্ঠ স্বরের একত্র সমাবেশে শ্রোতৃবর্গকে যেন এক স্বর্গরাজ্যে লইয়া গিয়াছিল। এই গানটির এক একটী ছত্রকে এক একটী রত্নবিশেষ বলা যাইতে পারে। ইহার পূর্ব্বে বিদ্যাসাগরের স্মৃতিসভায় এমারেল্ড থিয়েটারগৃহে রবিবাবু "বিদ্যাসাগর" সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেই সভায় গুরুদাস বাবু সভাপতি ছিলেন। সভার কার্য্য হইয়া সভাভঙ্গের পূর্ব্বে অনেকেই সেদিন রবি বাবুকে গান গাহিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু সেদিন রবিবাবু গান করেন নাই বা করিতে পারেন নাই। পরে পুনরায় অনুরোধ করিয়া রবিবাবু আপত্তি করেন, যে দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তাঁর গলা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সেদিন তাঁহাকে ক্ষমা করিতে হইবে। কিন্তু শ্রোতৃবর্গ রবিবাবুর সে আপত্তি নামুলি ধরণের অকেজো আপত্তি মনে করিয়া, তাঁহাদের অনুরোধের মাত্রা উত্তরোত্তর বাড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু সেদিন রবি বাবুর আপত্তির মাত্রাও সেদিন বাড়িতে লাগিল, তখন সভাপতি গুরুদাস বাবুর বিচারে রবিবাবু সে দায়ে নিষ্কৃতি পাইলেন। গুরুদাস বাবুর রায় এইরূপ হইল। রবিবাবুর গলা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠে তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুণ্য চরিত্র আজ আপনাদের সম্মুখে কীর্ত্তিত হইল। বিদ্যাসাগর দয়ার অবতার ছিলেন। সুতরাং আপনারা বিদ্যাসাগরের সেই দয়ার কথা স্মরণ করিয়া 'দয়া' করিয়া রবিবাবুকে আজ গান গাহিতে বলিবেন না। একে সভাপতি, তায় আবার হাইকোর্টের জজ, তাঁর রায়ের বিরুদ্ধে আর আপীল চলিল না।

কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তখনও তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকগুলি লেখেন নাই। তখন "সাহিত্য" "সাধনা" "ভারতী" প্রভৃতি মাসিকপত্রে দ্বিজেন্দ্রবাবুর হাসির গান ও হাসির গল্প বাহির হইত। সেই সময়েই তাঁর "অদল বদল," "হরিনাথের শ্বশুর বাড়ী যাত্রা," "হর্ষি জানতে চাও আমরা কে?" "আমরা Reformed Hindus" পার ত কোথাও কেউ বিয়ে করেন "কর্ণার্জ্জুন কাহিনী" প্রভৃতি বাহির হয়। শিক্ষিত সমাজে দ্বিজেন্দ্রবাবুর এই সকল হাসির কবিতা ও গানের যথেষ্ট আদর হয়। নাটককার শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ তখন জেনেরেল এসেম্ব্লির রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন, তখন তাঁহার নাটকের মধ্যে বোধ হয় যেন "পুল নজর" বাহির হইয়াছে। সেই সময় বোধ হয় যেন ক্ষীরোদবাবু কোন এক মাসিক পত্রে একটী কবিতা লেখেন, সেই কবিতার এক ছত্র এইরূপ "থেকে থেকে কেন মাগো বীণার মার তান্।" সাহিত্য সম্পাদক সমাজপতি মহাশয় ইহা লইয়া ক্ষীরোদ বাবুকে খুব ঠাট্টা করেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত।

ভারত মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। (মনু)
The woman's cause is man's ; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free :
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall man grow ? (TENNYSON.)

বঙ্গানুবাদ :—স্ত্রী-পুরুষের উন্নতি অবনতি একসূত্রে গ্রথিত। নারী অনুন্নত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে পুরুষ কখনই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। (টেনিসন)

"I will be as harsh as truth, and as uncompromising as Justice ; I am in earnest—I will not equivocate, I will not retreat a single inch——and I will be heard." (WILLIAM LLOYD GARRISON.)

মর্ম্মানুবাদ :—আমি সত্যের ন্যায় কঠোর ও ন্যায়ের মত অনমনীয় হইব। আমি দৃঢ়সংকল্প, আমি কিছুতেই এক তিলও পশ্চাৎপদ হইব না। আমি নিশ্চিত জানি, তোমরা আমার কথার কর্ণপাত না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। (লয়ড গ্যারিসন)

১২শ ভাগ } মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩২৩। { ১০ম, ১১শ ও ১২শ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ।

কুলীদের দুঃখে নারীর বেদনা।

প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত ফিজি প্রভৃতি দ্বীপ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত একটী উপনিবেশ। এই সকল দ্বীপে ইংরেজ বণিকগণ ইক্ষুর চাষ করিয়া প্রচুর অর্থ লাভ করে। ভারতবর্ষ হইতে কুলী সংগ্রহ করিয়া তাহারা ফিজির ইক্ষুক্ষেত্রে মজুরের কাজ করায়। এই সকল কুলির প্রতি অতি অমানুষিক ব্যবহার করা হয়। এই সকল ব্যবহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া বোলপুর ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সন যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে ক্রোধে, লজ্জায়, ঘৃণায় ধৈর্য্য রক্ষা করা কঠিন হয়। ভারত-গবর্ণমেণ্টের যে আইনের বলে এই সকল কুলী সংগ্রহ করা হয় তাহা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে গত ২রা মার্চ্চ কলিকাতা রামমোহন লাইব্রেরী হলে বঙ্গমহিলাদের এক সভা হইয়াছিল। শ্রীযুক্তা প্রসন্নময়ী দেবীর প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে লেডি জে. সি, বসু সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। তিনি আসন গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত বক্তৃতা করেন।

লেডি জে. সি, বসুর বক্তৃতা।

সুদূর সাগর পার হইতে বিপন্ন ভ্রাতা-ভগিনীর যে আর্ত্ত কণ্ঠস্বর আমাদের হৃদয় ব্যথিত ও আলোড়িত করিতেছে, তৎসম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে আজ আমরা এখানে সকলে মিলিত হইয়াছি। এই প্রশ্নের রাজনৈতিক মীমাংসার ভার পুরুষের উপর। সে সম্বন্ধে তাহা কর্ত্তব্য তাহা তাঁহারা করিবেন।

আমাদের কর্ত্তব্য সাহায্য করা। নারীর রাজনৈতিক অধিকারে আমাদের জন্ম জগতের ছিন্ন ভিন্ন সভ্য দেশে যে সংগ্রাম চলিতেছে একদিন যে, সে তরঙ্গের আঘাতে আমাদের জাতীয় জীবনের কূলভূমি স্পর্শ করিবে তাহা অসম্ভব নহে, কিন্তু আমরা এখন একটী প্রশ্ন বিবেচনা করিবার জন্ম সমবেত হইয়াছি, যাহাতে নরনারীর কল্যাণ নিহিত। পুরুষ তাঁহার সবল স্কন্ধে জীবনের দুর্ব্বহ ভার তুলিয়া অগ্রসর হইতেছেন। গৃহ পরিবারকে নিরাপদে রক্ষা করিতে তিনি প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। পুরুষের কর্ত্তব্যের যাহা অবশেষ তাহা সম্পন্ন করিবার ভার আমাদের নারীজাতির উপর। গৃহের পবিত্রতা রক্ষা করা, শিশু-সন্তানও বালকবালিকা-দিগকে পবিত্রতার প্রাণপ্রদ বায়ুতে লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত করিয়া নারী চরিত্রের যাহা সর্ব্বোচ্চ গৌরব ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার প্রাণপাত করিয়াও তাহা রক্ষা করা—ইহাই আমাদের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। পুরুষ জীবন সংগ্রামের উত্তেজনায় ও বিবিধ প্রতিকূল শক্তির সংঘর্ষের মধ্যে পতিত হইয়া, যাহাতে মানবের নৈতিক জীবনের অধঃপতন ও বিনাশ সুনিশ্চিত, তাহার কথা ভুলিয়া গিয়া সময় থাকিতে সে দিকে উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন না করিতে পারেন কিন্তু নিরাপদ অন্তঃপুরে থাকিয়া আমরা স্থির ও সমাহিত দৃষ্টিতে সকলই বুঝিতে পারি। আমরা কেবল আর্থিক ক্ষতি লাভ বা বাণিজ্য ব্যবসায়ের সুবিধা বা অসুবিধা দিয়া চুক্তিবদ্ধ কুলিপ্রথার বিচার করিব না। আমাদের নিকটে এ অমানুষ বর্ব্বর প্রথার অন্যতা কেবলমাত্র ইহা বলিয়াও নয় যে, উহাতে কতকগুলি স্ত্রীলোককে ছলনা দ্বারা ও অর্থের লোভ দেখাইয়া এমন সঙ্কটময় অবস্থায় নিক্ষিপ্ত করে যে প্রতি বৎসর তাহাদের মধ্যে অনেকে আত্মহত্যার দ্বারা জীবনের সকল বিভীষিকা হইতে মুক্ত হইতে বাধ্য হয়।

আমাদের দৃষ্টিতে এই পৈশাচিক প্রথা এই জন্ম অসহনীয় যে ইহা নারীকে তাহার চরম দুর্গতিতে উপনীত করে। যাহা নারীকে আপনার লজ্জা পবিত্রতা ও ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য করে তাহা তাহার সুবর্ণ আনয়ন করিলেও সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। আমাদের নারীত্ব আর এই লজ্জাকর অপমান সহ্য করিতে পারে না। ভারতের হীনতম নারী পৃথিবীর যে কোন স্থানে এই ঘোর অপমান সহ্য করিবেন তাহা আমাদের প্রতিজনের বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

তৎপর শ্রীযুক্তা কামিনী রায় বি, এ প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া নিম্নলিখিত বক্তৃতা করেন।

শ্রীমতী কামিনী রায়ের বক্তৃতা।

উপনিবেশীরা নিজেরা যে কাজ করিতে পারে না বা যে কাজে স্বজাতীয়েরা নিযুক্ত হইলে অনেক বেতন দিতে হয়, সস্তায় সেই কাজ করাইবার জন্ম এ-দেশ হইতে লোক লইয়া যাওয়া হয়। আর কি দেশ নাই? আর কি কোন দেশের লোক মজুরী করিয়া খায় না? দারিদ্র্য কি আর কোথাও নাই? আছে; কিন্তু এমন অসহায় নিরাশ্রয় মজুরের দল, এমন হতভাগ্য মূর্খের দল, এমন গাধা গরুর মত খাটিয়া মরিবার দল বুঝি আর কোথাও নাই। অন্ততঃ দেখা যায় তো নাই—একদা যে আফ্রিকা হইতে দাস ব্যবসায়ীরা বল-পূর্ব্বক মানুষ ধরিয়া জাহাজে ভরিয়া আনিয়া আমেরিকা ও অন্যান্য স্থানে বিক্রয় করিত। কিন্তু হৃদয়বান লোক-হিতৈষীদের চেষ্টায় সেই দাস প্রথা রহিত হইয়াছে।

চুক্তিবদ্ধ মজুরী বা কুলী-চালান প্রথাও দাসব্যব-সায়েরই রূপান্তর। কেবল আজীবনের দাসত্ব না হইয়া পাঁচ পাঁচ বৎসরের জন্ম নির্দ্দিষ্ট। এই জন্যই ইহার নাম চুক্তিবদ্ধ মজুরী—দাসত্ব নহে।

কিন্তু ইহাতেও দুর্গতি ও লাঞ্ছনার একশেষ হইয়া যায়। কোথায় যাইতেছি কি কাজে যাইতেছি, না জানিয়া, ঠিক খবর পাইবার উপায় না পাইয়া আড়কাঠী-দের প্রতারণা বাক্যে মুগ্ধ হইয়া এদেশের দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট কত নরনারী, কত সরল নির্ভীক সৌভাগ্যান্বেষী যুবক ও বালক এই দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কত গৃহস্থের বধূ সম্পূর্ণ অজ্ঞানে ও অনিচ্ছায় আপনার গৃহ ও দেশ হইতে দূরে নীত হইয়া জাতি মান হারাইয়া আসে, যদি পথে জাহাজ হইতে সমুদ্রে ঝাঁপ দেয় সে তো মানপ্রাণ লইয়া মুক্তি পায়।

আসামের চুক্তিবদ্ধ কুলীদের কথা আমরা অনেকেই জানি। সেখানেও আড়কাঠিরা মানুষকে মিথ্যা লোভ দেখাইয়া লইয়া যাইত। আসামের চা বাগানে অনেক বীভৎস কাণ্ড ঘটিয়াছে, অনেক নারীর দুর্গতির একশেষ হইয়াছে, কিন্তু সুখের বিষয়, দেশব্যাপী আন্দোলনের ফলে সেখানে চুক্তির দুষ্টুরী প্রথা রহিত হইয়াছে।

আজ একটি কথা শুনে হইতেছে। হয়তো এখানে তাহার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। দিন কয়েক পূর্ব্বে আসামের কোন চা-বাগানে কাম্য নারী কোন এক কুলী নারী তাহার পশুপ্রকৃতি প্রভুর হাতে মান ও প্রাণ দুই হারায়। জানিনা তৎকালের সংবাদপত্রে প্রকাশিত এ ঘটনার কথা উপস্থিত কাহারও মনে আছে কিনা। আমার খুব মনে আছে, কারণ ঐ ঘটনার কথা পাঠ করিয়া আমার সেই তরুণ বয়সের রক্ত গরম হইয়া উঠিয়াছিল, আমি আমার ক্ষীণকণ্ঠে বঙ্গের নারী-কুলকে উদ্দেশ করিয়া "রমণীর ঘর" নামে একটী কবিতা কুলীদের বান্ধব এবং সকল নিগৃহীত জনের শুভাকাঙ্ক্ষী সঞ্জীবনী পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। আজ আমি সেই কবিতার কথায় সকলকে ডাকিয়া বলিতেছি—

কেমনে আমোদে কেটে যায় দিন ?
কেমনে ঘুমায়ে কাটাস্ নিশি ?
তোদের রোদন বিদারি গগন
দিক হতে কেন ছুটে না দিশি ?

দূরে প্রশান্ত মহাসাগর বক্ষে ক্ষুদ্র ফিজিদ্বীপে ভারতের কুলী নারীর দুর্গতির কথা সকলেই অল্পাধিক শুনিয়া আসিয়াছেন। রাজ্ঞীনেত্রী মহাশয়ার নিকটও শুনিলেন। যাঁহারা মেসর্সি এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সন সাহেবদ্বয়ের রিপোর্ট পড়েন নাই, তাঁহাদের উহা পড়িতে অনুরোধ করি। এস্থানে সবিস্তার সব বলা সম্ভব নয়। তবে মোটামুটি এইগুলি আমাদের অভিযোগ। তীর্থস্থানে হয়তো কোন নারী আত্মীয়দের হারাইয়া ছুটিতেছে এবং কাঁদিতেছে, আড়কাঠি নিকটে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কেন কাঁদিতেছ ? সে বলিল—আমার সঙ্গীকে খুঁজিয়া পাইতেছি না। চল আমি খুঁজিয়া দিতেছি, সে চলিল ফিজিদ্বীপের

কোন মালিকার স্বামীর সহিত তাহার পিতার সদ্ভাব নাই, তাহাকে শ্বশুরবাড়ী যাইতে দেওয়া হয় না। আড়কাঠি যাইয়া বলিল, তাহার স্বামীর বড় অসুখ করিয়াছে। একবার তুমি গিয়া দেখিয়া এস। সে পিতামাতাকে লুকাইয়া স্বামীকে দেখিতে চলিল — কোথায় স্বামী, কোথায় পিতা। সে অশান্তির প্রশান্ত মহাসাগরের বক্ষে ঝাঁপ দিতে চাহিতেছে। কেবল নারী নহে, পুরুষদেরও নানারূপে প্রতারিত হইয়া কুলী-রূপে চালান হইতেছে।

১। স্ত্রী-পুরুষদিগকে ভুলাইয়া লইয়া যাওয়া হয়।

২। যাহাতে তাহাদের স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে এক ঘরে বাস করিতে দেওয়া হয়। স্ত্রীলোকদের সম্ভ্রম রক্ষার কোন বন্দোবস্ত থাকে না, দ্বীপে পৌঁছাইয়া দিবার পর তাহাদের বাসের সুব্যবস্থা হয় না। এক পরিবারের স্ত্রী-পুরুষ একসঙ্গে না লওয়াতে এবং স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন স্ত্রী, স্ত্রী হইতে বিচ্ছিন্ন স্বামীদের একত্র ফেলিয়া রাখাতে নীতির বন্ধন থাকে না, কেবল তাহাই নহে, কর্ত্তৃপক্ষের ইচ্ছায় ও শাসনে ও বিধানে দুর্নীতির পথ মুক্ত রাখা হয়।

স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা সমান না হওয়াতে এবং দুর্নীতি প্রচলিত ও প্রশ্রয় প্রাপ্ত হওয়াতে পুরুষদের মধ্যে ঈর্ষা-জনিত আত্মহত্যা এবং নারী-বধের ভীষণ প্রাদুর্ভাব। যাহারা দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিতেছেন তাঁহারাও এই আত্মহত্যা ও নারী-বধ নিবারণ করিতে সচেষ্ট, কারণ ইহাতে তাহাদের পয়সা নষ্ট হয়। এক একটি পুরুষ কুলীকে ৪০৲, এক একটী নারীকে ৫০৲ টাকা দিয়া প্রথমে কিনিতে হয়। তাহার পথ খরচ বোধ হয় সাড়ে তিন শ টাকা, সে যতদিন কাজ করে সপ্তাহে ৩৪৲ টাকা করিয়া পায়। এই মজুরীর দাম তত কিছু নহে, আসিবার খরচটাই তাহাদের গায়ে লাগে।

আমাদের দেশের মানুষদের এত উপনিবেশীদের মমতা না থাকাই সম্ভব। কিন্তু আমাদের রাজপুরুষদের কিছু মমতা হওয়া উচিত। তাঁহাদের রাজধর্ম্ম আছে, তাহা অবশ্য পালনীয়। দুর্ব্বল অজ্ঞ নিরাশ্রয় কুলীদের

মান এবং প্রাণ স্নেহ এবং ধর্ম্ম দুইই রক্ষা হইতেছে কিনা তাঁহারা দেখিবেন না?

কেহ কেহ বলেন, ছোটলোকদের মধ্যে অমন দুর্নীতি ইত্যাদি সর্ব্বদাই ঘটে। একি সত্য কথা? আমাদের দেশের ছোট লোক কি সত্য সত্যই এত হীন? সভ্যদেশের লোকেরা কি বার বার এ সাক্ষ্য দেন নাই যে, এদেশের শ্রমজীবীরা, দরিদ্র বৃহদ্বেরা সকল দেশের দরিদ্র শ্রমজীবীদের চেয়ে সুসভ্য, সংযত ও নীতিবান? আমাদের দেশে ডোম, বাগ্দী, হাড়ী, চণ্ডাল সকলেরই মধ্যে সতীনিষ্ঠা আছে। বিষয় বিশেষে কুসংস্কার থাকিতে পারে, পৌত্তলিকতা থাকিতে পারে, কিন্তু নীতি নাই এ কথা আমরা মানি না।

আর কেবল হাড়ী ডোম, চণ্ডাল ও অন্যান্য অস্পৃশ্য জাতিই কুলী হইতেছে, তাহা নহে। ভদ্রলোকের ছেলে, ভদ্র ঘরের বধূও প্রতারিত হইয়া কুলীরূপে নীত হইতেছে।

আমাদের রাজপুরুষদের মতে স্ত্রী-কুলী ও পুরুষ কুলীর সংখ্যা সমান হইলে পুরুষ কুলীরা আত্মহত্যা ও নারী-বধ হইতে বিরত হইবে। আমাদের মতে ইহাও সমীচীন প্রতিবিধান নহে। ইহাতে নারীর প্রাণরক্ষা হইলে হইতে পারে, কিন্তু তাহার মান যে তাহার প্রাণের চেয়ে অনেক বড়। মান রক্ষার কি হইল? পাঁচ বৎসরের জন্য প্রবাসে গিয়া স্ত্রীপুরুষ ভাবে থাকিয়া অতঃপর তাহাদের কি দশা হইবে, সে কথা কে ভাবে? বিবাহবন্ধন দাম্পত্য-ধর্ম্ম প্রভৃতি পাঁচ বৎসরের জন্য পরিবর্ত্তন করিবার যে ব্যবস্থা, সে ব্যবস্থা দিবার অধিকার রাজপুরুষদের কে দিয়াছে? নারী-পুরুষের সংখ্যার সমতায় দুর্নীতি ও পাপের স্রোত রুদ্ধ হইবে না, অতএব এই কুলি চালান প্রথা সমূলে উচ্ছেদ করিতে হইবে।

আপনার দেশ হইতে বহুদূরে আত্মীয়স্বজন হইতে বহুদূরে আনিয়া আপনার ভাষা বোঝে এমন মানুষ হইতেও দূরে আনিয়া দুর্ব্বল স্ত্রীলোকদিগকে পাপের আবর্ত্তের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া অতি নিষ্ঠুরের কাজ। এই কথা আমাদের রাজপুরুষদের বুঝাইতে হইবে। রাজা প্রজার রক্ষক; নিজেদের দেহ রক্ষার জন্য, পেটের দুই মুঠা অন্নের জন্য সাত সমুদ্র তের নদীর পারে যে হীন প্রজারা যাইতেছে,—যাহাকে বিদেশীর কাজ উদ্ধারের জন্য প্রলুব্ধ ও প্রতারিত করিয়া অন্যত্র লইয়া যাইতেছে তাহাদের প্রতি আমাদের মহারাজের এবং তাঁহার প্রতিনিধির বিশেষ কর্ত্তব্য আছে। আমরা নারীর সকল কণ্ঠ একত্র করিয়া এই ঔদাসীন্য ও অবিচারের বিরুদ্ধে রাজপুরুষদিগকে জাগাইয়া তুলিব। আমরা নারী, আমরা ভারতবাসিনী। উপনিবেশের লাভালাভ যুরে থাকুক, স্বদেশের আর্থিক লাভালাভের চেয়ে ধর্ম্ম আমাদের বড়। এদেশে সতীত্বের মূল্য কি তাহা কাহাকেও বুঝে শিখাইয়া দিতে হয় না। এখানে সতীত্ব নাশের ভয়ে শত শত রাজপুত নারী চিতানলে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন; এদেশে লোকান্তরে জন্মান্তরে একই পতির পত্নী থাকিবার আকাঙ্ক্ষায় নারী স্বামীর চিতায় জীবন্ত-দেহ ভস্মীভূত করিয়াছে। রক্ত মাংসের সঙ্গে সে শিক্ষা যুগে যুগে চলিয়া আসিতেছে। নারী-চরিত্রের শুদ্ধতা এদেশে চিরদিন পূজা পাইয়া আসিতেছে। সতী শব্দের মধ্যে এই শুদ্ধতার আদর্শ চিরকালের মত গ্রথিত হইয়া আছে। The chaste has become synonymous with the true and the good.

এই দেশ হইতে কিনা নারীকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়া তাহাকে তাহার লজ্জাসম্ভ্রম নষ্ট করিতে দেওয়া হয়, কুলী হইলে তাহাকে ভ্রষ্টা নারীদের সহিত মিশিতে দিয়া বলপূর্ব্বক এবং বিধিপূর্ব্বক তাহাকে সতী নামের অযোগ্য করা হয়।

ইহা যে কতদূর গর্হিত কাজ কেন রাজপুরুষেরা তাহা বুঝিতেছেন না, এবং বুঝিয়াও কেন ইহার প্রতিকারে ব্যগ্র হইতেছেন না, আমরা নারীরা তাহাই বুঝিতে পারি না। আমরা রাজনৈতিক ব্যাপারে হাত দিতে অত্যন্ত নই, নিজ-নিজ গৃহ পরিবার লইয়াই ব্যস্ত থাকি এবং সেইরূপ ব্যস্ত থাকিতেই চাই কিন্তু যখন এমন সব ব্যাপার আমাদের কাণে আসে, যাঁহারা স্বচক্ষে এ সকল প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা

যখন এই সকল কথা আমাদের জানান, তখন আমাদের পক্ষে মিশ্চেষ্ট থাকা অসম্ভব—সম্ভব হইলেও অন্যায় ও পাপ।

পুরুষ নারীর সংখ্যার সমতায় কি হইবে? পুরুষেরা যদি প্রত্যেক স্ত্রী সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিত, তাহা হইলে ভাল হইত, কিন্তু তাহাতো হয় না। হইলেও তাহাতে কুলীদের মনিবদের লাভ নাই। গৃহধর্ম ও সন্তান পালন এবং সারাদিন ইক্ষুক্ষেতে কাজ কুলীনারীর পক্ষে এক সঙ্গে করা সম্ভব নহে। যদি কেবল পুরুষ কুলী রাখা সম্ভব হইত মনিবেরা তাহাই ইচ্ছা করিতেন। কিন্তু তাহাও সম্ভব নহে। পুরুষ কুলিদের কাজে লাগিয়া রাখিবার জন্য গড়ে ১০০ পুরুষের সঙ্গে ৪০ জন করিয়া স্ত্রীকুলি প্রেরিত হয়।

আর সকল কুফলের কথা বলার প্রয়োজন নাই। এই নরকে যদি কোন পরিবারের থাকা সম্ভব হয়, এবং যে পরিবারে সন্তান সকল জন্মে ও বর্দ্ধিত হয়, তাহারা কি গৃহস্থ সন্তানের মত হইবে?

অতএব এই কুপ্রথা রহিত করিতে হইবেই হইবে। সভ্য দেশ হইতে নারীকে লইয়া গিয়া তাহাকে কলঙ্কলিপ্ত করিতে আমরা দিব না। ফিজিদ্বীপে বিদেশাগত লোক আসিয়া ইহাদিগকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছে, এই দেখ ভারত নারী।

আমরা ভারত নারীর নাম এইরূপ মসীলিপ্ত হইতে দিব না, উহা চিরদিন উজ্জ্বল রাখিতেই চেষ্টা করিব—নহিলে মিথ্যা আমাদের স্বদেশ প্রেম, মিথ্যা আমাদের শিক্ষা।

আমি আমার সেই পুরাতন কবিতা হইতে বলিতেছি—

কে আজ নীরবে রয়েছিস দেশে
কার ভ্রাতা পতি মগন ঘুমে
রমণীর স্বর গৃহতেদ করি,
হউক ধ্বনিত সমস্ত ভূমি।

আজ আমাদের স্বর রাজপ্রতিনিধির দরবার পর্য্যন্ত পৌঁছুক।

আমি প্রস্তাব করিতেছি যে

চুক্তিবদ্ধ মজুরী অর্থাৎ কুলী চালান প্রথার দুষ্টীয়তা জানিতে পারিয়া এবং তজ্জন্য ভারতের নারীগণ কিরূপ অপমানিত অবমানিত হইতেছে, আমাদের সমগ্র নারীজাতির লজ্জার কারণ হইতেছে, ইহা অনুভব করিয়া বঙ্গ রমণীগণের এই সভা মহামান্য রাজপ্রতিনিধি মহাশয়কে এই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করুন যে আগামী ৩১ এ মে তারিখের মধ্যে উপনিবেশ সমূহের কুলি চালান প্রথা সম্পূর্ণরূপে রহিত হউক।

শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী বি, এ ঐ প্রস্তাবের অনুমোদন করেন। তিনি বলেন:—

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবীর বক্তৃতা।

বিধির বিধানে নারীহৃদয়ে বেদনাবোধ স্বতঃই অধিক, তাই নারী জননী হইবার অধিকারিণী। অনেক দুঃখের বোঝা তাঁহাকে বহিতে হয়, কঠোর আত্মত্যাগের দ্বারা প্রতিদিন তাঁহার জীবন গড়িয়া ওঠে, তিনি সন্তানের প্রসূতি, স্বামীর সহধর্ম্মিণী, ভ্রাতার ভগ্নী, পরিবারের সকলের কল্যাণবিধায়িত্রী। তাই সহানুভূতির আহ্বানে তাঁহাকে যত বিচলিত করে, সমস্ত জগৎ অপরের সুখ দুঃখের স্পর্শে যেমন সাড়া দিয়া ওঠে এমনটি পুরুষের হয় না। এজন্য নারীর দ্বারায় পুরুষের লজ্জাবোধ করিবার কারণ নাই, কেননা ইহা স্বাভাবিক, বিধিদত্ত, স্বোপার্জ্জিত কিছুই নয়। নারীর কার্য্যক্ষেত্র পরিবারের মধ্যে তাই বলিয়া চিরকালই সেখানে আবদ্ধ থাকিতেই হইবে, এমন কোন কথাতো নাই। স্নেহ প্রীতি ও ঔদার্য্য গুণের স্বভাবই এই যে তাহা সুপ্রসারিত, স্নেহের ধর্ম্ম বিস্তৃত।

নারীর কর্ত্তব্য পরিবার প্রতিবেশী সমাজের মধ্যে ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতেছে, ইহা আমরা প্রতিদিনই দেখিতে পাইতেছি। এক সময়ে আমাদের দেশ বোধ হয় তেমন জীবন্ত ছিল না, তখন আমরা আমাদের মহিমান্বিত অতীতের কথা স্মরণ করাই দেশভক্তি ও প্রীতির চূড়ান্ত মনে করিতাম, কিন্তু আজ অতীতের চরণে অঞ্জলি অর্পণ করিয়া মন তৃপ্ত হয় না। বর্ত্তমানকে ষোড়শোপচারের পূজা কেমন করিয়া যোগাইব তাহারই অবসর খুঁজিতে ব্যস্ত। দেশাত্মবোধ যে আমা-

ছেয়ে ফেলিয়াছে স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই মধ্যে তাহার ছুরি ছুরি প্রসার। চারিদিকে কোথায় দুর্ভিক্ষ, কোথায় বন্যা, কোথায় মহামারি, দেশের ভাই ভগ্নী কিংবা, নিরন্ন, আশ্রয়হারা, মৃত্যুতীত, অসহায়, স্ত্রীপুরুষ নির্বিচারে প্রত্যেক প্রাণের ভগ্নী বেদনার সহানুভূতিতে কাঁপিয়া ওঠে, সামান্যতম সেবা সাহায্য না দিয়া আপনার কাছ হইতেই অব্যাহতি লাভ হয় না, যতক্ষণ আপন দেশ ও দেশ মায়ের ঋণভারে জন্য করিয়া না দি, ততক্ষণ মনের পেয়াদা কেবলই তাগিদ দিতেই থাকে।

আজ যখন রাজার নাম ও দেশের মানরক্ষাকল্পে দেশ মায়ের ভাইয়েরা প্রাণপণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, দুঃখের আহ্বানে আত্মবিসর্জন করিতে প্রস্তুত, স্বচ্ছল সুখের সঙ্কীর্ণপথ জীবনের স্বচ্ছন্দতা মাতৃসেবায় উৎসর্গ করিতে দ্বিধাহীন, সামান্য কয় গ্রাসাচ্ছাদনমাত্র লইয়া সৈনিকের দুরূহ জীবন গ্রহণ করিতে ব্রতী, তখন সুদূর হইতে আমাদের পীড়িত, অবমানিত, অত্যাচার দলিত ভাইভগ্নীর দুঃখের ক্রন্দন আমাদের মনের দ্বারে বারংবার বেদনার আবেদন জানাইতেছে। এ দুঃখ নূতন নয়, অনেকবার শুনিয়াছি, কিন্তু আজ এ আহ্বান যেমন করিয়া হৃদয়কে আঘাত করিয়া জাগ্রত করিতেছে, এমন তো কোন দিন করে নাই। আজ সমস্ত দেশের মন সজাগ, আজ অন্তরের অনুভূতি বড় প্রবল, তাই এ অত্যাচারের প্রতিকার করিবার জন্য অগ্রসর হইতেই হইবে।

আমরা নারী, তাই বলিয়া দুর্বল নহি, এ দেশে নারী চিরদিনই বীরের কর্তব্যের সহায়তা করিয়াছে, যে দেশে দ্রৌপদীর মত সম্রাজ্ঞী, সুভদ্রার মত মাতা, পদ্মিনীর মত আত্মগৌরব রক্ষাকারিণী, সাবিত্রীর মত মৃত্যুবিজয়িনী সাধ্বী জন্মগ্রহণ করিয়া জীবন্ত আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, সেখানে নারীর সম্মান রক্ষা করিবার আহ্বান যখন আসিয়াছে, তখন আমরা আমাদের আরাম-বহুল শান্তিময় নিভৃত বৃহনীড়খানিতে নিশ্চিন্ত হইয়া কেমন করিয়া বসিয়া থাকিব? রাজনৈতিক আন্দোলন কি তাহা আমরা জানি না, জানিতেও চাহি না, আমরা জানি আমাদের দেশ-ভ্রাতাদিগকে, আমরা জানি মাতা-ভগ্নীর অপমানে তাঁহাদের উচ্চ মস্তক অবনত হইতেছে—আমরা আবেদন করিব তাঁহাদেরই কাছে। বলিব ভাইসকল, বন্ধুগণ, উপায় কর। রাজপুরুষের কাছে কেমন করিয়া কি বলিলে সুফল হইবে, তাহা তোমরা আমাদের অপেক্ষা ভাল করিয়া জান, সেই জ্ঞানকে আজ কাজের সহায় কর। আমাদের যাত্রাপথ তোমাদের মত সুদূরবিস্তৃত নয়, এখনও তাহা সঙ্কীর্ণ, এখনও তাহা অনতিদীর্ঘ, তবু যতখানি পথ আমরা সঙ্গে যাইতে পারি, তাহার ত্রুটি করিব না। একত্রে আমরা আমাদের প্রবাসী ভ্রাতা-ভগিনীর জীবন স্বাধীন করিবার উপায় করিয়া দিব। স্বর্ণপ্রসূ ভারতবর্ষে কি তাহাদের দিনান্তের অন্ন সংস্থান হইবে না, এত গোত এত চুঁই, এত কলকারখানা পড়িয়া আছে, এখানে কি আমরা তাদের মোটা ভাত কাপড় যোগাইতে পারিব না? নাই যদি পারি, কাজ যদি নাই জোটে, তবে আমাদের দিনান্তের অন্নমুষ্টি তাহাদের সহিত ভাগ করিয়া খাইব, আমাদের পরিধেয় বস্ত্র বিলাইয়া তাহাদের লজ্জা রক্ষা করিব। ফিরাইয়া আন তাহাদের, ফিরাইয়া আন।

নারীর দেহ, সেইত তার দেবতার মন্দির, বিলাসীর লোলুপদৃষ্টিপাতেও কলুষিত হইবে বলিয়া বেদনা বোধ হয়, সেই দেবায়তন পণ্য সামগ্রীর মত হাতে হাতে ফিরিতেছে, জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্মান ধূলি অবলুণ্ঠিত—শুধু দিনান্তের অন্নমুষ্টি, ক্ষুধার যাতনা হইতে পরিত্রাণ, শুধু কয়েকখণ্ড তুচ্ছ রজত মুদ্রার বিনিময়ে তাহার সর্বনাশ হইতেছে, এ কথা শুনিয়া মন যে ধৈর্য্য মানে না। কাল বিলম্বে, বিধির বিধানে বিদেশে স্বদেশের নারীর জীবন ও সম্মান সুরক্ষিত হইবে, এ কথায় কে সায় দিতে পারে? রাজকীয় আদেশ বিধিবদ্ধ হইতে থাকুক, আজ তোমরা স্থিরপ্রতিজ্ঞ হও, আজ তোমরা উপায় কর আর যেন বিদেশে কুলী চালান না হয়—যাহারা গিয়াছে, তাহাদের কাল পূরণ হইবামাত্র তাহাদিগকে ফিরাইয়া আন, তাহাদের আশ্রয় দাও, তাহাদের জীবিকার ব্যবস্থা কর।

নারীর অপমান, মাতৃজাতির অবমাননা, যে দেশ-

ভাইগণ এ দুর্দৈব ঘটিতে দিয়ো না, মাতৃ অপমানে চিরদিন অকল্যাণ শঙ্কিত হইয়া উঠে। তাহা দূর করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প, স্থিরনিষ্ঠ হও—

কেমনে সহিছ বীর হেন মাতৃ অপমান ?
হেরি ঘৃণ্য ব্যবসায় দৈন্য গ্লানি নিরাশায়
চিত্ততরে বেদনায়, জ্বলিয়া ওঠেনা প্রাণ ?
যে তোমারে গর্ভে নিয়ে প্রাণ দিল প্রাণ দিয়ে
যার বুকে দুধ পিয়ে পাইলে জীবন দান,
তোমারে পাইলে বুকে ভোলে যে সকল দুখে
তোমারে রাখিতে সুখে ত্যজে লজ্জা অপমান।
সেই মা পথের ধারে কাঁদিছে আকুল ধারে
সন্তানে সহিতে নারে জননীর অসম্মান।
কুলাঙ্গার দুর্য্যোধন স্পর্শে অঙ্গ পরশন
কেশে ধরে দুঃশাসন করিবেন পরিত্রাণ ?

তৎপর শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু বি, এ এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন এবং বলেন :—

শ্রীমতী কুমুদিনী বসুর বক্তৃতা।

দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত ট্রিনিডাড, ডেমেরারা, আফ্রিকার নিকটবর্ত্তী মরিসাস, আটলান্টিক মহাসাগরের স্থিত আজেরা এবং প্রশান্ত মহাসাগরে স্থিত ফিজি দ্বীপে ইংরাজগণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। এই সকল স্থানে বিপুল চিনির কারবারই তাঁহাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের প্রধান অবলম্বন। চিনি প্রস্তুত করিবার জন্য এইসকল দ্বীপে অসংখ্য আখের ক্ষেত এবং কলকারখানা আছে। এই সকল ক্ষেত, কলকারখানা চালাইবার জন্য ভারতবর্ষ হইতে সদাসর্ব্বদা দরিদ্র, অজ্ঞ নরনারী-দিগকে মিথ্যা প্রলোভন বাক্যে ভুলাইয়া কুলী করিয়া চালান দেওয়া হয়। আমাদেরই দেশের একদল লোক এই মানুষ চুরীরূপ ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত আছে। ইহারা প্রতি পুরুষের জন্য ৫০৲ এবং প্রতি রমণীর জন্য ৫৭৲ পাইয়া থাকে। দরিদ্রের সম্মুখে ইহারা ঐশ্বর্য্য এবং সমৃদ্ধিলাভের এমন এক মোহনচিত্র অঙ্কিত করিয়া দেখায় যে সে অমন সুখময়, আরামপূর্ণ জীবন যাপনের প্রলোভনে ভুলিয়া অজ্ঞাতসারে দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। গ্রামের অজ্ঞ সরল নিরীহ নরনারীদিগকে ফিজি কলিকাতার নিকটেই এক বনবাদাড়ময় স্থান, সেখানে সোণার গাছে মুক্তার ফল ফলে এইরূপ ছলনাপূর্ণ মিষ্ট বাক্যে ভুলাইয়া কি ভয়ানক জঘন্য, দুর্নীতিপূর্ণ অবস্থার মধ্যে বাস করিতে বাধ্য করে, তাহার বিবরণ পাঠ করিলে দেহ শিহরিয়া উঠে, মর্ম্মান্তে মর্ম্মান্তে শোণিত দ্রুত সঞ্চালিত হয়, ঘৃণায় অসাড় অঙ্গ উত্তেজিত হইয়া উঠে। তাহাদিগকে সাধারণতঃ পাঁচ বৎসরের চুক্তিতে আবদ্ধ করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। অবশ্য অজ্ঞ নরনারীগণ এই চুক্তির কথা পূর্ব্বে কিছুই জানিতে পারে না। ফিজি দ্বীপে পৌঁছিলে তাহাদিগকে এই চুক্তির কথা জানান হয়। তখন ইহা জানিয়া তাহারা যতই কাতর ক্রন্দনে ধরা সিক্ত করুক না কেন, স্বদেশ, স্বজাতি, প্রিয়জন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যতই হাহাকার করিয়া মরুক না কেন, আর ফিরিবার পথ থাকে না। তাহাদের সেই বুকফাটা বেদনায় পাষাণ গলিলেও গলিতে পারে, কিন্তু এই সকল অমানুষ মনুষ্যরূপী পাষাণের প্রাণে এক বিন্দুও দাগ বসে না। একবার এই পাষাণ প্রাচীরে ঘেরা চুক্তির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িলে তাহার শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, সকল প্রকার দুর্গতির মধ্যে ডুবিতে আরম্ভ করে, এবং ক্রমে ক্রমে মানবোচিত সকল মহত্ব হারাইয়া পশুর ন্যায় জীবন যাপন করে। • • • পতি হইতে পত্নীকে, পত্নী হইতে পতিকে প্রাণপ্রিয় সন্তান সন্ততি হইতে মাতাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া মিথ্যা প্রলোভনে ভুলাইয়া লইয়া যাইতেছে। শুধু উপার্জ্জনের জন্য লইয়া গেলে ত ক্ষতি ছিল না, কিন্তু নরনারীদিগকে অতি জঘন্য ঘৃণ্য জীবনের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিতেছে। সে দেশে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান কোন ধর্ম্মানুসারে বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া গণ্য হয় না। সুতরাং ভারতবর্ষ হইতে বিবাহিত হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ধর্ম্মানুসারে বিবাহিত পতি পত্নী সে দেশে গ্রাহ্য হয় নাই। সে দেশের Immigration departmentএর আফিসে গিয়া টাকা দিয়া নাম রেজেষ্ট্রী করিলে যে কেহ পতি পত্নী সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে পারে ইহার ফল কি ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। ১৯১৩ সনের Immigrationএর যে রিপোর্ট বাহির হইয়াছে তাহাতে দেখা

যায় যে ঐ সনে ৭৪০ জন স্ত্রীলোক ব্রিটিশ এবং অন্যান্য বৈদেশিক জাতির উপনিবেশে কুলি-রূপে প্রেরিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ১৯১ জন স্ত্রীলোক স্বামীসহ গিয়াছিল, অবশিষ্ট ৫৪৯ জন স্ত্রীলোককে অবিবাহিত বলিয়া রেজেষ্টরী করা হইয়াছিল। রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে এই ৫৪৯ জনের মধ্যে ১৪২ জনের বয়স ১৫ হইতে ২০, ১৬২ জনের বয়স ২০ হইতে ৩০ এবং ২৭ জনের বয়স ৩০ হইতে ৪০। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এই সাময়িকভাবে প্রকাশিত রেপোর্টে ৫৪৯ জনের মধ্যে ৪৩১ জন স্ত্রীলোকের অবিবাহিত থাকা সম্বন্ধে সন্দেহ করা। যাহারা অবিবাহিতরূপে এই সব দেশে যায় তাহারা যে কি হীন জীবন যাপন করে তাহা বলা যায় না। এক-জন ভারতবাসী মিঃ এণ্ড্রুজকে বলিয়াছিল, "সাহেব, এই সকল স্ত্রীলোক নৈতিক জীবনের চরমসীমায় উপস্থিত হইয়াছে, লোকে যেমন বস্ত্র পরিবর্তন করে, ইহারা তেমনি স্বামী পরিবর্তন করে।" এই কথায় ইহাদের ঘোর দুর্গতির কথা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। অধিক বলিয়া লেখনী কলঙ্কিত করিব না। শুধু এই একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। একটি সধবা হিন্দু পরিবারের দুই ভাই এবং একটী অবিবাহিতা ভগ্নী ঐ দেশে উপার্জ্জনের জন্য গিয়াছিল। কিন্তু সে-খানে পৌঁছিলে পর ঐ বিবাহিতা ভগ্নীর বিবাহ অসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হওয়াতে এক ব্যক্তি কুলী-চালান-অফিসে গিয়া রেজেষ্টরী করিয়া তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইল। দুই ভাই বহু চেষ্টা করিয়াও যখন ঐ ব্যক্তিকে নিরস্ত করিতে পারিল না তখন তাহারা যাইয়া ভগ্নীকে হত্যা করিল এবং নিজেরা থানায় গিয়া হত্যা-কারী বলিয়া ধরা দিল। হা, হিন্দুস্থানের উপযুক্ত কার্য্যই বটে। কৃষ্ণকুমারীর জন্মভূমির যোগ্য কার্য্যই হইয়াছিল।

এই ঘোর দুর্নীতির ফলে ফিজি প্রভৃতি দ্বীপে আত্মহত্যার সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। ফিজিদ্বীপে ভারত-বর্ষ অপেক্ষা আত্মহত্যার সংখ্যা ২০ গুণ বেশী এবং নরহত্যার সংখ্যা ৮০ গুণ বেশী।

ভগিনীগণ, এই শোচনীয় অবস্থার কথা জানিয়াও কি আমরা মৃতের মত পড়িয়া থাকিব? রাজনীতি-ক্ষেত্রে পুরুষদের হাত না দিয়া, অন্তরস্থ আমরা আর এসব বিষয়ে কি করিতে পারি, এই বলিয়া কি বিবা আরামে থাকিয়া দিন কাটাইয়া দিতে ত পারি না। আমরা কিছু করিতে পারিব না সত্য, কিন্তু আমাদের প্রাণের তীব্র ঘৃণা ত জ্ঞাপন করিতে পারি। যে প্রথা ভারতনারীর নারীত্ব নষ্ট করিয়া অশেষ প্রকার দুর্গতি আনয়ন করিতেছে সে প্রথার বিরুদ্ধে ঘোরতর প্রতি-বাদ ধ্বনি ত তুলিতে পারি। আমরা দুর্বল, আমরা কিছু করিতে অক্ষম, এই বলিয়া ঘুমাইবার দিন আর নাই। আমাদের বহন ক্ষমতা আমরা না বুঝাইলে আর কাহারও তাহা বুঝিবার সাধ্য নাই। তবে ভারত-বর্ষের নারীত্বের সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সমগ্র নারী সমাজের শক্তি জাগ্রত হইয়া উঠুক। আপনাদের কুসুমকোমল অথচ প্রয়োজন স্থলে বজ্রাদপি দৃঢ় হৃদয়ের তীব্র প্রতিবাদধ্বনির ভৈরব নিনাদে সমগ্র হিন্দুস্থান প্রকম্পিত করুন। এই দেবাধ্যুষিত পুণ্য ভূমির নারি-দিগকে এই ঘোর পাপে আর নিমজ্জিত থাকিতে দিব না, এই প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়সঙ্কল্প হউন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব ডাক্তার শ্রীযুক্তা কাদম্বিনী গাঙ্গুলী বি, এ উত্থাপন করেন। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি এই।—এই সভা মাননীয়া সভানেত্রী মহাশয়াকে প্রস্তাবগুলি বড়লাটপত্নী লেডি চেম্‌স্‌ফোর্ডের নিকট এবং সকল সম্প্রদায়ের মহিলাগণের স্বাক্ষরিত একটি আবেদনপত্র রাজ্ঞী মেরীর নিকট পাঠাইতে অনুরোধ করিতেছেন।

শ্রীযুক্তা কৃষ্ণভামিনী দাস এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন এবং শ্রীযুক্তা বাসন্তী মিত্র বি, এ উহার সমর্থন করেন।

তৎপর শ্রীযুক্তা লীলাবতী মিত্র মহাশয়া সভানেত্রী মহোদয়ার এদেশের নারী-জাতির কল্যাণচেষ্টার কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

এই সভার প্রস্তাবগুলি তারযোগে বিলাতে ভারত-সচিব মহোদয়ের নিকট প্রেরিত হইয়াছে।

শ্যামনগরের জমিদার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৩)

মিস্ সিসিলিয়াকে ডেস্‌ডেমোনার ভূমিকার অভিনয় শিক্ষা দিতে গিয়া দেখিলাম, আমি তাঁহাকে শিক্ষা দিব কি, তিনি অনেক স্থানে আমার অভিনয়ের ত্রুটী দেখাইয়া তাহা সংশোধন করিয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহার নিজের অংশের অভিনয় এমন সুন্দর করিয়া করিতে লাগিলেন যে, আমি তাহা কল্পনাতে আনিতে পারি নাই। এইরূপে দুই দিবস ধরিয়া মিস্ সিসিলিয়া ডেস্‌ডেমোনার ভূমিকার রিহার্সাল দিলেন। ক্রমে অভিনয়ের রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল।

অভিনয়ের পূর্ব্বে মিস্ সিসিলিয়া তাঁহার পরিচ্ছদ সম্বন্ধে দুএক স্থানে নিজের মত খাটাইয়া এমন করিয়া সাজিলেন যে, তাঁহাকে দেখিয়া মিস্ সিসিলিয়া বলিয়া চিনিবার উপায় রহিল না। ক্রমে অভিনয় আরম্ভ হইল। ব্যবসাদারী রঙ্গমঞ্চে তিনি এই প্রথম অবতীর্ণ হইতেছেন। অভিনয়ের জন্য রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বক্ষণে মিস্ সিসিলিয়া আমাকে বলিলেন যে, "কি জানি আমার কেমন ভয় করিতেছে। আমার মনে হইতেছে যে রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া একটী কথাও আমার মুখ দিয়া বাহির হইবে না।" আমি তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়া বলিলাম, "কোন চিন্তা নাই। আপনার অভিনয় অতি সুন্দর হইবে। বৃথা চিন্তা করিবেন না।" মিস্ সিসিলিয়া রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া অভিনয় করিতে লাগিলেন। সে দিন অভিনয় খুব ভাল হইল। অভিনয় শেষ হইবার পর মিঃ ডিক্স মিস্ সিসিলিয়া ও আমাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, "আজকার রাত্রির মত এত সুন্দর অভিনয় ইতিপূর্ব্বে আর একদিনও হয় নাই। মিস্ সিসিলিয়ার অভিনয় মিস্ ডোরার অভিনয় অপেক্ষা সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ। আপনার অভিনয়ও আজ অন্যান্য দিন অপেক্ষা নূতন রকমের হইয়াছে। কয়েকজন নামজাদা বঙ্গভূমি-সমালোচক আমাকে এই মাত্র বলিয়া গেলেন যে এমন সুন্দর অভিনয় তাঁরা ইতিপূর্ব্বে দেখেন নাই বলিলেই হয়। আগামী কল্য দৈনিক কাগজে এই অভিনয়ের অনেক প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা বাহির হইবে।" হইলও তাই। তৎপর দিবস একাধিক দৈনিক সংবাদপত্রে মিস্ সিসিলিয়া ও আমার অভিনয়ের অজস্র প্রশংসা বাহির হইল। এইরূপ সতেজে ওথেলোর অভিনয় চলিতে লাগিল।

(৪)

মিস্ সিসিলিয়া কে? তাঁর চাল চলন, কথাবার্ত্তা, ও ভাবভঙ্গি দেখিয়া তাঁহাকে সামান্য লোক বলিয়া মনে হয় না। মিঃ ডিক্স ও আমার সহিত ব্যতীত মিস্ সিসিলিয়া আমাদের দলের অন্য কোন লোকের সহিত অভিনয়ের সময় ছাড়া অন্য সময়ে মিশিতেন না বা কথা কহিতেন না। এজন্য দলের অন্যান্য অভিনেতা বা অভিনেত্রীরা মিস্ সিসিলিয়ার উপর বড় সন্তুষ্ট ছিল না। আমার প্রতি সিসিলিয়ার বিরক্তি নাই বুঝিতে পারিয়া আমি একদিন তাঁকে অত্যন্ত সাবধানতার সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, "মিস্ সিসিলিয়া, আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।"

মিস্ সিসিলিয়া। কি জিজ্ঞাসা করিবেন করুন না! আমি কিছু মনে করিব না। আপনি যখন জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন নিশ্চয়ই কোন অসঙ্গত প্রশ্ন হইবে না।

আমি। আপনি এত সুন্দর অভিনয়-কৌশল শিখিলেন কোথায়?

মিস্ সিসিলিয়া। ফ্রান্সে শিখিয়াছি।

আমি। ফ্রান্সে কত দিন ছিলেন? সেখানে কি সূত্রে কার সঙ্গে গিয়াছিলেন? আমার প্রশ্নের শেষ অংশ জিজ্ঞাসা করা আমার অন্যায় হইয়াছে, সেজন্য ক্ষমা করুন।

মিস্ সিসিলিয়া। ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়োজন নাই। আপনি যদি একটি কার্য্য করিতে সম্মত হন, তাহা হইলে আমি আপনাকে আমার সম্বন্ধে সকল কথাই বলিব।

আমি। কি কার্য্য বলুন। সে কার্য্য করা যদি আমার সাধ্যায়ত্ত হয়, তাহা হইলে তাহা আমি অবশ্য করিব।

মিস্ সিসিলিয়া। শুনিয়াছি, আপনি আফ্রিকা আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশের অন্তর্গত নানাদেশে ভ্রমণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষ ত আপনার জন্মভূমি। এই সকল দেশে আপনি কি কি কার্য্য করিয়াছেন এবং সেই সকল দেশে কি কি দেখিয়াছেন এই সমস্ত বিষয়ণ যদি আমাকে বলেন তাহা হইলে আমার সম্বন্ধে আপনার কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে পারি।

আমি। তাহাতে কিছু মাত্র আপত্তি নাই। আপনি যখনই শুনিতে ইচ্ছা করিবেন আমি তাহা আনন্দের সহিত শুনাইব।

"তাহা হইলে আমার কথা শুনুন" এই বলিয়া মিস্ সিসিলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিতে লাগিলেন।

(৩)

মিস্ সিসিলিয়া বলিলেন:—আমার পিতা খুব ধনী লোক ছিলেন। উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি এক বিস্তৃত জমিদারী প্রাপ্ত হন। সেই জমিদারীর আয় সুপ্রচুর। তিনি ইচ্ছা করিলে, রাজার হালে থাকিয়াও প্রতি বৎসর অন্ততঃ কুড়ি হাজার পাউণ্ড কমাইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত অপরিমিতব্যয়ী ছিলেন।

আমার তিন বৎসর বয়সের সময় আমার মাতার মৃত্যু হয়। আমার আর ভাই কিম্বা ভগিনী তখন বাঁচিয়া ছিল না। আমিই তখন পিতা মাতার একমাত্র সন্তান। মাতাকে পিতা অত্যন্ত ভালবাসিতেন। মাতার মৃত্যুর পর পিতা শোকে পাগলের মত হইলেন। সর্ব্বদা আমাকে কোলে করিয়া তাঁহাদের। তাঁর বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনেরা তাঁহাকে কতই বুঝাইতেন। কিন্তু তাঁহাকে কিছুতেই সান্ত্বনা দিতে পারিত না। এইরূপে দুই বৎসর কাটিল। পিতার শোকের বেগ যেন কিঞ্চিৎ কমিল। তিনি আমার শিক্ষার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। অভ্যাস শিক্ষার সহিত আমার নৃত্যগীত ও চিত্রবিদ্যা শিক্ষার উত্তম বন্দোবস্ত হইল। তজ্জন্য মোটা বেতনে শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইলেন।

এই সময়ে পিতা লণ্ডনের বিলাসী সমাজের সহিত মিশিয়া নানাপ্রকার আমোদের স্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন। তাঁর বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে বিবাহ করিতে বলিলেন কিন্তু তিনি আর বিবাহ করিলেন না। দিন দিন তাঁর সুরাপানের মাত্রা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। আমোদপ্রমোদ ও বাবুগিরিতে জলের মত অর্থ ব্যয়িত হইতে লাগিল।

তিনি ছয় মাস ফ্রান্সে, তিন মাস সুইডেনে, চার মাস সুইজারলণ্ডে, তিন মাস রাশিয়াতে, ছয় মাস ইটালীতে, এক বৎসর আমেরিকাতে এইরূপ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। আমি বাড়ীতে আমার এক বৃদ্ধা ধাত্রীর কাছে থাকিতাম ও শিক্ষকদের নিকট পাঠ শিক্ষা করিতাম। এইপ্রকারে পিতা প্রায় দশ বৎসর নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া দেশে ফিরিলেন। তখন তাঁহার হাতে নগদ অর্থ কিছুই ছিল না। এত দেশ ভ্রমণ করিয়া, এত আমোদ আহ্লাদ করিয়াও তাঁহার সখ মিটিল না। দেশে ফিরিয়াও তিনি পূর্ব্ববৎ টাকা উড়াইতে লাগিলেন।

সেই সময় আমাদের যেখানে বাড়ী সেই গ্রামের কয়েকটী বড় লোকের সখের থিয়েটার করিবার বাতিক হইল। তাঁহারা আমার পিতাকে এজন্য মুরুব্বী পাকড়াইলেন। তিনি অত্যন্ত আনন্দের সহিত তাঁহাদিগের মুরুব্বী হইলেন এবং তাঁহাদের সংকল্পিত বিষয়টি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তাঁহাদিগকে প্রচুর অর্থ দিলেন। এজন্য তাঁহাকে কিছু ঋণ করিতে হইল।

আমাকেও এই সখের থিয়েটারের দলে লওয়া হইল। ব্যাপারটা আমার নিকট মন্দ লাগিল না। উৎসাহের সহিত আমি এই থিয়েটারে যোগ দিয়া প্রথম প্রথম ছোট ছোট ভূমিকার অভিনয় করিয়া শেষদিকে প্রধান পাত্র ও পাত্রীদিগের ভূমিকার অভিনয় করিতে লাগিলাম। ইহার মধ্যে একবার

পিতার সহিত প্যারিসে গিয়া সেখানকার একজন উৎকৃষ্ট অভিনেতার নিকট অভিনয়ের কৌশল শিক্ষা করি। এজন্য সেই শিক্ষককে প্রচুর অর্থ দিতে হয়।

প্যারিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের সখের দলে অভিনয় করিয়া বুঝিতে পারি, আমার অভিনয়-নৈপুণ্য অনেক উৎকর্ষলাভ করিয়াছে।

এখন আমার বয়স তেইশ বৎসর। আমার কুড়ি বৎসর বয়সের সময় হইতে আমার অনেক প্রণয়ী জুটিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই ধনীর সন্তান। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত আমার মনে ভালবাসার কিংবা বিবাহের কোন চিন্তা স্থান পায় নাই। সেজন্য, আমার সেই সকল প্রণয়ী হতাশ হইয়া আমার আশা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

বাবা আমাকে বড় স্নেহ করিতেন। তাঁর মত স্নেহশীল পিতা বুঝি আর হয় না। তিনি আমার বিষণ্ণ মুখ দেখিতে পারিতেন না। আমি যখন যা চাহিতাম, তিনি তখনই আমাকে তাহা দিতেন। পিতার নিকট প্রচুর অর্থ পাইতাম কিন্তু আমিও সেই সময় অর্থ সাজ পোষাক, মুক্তা ও পীতবাসের অলঙ্কার ক্রয় করিয়া, পরিষ্ব দুঃখীকে দান করিয়া, খরচ করিয়া ফেলিতাম। অর্থ যে সঞ্চয় করিবার জিনিষ এ চিন্তা কখনই আমার মনে হইত না। আমি ভাবিতাম যে আমার পিতা চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবেন, আমি তাঁর কাছে ইচ্ছামত অর্থ চাহিলেই পাইব। এমনই সুখেই চিরকাল কাটিবে।

আমার পিতামহের আমলের এক বৃদ্ধ এটর্নি মধ্যে মধ্যে পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। পিতা সেই বৃদ্ধ এটর্নিকে কিঞ্চিৎ খাতির করিতেন, এবং মনে হয় যেন একটু ভয়ও করিতেন। সেই এটর্নি কখন কখনও পিতাকে বলিতেন, "তোমার খরচের মাত্রাটা কমাইয়া ফেল। না হইলে সামলাইতে পারিবে না। মেয়েটার জন্য এপর্য্যন্ত কোন বন্দোবস্ত কর নাই। উহার জন্য একটা কিছু করিয়া ফেল। কার কখন কি হয় বলা যায় কি? পুত্র-সন্তানও নাই, আর বিবাহও করিলে না। বুঝিয়া চলিও।" তখন এই সকল কথার অর্থ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতাম না। এখন হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছি।

ব্রঙ্কাইটিস রোগে এক বৎসর ভুগিয়া আমার একুশ বৎসর বয়সের সময় পিতা প্রাণত্যাগ করিলেন। পিতার মৃত্যুকালে আমার এক দূর সম্পর্কে জ্ঞাতি ভ্রাতা পিতাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। তাঁর নাম টমাস। বাবার মৃত্যুতে আমি শোকে হতজ্ঞান হইলাম। তাঁর মৃত দেহের সমাধি হইবার পর নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া শয্যায় আশ্রয় লইলাম। । দুই দিন সেই কক্ষ ত্যাগ করিতে পারিলাম না। এই দুই দিন স্নান আহার কিছুই হইল না।

তৃতীয় দিবস শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইয়া দেখি, আমাদের বাড়ীর মূর্ত্তি বদলাইয়া গিয়াছে। পুরাতন দাস দাসীর মধ্যে কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। আমি বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছি "একি হইল! এরা সব গেল কোথায়?" এমন সময় টমাস আমার নিকট আসিয়া সস্নেহে আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, "সিসিল, শোকে এত আত্মহারা হইলে কি চলে? বাবা কাহারও চিরকাল বাঁচিয়া থাকেন না। আমার বাবা যখন যান, তখন আমি তোমার চেয়ে ছোট। তা তোমার ভাবনা কি? আমাকে তোমার ভায়ের মত মনে করিও। চল, আমার স্ত্রীর সহিত তোমার পরিচয় করিয়া দিই। তার নাম ক্যাথারিন্; সে তোমাকে দেখিয়া আনন্দিত হইবে। কেটের ন্যায় মধুর-ভাষিণী মহিলা তুমি কখনই দেখ নাই, একথা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি।" আমি টমাসের সহিত বৈঠক-খানায় প্রবেশ করিলাম।

সেখানে গিয়া দেখিলাম, একজন আন্দাজ ত্রিশ-বৎসর বয়সের মহিলা বসিয়া রহিয়াছেন। টমাস সেই মহিলাকে বলিলেন, "কেট, ইনিই হইতেছেন সিসিলিয়া। সিসিলিয়া, ইনিই হইতেছেন আমার পত্নী কেট।" কেটকে দেখিবামাত্র আমার মনে কেমন ভয়ের সঞ্চার হইল। এরূপ হইয়া থাকে। কোন লোককে দেখিবামাত্র তাহার প্রতি মন আকৃষ্ট হয়, আবার কাহাকেও দেখিবা মাত্র মন বড় অপ্রসন্ন

হয়, মনে হয় এ ব্যক্তি লোক ভাল নয়, এ আমার অনিষ্ট করিবে। এরূপ মনের ভাব কেন হয় বলা কঠিন। কেট দেখিতে মন্দ নয় কিন্তু তাঁর মুখের ভাব কোমলতা বর্জ্জিত। তিনি আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া আমার হাত ধরিয়া আমাকে একখানি চেয়ারে বসাইয়া বিস্ফারিতনেত্রে আমার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যেন এ ঘরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত দেখিতেছেন। ইহাতে আমি বড়ই অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিলাম।

টমাস কেটের এই ভাব দেখিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "আশা করি, এখন হইতে তোমরা পরস্পরের অন্তরঙ্গ বন্ধু হইবে। তোমাদের বন্ধুত্ব দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকুক, ঈশ্বরের নিকট ইহাই প্রার্থনা করি। তোমরা এখন আলাপ কর।" এই বলিয়া টমাস প্রস্থান করিলেন।

কেট আমাকে বলিলেন, "পিতৃশোকে এত মুহ্যমান হওয়া তোমার উচিত হয় নাই। এখন হইতে তোমাকে কঠোর জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।" আমি ক্ষীণস্বরে বলিলাম, "আপনার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না।" তখন ক্ষুধাতৃষ্ণা ও দুঃখজনিত বশতঃ আমার মাথা ঘুরিতেছিল। কেট বোধ হয় তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "আমার সঙ্গে আইস। তোমাকে কিছু খাওয়াইয়া আমি। তুমি একটু সুস্থ হইলে তোমাকে সব কথা বুঝাইয়া বলিব।"

আহারান্তে কেট স্পষ্টাক্ষরে আমার বর্ত্তমান অবস্থা আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। বাড়ী ঘর দুয়ার আমার পিতার ত্যক্ত বিপুল সম্পত্তি, এ সমস্তই এখন টমাসের হইয়াছে। আমার পিতার সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে স্ত্রীলোকের পাইবার উপায় ছিল না। অপুত্রক অবস্থায় আমার পিতার মৃত্যু হওয়ায়, জ্ঞাতি-পুত্র বলিয়া টমাস সেই বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন। এ বাটীতে আমার বাস করিবার অধিকার নাই। এখন আমাকে টমাসের গলগ্রহস্বরূপে এখানে বাস করিতে হইবে। পিতা আমার ভরণ-পোষণের কোন বন্দোবস্তই করিয়া যান নাই। এতদিনে বৃদ্ধ এটর্নির কথা মনে পড়িল। মনে পড়িল, তিনি যখন যখন পিতাকে দাবধান করিতেন এবং আমার জন্য একটা ব্যবস্থা করিয়া যাইতে বলিতেন।

টমাস আমার সহিত সদয় ব্যবহার করিতেন। কিন্তু তিনি অধিকাংশ সময়ে বাটীতে থাকিতেন না। প্রথম দিন হইতেই কেট আমার সহিত অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার কথাবার্ত্তায় আমি অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিতে লাগিলাম। তিনি আমাকে তাঁর দাসদাসীর চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। এরূপ অপমানিত হইয়া কোনখানে বাস করা আমার পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব। অতি কষ্টে আমার দিন কাটিতে লাগিল। কি করিব, কোথায় যাইব, এই ভাবনায় আকুল হইলাম।

এই সময়ে আমার পূর্ব্ব প্রণয়প্রার্থীদের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহাদের সেই ইচ্ছার কথার ভাব প্রকাশ পাইল দেখিয়া আমি তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলাম না। তা' ছাড়া যাঁহার প্রতি আমার আন্তরিক ভালবাসা নাই, যাঁহাকে আমার সঙ্কট অবস্থার সময় বিবাহ করিতে চাহি নাই, এখন কেবলমাত্র অন্ন-বস্ত্রের জন্য কেমন করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিব? এরূপ নীচজনোচিত কার্য্য করিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। আমার সেই সকল হতাশ প্রণয়ীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ সোডেন্থা স্যার হেন্‌রী ষ্টিফেনের নাম উল্লেখযোগ্য। আমার প্রণয়প্রার্থীদিগের মধ্যে কেবলমাত্র তিনিই যেন আমার প্রকৃত অনুরাগী আমার এইরূপ মনে হইত। তাঁর মত সদাশয়, সদ্বংশ, প্রেমপ্রবণ, প্রতিপত্তিশালী ও অর্থবান লোককে যদি আমি বিবাহ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে, আমি পূর্ব্ববৎ সুখে কাল কাটাইতে পারিতাম। কিন্তু যাঁহার প্রতি আমার ভালবাসা নাই, তাঁহাকে বিবাহ করিব কেমন করিয়া? অনেকে বলেন যে ভালবাসা এক জিনিষ, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য আর এক জিনিষ। স্বামীকে ভাল না বাসিয়াও তাঁহার কর্ত্তব্যপরায়ণা স্ত্রী হইতে পারা যায়। এরূপ অসম্ভব ব্যাপার যে কেমন করিয়া হইতে

পারে তাহা আমার বুদ্ধির অগোচর। পিতা বা মাতার প্রতি কর্ত্তব্যের অনুরোধে কোন কোন রমণীকে এমন পুরুষের পাণিগ্রহণ করিতে দেখিয়াছি যাহার প্রতি সেই রমণীর ভালবাসা নাই। এরূপ স্থলে সেই রমণীর কার্য্যের সমর্থন বরং করা যায়, কিন্তু যেখানে পিতা বা মাতার প্রতি কর্ত্তব্যের কোন কথা নাই সেরূপ স্থলে ঐরূপ কার্য্যের সমর্থন করা যায় না। আমার বন্ধুদিগের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে স্যার হেন্‌রী টিকেনের পাণিগ্রহণ করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু আমি তাঁহাদের পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিতে পারি নাই। স্যার হেনরী টিকেন, আমার পিতার মৃত্যুর পর দেখবার আমার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইয়াও, আমার প্রতি বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া আমাকে বলিয়া দিয়াছেন যে, "আপনি আমাকে আপনার সহৃদয় বন্ধু বলিয়া জানিবেন। কখন কোন বিষয়ে আমার সাহায্যের প্রয়োজন হইলে অসঙ্কোচে আমার নিকট তাহা প্রকাশ করিবেন।"

পিতার মৃত্যুর পর ছয় মাস পর্য্যন্ত অতি কষ্টে কেটের নিকট রহিলাম। অবশেষে আমার প্রতি কেটের অত্যাচারের মাত্রা এতদূর বৃদ্ধি পাইল যে আমি আর তাহা সহ্য করিতে পারিলাম না। টমাস আমার পক্ষাবলম্বন করিয়াও কিছু করিতে পারিল না। আমার প্রতি টমাসের সদয় ভাব দেখিয়া কেট আমার প্রতি অধিকতর বিরক্ত হইলেন। বিত্তশালী ব্যক্তিদিগের প্রণয় আমি প্রত্যাখ্যান করিতেছি দেখিয়া তিনি প্রত্যহই আমাকে গালি দিতেন।

কেটের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া আমি একদিন টমাসের গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলাম। ভাবিলাম অনাহারে মরিলেও ভাল, তথাপি কেটের গলগ্রহ হইয়া কেটের নিকট বাস করিব না। তারপর এই সেক্‌স্‌পিয়ার থিয়েটারে অভিনেত্রীর কার্য্য গ্রহণ করিয়াছি। অতঃপর যাহা ঘটিয়াছে তাহা আপনার অবিদিত নাই। একার্য্যে আমার খুব অনুরাগ, তথাপি সাধারণ লোকে রঙ্গালয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগকে কেমন যেন একটু হীন চক্ষে দেখে বলিয়া, কখন কখন মন খারাপ হয়। মনে হয় একার্য্য ছাড়িয়া দিব। আবার তখনই ভাবি, একার্য্য ছাড়িয়া দিলে, সচ্ছলভাবে গ্রাসাচ্ছাদন চলিবে কেমন করিয়া? এখন পর্য্যন্ত একার্য্যে কোনরূপ অসুবিধা বুঝিতে পারি নাই, যেদিন তা বুঝিব, সেই দিন নাচা হইয়া এ কার্য্য ত্যাগ করিতে হইবে।

সংক্ষেপে আমার জীবনবৃত্তান্ত আপনাকে বলিলাম। এখন আপনার ভ্রমণকাহিনী, সময় মত আমাকে বলিবেন।"

আমি। আমার ভ্রমণকাহিনী এক মাসিকপত্রে বাহির হইয়াছে। আপনি সে মাসিকপত্র পড়িয়াছেন কিনা জানিনা।

সিসিলিয়া। কোন্ মাসিকপত্রের কথা বলিতেছেন?

আমি সেই মাসিকপত্রের নাম করিলাম। সিসিলিয়া বলিলেন, "না আমি সেই মাসিকপত্র পড়ি নাই। আমি আপনার ভ্রমণবৃত্তান্ত আপনার মুখে শুনিতে ইচ্ছা করি। আপনি কেমন করিয়া, সিংহ ও বাঘের সহিত লড়াই করিতেন, কেমন করিয়া মেক্‌সিকো দেশে যুদ্ধ করিতেন, কোন্ যুদ্ধে আপনার চক্ষুটি নষ্ট হইল, আফ্রিকার মরুভূমি কেমন, সে সব দেশের লোকের আচার ব্যবহার কেমন, এই সকল বিষয় আপনার মুখে শুনিতে আমার বড় সাধ।

আমি। আপনি যখনই এই সকল বিষয় শুনিতে চাহিবেন, আমি আনন্দের সহিত আপনাকে সেই কথা শুনাইব। তবে আমার আশঙ্কা হইতেছে যে আমার মত সামান্য লোকের জীবনের বিবরণ শুনিয়া আপনি তেমন তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবেন না।

ইহার পর হইতে অবসর মত আমি মিস্ সিসিলিয়াকে আমার জীবনের বৃত্তান্ত বলিতাম। ছেলেবেলায় শ্যামনগরে কি করিতাম, সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া সেক্‌স্‌পিয়ার থিয়েটারে যোগ দেওয়া পর্য্যন্ত ঘটনার বিবরণ বলিতাম। মিস্ সিসিলিয়া আত্মহারা হইয়া তাহা শুনিতেন। সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে

না বলিলে মিস্ সিসিলিয়ার তৃপ্তি হইত না। এইরূপে মিস্ সিসিলিয়া আমার অত্যন্ত পক্ষপাতিনী হইয়া পড়িলেন। আমার নিকটও তাঁহার স্বভাবটি বড় মধুর বলিয়া বোধ হইত

(৩)

এইরূপে "সেক্সপিয়ার" থিয়েটারে তিন বৎসর কাটিল। ইতিমধ্যে মিঃ ডিক্সনের মৃত্যু হইল। সেক্সপিয়ার থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী ও ম্যানেজারের পরিবর্ত্তন ঘটিল। মিঃ ফেয়ারব্রে নামক এক ব্যক্তি সেই থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী ও ম্যানেজার হইলেন। ইঁহার মেজাজ বড় রুক্ষ। মিঃ ডিক্সনের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইঁহার সহিত অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের প্রায়ই অভৌমন হইত।

একদিনের একটি ঘটনা এখানে না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। সেদিন "মাচেণ্ট অব ভিনিস" অভিনীত হইবে। আমি আন্টোনিও সাজিব ও মিস্ সিসিলিয়া পোর্সিয়া সাজিবেন। আমরা সকলে প্রস্তুত হইয়া সজ্জাগৃহে বসিয়া আছি। এমন সময় সহরের বিলাসী সমাজের একজন প্রসিদ্ধ ধনী সুরাপানে মত্ত হইয়া সজ্জাগৃহে প্রবেশ করিলেন এবং মিস্ সিসিলিয়ার গা ঘেঁষিয়া বসিয়া তাঁর সহিত ইতরজনোচিত ভাষায় ঠাট্টা তামাসা আরম্ভ করিয়া দিলেন। মিঃ ফেয়ারব্রে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই ব্যবহারের কোন প্রতিবাদ করিলেন না। মিস্ সিসিলিয়ার মুখ ক্রোধে সাদা হইয়া গেল। আমরা আর সকলে স্তম্ভিত হইলাম। অবশেষে আমি ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া বলিলাম, "মিঃ ফেয়ারব্রে, আপনি কিরূপ লোক? আপনার সাক্ষাতে একজন বাহিরের লোক সজ্জাগৃহে প্রবেশ করিয়া আপনার থিয়েটারের একজন অভিনেত্রীকে অপমান করিতেছেন, আর আপনি চুপ করিয়া রহিয়াছেন? ঐ ব্যক্তিকে এখনই বাহির হইয়া যাইতে বলুন। মিঃ ডিক্সন থাকিলে কখনই এমন হইত না।"

মিঃ ফেয়ারব্রে বলিলেন, "মিঃ চ্যাটার, আপনি মুখ সামলাইয়া কথা কহিবেন। জানেন, আপনি আপনার ঘনিবের সহিত কথা কহিতেছেন। যাঁহাকে সজ্জাগৃহ হইতে তাড়াইয়া দিতে বলিতেছেন তিনি কে জানেন? ওঁহার মত উচ্চবংশজাত বিত্তশালী লোকের পদার্পণে আমার থিয়েটার আজ ধন্য হইয়াছে। আপনারা সকলে ওঁহার নিকট আপনাদের এই আহম্মকী ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। উনি খুব ভদ্রলোক দিলদরিয়া লোক। আমার থিয়েটারের একজন প্রধান মুরুব্বি।"

আমি। উনি যত বড় লোকই হউন না কেন, সজ্জাগৃহে প্রবেশ করিবার অধিকার উঁহার নাই।

মিঃ ফেয়ারব্রে। মহাশয়, আপনি বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিলেন। আমির লোকেরা ত সজ্জাগৃহে প্রবেশ করিয়া অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সহিত অবাধে মিশিয়া থাকেন। এজন্য অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের গৌরব অনুভব করা উচিত। আপনি জানেন এই সুযোগে কোন কোন অভিনেত্রী আমির লোককে বিবাহ করিয়া রাজার হালে জীবন যাপন করিতেছে?

আমি। আপনার কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। কিন্তু আপনার বোধ হয় জানা আছে যে, মিস্ সিসিলিয়া যখন এই থিয়েটারে প্রবেশ করেন সেই সময় তিনি এই সর্ত্তে প্রবেশ করেন যে, বাহিরের কোন লোক সজ্জাগৃহে তাঁহার সহিত কোনরূপ অশিষ্ট ব্যবহার করিতে পারিবে না।

মিঃ ফেয়ারব্রে। হাঁ, আমি তা জানিতাম না। মিস্ সিসিলিয়া কে তা আমি জানি। তিনি উচ্চবংশে জন্মিয়া যখন অভিনেত্রী হইয়াছেন তখন তাঁর আর অত মানের ভাত কাঁদিলে চলিবে কেন?

এতক্ষণ সিসিলিয়া কোন কথাই কহেন নাই। মিঃ ফেয়ারব্রের শেষ কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "মিঃ ফেয়ারব্রে, আমাকে এরূপ ভাবে অপমানিত করিবার অধিকার আপনার নাই। আমি যে সর্ত্তে এই থিয়েটারে যোগ দিই, আপনি সে সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়াছেন, এখন হইতে আমি আর আপনার থিয়েটারে অভিনয় করিতে বাধ্য নই। আপনার থিয়েটারের সহিত আমার সম্বন্ধ রহিল না।" আমি বলিলাম, "আমারও সেই কথা। আমিও আপনার থিয়েটারের সম্বন্ধ আজ

করিলাম।" আমার এই কথা শুনিয়া আরও কয়েক জন অভিনেতা ও অভিনেত্রী বলিলেন, "আমরা অভিনয় করিতে আসিয়াছি বলিয়া যে আমাদের মানাপমান নাই, এরূপ নহে। মিস্ সিসিলিয়াকে অপমানিত করায় প্রকারান্তরে আমাদের সকলকেই অপমানিত করা হইয়াছে। আমরা আপনার থিয়েটারে কাজ করিব না।"

এইবার মিঃ কেয়ারলের চৈতন্য হইল। তিনি তাঁহার পূর্ব্ব ব্যবহারের জন্য মিস্ সিসিলিয়ার নিকট ও আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অপরাপর ভদ্রলোকটী মিস্ সিসিলিয়ার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সন্তোষের হইতে চলিয়া গেলেন। মিস্ সিসিলিয়া বলিলেন, "আমি আর অভিনয় করিতে পারিব না। আমি বড় উত্তেজিত হইয়াছি।" তখন মিঃ কেয়ারলে মিস্ সিসিলিয়াকে অত্যন্ত বিনীত ভাবে বলিলেন, "আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করুন। আজ রাত্রে আপনারা অভিনয় না করিলে আমার সর্ব্বনাশ হইবে। আমি অবশ্যই মারা যাইব। দোহাই আপনার, আমাকে রক্ষা করুন। মিঃ চ্যাটার, আপনি ইহাকে রক্ষা করুন। আপনি একবার মিস্ সিসিলিয়াকে অনুরোধ করুন। উনি আপনার অনুরোধ এড়াইতে পারিবেন না।" এই সময় মিস্ সিসিলিয়া অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিলেন। এ দিকে আর সময় নাই। আর দুই মিনিটের মধ্যে অভিনয় আরম্ভ করিতে হইবে। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের প্রথম কথাই আমার মুখ দিয়া বাহির হইবে। মিঃ কেয়ারলের কাতরতা দেখিয়া বড় কষ্ট হইল। আমি বলিলাম, "আচ্ছা, অদ্যকার রাত্রির মত অভিনয় করিতে আমি সম্মত হইলাম। মিস্ সিসিলিয়া ইহাতে স্বীকৃত হইলে সুখী হইব।" মিস্ সিসিলিয়া বলিলেন, "আচ্ছা আজিকার রাত্রির মত কাজ চালাইয়া দিব, কিন্তু মন যেরূপ খারাপ হইয়াছে, তাহাতে আজিকার অভিনয় ভাল হইবে বলিয়া বোধ হয় না।"

তাহার পর অভিনয় আরম্ভ হইল। মিস্ সিসিলিয়া ঠিক বলিয়াছিলেন, সেদিনকার অভিনয় মোটেই জমিল না।

(৭)

এই অভিনয়ের পর দিবস মিস্ সিসিলিয়া সেক্স্‌পিয়ার থিয়েটারের সম্পর্ক ত্যাগ করিলেন। মিঃ কেয়ারলে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, তথাপি মিস্ সিসিলিয়ার মতের পরিবর্ত্তন হইল না। তিনি বলিলেন যে তিনি আর অভিনেত্রীর কার্য্য করিবেন না। সেই কার্য্যের প্রতি তাঁহার আন্তরিক ঘৃণা জন্মিয়াছে।

মিস্ সিসিলিয়া কার্য্য ত্যাগ করিবার পর আমারও মন কেমন দমিয়া গেল। অভিনয়-কার্য্যে কিছুমাত্র উৎসাহ রহিল না। কয়েক রাত্রি অভিনয় করিয়া বুঝিলাম, আমার অভিনয় আর পূর্ব্ববৎ হইতেছে না। ইহার কারণ কি? মিস্ সিসিলিয়া আমাদের থিয়েটার ছাড়িয়া গিয়াছেন বলিয়াই এমন হইতেছে নাকি? আমার অভিনয়ে লোক তৃপ্ত হইতেছে না বুঝিতে পারিয়া আমি কার্য্যত্যাগের জন্য ছয় মাসের নোটীশ দিলাম।

মিঃ কেয়ারলে আমার নোটীশ পাইয়া বলিলেন, "আপনি যদি ইচ্ছা করেন, আমি আপনাকে পনের দিনের মধ্যে অব্যাহতি দিতে পারি। সেই রাত্রির শোচনীয় ঘটনার পর হইতে আপনার মন কেমন খারাপ হইয়া গিয়াছে। তাহার পর মিস্ সিসিলিয়া আমাদের থিয়েটার ছাড়িয়া দিবার পর হইতে আপনি যেন মুষড়িয়া গিয়াছেন। আপনার মনের ভাব এরূপ থাকিলে আপনি আর অভিনয়কার্য্যে কৃতিত্ব দেখাইতে পারিবেন না।" আমি বলিলাম, "আমারও তাই মনে হয়। মনে হয় যে আমার অভিনয় করিবার ক্ষমতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আপনি পনের দিন পরে, পনের দিন কেন আজই যদি ছাড়িয়া দেন ত আজই চলিয়া যাই। আমার দ্বারা আর অভিনয় করা চলিবে বলিয়া বোধ হয় না।

মিঃ কেয়ারলে। মিঃ চ্যাটার, আজই আপনাকে ছাড়িতে পারি না। আপনি পনের দিন পরেই যাইবেন। যদি কিছু মনে না করেন, আপনাকে একটি কথা বলিতে চাই।

আমি। কি বলিবেন বলুন।

মিঃ ফেরারলে। মিস্ সিসিলিয়া আপনাকে ভালবাসেন, এবং আপনিও বোধ হয় তাঁকে ভালবাসেন। এমতীর মনের গতি অতি দুর্ব্বোধ্য।

মিস্ সিসিলিয়ার কথা।

(১)

থিয়েটারের সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছি। অনাহারে মরিলেও ভাল, তথাপি আর থিয়েটারের সংস্রব রাখিব না। এই কয় বৎসর চাকুরী করিয়া পাঁচ শত পাউণ্ড জমাইয়াছি। কোন কাজকর্ম না করিলেও আমার কোনরকমে কিছুদিন কাটিবে।

তিন চারি দিবস নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকার পর একদিন এক খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিলাম যে, "একজন ভারতবর্ষীয় করদরাজ্যের রাজার পত্নী তাঁহার পুত্র ও কন্যাদিগকে ইংরেজী ও গীত-বাদ্য শিক্ষা দিবার জন্য একজন উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী চাহিয়াছেন। যোগ্যতা অনুসারে বেতন নির্দ্দিষ্ট হইবে।" অনুসন্ধান করিয়া বিজ্ঞাপনদাত্রী রাণী সাহেবার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। দেখিলাম তিনি ইংরেজ-মহিলা।

রাণী-সাহেবা আমাকে সাদরে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাকে সেক্‌স্‌পিয়ার থিয়েটারে অভিনয় করিতে দেখিয়াছি অনুমান করিতেছি।" আমি বলিলাম, "রাণী-সাহেবার অনুমান সত্য। আমি থিয়েটারের সংস্রব ত্যাগ করিয়াছি। আমি গীত-বাদ্য উত্তমরূপে শিখাইতে পারিব। ইংরেজী সাহিত্যে আমার অধিকার আছে। গণিত, ইতিহাস ও ভূগোলও অল্প অল্প জানি। চিত্রবিদ্যাতেও আমার অধিকার কম নয়।"

রাণী-সাহেবা। আপনি আমার পুত্রকন্যাদের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্তা হইবার উপযুক্ত বটে। আপনাকে নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহি।

আমি। জিজ্ঞাসা করুন।

রাণী-সাহেবা। আপনার বয়স কত?

আমি। সাতাইশ বৎসর।

রাণী-সাহেবা। আপনার পিতার নাম বলিতে আপত্তি আছে?

আমি আমার পিতার নাম করিলাম। রাণী-সাহেবা একটু চমকিত হইয়া কহিলেন, "আমি আপনার পিতাকে চিনিতাম। আপনি দেখিতেছেন আমি ইংরেজ-মহিলা। আমি একজন ভারতবর্ষীয় করদ-রাজ্যের রাজাকে বিবাহ করিয়াছি দেখিয়া আপনি বিস্মিত হইতেছেন না?"

আমি। না। আপনি যদি রাজা-সাহেবকে ভালবাসিয়া থাকেন, এবং রাজা-সাহেব যদি আপনাকে ভালবাসিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনাদের বিবাহ হইতে পারিবে না কেন?

রাণী-সাহেবা। আমি ইংরেজ-মহিলা, রাজা-সাহেব ভারতবর্ষের লোক, তাঁর রং কাল। ইহা একটা আপত্তির কারণ মনে করেন না?

আমি। সকল সময়ে নয়। তাহা হইলে, ডেস্‌ডেমোনা কখনই ওথেলোকে বিবাহ করিতেন না।

রাণী-সাহেবা। বেশ বলিয়াছেন। আপনাকে ডেস্‌ডেমোনা সাজিতে দেখিয়াছি। যিনি ওথেলো সাজিতেন তাঁর স্বাভাবিক রংই যেন ঐ রকম কাল বলিয়া আমার মনে হইতেছে। আমার অনুমান ঠিক কিনা?

আমি। হাঁ, আপনার অনুমান ঠিক। তিনি ভারতবর্ষের লোক।

রাণী-সাহেবা। তাঁর নাম কি?

আমি। তাঁর নাম ভবানীচরণ চাটুর্য্যে, এখন সব চ্যাটার নামে পরিচিত।

রাণী-সাহেবা। আপনি তাঁকে পছন্দ করেন?

আমি রাণী-সাহেবার এই প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া থাকিলাম।

রাণী-সাহেবা বলিলেন, "আমি পূর্ব্বে লণ্ডনের এক থিয়েটারে অভিনেত্রী ছিলাম। আমার পিতা বড় দরিদ্র ছিলেন। রাজা-সাহেব থিয়েটারে আমাকে দেখিয়া আমার রূপে মুগ্ধ হইয়া আমাকে বিবাহ

করিবার প্রস্তাব করেন। আমি তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে বিবাহে করিতে সম্মত হই। রাজা-সাহেব মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী, মুসলমানের দুইটি রমণীর পাণিগ্রহণে বাধা নাই। সেজন্য আমাদের বিবাহে কোনরূপ গোলযোগ হয় নাই। তবে ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে একটি কুপ্রথা প্রচলিত আছে। হিন্দু ও মুসলমান পুরুষ ইচ্ছা করিলে একই সময়ে একাধিক রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে পারেন। আমাকে বিবাহ করিয়া রাজা-সাহেব তাঁর রাজ্যে লইয়া গেলে তাঁর রাজ্যের লোকেরা অনেক বিরক্ত হইল। রাজা-সাহেব অনেক কষ্টে তাহাদিগকে শান্ত করিলেন। আমার সৌভাগ্যক্রমে রাজা-সাহেবের পূর্ব্ব দুই স্ত্রীর তৎপূর্ব্বেই মৃত্যু হইয়াছিল। আমাকে যখন রাজা-সাহেব বিবাহ করেন, তখন তাঁর প্রতি আমার কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না। আমি তাঁহার ঐশ্বর্য্যের লোভে তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলাম। এখন আমি তাঁহাকে ভালবাসি। ভালবাসি বলিলে ঠিক হইবে না, এখন আমি তাঁকে ভক্তি করি। ভারতবর্ষের লোকদিগের বিবাহের পূর্ব্বে ভালবাসা সম্বন্ধে কোন ধারণা নাই। দেশাচারে রমণীরা বিবাহের পর তাহাদিগের স্বামীদিগকে ভালবাসিয়া থাকে। আমারও তাই হইয়াছে। আমি পূর্ব্বে অভিনেত্রী ছিলাম, আপনিও অভিনেত্রী ছিলেন, সেজন্য আপনাকে আমার বড় পছন্দ হইয়াছে। তা ছাড়া আপনার পিতাকে আমি জানিতাম, তিনি অপরিমিতব্যয়ী হইলেও অতি সদাশয় লোক ছিলেন।

আমার শরীর অসুস্থ হওয়ায় কয়েক মাস হইল চিকিৎসার জন্য এখানে আসিয়াছি। আরও কয়েক মাস এখানে থাকিয়া ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাইব। এখন রাজাসাহেব এখানে নাই। তিনি শীঘ্রই এখানে আসিয়া আমাকে লইয়া যাইবেন। আপনি আমার ছেলেমেয়েদের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইলে, আপনাকে ভারতবর্ষে যাইতে হইবে। সেখানে গিয়া আমি প্রথমে বছরখানেক কলিকাতায় থাকিব, তারপর আমাদের রাজ্যে ফিরিয়া যাইব। আপনি ইহাতে সম্মত আছেন? কত বেতন চাহেন?

আমি। ইহাতে আমার আপত্তি নাই। আপনি কত বেতন দিতে ইচ্ছুক জানিতে ইচ্ছা করি।

রাণী-সাহেবা। আমার ছেলেদের শিক্ষয়িত্রীদিগকে ইতিপূর্ব্বে মাসিক তিন শত টাকা হিসাবে দিতাম। আপনি যদি আমার সঙ্গে ভারতবর্ষে যাইতে সম্মত হয়েন, তাহা হইলে আপনি মাসিক পাঁচ শত টাকা পাইবেন, বাস করিবার জন্য একটী ভাল বাড়ী পাইবেন এবং দুইজন দাসী পাইবেন। আপনাকে সেই বাড়ীর ভাড়া দিতে হইবে না। দাসী দুইটীর বেতন ও আহার্য্য সরকার হইতে দেওয়া হইবে।

আমি। তাহা হইলেই আমার চলিবে।

রাণী-সাহেবা। আপনার কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। আমার স্বভাব এই যে, আমি কোন কথা গোপন করিতে জানি না। কোন লোককে দেখিবামাত্র আমি বুঝিতে পারি তাহাকে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য কিনা। আপনাকে দেখিয়া ভাল লোক বলিয়া আমার মনে হইয়াছে। সেইজন্য আমার সকল কথা আপনাকে বলিলাম। আশা করি, আপনিও আমার নিকট কোন কথা গোপন করিবেন না। আপনাকে আমি আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব। আশা করি, অসঙ্কোচে সে কথার উত্তর দিবেন। আমার মনে হইতেছে যে আপনি মিঃ বব্ চ্যাটারের অনুরাগিণী।

আমি। তাঁর প্রতি আমার বিরক্তি নাই। তাঁর দেশভ্রমণের কাহিনী শুনিতে আমি বড় ভালবাসি।

রাণী-সাহেবা। আমার প্রশ্নের ঠিক উত্তর হইল না। আপনি মিঃ চ্যাটারকে ভালবাসেন কিনা?

আমি। বাসি।

রাণী-সাহেবা। তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক কিনা?

আমি। তাঁর মনের ভাব কি জানি না। আমি রমণী হইয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁর নিকট এ প্রস্তাব করিতে পারি না।

রাণী-সাহেবা। আর কিছু বলিতে হইবে না।

আমি আপনাদের দুই জনের মিলন সংঘটিত করিয়া দিব। আগামী কল্য হইতে আপনি আমার ছেলে-মেয়েদের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইলেন। আপনি যদি ইচ্ছা করেন, এখানে আমার নিকট থাকিতে পারেন, তবে রাজা-সাহেব আসিলে আপনাকে স্বতন্ত্র স্থানে বাস করিতে হইবে।

আমি। আমি এখন যেখানে আছি, সেই খানেই থাকিব।

"উত্তম। এই আপনার নিয়োগ-পত্র গ্রহণ করুন।" এই বলিয়া রাণী-সাহেবা স্বহস্তে লিখিয়া আমাকে একখানি নিয়োগ-পত্র দিলেন। আমি তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া চলিয়া আসিবার উপক্রম করিতেছি দেখিয়া তিনি আমাকে বলিলেন, "আর একটা কথা বলিয়া যান। মিঃ চ্যাটার এখন কোথায় থাকেন জানেন?"

আমি। তিনি এখনও সেক্সপিয়ার থিয়েটারে কার্য্য করেন।

রাণী-সাহেবা। আচ্ছা আপনি এখন যাইতে পারেন।

আমি চলিয়া আসিলাম। আমি একটি ছোট হোটেলের একটি ক্ষুদ্র কক্ষে একাকিনী থাকিতাম। সেই কক্ষে যাইয়া রাণী-সাহেবার কথা ভাবিতে লাগিলাম।

ভবানীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের কথা।

(১)

সেক্সপিয়ার থিয়েটারের সংস্রব ত্যাগ করিয়াছি। এখন মধ্যে মধ্যে মিস্ সিসিলিয়ার সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি কয়েক দিবস হইল একজন ভারতবর্ষীয় সামন্ত-রাজার ছেলেমেয়েদের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, কয়েক মাস পরে তাঁকে তাঁর ছাত্রদের সহিত ভারতবর্ষে যাইতে হইবে। আমারও আর এখানে থাকিতে ভাল লাগিতেছে না। আমাকেও ভারতবর্ষে যাইতে হইবে। মনে করিয়াছি যে মিস্ সিসিলিয়া যখন ভারতবর্ষে যাইবেন, আমিও সেই সময়ে সেখানে যাইব। মিঃ ফেয়ারফ্রে সেদিন যা বলিয়াছিলেন তাহা কি ঠিক? মিস্ সিসিলিয়া কি সত্যই আমার পক্ষপাতিনী? সেক্সপিয়ার সেনাপতির কন্যা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন, আমি তাঁহার প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করিতে পারি নাই। এখন আমি যদি মিস্ সিসিলিয়ার নিকট আমার ভালবাসা জানাই, তাহা হইলে কি তিনি আমাকে হতাশ করিবেন? তিনি ইংলণ্ডের উচ্চ বংশের ধনবান্ লোকদিগের ভালবাসা অগ্রাহ্য করিয়াছেন, স্যার হেন্‌রী ষ্টিফেনের অকৃত্রিম প্রণয় যাঁর নিকট হারি মানিয়াছে, তাঁর হৃদয়ে বোধ হয় প্রণয়, ভালবাসা প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তির স্থান নাই। তাই বা কেমন করিয়া বলিব? আমার প্রতি তিনি বরাবর সদয় ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন। তিনি অভিনয় বিদ্যায় অভিজ্ঞা। তবে কি আমার প্রতি তাঁর সেই সকল সদয় ব্যবহার অভিনয় মাত্র? কিছুই আন্তরিক নয়? না, তা' হওয়া সম্ভব নয়। মিঃ ফেয়ারফ্রের অনুমান বোধ হয় অমূলক নয়।

(২)

আমার মনের ভাব যখন এইরূপ সেই সময় একদিন মিস্ সিসিলিয়ার মুনিব সাহেবার একজন ভৃত্য আসিয়া আমার হাতে একখানি পত্র দিল, সেই পত্রে তিনি আমাকে তাঁর সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তদনুসারে আমি রাণী-সাহেবার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমাকে সামান্য দু'চারটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "আপনি রাজা-সাহেবের শরীর-রক্ষী সৈনিকদিগের প্রধান সৈনিকের পদ গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষে যাইতে রাজী আছেন কিনা?"

আমি বলিলাম, "আমি শীঘ্রই ভারতবর্ষে ফিরিব মনে করিতেছিলাম। এখন যদি রাজা-সাহেবের অধীনে কার্য্য পাই তাহা হইলে তাহা আমার সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিব।"

রাণী-সাহেবা। রাজা-সাহেব এক সপ্তাহের মধ্যেই এখানে আসিবেন। আমি তাঁহাকে অনুরোধ করিলেই তিনি আপনাকে তাঁর শরীর-রক্ষী সৈনিকদিগের

প্রধানের পদে নিযুক্ত করিবেন। আপনি উপযুক্ত বেতন পাইবেন। আপনি কি বিবাহিত?

আমি। বিবাহ করিয়াছিলাম কিন্তু এখন সে স্ত্রী বাঁচিয়া নাই।

রাণী-সাহেবা। সন্তানাদি আছে?

আমি। না। তাহাদেরও মৃত্যু হইয়াছে।

রাণী সাহেবা। শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলাম। যা হইবার তা হইয়াছে। ইহার উপর মানুষের কোন হাত নাই। আপনি পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছুক কিনা?

আমি। এখন অনিচ্ছা নাই।

রাণী-সাহেবা। মিস্ সিসিলিয়াকে আপনি জানেন ত?

আমি। ভাল করিয়া জানি। আমরা এক থিয়েটারে কাজ করিয়াছি।

রাণী-সাহেবা। তাঁকে আমি আমার ছেলেমেয়েদের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়াছি, জানেন?

আমি। হাঁ।

রাণী-সাহেবা। মিস্ সিসিলিয়াকে আপনার কেমন লোক বলিয়া বোধ হয়।

আমি। আমি যতদূর জানি তিনি খুব ভাল লোক।

রাণী-সাহেবা। আপনি মিস্ সিসিলিয়াকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছেন?

আমি। আমি প্রস্তুত থাকিলেই ত হইবে না। মিস্ সিসিলিয়া প্রস্তুত থাকা চাই। তিনি ইতিপূর্ব্বে অনেক বড় লোকের প্রণয় প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। আমি ত অতি সামান্য ব্যক্তি।

রাণী-সাহেবা। যদি মিস্ সিসিলিয়া আপনাকে ভালবাসিয়া থাকেন, যদি তিনি আপনাকে বিবাহ করিতে সম্মত হ'ন, তাহা হইলে আপনি তাহাতে রাজী আছেন কিনা?

আমি। তাহা হইলে আমি নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী মনে করিব।

রাণী-সাহেবা। অতি উত্তম। মিস্ সিসিলিয়া, একবার এইখানে আসুন।

মিস্ সিসিলিয়া পার্শ্ববর্ত্তী একটী কক্ষ হইতে বাহির হইয়া রাণী সাহেবার নিকট আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইলেন। রাণী সাহেবা তাঁহাকে বলিলেন, "মিস্ সিসিলিয়া, আপনি মিঃ বব্ চ্যাটারের কথা শুনিয়াছেন। আপনার আপত্তির কোন কারণ নাই। শুনুন, মিঃ চ্যাটার, মিস্ সিসিলিয়া আপনাকে ভালবাসেন। একথা তিনি আমার নিকট স্বীকার করিয়াছেন। আপনিও তাঁহাকে ভালবাসেন। এমত অবস্থায় আপনারা দুইজনে বিবাহিত হইয়া পরস্পরকে সুখী করুন, ঈশ্বরের নিকট আমি ইহাই প্রার্থনা করি। কেমন মিঃ চ্যাটার, আপনি মিস্ সিসিলিয়াকে বিবাহ করিতে সম্মত আছেন ত?

আমি। আজ্ঞে হাঁ।

রাণী-সাহেবা। মিস্ সিসিলিয়া, আপনি মিঃ চ্যাটারকে পতিত্বে বরণ করিতে স্বীকৃত আছেন ত?

মিস্ সিসিলিয়া। আছি।

রাণী-সাহেবা। এই ত আপনাদের বিবাহের কথাবার্ত্তা পাকা হইয়া গেল। এখন কেবল বিবাহের অনুষ্ঠানটা হইলেই হয়।

(৩)

আমার সহিত সিসিলিয়ার বিবাহের অনুষ্ঠান লইয়া গোল বাধিল। বিবাহ কোন মতে হইবে? খৃষ্টান মতে হইতে গেলে আমাকে খৃষ্টান হইতে হয়। কিন্তু আমি তা হইতে পারিব না। মিস্ সিসিলিয়া খৃষ্টানের ঘরে জন্মিলেও প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি তাঁহার কোনই আস্থা ছিল না। এখন কি করি। কি উপায় অবলম্বন করিলে এই সংকট হইতে উদ্ধার হইতে পারি? এই চিন্তায় এখন আমার আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়াছে। একবার রাণী-সাহেবা ইঙ্গিত করিয়াছিলেন যে, আমরা দুইজনেই যদি মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হই, তাহা হইলেই সকল আপত্তির খণ্ডন হইয়া যায়। কিন্তু তাহাও হইতে পারে না। আমি মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে পারিব না।

অনেক চিন্তার পর আমার পূর্ব্ব পরিচিত ব্যারিষ্টার মিঃ মরীসের শরণাপন্ন হইলাম। তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। তিনি আমার সমস্ত কথা একটী খাতায় টুকিয়া লইয়া বলিলেন, "আপনি তিন চারি দিন পরে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।"

আমি তাঁহাকে এজন্য কত কি দিতে হইবে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "আপনাকে কোন টাকা দিতে হইবে না। আমি এখনও আপনাকে আমার বন্ধু মনে করি।

(৪)

তিন দিন পরে মিঃ মরীসের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি বলিলেন যে, "যাহারা খৃষ্টান, য়ুহুদি, হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, বৌদ্ধ, শিখ বা জৈনধর্ম্ম অবলম্বী নহে এইরূপ বিবাহ হইলে সেই বিবাহ বৈধ-বিবাহ হইবে, ভারতবর্ষে ইংরেজ-গবর্ণমেণ্টের এইরূপ একটি আইন আছে। আপনারা যদি সেই আইনের বিধান মতে বিবাহিত হইতে পারেন। তাহা হইলে বোধ হয় চলিতে পারে।"

আমি বলিলাম, "আপনি যেরূপ বলিলেন তাহাতে পাত্র ও পাত্রীকে বলিতে হয় যে আমরা প্রচলিত কোন ধর্ম্মই মানি না।

মিঃ মরীস। ঠিক তা নয়। তবে, আপাততঃ তাই মনে হয়। রাজা রামমোহন রায় প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বীরা এই আইন অনুসারে অনেক সময়ে বিবাহিত হন শুনিয়াছি।

আমি। আমরা যদি আপনার কথিত আইন অনুসারে বিবাহিত হইতে চাহি, তাহা হইলে আমাদিগকে কি করিতে হইবে?

মিঃ মরীস। আচ্ছা, আমি অবসরপ্রাপ্ত সিবিল সার্জ্জন ডাক্তার ঘোষালের নিকট একখানি পরিচয় পত্র দিতেছি। তিনি বাঙ্গালার লোক। পেনসন লইয়া কিছুদিন হইতে এখানে বাস করিতেছেন। তিনি একজন ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক। লোকটি অতি অমায়িক। আপনি তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিলেই তিনি এ সম্বন্ধে আপনাকে যথেষ্ট সাহায্য করিবেন।

মিঃ মরিসের চিঠি লইয়া আমি ডাক্তার ঘোষালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলাম।

(৫)

ডাক্তার ঘোষালের পূরানাম শশাঙ্কচরণ ঘোষাল। ইনি বিলাত হইতে ডাক্তারী পরীক্ষা পাশ করিয়া বাঙ্গালা প্রদেশের বহু জেলায় সিবিলসার্জ্জনের কার্য্য করিয়া প্রায় তিন বৎসর হইল অবসর গ্রহণ করিয়াছেন ও দুই বৎসর যাবৎ লণ্ডনে বাস করিতেছেন। তাঁর একমাত্র পুত্র নৃপেন্দ্রনাথ সিবিলসর্ব্বিস পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাত আসিয়াছেন। তাঁর শরীর তত ভাল নয় বলিয়া ডাক্তার ঘোষাল ও তাঁহার পত্নী স্নেহের জন্য বিলাতে রহিয়াছেন। ডাক্তার ঘোষাল, তাঁর পত্নী ও তাঁহাদের পুত্র নৃপেন্দ্রনাথ একটি ক্ষুদ্র অথচ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাটিতে বাস করেন। নৃপেন্দ্রনাথ গত সিবিল-সর্ব্বিস পরীক্ষায় সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। শীঘ্রই তিনি ভারতবর্ষে যাইবেন। তাঁহার বয়ঃক্রম তেইশ বৎসর।

ডাক্তার ঘোষালের বয়ঃক্রম সাতান্ন আটান্ন বৎসরের মধ্যে। লোকটি খর্ব্বাকৃতি। বর্ণটি তামাটে। অতি সরল প্রকৃতির লোক। এখানে আসিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়াছেন। পরিব দুঃখীদিগকে বিনা পয়সায় দেখেন এবং কোন রোগী নেহায়েৎ না ছাড়িলে তাহাকে হোমিওপ্যাথিক মতে ঔষধ দেন। ইনি কেবল যে চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন তাহা নহে, সংস্কৃত সাহিত্যে ও ভারতবর্ষীয় দর্শনশাস্ত্রে ইঁহার অসাধারণ অধিকার। কয়েকমাস পূর্ব্বে জার্ম্মেনীতে দার্শনিকদের মহাসম্মিলন হয়। সেই সম্মিলনে ডাক্তার ঘোষাল নিমন্ত্রিত হইয়া ভারতবর্ষের দর্শন সম্বন্ধে যে বক্তৃতা পাঠ করেন, তাহা ইয়ুরোপীয় বিদ্বন্মণ্ডলীকে চমৎকৃত করে।

ডাক্তার ঘোষালের পত্নীর বয়ঃক্রম পঞ্চাশ হইতে পারে। তিনি শিক্ষিতা ও স্নেহশীলা। বিলাতে আসিবার পর হইতে ডাক্তার ঘোষাল বিলাতপ্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদিগের অভিভাবক ও অকৃত্রিম সুহৃদ্ হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার বাটীতে বিলাতপ্রবাসী ভারতবর্ষীয় ছাত্রদিগের সর্ব্বদা যাতায়াত লাগিয়া রহিয়াছে।

ডাক্তার ঘোষালের পত্নী সেই সকল ছাত্রদিগকে নিজের সন্তানের ন্যায় স্নেহের চক্ষে দেখেন। ছাত্রেরাও ডাক্তার ঘোষাল ও তাঁহার পত্নীকে আন্তরিক ভক্তি করে। ছাত্রদিগের বিশ্বাস এইরূপ যে, যতদিন ডাক্তার ঘোষাল বিলাতে থাকিবেন ততদিন তাহাদের কোন বিষয়ে কোনপ্রকার অসুবিধা ঘটিতে পারিবে না।

(৬)

ডাক্তার ঘোষালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমি তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। তিনি বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারি। আমি বিবাহের রেজিষ্ট্রার ও বটে। কিন্তু বিলাতে আমার বিবাহ রেজেষ্টরী করিবার ক্ষমতা আছে কিনা ঠিক বলিতে পারি না। তা ছাড়া, আমার কাছে এখানে প্রয়োজনীয় খাতাপত্রও নাই। আমি তোমাদিগকে এই করিতে বলি। তোমরা এইখানে আমার নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হও।

তোমরা যে সময়ে ভারতবর্ষে যাইবে শুনিতেছি, আমাদেরও বোধ হয় সেই সময়ে যাওয়া হইবে। যদি এক সঙ্গে যাইতে পারি তাহা হইলে অতি উত্তম হয়। যদি আমাদের একসঙ্গে যাওয়া না ঘটে, তাহা হইলেও কোন ক্ষতি হইবে না। আমি আমার কলিকাতার বন্ধুদিগের নিকট পত্র দিব। তাঁহারা অবিলম্বে তোমাদের শুভপরিণয় সংঘটিত করিয়া দিবেন। কলিকাতায় তোমাদের বিবাহ হইয়া তাহা আইন অনুসারে রেজেষ্টরী হইয়া গেলে আর কোনরূপ গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

ডাক্তার ঘোষালের কথা রাণী-সাহেবা ও মিস্ সিসিলিয়াকে জানাইলাম। তাঁহারা ডাক্তার ঘোষালের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

তার পর একদিন ডাক্তার ঘোষাল, মিস্ সিসিলিয়া ও আমাকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। তাঁহার আদেশ মতে আমাকে পুনরায় তারাসীচরণ চট্টোপাধ্যায় নাম গ্রহণ করিতে হইল। এবং তিনি মিস্ সিসিলিয়ার নাম একটু বদলাইয়া সুশীলা রাখিলেন। এখন হইতে সিসিলিয়া "সুশীলা" নামে পরিচিতা হইতে লাগিলেন। ডাক্তার ঘোষালের পত্নী, সুশীলার রূপ গুণ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন।

(৭)

ডাক্তার ঘোষালের বিলাতের বাটীতে আর এক জন আসিয়া মধ্যে মধ্যে বাস করিতেন। তাঁর নাম মধুসূদন কর্ম্মকার। কর্ম্মকার মহাশয়ের রংটী এত কাল যে আলকাতরাকেও হার মানিতে হয়। তাঁর শরীরে মাংস মোটেই নাই। মনে হয় যেন নরকঙ্কাল কৃষ্ণবর্ণের একখানি কাপড় দিয়া কেহ মুড়িয়া দিয়াছে। তাঁর বাম চক্ষুটি কাণা;—একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। দক্ষিণ চক্ষুটি ঈষৎ ট্যারা। তাঁর নীচের পাটির দাঁত গুলি পরস্পরের সহিত বিবাদ করিয়া যতদূর সম্ভব দূরে অবস্থিত, আর তাঁর উপর পাটীর সম্মুখের তিনটি দাঁত এত বড় যে নিম্নের অধরকে আবৃত করিয়াছে। তিনি একটু খোঁড়াইয়া হাঁটেন। হাসিলে তাঁহাকে ভয়ানক দেখায়। এককথায়, এমন কদাকার মনুষ্য সচরাচর দেখা যায় না। শিশুরা তাঁহাকে অন্ধকারে দেখিলে ভূত মনে করিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠে। কর্ম্মকার মহাশয়ের মাথায় টাক এবং মুখমণ্ডলে শ্মশ্রু-গুম্ফ বিরল।

কর্ম্মকার মহাশয় প্রথম যেদিন আমাকে দেখেন সেদিন কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া কিয়ৎক্ষণ উচ্চহাস্য করেন। তার পর অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে আমার পাশে দাঁড়াইয়া আমার ঘাড়ে হাত দিয়া বলেন, "মহাশয়, আপনি বোধ হয় ভাবিতেন যে আপনার মত রূপবান ব্যক্তি আর নাই। কিন্তু এই আমার দিকে চাহিয়া দেখুন, আমি আপনার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছি।"

কর্ম্মকার মহাশয়ের সহিত অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমার বিলক্ষণ ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। লোকটী দেখিতে কদাকার হইলেও, তাঁর অন্তঃকরণ খুব ভাল। অনেক বিষয়ে ইঁহার অসাধারণত্ব আছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদিগকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। তাহাদিগকে প্রসন্ন করিবার জন্য নানাপ্রকার খেলনা সর্ব্বদা নিজের পকেটে রাখেন।

কতক বা ডাঃ ঘোষালের নিকট কতক বা স্বয়ং কর্ম্মকার মহাশয়ের নিকট শুনিয়া, কর্ম্মকার মহাশয়ের সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি।

কর্ম্মকার মহাশয়ের বাড়ী রাজসাহী জেলার এক পল্লীগ্রামে, তিনি পিতামাতার একমাত্র সন্তান। শৈশবে পিতৃমাতৃ বিয়োগ হওয়ায় এক পিতৃব্য কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হয়েন। সেই পিতৃব্যের নিজের সন্তানাদি ছিল না। কিন্তু হস্তে কিঞ্চিৎ অর্থ ছিল। অত্যধিক আদরে তিনি তাঁর পিতৃমাতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রটীর মস্তক উত্তমরূপে ভক্ষণ করিয়াছিলেন। কর্ম্মকার মহাশয় গ্রামস্থ মধ্যইংরেজী স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছিলেন; লেখা পড়ায় কখনই তাঁহার রুচিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। তাঁর পিতার একটী ছোট তামা কাঁসার দোকান ছিল। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাহা উঠিয়া যায়।

কর্ম্মকার মহাশয় তাঁহার গ্রামস্থ কামারের দোকানে গিয়া সর্ব্বদা বসিয়া থাকিতেন এবং নিবিষ্টচিত্তে তাহাদিগের দা, বঁটী, কুড়ুল প্রভৃতি নির্ম্মাণ কার্য্য দেখিতেন। কখন কখনও তৎসম্বন্ধে এমন দু'একটি কথা বলিতেন যে অভিজ্ঞ কামারেরা যদুনাথের বুদ্ধি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া যাইত এবং তাঁহাকে কামারের দোকান খুলিবার জন্য অনুরোধ করিত। যদুনাথ সে কথা শুনিয়া কেবল হাসিতেন, কোন কথা কহিতেন না। এই সময়ে যদুনাথ গ্রামের ছেলেদের নূতন নূতন ধরণের নানাবিধ খেলনা প্রস্তুত করিয়া দিতেন এবং নানাবিধ পশু ও পক্ষীর স্বরের অনুকরণ করিয়া বন্ধুবান্ধবদিগকে আনন্দিত করিতেন।

একদিন গ্রামের জমিদার বাবুর একটি লৌহ ট্রাঙ্কের বাক্সের কুলুপের চাবি হারাইয়া যায়। সেই সময় সেই ট্রাঙ্কটি না খোলা হইলে জমিদার বাবুকে ভয়ানক অসুবিধায় পড়িতে হয়। অন্য চাবির দ্বারা বাক্সের কুলুপ খুলিতে পারা যায় না। জমিদার বাবু অনন্যোপায় হইয়া সেই কুলুপটি ভাঙ্গিবার জন্য একজন কামারকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। যে কামারকে ডাকিতে জমিদার বাবুর লোক গেল, তার দোকানে সেই সময়ে যদুনাথ বসিয়াছিলেন। যদুনাথও সেই কামারের সহিত জমিদার বাবুর বাটীতে চলিলেন। সেখানে গিয়া সেই কামার কুলুপটী ভাঙ্গিতে উদ্যত হইলে যদুনাথ তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন যে, "তা হলে কুলুপটী একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে। কোন রকমে কুলুপটী খুলিয়া ফেলা করিলে ভাল হয়।" সেই কামার বলিল, "চাবি ছাড়া অন্য রকমে খুলিবে না।" যদুনাথ তখন জমিদার বাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমাকে যদি অনুমতি করেন, আমি একবার চেষ্টা করিতে পারি।" জমিদার বাবু বলিলেন, "তুই কি চেষ্টা করিবি? কুলুপ না ভাঙ্গিয়া তাহা খুলিতে পারিবি?" যদুনাথ বলিলেন, "আজ্ঞে, একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে চাহি।" জমিদার বাবু কৌতূহল-পরশ হইয়া যদুনাথকে কুলুপ খুলিবার অনুমতি দিলেন। যদুনাথ অনেকগুলি চাবির মধ্যে একটি চাবি বাছিয়া লইলেন, তারপর সেই চাবিটীকে একটু ঘসিয়া, সেটার এদিকে ওদিকে দু'একবার পিটিয়া সেই চাবিটির দ্বারা অবলীলাক্রমে সেই চন্দ্রের কুলুপ খুলিয়া দিলেন। সেই অবধি যদুনাথ জমিদার বাবুর সুনজরে পড়িলেন। জমিদার বাবু তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া গেলেন।

যদুনাথ কলিকাতায় গিয়া অধিকাংশ সময় আমোদ-প্রমোদ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে কামার ও সোনারের দোকানে গিয়া তাহাদের কার্য্যকলাপ দেখিতেন। ঘড়ির দোকানে গিয়া ঘড়ি মেরামত দেখিতে যদুনাথ খুব ভালবাসিতেন। রেলওয়ে ষ্টেশনে গিয়া রেলের এন্‌জিন কেমন করিয়া চলিতেছে, এন্‌জিনের কলকব্জা কি রকম, এই সকল বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে যদুনাথের আগ্রহ দেখা যাইত। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী নাটাগরের কর্ম্মকারেরা উৎকৃষ্ট কুলুপ গড়িতে পারে। যদুনাথ তাহা দেখিতে দুইবার নাটাগরেও গেলেন। এই রকমে যদুনাথের জীবনের কুড়ি বৎসর কাটিয়া গেল।

যদুনাথ ঘড়ি মেরামত করিতে শিখিলেন, কুলুপ তৈয়ার করিতে শিখিলেন, কলকব্জা সংক্রান্ত এমন

কোন কাজই রহিল না যাহা যদুনাথ করিতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি স্থির হইয়া বসিয়া কোন কাজই করিতে পারিতেন না। এই সকল বিষয়ে তাঁহার অশিক্ষিতপটুত্ব দেখিয়া কত লোকে যদুনাথকে কত রকমের কারখানা খুলিতে বলিতেন, কিন্তু যদুনাথ তাঁহাদের কথা উড়াইয়া দিতেন। কখনও বা বলিতেন "আমার মূলধন নাই," কখনও বা বলিতেন, "আমার বুদ্ধিসুদ্ধি নাই," কখনও বা বলিতেন, "আমার বাড়ী ছাড়িয়া বিদেশে না গেলে কোন কাজ হয় না। আমার বাড়ী ছাড়াও হইবে না, কোন কাজ করাও হইবে না।" যাহাই হউক, ঘড়ি প্রভৃতি মেরামত করিয়া যদুনাথ কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন।

কলকব্জা সম্বন্ধে যদুনাথের এমন সুন্দর বুদ্ধি মাঠে মারা যাইতেছে দেখিয়া, পূর্ব্বকথিত জমিদারবাবু একদিন যদুনাথকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "আমি তোর ভালর জন্য তোকে কলিকাতায় আনিলাম, তা তোর ত ভাল কিছুই হইল না। তুই ইয়ারের দলে মিশিয়া তোর এমন যে বুদ্ধি তা নষ্ট করিয়া ফেলিতেছিস্। আমি তোকে পুঁজি দিতেছি। তুই কুলুপ আর ট্রাঙ্ক তৈয়ার করিতে আরম্ভ কর। কলিকাতাতে একটা কারখানা খোল। জানিস্, কত লোক ট্রাঙ্ক প্রভৃতি তৈয়ার করিয়া বড় লোক হইয়া গেল, আর তুই ফ্যা ফ্যা করিয়া বেড়াইতেছিস্। তোর মত বুদ্ধি থাকিলে লোকে কিনা করিতে পারে? আমাদের দেশের লোকের একেত কলকব্জার দিকে মাথা খেলে না, যদি বা কাহারও খুলিল, ত তাহার আবার অন্য রকম খেয়াল আসিয়া জুটিল। তুই যদি স্থির হইয়া একটা কাজে না লাগিস, তাহা হইলে আমি আর তোর মুখ দেখিব না। তোকে আমার কলিকাতার বাসা বাটীতে উঠিতে দিব না।"

(৮)

এই সময় নানা কারণে যদুনাথের মন খারাপ ছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে যদুনাথের পিসীর মৃত্যু হয়। যদুনাথ পিসী-মাতার শ্রাদ্ধে কোনরূপ ঘটা করেন নাই, কোন লোকজনকে খাওয়ান নাই। এমন কি, শ্মশানবন্ধুদিগকেও মিষ্টমুখ করান নাই। এজন্য যদুনাথের জ্ঞাতিভায়েরা যদুনাথের উপর চটিয়া তাহাকে একঘরে করে। কলিকাতার ঘোরাফেরা করিয়া যদুনাথের মেজাজও একটু উগ্র রকমের হইয়াছিল, সেজন্য তিনি তাঁর জ্ঞাতিভায়েদের নিকট গিয়া তাহাদের সহিত চলিবার জন্য কোনরূপ চেষ্টা করিলেন না। ইহাতে যদুনাথের স্বজাতিবর্গ তাঁহার উপর আরও বিরক্ত হইয়া তাঁহার উপর নানাবিধ অত্যাচার আরম্ভ করিল। যদুনাথের গোপা নাপিত বন্ধ হইল। যদুনাথের আপনার বলিতে তখন কেহই ছিল না। তিনি স্বজাতিবর্গের উপর বিরক্ত হইয়া গ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। সেই সময় জমিদার বাবু যদুনাথকে পূর্ব্বকথিত মত তিরস্কার করিলেন। যদুনাথ মনের দুঃখে কলিকাতা হইতে পলায়ন করিলেন। কিছুদিন তাঁহার কোনই সংবাদ পাওয়া গেল না। কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি সাধুসন্ন্যাসীদের সহিত মিশিয়া ভারতবর্ষের নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া পুনরায় কলিকাতায় আসিলেন। তখন যদুনাথের বয়ঃক্রম আটাইশ বৎসর।

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া যদুনাথ তাঁহার পূর্ব্বপরিচিতদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। এইরূপ গোপনে কলিকাতায় বাসের দুই বৎসর অতীত হইবার কিছুদিন পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের নোট ও টাকা জাল করার অপরাধে কামদাকান্ত মাস-চটক নামক একজন ধনী সন্তানের সহিত যদুনাথকে গ্রেপ্তার করা হইল।

কামদাকান্ত মাস-চটকের পিতা একজন প্রসিদ্ধ জমিদার ও বিহার প্রদেশের এক জেলাকোর্টের বিখ্যাত উকিল ছিলেন। ওকালতী করিয়া তিনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন ও পৈতৃক জমিদারী যা ছিল, তাহার দ্বিগুণ আয়ের জমিদারী কিনিয়াছিলেন। তিন পুত্র, দুই কন্যা এবং এক পত্নী রাখিয়া তিনি পরলোক গমন করেন। অন্যান্য সম্পত্তির মধ্যে কলিকাতা সহরে তাঁহার কয়েকটী বাড়ী ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর উইলের প্রবেট লওয়া লইয়া ও স্থাবর অস্থাবর লইয়া তাঁহার তিন পুত্র, দুই কন্যা ও পত্নীর মধ্যে

ছয় মাস বৎসরব্যাপী তুমুল মোকদ্দমা চলিল। সেই মোকদ্দমায় কামদাকান্তের পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকাংশই নিঃশেষিত হইয়া গেল। সহিষ্ণু বিশেষের কাছে অসম্ভবিক পদার্থ পৃথিবীতে আর নাই। সুতরাং মোকদ্দমা শেষ হইবার পরও কামদাকান্ত ও তাঁহার ভ্রাতা ভগিনীদের পরস্পর মনোমালিন্য দূর হইল না। এই মোকদ্দমায় কামদাকান্তই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। মোকদ্দমা শেষে কলিকাতার একটি প্রকাণ্ড বাড়ী ব্যতীত তাঁর আর কিছুই রহিল না।

কামদাকান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিভাশালী ছাত্র ছিলেন। তিনি সুখ্যাতির সহিত বিজ্ঞান ও ইংরেজি শাস্ত্রে এম, এ পাশ করেন। তাঁহার এম, এ পাশ করিবার এক বৎসর পরেই পূর্ব্বকথিত মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। এই মোকদ্দমার পরিচালনে অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করিয়া কামদাকান্তের মস্তিষ্কের পীড়া জন্মিল। মোকদ্দমায় সর্ব্বস্বান্ত হওয়াতে তাঁহার মস্তিষ্কের পীড়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। এই সময়ে কেমন করিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর অর্থ লাভ করিতে পারা যায়, এই চিন্তা কামদাকান্তের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল। তিনি আলাদিনের প্রদীপ আবিষ্কার করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। অনেক চিন্তার পর তাঁর মনে এক কুবুদ্ধির উদয় হইল। তিনি স্থির করিলেন, গবর্ণমেণ্টের নোট ও টাকা জাল করিয়া চালাইতে পারিলে অল্প সময়ের মধ্যে অগাধ অর্থের অধিকারী হইতে পারিবেন। কামদাকান্ত তাঁহার কলিকাতার প্রকাণ্ড বাসায় জাল নোট ও টাকা প্রস্তুত করিবার আয়োজন অতি গোপনে করিতে লাগিলেন। এই সময়ে যদুনাথ কামদাকান্তের সহিত মিলিত হইলেন। কামদাকান্ত যদুনাথকে পাইয়া হাতে যেন আকাশের চাঁদ পাইলেন। জাল নোট ও জাল টাকা প্রস্তুতের কার্য্য অতি দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। এক বৎসর পরিশ্রম করিয়া কামদাকান্ত প্রায় তিন চার লক্ষ টাকা মূল্যের নোট ও টাকা জাল করিয়া অপূর্ব্ব কৌশলে সেগুলি বাজারে চালাইয়া দিলেন। জাল নোটগুলি দশ টাকার। এই জাল নোট ও জাল টাকা বাজারে চলিবার পাঁচ ছয় মাস পরে গবর্ণমেণ্টের গোয়েন্দা বিভাগের লোকদিগের সন্দেহ হইল। তাঁহারা এই বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। এদিকে কামদাকান্তের কলিকাতার বাটীতে গোপনে জাল নোট ও জাল টাকা পরমোৎসাহে কার্য্য উৎসাহের সহিত চলিতে লাগিল। কামদাকান্তের হাতে কিছু নগদ টাকাও জমিল।

(৯)

এই সময় একদিন একখণ্ড কাচপাত্রে খানিকটা সিসা গালাইবার সময় সেই কাচখণ্ড হঠাৎ ফাটিয়া গিয়া যদুনাথের একটি চক্ষুতে লাগিল। যদুনাথের অজ্ঞাতসারে সেই কাচখণ্ডে একফোঁটা জল ছিল। ইহার ফলে যদুনাথের সেই চক্ষুটি নষ্ট হইল। যথা সম্ভব গোপনে যদুনাথের চক্ষুটিকে রক্ষা করিবার জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা হইল, কিন্তু কোন ফল হইল না। যদুনাথের চক্ষুর চিকিৎসার জন্য যে ডাক্তারকে ডাকা হয়, সেই ডাক্তারের এক ভাই গোয়েন্দা বিভাগে কার্য্য করিতেন। যদুনাথের চক্ষু চিকিৎসা করিবার সময় সেই ডাক্তারের মনে কেমন সন্দেহ হয়। তিনি সন্দেহের কথা তাঁহার গোয়েন্দা বিভাগের কর্ম্মচারী ভ্রাতাকে জানান। তিনি গোপন অনুসন্ধানে অনেক আবশ্যক সংবাদ সংগ্রহ করিয়া তাহা গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীকে জ্ঞাত করেন। তাহার কিছুদিন পরে কামদাকান্তের কলিকাতার বাটীতে নোট ও টাকা জাল করিবার যন্ত্রাদিসহ কামদাকান্ত, যদুনাথ ও আর দুই ব্যক্তি ধৃত হয়। এই শেষোক্ত দুই ব্যক্তি কয়েদি অফিসে অল্প বেতনে কার্য্য করিতেন।

নোট ও টাকা জাল করার অপরাধে কামদাকান্ত, যদুনাথ ও কয়েদি আফিসে পূর্ব্বকথিত কর্ম্মচারী দুইটী অভিযুক্ত হইলেন। কামদাকান্ত ও কয়েদি আফিসের কর্ম্মচারী দুইটী তাঁহাদের অপরাধের কথা স্বীকার করিলেন না। যদুনাথ অকপটে সকল কথা প্রকাশ করিয়া স্বীকার করিলেন। এজন্য যদুনাথকে গবর্ণমেণ্ট পক্ষের সাক্ষী করা হইল। আদালতের সমক্ষে সত্য-সাক্ষ্য দিলে যদুনাথ মুক্তিলাভ করিবেন একথা তাঁহাকে

বুঝাইয়া দেওয়া হইল। মোকদ্দমার সময় যদুনাথ জাল নোট ও জাল টাকা তৈয়ার করার সম্বন্ধে যাহা জানিতেন তৎসমস্তই বলিলেন। যদুনাথের সাক্ষ্যের পোষক গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে অন্যান্য সাক্ষীরও সাক্ষ্য গৃহীত হইল। কামদাকান্ত ও করেন্‌সি আফিসের কর্ম্মচারী দুইটী অপরাধী প্রমাণিত হইলেন। তাঁহাদের প্রতি কঠোর পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আদেশ প্রদত্ত হইল। কিন্তু সেই মোকদ্দমার বিচারের সময় কামদাকান্তের মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইল। বিচারকের আদেশ অনুসারে কামদাকান্তকে চিকিৎসকদিগের পরীক্ষাধীনে রাখা হইল। পুলিশের লোকেরা বলিতে লাগিল যে কামদাকান্তের পাগলামি প্রকৃত নহে, ভাণ মাত্র। উপযুক্ত চিকিৎসকেরা কয়েক মাস ধরিয়া পুংখানুপুংখরূপে কামদাকান্তের কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিয়া এই মত প্রকাশ করিলেন যে, কামদাকান্তের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিয়াছে এবং বোধ হয় যে, দুই বৎসর পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার এই রোগের সূত্রপাত হইয়াছে। চিকিৎসকদিগের পূর্ব্বকথিত অভিমতের পর কামদাকান্তকে পাগলা-গারদে পাঠান হইল। করেন্‌সি আফিসের কর্ম্মচারী দুইটী কারাগারে গমন করিলেন। যদুনাথ মুক্তিলাভ করিলেন।

(১০)

মুক্তিলাভ করিয়া যদুনাথ নূতন বিপদে পড়িলেন। তিনি দেখিলেন কোন লোকই আর তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে চাহে না। তিনি কাহারও নিকটে গেলে সে ব্যক্তি অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করে, এবং যদুনাথ চলিয়া গেলে, হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে। উপায়ান্তর না দেখিয়া যদুনাথ পূর্ব্বকথিত জমিদার বাবুর নিকট গিয়া তাঁহাকে তাঁহার সকল অবস্থা খুলিয়া বলিলেন। সেই জমিদার বাবু যদুনাথের সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "তোমার কথা শুনিয়া মনে হইতেছে যে, তুমি কামদাকান্তের কথায় ঐ গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে। ঐ কার্য্যে তোমার নিজের বিশেষ কোন লাভ ছিল না। যাহাই হউক তোমার এ কার্য্য করা অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে। এখন তুমি আমাকে কি করিতে বল?" যদুনাথ বলিলেন, "আপনি যদি দয়া করিয়া আমাকে একবার বিলাতে পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে আমি সেখান হইতে ঘড়ি তৈয়ার করিতে শিখিয়া আসি।" জমিদার বাবু যদুনাথের সেই কথা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "একজন করদ নৃপতি শীঘ্রই বিলাত যাইবেন। তাঁর সঙ্গে একজন বাঙ্গালী ডাক্তার যাইবেন। সেই ডাক্তারের সহিত আমার বিলক্ষণ ঘনিষ্ঠতা আছে। আমি তাঁহাকে তোমার কথা বলিব। তিনি যদি তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহেন, তবে তোমাকে বিলাতে পাঠাইতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু বাপু, সাবধান, সেখানে গিয়া যেন আর কোন মন্দ কর্ম্ম করিও না।" যদুনাথ বলিলেন, "আজ্ঞে, আর কখনও ওরূপ করিব না। একবার যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, তাহার জন্য অনুশোচনার অনলে দগ্ধ হইতেছি। আশীর্ব্বাদ করুন, আর যেন আমার অসৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি না হয়।" জমিদার বাবু বলিলেন, "কোন ব্যক্তি একবার কোন দুষ্কর্ম্ম করিলে যে সে আর কখন ভাল হইতে পারে না, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। এ সম্বন্ধে আমার বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত আমার মতের মিল হয় না। তোমাকে দিয়া আমি এই বিষয়ের পরীক্ষা করিব। ডাক্তার আপত্তি না করিলেই আমি তোমাকে তাঁর সঙ্গে বিলাত পাঠাইব।"

তাহার পর যদুনাথ বিলাতে আসিলেন। বিলাতে আসিয়া তিনি সেখানকার নানাপ্রকারের কারখানার কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এক বৎসর ইংলণ্ডে কাটাইয়া যদুনাথ এক বৎসর জার্ম্মেনীতে ও এক বৎসর সুইজারল্যাণ্ডে কাটাইলেন। এই তিন বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ড, জার্ম্মেনী ও সুইজারল্যাণ্ডের সকল প্রকারের কারখানার মালিকদিগের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহার বুদ্ধিকৌশলে মুগ্ধ করিয়া তাঁহাদিগের কারখানার কলকব্জা সংক্রান্ত অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া লইলেন এবং কোন কোন কারখানায় সময় সময় কার্য্য করিয়া কিছু উপার্জ্জনও করিলেন।

যদুনাথের চতুর্দোপে অবস্থানকালে পূর্ব্বোক্ত জমিদার বাবু যদুনাথকে নিয়মিতরূপে খরচ যোগাইতেন। এইবার যদুনাথ দেশে ফিরিবেন। যে ডাক্তার মহাশয়ের সহিত যদুনাথ বিলাতে আসেন, তাঁহার সহিত ডাক্তার ঘোষালের বন্ধুত্ব ছিল। সেই ডাক্তার মহাশয়, যদুনাথকে ডাক্তার ঘোষালের সহিত পরিচিত করিয়া দেন। তাহার পর হইতে যদুনাথ মধ্যে মধ্যে ডাক্তার ঘোষালের লণ্ডনের বাসাবাটীতে আসিয়া থাকিতেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল গুপ্ত।

সাহিত্যের ধারা।*

আদি মানব ও ভাষা।

ধরণীর বক্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া যে মানব প্রথম চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল তখন তার কাছে এই জগৎ যে কি ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল তাহা ভাবিতে গেলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। মাথার উপরে দিগন্ত প্রসারিত নীল আকাশ, পদতলে শ্যামায়মানা ধরণী আর চারিদিকে গন্ধমুগ্ধ উচ্ছ্বসিত সমীরপ্রবাহ, ছায়াবহুল তরুরাজি, এই বিরাট রহস্যের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই মানবের প্রথম চিন্তা যে কার পানে ধাইয়াছিল কল্পনার বলে সে কথা একবার প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে চেষ্টা করি। তাহার বিস্ময়বিস্ফারিত আঁখির সম্মুখে ধরণী মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নবীন সাজে সজ্জিত হইতেছিল। এই, দিকে দিকে প্রস্ফুট কুসুমসম্ভারে শুভ্রনমুখর অলিকুলের পুলকচাঞ্চল্য, মুক্ত সৌন্দর্য্যের অযাচিত আহ্বান, তার পরক্ষণেই দিগদিগন্তব্যাপী মেঘ-লীলা-স্ফুরিত বিদ্যুতের চকিত বিলাস ও আকাশভাঙ্গা অজস্র সলিলবর্ষণ। এই সকল দেখিয়া সেই মুক্ত আকাশের তলে দাঁড়াইয়া সেই প্রথম চিন্তাশীল মানব কি ভাবিয়াছিল? শ্বাস টানিয়া সে দেখিল কোথা হইতে একটা পুলকিত সৌরভোচ্ছ্বাস তার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিতেছে। কর্ণদ্বারা ও নব আকাশেরই কিসের যেন একটা চাঞ্চল্য-কম্পন তার মস্তিষ্কে আঘাত করিতেছে। কিন্তু এই সকল কথা সে কি করিয়া প্রকাশ করিবে? তারই মত যে কতজন এই সকল দেখিতেছে শুনিতেছে চিন্তাহীন-ভাবে চলিয়া যাইতেছে সেই সব মূকদের কাছে সে তার এমন সুন্দর উপলব্ধিকে কেমন করিয়া প্রকাশ করিবে? সেই চিন্তাশীল মানব বুঝিল শুধু ইঙ্গিতে আর চলিবে না। সেই সব মূকদের মধ্যে একটা শব্দের সঙ্কেত দিতে হইবে—তাহাদের মুখে একটা ভাষা দিতে হইবে—তাহাদের সকলদিকের নীরবতাকে মন্থিত করিয়া তুলিতে হইবে। সেই মানব উপরের নীল প্রসন্নতাকে কহিল 'আকাশ', তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া যে একটা কোমল চঞ্চল প্রবাহ চলিয়াছে তাহাকে কহিল 'সমীরণ', পদতলের তৃণাচ্ছাদিত কঠিন বস্তুটিকে কহিল 'মৃত্তিকা'—তরঙ্গচঞ্চল তরল প্রবাহের নাম দিল 'জল'। 'আকাশ'—'বায়ু'—'মৃত্তিকা'—'জল'—এমনি আরও কতকগুলি শব্দদ্বারা সেই মানব তাহার সব জাতীয় প্রাণীদিগকে এই দৃশ্যমান জগতের একটা পরিচয় দিয়াছিল। কি গভীর রহস্য—তাহার অদ্ভুত আদিকাণ্ড। নাম নাই—পরিচয় নাই—চারিদিকে কুহেলিত অজ্ঞতা, ইন্দ্রিয়ের প্রবল তাড়না—তার মাঝে দহনা সেই চিন্তাশীল মানব বলিয়া উঠিল—"ক্ষিত্যপতেজোমরুৎব্যোম।"

এই বাণী যাহারা শুনিল, তাহারা সেই শব্দ সকলের আবিষ্কারকর্ত্তাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিবে বুঝিল না। তাহারা যাহা শুনিল তাহা শিখিল—যাহা শুনিল না তাহা শুনিতে চাহিল। ক্রমে ক্রমে কত কি শিখিল, যাহা দেখিল—যাহা শুনিল তাহারই একটা নাম সৃষ্টি করিল। কেবল তাহাই নয়, তাহারা মনের ভাব প্রকাশ করিতে শিখিল—একজন আর একজনের কাছে আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার কৌশল আবিষ্কার করিল; তাহারা জগতে কথাভাষার সৃষ্টি করিল। কিন্তু হায়, যে মানুষ তাহার সমজাতীয় মূক সকলকে কয়েকটী শব্দ শিখাইয়াছিল—কালক্রমে কোথায় সে

* সভ্যেন্দ্রকুমার সাহিত্য সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশনে পঠিত।

পড়িয়া রহিল—মানুষ তাহা ভুলিয়া গেল। যাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা মূক ছিল—তাহাদেরই পরপুরুষেরা ঘোষণা করিল, শব্দ কেহ দেয় নাই, উহা আকাশ হইতে ভাসিয়া আসিয়াছে। উহা ব্রহ্মময়—উহা আদ্যন্তবিহীন, নিত্য অজর ও অমর। কি ইন্দ্রজাল, কি বিস্মৃতি! তবু যে মহাপুরুষ জগৎকে একদিন শব্দমুগ্ধ করিয়াছিলেন—কত কোটী বৎসরের অবিরাম আর্ত্তনাদের মধ্যে আজিও তাহাকে আমাদের কল্পনা লক্ষ্য করিতে পারে। পশুসম মূক প্রাণীমণ্ডলীর মধ্যে দাঁড়াইয়া এক বিরাট পুরুষ মেঘমন্দ্রস্বরে মানবের নিকট শব্দোচ্চারণ করিতেছে—আর সহস্র সহস্র কুতূহলী মূক তাহা শুনিয়া পুলকে আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। মনে হয় এমনি একটী বৃত্তের মধ্যে অতীতের কোন এক বিস্মৃত দিবসে, আলোক তরঙ্গে, সৌরতোচ্ছ্বাসে, নদীর হিল্লোলে সেই রহস্যময় শব্দগুলি দিকে দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

এই শব্দ—তারপর বাক্য—তারপর ভাষা—তারপর অক্ষর—পরিশেষে সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু শব্দের পর বাক্য—বাক্যের পর ভাষা—ভাষার পর অক্ষর—অক্ষরের পর সাহিত্য সৃষ্ট হইতে যে কত যুগ চলিয়া গিয়াছে তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু শব্দ হইতে যে বাক্য ভাষা ও অক্ষরের মধ্য দিয়া সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। কেন করা যায় না তাহা আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের নিজেদের নিকট হইতেই জানিতে পারিতেছি। ব্যক্তির সমষ্টি জাতি—জাতির সমষ্টি বিশ্বমানব। ব্যক্তি যে ভাবে শব্দ বাক্য ও অক্ষরের ভিতর দিয়া সাহিত্যের দেখা পায়—বিশ্ব মানবও ঠিক সেই ভাবেই সাহিত্যের সংগঠন করিয়াছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য এই সংগঠন।

সাহিত্যের পুষ্টি।

শব্দ বাক্য ও অক্ষরের ভিতর দিয়া তো সাহিত্যের সৃষ্টি হইল। কিন্তু শৈশব, যৌবন, বার্দ্ধক্য তো এক নয়। অক্ষরের পর যে সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল—তাহা শিশুর মতই নিতান্ত সরল। কিন্তু দেখা যাইতেছে যুগে যুগে সাহিত্যের মধ্যে নানা প্রকার জটিলতা প্রবেশ করিয়াছে। এই জটিল সাহিত্য বৃদ্ধেরই মত সতর্ক, বৃদ্ধেরই মত সতত চিন্তাশীল। এই সাহিত্য বুঝিতে গভীর গবেষণা—বিপুল পরিশ্রম ও অবিরাম পাঠের প্রয়োজন। সুতরাং প্রশ্ন হইতে পারে—অক্ষর হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া যে সাহিত্য শিশুর মত সরল ছিল—ক্রমে ক্রমে তাহা এত জটিল হইল কিরূপে? এখন আমরা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।

শিশু সাহিত্য।

প্রথম যে সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা মুক্তকণ্ঠ পাপিয়ার প্রভাতী সঙ্গীতের মত অবাধ ও সতত সঞ্চরণশীল। তার মধ্যে কোন জটিলতা নাই। আছে শুধু অবাধ হৃদয়ের সরল উচ্ছ্বাস—আছে শুধু—উলঙ্গ প্রকৃতির সঙ্গে মানবের সরল সংমিশ্রণের পরিচয়। জ্ঞানের প্রথম উষায় তাহারা দেখিল—এই চতুর্দ্দিকের বাধাহীন প্রকৃতির মধ্যে একটা কার্য্যশীল প্রাণ অবিরত স্পন্দিত হইতেছে—চন্দ্রে সূর্য্যে নক্ষত্রে—পাহাড়ে, গহ্বরে, উপত্যকায়, নদীতে নির্ঝরে, সাগরে এই সমস্ত বিশ্বের মধ্যে যাহা কিছু আছে—সমস্তের মধ্যেই একটী কর্ম্ম-চঞ্চল সুন্দর জীবন অবিরত কার্য্য করিতেছে। আপনাকে ঘিরে তাহারা যাহা দেখিল তাহাই তাহাদের কাছে দৈবশক্তি বলিয়া মনে হইল। ক্রমে ছোট বড় সহস্র দেবতার সৃষ্টি হইল। তাহারা তাহাদিগকে পূজা করিত। কর্ম্মক্ষেত্রে এই সমস্ত প্রাকৃতিক অবস্থাগুলি যাহাতে তাহাদের সহায় হয়—সেই জন্য তাহারা তাহাদের নিকট প্রার্থনা করিত। এই সরল হৃদয়ের সরল প্রার্থনাগুলিই জগতের শিশু সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। দেশ, কাল, পাত্র ভেদে অবশ্য এই শিশু-সাহিত্য নানা দেশে নানা ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে গ্রীসের শিশু-সাহিত্য ও ভারতের শিশু সাহিত্য অনেকটা এক ভাবাপন্ন। এই দুই দেশই উত্তর কালে জ্ঞানে, বিজ্ঞানে ও বুদ্ধিতে সমস্ত জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

কেহ কেহ মানবের এই প্রথম সাহিত্যের মধ্যে পরিণত জ্ঞানের বিকাশ দেখাইয়াছেন। তাঁহারা বলেন, জগতের এই সমস্ত আদিম লোক প্রকৃতির অনেক গোপন কাহিনী জানিতে পারিয়াছিলেন—এবং তাঁহাদের সেই জ্ঞানকে অধিকতর উপযোগী করিবার জন্য তাহারা উহাকে কতকগুলি পদের (allegory) আবরণে ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন। মহাত্মা কার্লাইল সেই সমস্ত কথা অস্বীকার করিয়াছেন। বাস্তবিক জগতের আদিম লেখকগণ কোন নীতি বিশেষ দ্বারা প্রকৃতির রহস্যগুলিকে ঢাকিয়া দেখিয়াছিলেন কিনা সে বিষয়ে অনেকের সন্দেহ আছে।

মানবের সংখ্যা বৃদ্ধি ও বিপ্লব।

সাহিত্যের যখন এই শৈশব অবস্থা তখন কতকগুলি সামাজিক গণ্ডগোল মানুষকে প্রথম বার বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছিল। এসিয়ার যে উচ্চ ভূমিখণ্ডে মানুষ সর্ব্বপ্রথম বসতি স্থাপন করিয়াছিল—যে দেশের দ্রাক্ষাকুঞ্জের মাঝে মানুষ প্রথম মৃত্তিকাস্তূপ সৃজন করিয়াছিল, জ্ঞান উন্মেষের প্রথম অবস্থায়ই তাহারা দেখিল—সেখানকার উর্ব্বরতা আর তাহাদিগকে ক্ষুধার অন্ন দিতে পারিতেছে না। তাই সেই জনসঙ্ঘের ভিতর হইতে কেহ কেহ ঝড়, বৃষ্টি, রৌদ্র সহিয়া ক্ষুধার পিপাসায় জর্জ্জরিত হইয়া নদ নদী গিরি কন্দর ভয় উপত্যকা লঙ্ঘিয়া ঘুরে ঘুরে ছড়াইয়া পড়িল। এই অভিযানে তাহারা আভাস পাইল, পৃথিবী ক্ষুদ্র নহে। কত কানন-কুন্তলা সঙ্গীতমুখরা নির্ঝরিণী, কত তরঙ্গ-চঞ্চলা অপ্রতিহতবেগা সিরিনদী তাহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। বিপুল বিটপিসমাবৃত উত্তুঙ্গ শৈলমালা, কত তুষারধবল-তুঙ্গ-শৃঙ্গ, কত তমপরিবৃত আগ্নেয়গিরি তাহাদের চক্ষে পড়িল। ধূলিধূসরিত কত মরুপ্রান্তর, কত বুভুক্ষু হিংস্রজন্তু তাহাদের কতজনকে গ্রাস করিল তবু সেই নবালোকদীপ্ত মানব-সন্তানগণের বিরাম নাই, শান্তি নাই—তাহারা চলিয়াছে, কেবলই চলিয়াছে। তাহারা যে কেবল ক্ষুধার জ্বালায় তাহাদের বাসস্থান ত্যাগ করিয়া ঘুরে ঘুরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহা নয়। ক্ষুধার জ্বালায় একবার যখন তাহারা বাহির হইয়া পড়িল—তখন তাহারা দেখিল, তাহাদের দ্রাক্ষাকুঞ্জবেষ্টিত গৃহ-প্রাঙ্গণের বাহিরে বিশ্বের কি বিপুল পরিসর—কি উহার সৌন্দর্য্য! তাই মনে হয় তাহারা শুধু বিশ্বপ্রকৃতিকে দেখিবার জন্যই যেন চলিয়াছিল। কোথায় যাইতে হইবে জানে না—কেবল দেখিবার সাধ। দর্শনেন্দ্রিয়ের প্রবল ইঙ্গিতে তাহারা দূর দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িল। এই অভিযানে কত লোক মরিল—যাহারা বাঁচিয়া রহিল তাহারাও ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িল; তারপরে যে যেখানে ইচ্ছা সেখানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিল। পূর্ব্বে চীন, পশ্চিমে স্পেন, উত্তরে নরওয়ে ও দক্ষিণে মিশর পর্য্যন্ত এই বিচ্ছিন্ন মানব-সন্তানগণ ছড়াইয়া পড়িল। যাহারা উত্তরদেশে যাইয়া অবস্থান করিয়াছিল, তাহারা শীঘ্রই আরও সভ্য হইয়া উঠিল। যাহারা পাহাড়ে পর্ব্বতে আশ্রয় লইয়াছিল তাহারা ক্ষুধার তাড়নায় যাহা শিখিয়াছিল তাহাও ভুলিল। এই জন্যই মিশরে, চীনে ও কেলডিয়াতে সভ্যতা দ্রুতগতিতে উন্নত হইয়াছিল—পক্ষান্তরে পার্ব্বত্য জাতিগণ বর্ব্বরূপে দিন যাপন করিতে লাগিল। চীন, মিশর ও কেলডিয়ার সভ্যতা শীঘ্রই সাহিত্য ও শিল্পে প্রতিফলিত হইল। কিন্তু এসিয়ার মধ্যখণ্ডে যাহারা রহিয়াছিল, তাহারা তাহাদের ভাবগুলিকে নাড়িয়া চাড়িয়া গুছাইয়া লইল। কিন্তু সাহিত্যের বিশেষ কোন উন্নতি করিতে পারিল না।

দ্বিতীয় অভিযান।

এই যে প্রথম অভিযান ইহার মধ্যে শুধু অবিমিশ্র ক্ষুধা ও দর্শনপিপাসার চিহ্ন দেখা যায়। প্রাচীন চীন, মিশর ও কালডির সাহিত্যে এই চিহ্ন পতিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার পর মধ্য এসিয়া হইতে মানবগণ আরও অনেকবার নানাস্থানে অভিযান করিয়াছে। সেই সমস্ত অভিযানের মূলে মধ্য এসিয়ার ধর্ম্মতত্ত্বগুলি বিশেষভাবে আশ্রয়লাভ করিয়াছিল। সূর্য্যের উপাসনা লইয়া যাহারা পেরু বেবিলনের দেশে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারা পারসিক, সূর্য্যের উপাসনা লইয়া যাহারা

দক্ষিণ ভারতে গিয়াছিল তাহারা দ্রাবিড়, বৃক্ষ বিশেষের উপাসনা লইয়া যাহারা সুদূর পশ্চিমে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহারা টিউটন, আর জড়প্রকৃতির মধ্যে জীবন দেখিয়া বহু দেবতার উপাসনা লইয়া যাহারা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল—তাহারাই গ্রীসে যাইয়া নাম ধারণ করিল হেলেনিক (Hellenic), পারস্যে যাইয়া নাম ধারণ করিল ইরানি ও লক্ষপ্রবাহবিধৌত সিন্ধু-তটে নাম ধারণ করিল আর্য্যজাতি। এই সমস্ত জাতিই এসিয়ার আদিম বাসস্থান ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে এক একটী আদর্শের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে গ্রীকগণ ও ভারতীয় আর্য্যগণই বোধ হয় অনেক কাল একস্থানে থাকিয়া একই দেবদেবীর আরাধনা করিয়াছিল। ক্রমে গ্রীকগণ দক্ষিণে সরিয়া গিয়া পেলেসীয়নদের সহিত ভীষণ সংগ্রামে রত হয় এবং আর্য্যগণ ভারতে আসিয়া আর্য্যেতর জাতিদের সঙ্গে সংঘর্ষ উপস্থিত করে। ভারতের গ্রীসের ও ইরাণের সাহিত্যে এই ভাবের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্যেক জাতিই আপন আপন ভাব প্রকাশ দ্বারা আপন আপন জাতীয় সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিয়াছিল। কিন্তু এই সমস্ত জাতির মধ্যে ভারতবর্ষ সাহিত্যের মধ্যে আপনাদের উন্নততর ভাবগুলি এমনি ভাবে প্রকাশ করিয়াছিল যে, প্রাচীন জাতিসমূহের মধ্যে ভারতবর্ষকে অবিসংবাদিতরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সভ্য দেশ বলা যাইতে পারে।

সাহিত্য ও সমাজ।

এই পর্য্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে তাহা পরবর্ত্তী সাহিত্যকর্ত্তৃক পরিপোষিত হইলেও প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হয় নাই। ঐ সমস্ত কথার মূলে একটা দৃঢ়-সংবদ্ধ অনুমান ভিন্ন অন্য কোনও প্রমাণ নাই। কিন্তু মধ্য এসিয়া ত্যাগের পর জাতিসমূহ যে বিরাট সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা হইতে আমরা অনেক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি। মধ্য এসিয়ার বাসকালে মানবের মনে মনে যে চিন্তাবীজ উপ্ত রহিয়াছিল, বিভিন্ন দেশে যাইয়া তাহাই তৎকালীন বিশ্ব-সাহিত্যের সৃজন করিয়াছিল। সেই বিশ্ব-সাহিত্য সহস্র বৈচিত্র্য ও বিপ্লবের মধ্যদিয়া আজ বিংশ শতাব্দীর কোলে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। আমরা তাহা দেখিয়া বিপুল গৌরবে মোহিত, পুলকিত ও স্তম্ভিত হইতেছি।

জগতের আদিম সাহিত্যে যে ভাবগুলি আশ্রয় পাইয়াছে তার মধ্যে প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির উপর দেবভাব আরোপটাই যেন খুব উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়। জীবনধারণ করিবার জন্য প্রাণীদিগকে প্রতিনিয়ত প্রকৃতির সহিত কঠোর সংগ্রাম করিতে হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দীর উচ্চতর জ্ঞান যে শক্তিকে পরাজিত করিতে পারে নাই—আজিও যে অজ্ঞের অপরিজ্ঞেয় অসীম শক্তি সর্ব্বত্তরে বিশ্বকে চালিত করিতেছে সেই শক্তি যে বিশ্বাস-প্রবণ মুক্তপ্রাণ আদিম মানবদিগের নিকট দেবতা বলিয়া পূজিত হইবে—তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। কাব্য হিসাবে জগতের প্রথম সাহিত্য একটী আশ্চর্য্য জিনিষ। বিংশ শতাব্দীর উচ্চতর রুচিও উহার আদর করিতেছে।

ইহার পরে ক্রমে ক্রমে মানুষের জ্ঞান বাড়িতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের মধ্যেও তার বিকাশ দেখা যাইতে লাগিল। নানাপ্রকার সামাজিক দ্বন্দ্ব ক্রমে ক্রমে সাহিত্যে প্রবেশলাভ করিল। লোক চারিদিক হইতে বিবিধবার্ত্তা লইয়া সাহিত্যের দ্বারে উপস্থিত হইল। সাহিত্যও উদারভাবে সকলকে আপন বক্ষে টানিয়া লইল—সঙ্গে সঙ্গে মানবের প্রকৃতিও পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল।

সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ।

এইখানে একটী কথা বলা যাইতে পারে যে সাহিত্য ও সমাজ পরস্পর সমান ও সমান্তরাল ভাবে উন্নতির দিকে চলিয়াছে। সমাজ সাহিত্যের মন—সাহিত্য সমাজের দেহ। দু'টী রেখাদ্বারা যদি সাহিত্য ও সমাজকে পরিকল্পিত করা যায়, তাহা হইলে দেখান যাইতে পারে যে সাহিত্যের রেখা যতদূর অগ্রসর হইয়াছে—সমাজরেখাও ঠিক ততদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং রেখা দুটী পরস্পর সমান্তরাল ভাবেই চলিয়াছে।

সাহিত্যকে পশ্চাতে রাখিয়া সমাজ অগ্রসর হইতে পারে নাই—সমাজকে পেছনে রাখিয়াও সাহিত্য অগ্রসর হইতে পারে নাই। মানুষের মনোভাব সরলতা যে সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার ভাব সরল—ভাষা সরল—উপমাও নির্ঝরনিঃসৃতা গিরি-নদীর খরস্রোতের মত তরতর বহমানা। পরবর্তী সাহিত্য চারিদিক হইতে সমাজের জটিলতা আনিয়া উহাকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে। আদিম সাহিত্য চন্দ্রে, সূর্য্যে, গ্রহে, নক্ষত্রে, সাগরে, বিমানে দৃষ্টিমর দেবতার আরোপ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে নাই। উদগ্র প্রকৃতির প্রবল শক্তি যে ভাবে মানুষের নিকট দেখা দিয়াছে, তাহারা সেই ভাবেই তাহাকে বর্ণনা করিয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তী সাহিত্য ঐ সমস্ত ভাবের মধ্যে অবিশ্বাস ঢালিয়া দিয়াছে। সমস্ত আদিম ভাবকে টীকা-টিপ্পনি দ্বারা নানা ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছে। বৈদিক সাহিত্যে, রোমিয়ান ও গ্রীসের গ্রীক সাহিত্যে, যে সব অবিশ্বাস্য কথা দৃঢ় ভাবে [illegible] পরবর্ত্তী পৌরাণিক সাহিত্য তার মধ্যে একটা সীমার আরোপ করিয়াছে। হেলেনাকে সতী বলিতে হোমর শঙ্কিত হন নাই। কিন্তু গ্রেচো তাহাতে বিস্মিত হইয়াছেন। দ্রৌপদীকে আদর্শ নারী বলিতে বৈপায়ন আনন্দ বোধ করিয়াছেন, কিন্তু তাহারই অল্পপরে দ্রৌপদীর চরিত্র-গৌরব রক্ষা করিবার জন্য কত প্রয়াস মহাভারতের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এইস্থানে এত কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে সমাজ যেমন দিন দিন জটিলতার দিকে অগ্রসর হইতেছে সাহিত্যেও দিন দিন সেই ভাব প্রতিবিম্বিত হইতেছে। মোট কথা সমাজে যখন যে কথা উঠিতেছে—সাহিত্যেও তৎক্ষণাৎ তাহা আশ্রয় পাইতেছে।

সাহিত্যের মধ্যে এই একটা আশ্চর্য্য সত্য উপলব্ধি করা যায় যে জ্ঞানের প্রারম্ভে যে সমাজ সাহিত্যের সৃজন করিয়াছিল পরবর্ত্তী সময়ে আবার সেই সাহিত্যই সমাজের সংস্কার করিয়াছে। জগতের সাহিত্য এই সত্যের সাক্ষ্য দিতেছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য যে সরল বেদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী সময়ে সেই বেদই ভারতবর্ষকে কর্ম্মবহুল যাগযজ্ঞের মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছিল। আবার যখন সমাজের মধ্যে বেদ শিরোন্নত করিয়া দাঁড়াইল—তখন ভারতে প্রকাণ্ড বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। একদিকে উপনিষদের জ্ঞানকাণ্ড, অন্যদিকে বেদের কর্ম্মকাণ্ড—একদিকে ব্রহ্মবাদ, অন্যদিকে কর্ম্মবাদ; সমাজের মধ্যে এই দু'টী মত এক সময়ে খুব প্রবল হইয়া পড়িয়াছিল। এই বিপ্লব সমাজে অনেক দিন চলিয়াছিল—পরে গীতা আসিয়া এই দুই বিভিন্ন মতের সমন্বয় সাধন করে। গীতাতে জ্ঞান ও কর্ম্ম, ভক্তি ও যজ্ঞ, সাধনা ও সিদ্ধির কথা সবিস্তারে কথিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলেন বেদ আপনার কর্ম্মকাণ্ড লইয়া ব্রাহ্মণের আশ্রয়লাভ করিয়াছিল—উপনিষদ্ আপনার জ্ঞানকাণ্ড লইয়া ক্ষত্রিয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। কর্ম্মকাণ্ডের বিজয়-গীতি গাহিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন বশিষ্ঠ—আর জ্ঞানকাণ্ডের বিজয়-গীতি গাহিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন বিশ্বামিত্র। অবশ্য রবিবাবুর এই মত নিয়া আজকাল খুব একটা তর্ক চলিতেছে। কিন্তু এই বিবাদ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যেই বিশেষভাবে সংঘটিত হো'ক আর নাই হো'ক—জ্ঞানবাদ ও কর্ম্মবাদ লইয়া এক সময়ে যে সমাজে একটা প্রবল বিপ্লববহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মহাভারতে ও সমস্ত পুরাণে এই কথা গম্ভীরভাবে ঘোষিত হইয়াছে। আবার পৌরাণিক সাহিত্যের মধ্যে সমাজের আরও কতকগুলি তত্ত্ব আমরা দেখিতে পাই। জ্ঞানযোগী বুদ্ধ জ্ঞানকাণ্ডের আশ্রয়স্বরূপ সতত যাগযজ্ঞশীল ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ ছাড়িবেন কেন? তাহারাও বেদের আশ্রয়ীভূত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের জন্য লেখনী ধারণ করিলেন। তাঁহারা বুদ্ধকে নাস্তিক এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মকে নাস্তিক্য ধর্ম্ম বলিয়া জনসাধারণের নিকট ঘোষণা করিলেন। বোধ হয় ব্রাহ্মণগণ এই সময়ে গীতাকেই দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিয়াছিলেন। পুরাণের মধ্যে জ্ঞানবিরহিত যাগযজ্ঞের কথা বলা হয় নাই। কিন্তু এই

সমস্ত পুরাণের মধ্যে সমস্ত ব্রাহ্মণজাতি বিপুল মহিমায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই পৌরাণিক যুগের ব্রাহ্মণই সমস্ত জগতের প্রথম ব্রাহ্মণ। একদিকে কঠোর সংযম, অন্যদিকে জ্ঞান—একদিকে প্রবল শক্তি, অন্যদিকে ভোগবিতৃষ্ণা—একদিকে তত্ত্বজিজ্ঞাসা, অন্যদিকে দৃঢ় কর্ম্ম—একদিকে জ্ঞান, আর একদিকে কর্ম্ম—এইসব আশ্চর্য্য গুণরাশি লইয়া ভারতের সমগ্র ব্রাহ্মণজাতি এই সময়ে সমাজ সংগঠনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বিদলিত সন্ত্রাসিত বুভুক্ষু আমরা এই ব্রাহ্মণেরই সংশধর। কি লজ্জা—কি ঘৃণা! যাহা হউক, ব্রাহ্মণজাতির প্রাধান্য সংস্থাপনের চেষ্টা ও তৎসাধনে কৃতকার্য্যতাও সাহিত্যের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

জগতের অন্যান্য অংশেও সাহিত্যের এই সত্যটী আমরা দেখিতে পাই। সরল বলিষ্ঠ স্যাক্সন জাতির সমাজ সংগঠন করিবার জন্য উদ্যতত্তর নর্ম্মান জাতি ইংলণ্ডে এক সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে স্যাক্সন সাহিত্যে বিলাসপরতাও অত্যন্ত পরিমাণে খৃষ্টীয়ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব মাত্র বিকশিত হইয়াছিল। রোমক জাতির দাম্ভিকতা ও প্রবল রাজ্যপিপাসার প্রতিকূলে তীব্র বিদ্রূপাত্মক সাহিত্যের প্রয়োজন হওয়ায় ভার্জ্জিল ও জুভেনেল্ লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের সাহিত্য সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে গ্রীক সাহিত্য সম্বন্ধেও সেই কথাই বলা যাইতে পারে।

ইউরোপের মধ্যযুগের সাহিত্যে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রভাব বিশেষ ভাবে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। জ্ঞান বিকাশের প্রথম সময়ে গ্রীস্ হইতে যে সাহিত্যের আলো ইটালীর মধ্য দিয়া সমস্ত ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল—সেই সাহিত্যে বহু দেববাদই বিশেষ ভাবে বিঘোষিত হইয়াছে। সমাজ তখন অবনত মস্তকে সেই ভূমধ্য সাগরের তটপ্রান্ত হইতে নিনাদিত বহু দেববাদ সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু মহামতি খৃষ্ট যখন গম্ভীর নির্ঘোষে বলিয়া উঠিলেন—"অমৃতের পুত্র মানব, এক হইতে উদ্ভূত সমস্ত জগৎবাসী, আমরা সকলে এক পিতার পুত্র—আমরা সেই পিতারই উপাসনা করিব। তিনি ভিন্ন আমাদের আর কেহ মুক্তি দিতে পারিবে না।" তখন ভগ্নোদ্যম শিথিল সমাজ সেই আশার বাণী সাদরে গ্রহণ করিল। কিন্তু আলো আঁধারের মধ্যে বর্দ্ধিত মানব চিরদিনই ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করিতেছে। খৃষ্টের বিরুদ্ধে একটা মত বিশেষ ভাবে ইহুদিদিগকে আশ্রয় করিয়া খুব প্রবল হইয়া উঠিল। ইউরোপের পুরাতন সাহিত্যে এই মতগুলিও ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতে লাগিল। পরে রোম নগরী হইতে উত্থিত শাণিত কৃপাণ কত বার ইউরোপের মৃত্তিকাকে রঞ্জিত করিয়াছে। প্রবল ধর্ম্ম বিদ্বেষ লইয়া কতবার কত দেশে কত বিদ্রোহ প্রজ্বলিত হইয়াছে। তাহাও সাহিত্যে বর্ণিত হইয়াছে। সমাজের যখন এই অবস্থা তখন ফরাসী দেশ হইতে প্রথম খৃষ্ট ধর্ম্মের ভ্রাতৃভাব প্রচারিত হয়। রোলাণ্ড ও সালিমেনকে আশ্রয় করিয়া খৃষ্টের মহত্ব লইয়া এক বিপুল সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। আর্থারকে বেষ্টন করিয়া ইংলণ্ডের খৃষ্ট-প্রচারিত কতকগুলি পবিত্র ভাব সাহিত্যের মধ্যে দীপ্তি লাভ করে। তারপর ইটালীর অপ্রাপ্তিই কবি ডান্টের প্রতিভায় ইউরোপে একটী ধর্ম্মভাব জাগিয়া উঠে। মধ্যযুগে ইউরোপে যে প্রকাণ্ড সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল তার মধ্যে সমাজের এই খৃষ্ট ভাবই বিশেষ ভাবে প্রচারিত হইয়াছে।

মধ্য এশিয়া।

মধ্যযুগে মধ্য এশিয়ার প্রাচীন জাতি সমূহের সাহিত্যেও আমরা সেখানের সমাজকে প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাই। কোরাণ ও কৃপাণ লইয়া আরব দেশীয় মহাপুরুষ মহম্মদ মরুপ্রান্তরে মক্কায় ও মদিনায় একটী তুমুল ঝটিকা বহাইয়া দিয়াছিলেন। সেই কোরাণ ও কৃপাণের কথা মধ্য এশিয়া অনেক কাল ভুলিতে পারে নাই। এই জন্যই সেখানকার সাহিত্যে কেবল ঝটিকা গর্জ্জন ও পিপাসার চিহ্ন দেখা যায়। মধ্য এশিয়ার বিখ্যাত লেখকদের মধ্যে দুই একজন ছাড়া তাহাদের লেখাতে সংযমের চিহ্ন বড় বেশী দেখা যায় না। ওমর খায়ামের রুবায়ৎ গুলিতো কতকগুলি জলন্ত আকাঙ্ক্ষা। পেত্রা বেদানো ও বেঙ্কটেশের পদের

উপর যখন মরুভূমির স্নিগ্ধ চন্দ্র হাসিয়া উঠে এই স্বপ্নময় কবির অন্তরে তখন একটা বিলাস ও কামনার রাগিণী বাজিতে থাকে। পুষ্পবিলম্বিত বেণী, রক্তিম অধর, মলয় হিল্লোল—বহিঃপ্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য্য তাহার নিকট শুধু কতকগুলি উপভোগের সামগ্রী। "শাহনামা" ইতিহাস হইলেও তাহার মধ্যে বিলাস-বাসনা ও উপভোগের কথার অভাব নাই।

মধ্যযুগে-সুদূর প্রাচ্য।

সুদূর প্রাচ্যের সাহিত্যে ও মধ্যযুগের সমাজপ্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছে। সভ্যতার যে কোন পুরাতনকে পরিহার করিয়া নূতন আলো, নূতন জ্ঞান লাভের চেষ্টায় যখন দেশ বিদেশে স্বদেশীয় পণ্ডিত দলকে প্রেরণ করিতেছিল তখন তাহারই মধ্য হইতে কতিপয় পণ্ডিত ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়া গিয়াছিলেন। সেই সময়ে স্বর্ণপ্রসূ শ্যামলা এই ভারতবর্ষের পানে সমস্ত সভ্য জগতের লুব্ধ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া ছিল। নানা দেশের নানা প্রকার লোক তখন এখানে আসিয়া চারিদিক হইতে ভারতের মুক্তকরে অভিনন্দন সঞ্চারিত করিতেছিল। জ্ঞান-বুভুক্ষু চীন এই সময়ে ভারতে আসিয়া এদেশের সকল অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া যান। এদিকে বৌদ্ধ পুরোহিতগণ নানা দেশ হইতে নব নব বার্ত্তা বহিয়া প্রাচীরবেষ্টিত চীনের প্রাচীন দুয়ারে আঘাত করিতেছিলেন। জ্ঞানী চীন জগতের মঙ্গল আহ্বানকে উপেক্ষা করিতে পারে নাই। চীনের সুখস্বপ্ন মদিরা-মত্ত কবি লি-টাই-পিহ্ (Li-Tai-Pih) পুলক কম্পিত জগতের সেই আহ্বানকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বর্গচ্যুত অমর কবি মধ্যযুগের চীনসমাজে একটা নবজন্মবার্ত্তা একটা নবীনতা ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। চীন তাহাতে মোহিত হইয়াছিল। এই কবি মদিরা হস্তে সুখ ও স্বপ্নের মধ্য দিয়া চীনের সহস্র জটিল সমস্যার মীমাংসা করিয়াছেন। পরে এই কবির অনেক শিষ্য জন্মগ্রহণ করিয়া সমাজ ও সাহিত্যের সম্বন্ধের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। চীনের উপর দিয়া যে সংস্কার চলিয়া যাইতেছিল, তাহা সেই সময়ে তাপা-নকে আলোড়িত করিয়াছিল। অন্ধকারযুগে মহিলা-কুলশিরোমণি মৌরকেশী সুরে ছন্দে ভাবে যে সঙ্গীত গাহিয়াছিলেন তাহা জগতকে এখনো পুলকিত করিতেছে। চীনের সংস্রবে আসিয়া জাপ-সমাজ কি ভাবে আন্দোলিত হইয়াছিল এবং কি ভাবে চলিলে তাপান ক্রমশঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারে—মৌ-কেশী এবং তাহার শিষ্যবর্গ তৎকালের জাপানী সাহিত্যে তাহাই গাহিয়াছিলেন। এখন নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, সমাজ প্রথমতঃ সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু যুগে যুগে সহস্র সামাজিক সমস্যা সাহিত্যের মধ্যে অভিব্যক্ত হইয়া সেই সমাজকেই সংস্কার ও সংগঠনের সহায়তা করিয়াছে। সাহিত্যের এই সত্যটী বর্ত্তমান যুগে কি উজ্জ্বল ভাবে আমাদের চক্ষে পতিত হইতেছে তাহা সকলেই জানেন। সুতরাং সে বিষয়ে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

সাহিত্যে ব্যক্তিত্বের ও অভিনবত্বের প্রভাব।

সমাজ ও সাহিত্যের সম্বন্ধ নির্ণয়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও একটী সাহিত্যিক নিয়ম আমরা বড় স্পষ্ট করিয়া উপলব্ধি করি। সেটী এই যে এক এক যুগের সাহিত্য শুধু একটী মাত্র ভাবকে ও সেই ভাবের আবিষ্কার-কর্ত্তাকে বেষ্টন করিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত জনসাধারণ সেই ভাবটী বর্জ্জন বা গ্রহণ না করে ততদিন সেই ভাবটী সাহিত্যের মধ্যে খুব প্রবলভাবে বিস্তৃত থাকে। অবশ্য বর্ত্তমান যুগের বিচিত্র ভাবাপন্ন সাহিত্যে এই নিয়মটী বিশেষভাবে প্রয়োগ করা যায় না। কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে যে কোন দেশের সাহিত্যের দিকে লক্ষ্য করিলেই এই নিয়মটীর আংশিক সত্যতা আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব। ফরাসী দেশের Romanticism আজকাল কোন না কোন প্রকারে সমগ্র জগতের মধ্যেই যেন একটু আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। রুশিয়ার মার্শনিক কবি কাউণ্ট টলষ্টয় দ্বারা প্রচারিত সাম্য ও বিশ্বপ্রেম ভাবটিও বর্ত্তমান বিশ্ব-সাহিত্যে কম প্রভাব বিস্তার করে নাই।

সুদূর পশ্চিমের এক প্রান্ত হইতে সাম্যমৈত্রী ও বিশ্বপ্রেমের ভাবগুলি আসিয়া রক্ষণশীল প্রাচ্যজাতিসমূহকেও বিশেষভাবে আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছে। এদিকে ভারতের নিভৃত গুহার মধ্যে লুক্কায়িত তপোবন হইতে একদিন যে মধুর তত্ত্ববার্ত্তা বিঘোষিত হইয়াছিল তাহাও আজকালকার সাহিত্যে বিশেষভাবে আদিপত্য লাভ করিয়া উঠিতেছে। প্রায় সকল দেশের বিখ্যাত লেখকদের কণ্ঠেই আজকাল পুরাতন ভারতের জ্ঞানপূর্ণ সঙ্গীতগুলি ধ্বনিত হইতেছে। আজ যে সাহিত্যের মধ্যদিয়া আমরা জলে, স্থলে, জড়ে ও অজড়ে একটা মহৎপ্রাণের অনন্তসত্তা অনুভব করিতেছি তাহা এই ভারতেই প্রথম নিনাদিত হইয়াছিল। এদিকে আবার ভারতীয় সাহিত্যেও অনেক পাশ্চাত্যভাব আসিয়া প্রভাব বিস্তার করিতেছে।

কিন্তু এই সার্ব্বজনীন প্রভাবগুলি ছাড়িয়া দিলেও বিভিন্নশ্রীকৃত বিভিন্ন দেশের সাহিত্যে আমরা আজকাল ভিন্ন ভিন্ন ভাব বিশেষ ভাবে প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাই। ভারতবর্ষীয় সাহিত্যে আজকাল বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ভাবগুলির সমন্বয় সাধন করিবার জন্য বেশ একটা চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ সাহিত্য জগতের অন্যান্য দেশের সঙ্গে সঙ্গে এদেশেও যে না বাড়িতেছে এমন নয়। কিন্তু সেই ভাবগুলি বর্ত্তমান বিশ্বসাহিত্যের একটা সাধারণ সম্পত্তি, সুতরাং রাজনৈতিক সাহিত্যের কথা বাদ দিয়া দেখিতে গেলে দেখা যাইবে যে সাম্প্রদায়িক বিভিন্ন মতগুলির সমন্বয়-চেষ্টাটাই আজ কালকার ভারতীয় সাহিত্যে বিশেষ ভাবে কার্য্য করিতেছে। ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় রাজনৈতিক সাহিত্যই খুব বাড়িয়া যাইতেছে। জর্ম্মানীতে কাণ্ট হিগেলের শিষ্যবর্গ এখনো দার্শনিক সাহিত্য নিয়াই ব্যস্ত। ফরাসীরা সকল দেশ হইতেই কিছু কিছু সংগ্রহ করিতেছে। বর্ত্তমান যুগে তাহাদের উদ্ভাবনী শক্তি খুব কমিয়া গিয়াছে বলিয়াই অনেকের বিশ্বাস। কিন্তু তাহা হইলেও সকল দেশের ভাব নিয়া ফরাসীজাতি যে সাহিত্যের সৃষ্টি করিতেছে তাহাকেই বিশেষ ভাবাপন্ন বলা যাইতে পারে। প্রাচ্যজাতি সমূহের মধ্যে জাপান পাশ্চাত্যজাতির সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়াও অপেক্ষাকৃত প্রশংসনীয়রূপে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে। এই স্বাতন্ত্র্য ভাবই জাপ সাহিত্যের বিশেষ ভাব। জগতের পুরাতন সাহিত্যেও দেখা যায় যে এক একটী ভাব নিয়া এক এক সময় এক এক জাতীয় সাহিত্য পুষ্ট হইয়াছে। রামায়ণ মহাভারতে জীবন মৃত্যু, প্রেম ও সংগ্রাম নিয়া যে সমস্যা উঠিয়াছিল ভারতের দার্শনিক যুগের সাহিত্য তাহার সমাধান করিয়াছে। কালিদাসের সময়ে যে সৌন্দর্য্যপিপাসা ভারতবাসীদের প্রাণে জাগিয়া উঠিয়াছিল, অনেকদিন পর্য্যন্ত সে পিপাসা নিবারিত হয় নাই। এইজন্য আজি পর্য্যন্তও ভারতীয় সাহিত্যে এত সৌন্দর্য্য আমরা দেখিতে পাই। মধ্যযুগের প্রথমাবস্থায় ফরাসী সাহিত্যে বিজয়ী বীরের প্রশংসনীয় বিজয়বার্ত্তা সাহিত্যে বিশেষভাবে প্রবেশ করিয়াছিল। এক সময়ে Chanson-de-geste ইউরোপের পশ্চিম প্রান্তের লোক সকলকে পুলকিত করিয়াছিল। এই Chanson-de-geste হইতেই উত্তরকালে Chanson-de-Roland ও Morte-de-Arthurএর সৃষ্টি হইয়াছে। চসারের (Chaucer) এর কেন্টারবারী কাহিনী এই Chanson-de-geste হইতেই সমুদ্ভূত। এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যখন ইউরোপে ভাবপ্রধান সাহিত্যের পুনরুত্থান হইয়াছিল, তখনো তাহাতে বীরকাহিনীগুলিই বিশেষভাবে ব্যক্ত হইয়াছিল।

এই তো গেল সাহিত্যে ভাবের প্রাধান্য। এইবার ব্যক্তিত্বের প্রাধান্য সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এক এক সময়ে এক জন প্রতিভাশালী লোক আসিয়া সাহিত্যের মধ্যে এমন একটা ভাব বিন্যাস করিয়া যায় যে সেই সময়ে ও তৎপরবর্ত্তী সময়ে উহা সাধারণ লোকদিগকে বিশেষভাবে আন্দোলিত করিতে থাকে, যতদিন পর্য্যন্ত আর একজন প্রতিভাশালী লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে দেখা না দেয় ততদিন পর্য্যন্ত সেই ভাবটাই সাধারণ লেখকদের হাতে সংস্কৃত মার্জ্জিত ও বিকশিত হইয়া ফুটিতে

থাকে। কালিদাসের প্রভাব ভারতবর্ষ অনেকদিন ভুলিতে পারে নাই। Euripidesএর সময়ে যে নাটকীয় সাহিত্য উদ্ভূত হইয়াছিল গ্রীসে অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহা সমাদৃত হইয়াছিল। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যে বাঙ্গালী কবি যশঃপ্রার্থী হইয়া লেখনি ধারণ করিতেন তিনিই একজন মাইকেল বা একজন নবীনচন্দ্র হইতে চেষ্টা করিতেন। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে যিনি ঔপন্যাসিক হইবার আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিতেন, তিনিই একজন দ্বিতীয় বঙ্কিমচন্দ্র হইবার স্পর্দ্ধা হৃদয়ে ধারণ করিতেন। বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ যে কি ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছেন তাহা মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন। ইংরেজী কাব্য-গুলি আজকাল টেনিসনের ভাবে অনুপ্রাণিত। জগৎ সাহিত্যে গেটের ক্ষমতা যে এক সময়ে কি প্রভাব লাভ করিয়াছিল—তাহা কার্লাইলের যে-কোন একখানা গ্রন্থ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। মোট কথা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাব লইয়া সমাজকে সাহিত্যের এবং সাহিত্যকে সমাজের অনুকূল করিয়া লইবার জন্য এক এক সময়ে এক এক জন প্রতিভাশালী লোক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা জগতের মধ্যে এমন একটা কিছু অভিনব কাণ্ড করিয়া যান—দূর ভবিষ্যৎ যাহার প্রতি চাহিয়া মুহূর্ত্তে জগৎকে মোটামুটী রকম বুঝিয়া লইতে পারে। কাল-আকাশে এই সমস্ত মহাপুরুষগণ এক একটী ধ্রুব-নক্ষত্র। এক এক দেশ এক একটী নক্ষত্রের দিকে চাহিয়া এক এক সময় পুলকিত হইয়া উঠে। এই নক্ষত্রগুলিই জগতের সাহিত্য। সাহিত্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে মহা-পুরুষদের অনুসরণ করিয়া যাহা বুঝিয়াছি তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। *

* লেখক নবাগতের নামটী জানাইয়া যাওয়ার দিতে পারা গেল না, এজন্য নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি। ভাঃ মঃ সঃ।

স্বরগের ঠিকানা।

(১)

স্বরগের ঠিকানা আমায়
কেহ কি বলিতে পার ভাই?
বহু দিন গেছেন অনেক
স্নেহ-লিপি আজও পাই নাই!

(২)

আশা-পথ চাহিয়া চাহিয়া
দিন মোর বৃথা কেটে যায়,
পূরে নাকো প্রাণের বাসনা
অশ্রু নিতি ঝরে নিরাশায়।

(৩)

ছিনু তাঁর হৃদয়ের ধন
রাখিতেন নয়নে নয়নে,
ক্ষণকাল হলে বিষাদিত
ভুলাতেন সুমিষ্ট বচনে।

(৪)

ক্ষণতরে হলে অদর্শন
হইতেন কি আকুল হায়!
সারা প্রাণ উঠিত কাঁদিয়া
কত যে অশুভ ভাবনায়।

(৫)

কত বুকে আজি যে বিষম
প্রাণ মোর করে হায়! হায়!
তাঁর কি গো গলে না হৃদয়
হায় পিতঃ রয়েছ কোথায়!

(৬)

আছ কেগো মুহৃদ্ এমন
বলে দিবে ঠিকানা তাঁহার,—
দূরে যাবে তপ্ত দীর্ঘশ্বাস
ও চরণ লভিলে আবার।

(৭)

ছাড়িয়ে জনকে আমি আর
না চাহি রহিতে এ ধরায়,
কে গো আছ দয়াময় এমন
নিয়ে যাবে আমারে সেথায় ? *

শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত।

১৩২২। ১৪ই ফাল্গুন, শুক্রবার।

ছাত্রজীবনের স্মৃতি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

"হিতবাদী" সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদের বিরুদ্ধে সেই সময় এক মানহানির মোকদ্দমা লইয়া কিছুদিন খুব হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছিল। সেই মোকদ্দমায় বাদী পক্ষের মামলা চালাইবার জন্য মনস্বী আনন্দ-মোহন বসুকে অনুরোধ করা হয়। তাহাতে তিনি এইরূপ প্রকাশ করেন যে "এ মোকদ্দমায় বাদীপক্ষ ব্রাহ্মসমাজের লোক। আমি বাদীপক্ষে মামলা চালাইলে লোকে মনে করিবে যে বুঝি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে হিন্দু সমাজের মোকদ্দমা হইতেছে। সুতরাং আমি এ মোকদ্দমায় কোন পক্ষ অবলম্বন করিব না।" পুলিশ কোর্টে বাদীর পক্ষে মামলা চালান স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার [স্যার] তারকনাথ পালিত, এবং আসামী কাব্য বিশারদের পক্ষ সমর্থন করেন প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী। এই মোকদ্দমা হাইকোর্টের সেসনে যায়। হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত জেঙ্কিন্স সাহেবের নিকট বিচার হয়। ইনি হইয়াছেন কলিকাতা হাইকোর্টের বর্ত্তমান প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স জেঙ্কিন্স। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবিবর নবীনচন্দ্র সেন, স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি বিখ্যাত সাহিত্যিকগণ এই মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দেন। এই ব্যপদেশে "হিতবাদী" দলের কেহ কেহ সেদিন চন্দ্রনাথ বাবুকে অযথা গালি দেন। চন্দ্রনাথ বাবুর অপরাধ তিনি কাব্যবিশারদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন।

সেই সময় ১৮৯৬ সনের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় 'কংগ্রেসের' অধিবেশন হয়। সেবার সভাপতি ছিলেন বোম্বাই হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ এটর্নি রহমতুল্লা সিয়ানী। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র। সেবারকার কংগ্রেসে বোম্বাইয়ের স্যার ফিরোজ-সাহ মেটা, মান্দ্রাজের আনন্দ চার্লু, যুক্তপ্রদেশের মদনমোহন মালব্য প্রভৃতি অনেক বিদ্বান ব্যক্তিকে আমরা একত্রে দেখিতে পাই। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন সভায় আসিতে পারেন নাই। ডাক্তার রাস-বিহারী ঘোষ মিত্র মহাশয়ের লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন। তখনকার নিয়ম মত সেবারকার কংগ্রেসে অভ্যাগতদিগের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য কলেজের ছাত্রেরা স্বেচ্ছাসেবক বা ভলেন্টিয়ার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তখন কংগ্রেসের উপর শিক্ষিত সমাজের প্রায় সকলেরই বেশ ভক্তি ছিল। সুরাটের কংগ্রেস ভঙ্গের পর হইতে কংগ্রেসের প্রতি লোকের সে ভক্তি-ভাবের যেন অভাব ঘটিয়াছে। তখনকার কংগ্রেসগুলিতে 'আবেদন নিবেদনের' পালাটা অবশ্য বেশী মাত্রায় থাকিতও। রবিবাবু সেই সময়ের কিছু পূর্ব্ব হইতেই এই আবেদন নিবেদনের বিরুদ্ধে সুর ধরিয়া গাহিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন যে "আবেদন আর নিবেদনের পালা ব'হে ব'হে" আমাদের 'শির কেবল নত' হইতেছে; কিন্তু "দাও দাও বলে পরের পিছু পিছু কাঁদিয়া বেড়ালে যেসেনাত কিছু।" এই কংগ্রেস সভায় রবি বাবু ও তাঁহার দাদা জ্যোতিরিন্দ্র বাবু উপস্থিত ছিলেন। জ্যোতিবাবু প্রভৃতি সঙ্গীতজ্ঞগণ কংগ্রেস সভায় গানের তত্ত্বাবধান করেন। সেই সভায় বঙ্কিম বাবুর "বন্দে-মাতরম্," শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "মিলে সবে ভারত-সন্তান, একতান মনপ্রাণ গাও ভারতের যশো-গান" এবং সেই কংগ্রেস উপলক্ষে রচিত জ্যোতিবাবুর "চল্‌রে চল্ সবে ভারত-সন্তান, মাতৃভূমি করে আহ্বান" এই গানগুলি গীত হয়। শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী ও

* এই কবিতাটী লেখিকার অধিক বয়স সময়ে লিখিত "বেদনাবী" নামক অপ্রকাশিত কাব্য হইতে সঙ্কলিত হইল।
—শ্রীযোগেন্দ্রকুমার দত্ত—

আরও কয়েকজন মহিলা সেই কংগ্রেস সভায় উপস্থিত ছিলেন। সেবার বিডন উদ্যানের একাংশে নির্ম্মিত-মণ্ডপে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। বলা বাহুল্য সেবারকার কংগ্রেসের প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্যে বাঙ্গলাদেশের সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, অম্বিকাচরণ মজুমদার, গুরুপ্রসাদ সেন, লাল-মোহন ঘোষ, আনন্দমোহন বসু, মতিলাল ঘোষ প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তখন হাইকোর্টের সিনিয়র গবর্ণমেণ্ট প্লিডার। সভাসমিতিতে ইঁহাকে কখন দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ইনি তখন কবিতা লেখা একরকম ছাড়িয়া দিয়াছেন বলিলেই হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যাসাগরের মৃত্যু উপলক্ষে "করাল কালের লীলা মাহাত্ম্য সকলি, হরিল বিদ্যাসাগরে কাল মহাবলী" ইত্যাদি এবং বঙ্কিম বাবুর মৃত্যুতে "বহিল বসন্ত অনিল বহে আহা কি মধুরতর" ইত্যাদি কবিতা লিখিয়াছিলেন, কিন্তু এই সকল কবিতা "ভারত সঙ্গীত "ভারত-ভিক্ষা" "স্বর্গারোহণ," "বৃত্র-সংহার," "দশমহাবিদ্যা" প্রভৃতির রচয়িতার উপযুক্ত হয় নাই।

মহিলা কবিদের মধ্যে তখন "আলো ও ছায়া" রচয়িত্রী শ্রীমতী কামিনী সেন, "কাব্য কুসুমাঞ্জলী" রচয়িত্রী শ্রীমতী মানকুমারী ও "অশ্রুকণা" রচয়িত্রী শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীমতী অবলাসুন্দরী, শ্রীমতী সরোজকুমারী শ্রীমতী বিনয়কুমারী প্রভৃতি কয়েকজন মহিলা কবি সেই সময়ের মাসিক পত্রাদিতে সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখিতেন।

কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন ও কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের কবিতাও আমরা তখন খুব আগ্রহের সহিত পড়িতাম। সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে সেই সময় কয়েকবার দেখি। তখন তাঁহার শরীর খারাপ বলিয়া বড় একটা কিছু লিখিতেন না। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র অমরলাল তখন কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে পড়িতেন। বন্ধুবর শৈলেন্দ্রনাথ ও অমরলাল এক বাসায় থাকিতেন। শৈলেন্দ্রনাথের নিকট যাইতাম বলিয়া অমরলালের সহিতও পরিচয় হয়। অমরলালের কলিকাতার বাসাতেই অক্ষয়বাবুকে দেখি। তৎপূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছে। অমরলালের ছোট ভাইকে লইয়া তাঁহাদের পিতাকে কিছু বিব্রত থাকিতে হইত। সেই সময় কলিকাতায় অমরলালের বিবাহ হয়। অমরলালের বিবাহের দিন অপরাহ্নে গুরুদাস বাবু হাইকোর্টের ফেরতা সেই কলিকাতার বাসায় গিয়া অক্ষয় বাবুর সহিত দেখা করিয়া আপ্যায়িত করিয়া যান। ইহার কয়েক বৎসর পর অক্ষয় বাবুর লিখিত "পিতাপুত্র" পাঠ করিয়া গুরুদাস বাবুর সহিত অক্ষয় বাবুর ঘনিষ্ঠতার কারণ বুঝিতে পারি।

কলেজের দেশীয় অধ্যাপকদের মধ্যে সে সময়ে অল্প দিনের মধ্যে ছাত্রমহলে যাঁহাদের অধ্যাপনার প্রশংসা হয়, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত মোহিতচন্দ্র সেন, ৺লাল-গোপাল চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু ও ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পাণ্ডিত্যের পরিচয় তৎপূর্ব্বেই বিদ্বজ্জন-সমাজ পাইয়াছিলেন।

ইহার কিছু পূর্ব্বেই বোধ হইতেছে "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ" প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু তখন ইহার কার্য্যক্ষেত্র এখনকার মত বিস্তৃত হয় নাই।

এই সময়েই শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির ঐতিহাসিক প্রবন্ধাবলী বাহির হইতে আরম্ভ হয়। "পুরাতন প্রসঙ্গে" শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় "বাঙ্গালীর" একটি চরিত্রগত দোষের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে বাঙ্গালীরা অনেক বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মুখে কাল খাইয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্ট কোন ব্যক্তি বা বিষয়ের যতক্ষণ পর্য্যন্ত না গুণগান করিলেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত বাঙ্গালী সেই ব্যক্তি বা বিষয়ের গুণ সম্বন্ধে একপ্রকার উদাসীন। ভট্টাচার্য্য

নবাবদরের সময়ে এ দোষটা বাঙ্গালীর চরিত্রে যতই কেন থাকুক না এখন যে এই দোষের অনেকটা লাঘব হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশের লোকের নিকট সম্মানিত। কিন্তু তাঁর এই সম্মানলাভের সহিত গবর্ণমেণ্টের কোন সম্বন্ধ নাই। সম্প্রতি ইউরোপ ও আমেরিকাতে রবীন্দ্রনাথ খুব সম্মানলাভ করিয়াছেন। সেদিন বড় লাট সাহেব প্রকাশ্য সভায় রবীন্দ্রনাথকে "এসিয়ার রাজকবি" বলিয়াছেন। কিন্তু ইহার বহু পূর্ব্ব হইতে রবীন্দ্রনাথ কবি ও লেখক বলিয়া তাঁহার দেশের লোকের নিকট সম্মানিত।

এই যে সুরেন্দ্র বাবুকে দেশের লোকে এত সম্মান করে, তাহার কারণ অবশ্য ইহা নহে যে সুরেন্দ্র বাবুকে গবর্ণমেণ্ট আগে সুখ্যাতি করিয়া বাড়াইয়াছেন। মিরর সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেনকে দেশের লোক খুব মানিত। তাহার কারণ গবর্ণমেণ্ট যে নরেন্দ্রনাথকে আগে বাড়াইয়াছিলেন তাহা নয়। তাহার কারণ, নরেন্দ্রনাথের তেজস্বিতা ও ন্যায়পরায়ণতায়। একবার তিনি এক বড়লাটের মুখের উপর সেই বড়লাটের অন্যায় ব্যবহারের প্রতিবাদ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। সেই নরেন্দ্রনাথ সেনকে যখন গবর্ণমেণ্ট রায় বাহাদুর করিলেন তখনই বরং লোকের চক্ষে তিনি অনেকটা খাটো হইয়া গেলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর দেশের লোকে যে তাঁর প্রতি সম্মান দেখাইয়াছিলেন তা'কি বঙ্কিমবাবু পেন্সনপ্রাপ্ত ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়া, না বঙ্কিমবাবু বাঙ্গালা-সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ লেখক বলিয়া? কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধেও সেই কথা। গবর্ণমেণ্ট-নিরপেক্ষ হইয়াই দেশের লোক তাঁহাদের প্রতি সম্মান দেখাইয়াছেন। প্রতি বৎসর গবর্ণমেণ্টের কত বড় বড় কর্ম্মচারী মরিতেছেন বা অবসর লইতেছেন কে তাঁহাদের তেমন খবর লইতেছেন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত।

বাঙ্গলার গীতিকবিতা।

বাঙ্গলার জল, বাঙ্গলার মাটীর মধ্যে একটা চিরন্তন সত্য নিহিত আছে। সেই সত্য, যুগে যুগে আপনাকে নব নব রূপে, নব নব ভাবে প্রকাশিত করিতেছে। শত সহস্র পরিবর্ত্তন, আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই চিরন্তন সত্যই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যে, দর্শনে, কাব্যে, যুদ্ধে, বিপ্লবে, ধর্ম্মে কর্ম্মে, অজ্ঞানে, অধর্ম্মে, স্বাধীনতায়, পরাধীনতায়, সেই সত্যই আপনাকে ঘোষণা করিয়াছে, এখনও করিতেছে।* সে যে বাঙ্গলার প্রাণ, বাংলার মাটী, বাংলার জল, সেই প্রাণেরই মহিমাবলে। বাংলার ঢেউ খেলান শ্যামল শস্যক্ষেত্র, মধু-গন্ধ-বহ মুকুলিত আম্রকানন, মন্দিরে মন্দিরে ধূপ ধুনা আলো সন্ধ্যার আরতি, গ্রামে গ্রামে ছবির মত কুটীর প্রাঙ্গণ, বাংলার নদ নদী, খাল বিল, বাংলার মাঠ, বাংলার ঘাট, তালগাছ ঘেরা বাঙ্গলার পুষ্করিণী, পূজার ফুলে ভরা গৃহস্থের ফুলবাগান, বাংলার আকাশ, বাংলার বাতাস, বাংলার তুলসীপত্র, বাংলার গঙ্গাজল, বাংলার নবদ্বীপ, বাঙ্গলার সেই সাগর-তরঙ্গে চরণ-বিধৌত জগন্নাথের শ্রীমন্দির, বাঙ্গলার সাগর-সঙ্গম, ত্রিবেণী-সঙ্গম, বাঙ্গলার কাশী, বাঙ্গলার মথুরা-বৃন্দাবন, বাঙ্গালীর জীবন, আচার-ব্যবহার, বাঙ্গলার সমগ্র ইতিহাসের ধারা যে, সেই চিরন্তন সত্য, সেই অখণ্ড অনন্ত প্রাণেরই পবিত্র বিগ্রহ! এই সবই যে সেই প্রাণ-ধারায় ফুটিয়া ভাসিতেছে, দুলিতেছে!

সেই প্রাণ-তরঙ্গে একদিন অকস্মাৎ ফুটিয়া উঠিল, এক অপূর্ব্ব অনন্যসাধারণ পদ্মের মত বাঙ্গলার গীতিকাব্য! কিন্তু ফুল ত একদিনে ফুটে না। তাহার ফুটনের জন্য যে অতীতের অনেক আয়োজন আবশ্যক। তাহার প্রত্যেক দলের মধ্যে যে অনেক গান, অনেক কথা, অনেক কাহিনী। তাহার গন্ধের মধ্যে যে অনেক কালের অনেক স্মৃতি, অনেক মধু জড়াইয়া থাকে। তাহার ডাঁটায় যে জন্ম-জন্মান্তরের চিহ্ন লুকান থাকে। ফুল যে অনন্তকাল ধরিয়া ফুটিতে ফুটিতে ফুটিয়া উঠে।

বাঙ্গলার গীতিকাব্য যে কখন কোন্ আদিম উষায় ফুটিতে আরম্ভ করিল, আমি জানি না। শুনিয়াছি,

পঞ্চাশ-ষাটের লিখিত খুঁটিতন গৌরব দোহার তাহার উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। চণ্ডিদাসের সময় সেই গীতিকাব্যের বিকশিত অবস্থা। কিন্তু তার আগে অনেক গীতিকাব্য না লেখা হইয়া থাকিলে এরূপ কবিতা সম্ভব হয় বলিয়া আমার মনে হয় না। আজকাল আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান, অনেক আলোচনা ও গবেষণা চলিতেছে। আশা করি, একদিন আমরা আমাদের গীতিকাব্যের এই হারাণ ধারাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব।

চণ্ডিদাসের লিখিত যে গীতিকাব্য, ইহাই বাঙ্গলার যথার্থ গীতিকাব্য; এই কবিতাগুলির মধ্যে যে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়, তাহাই বাঙ্গলা গীতিকবিতার প্রাণ। বাঙ্গলা চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিল, রূপে রূপে এ বিচিত্র ভুবন ভরিয়া আছে। কত কাল, কত যুগ, কোন্ অন্ধকারের অন্ধকারে রূপের ধ্যানে মগ্ন আমার বাঙ্গলা জাগিয়া দেখিল, উর্দ্ধে অনন্ত নীল, নীলের পর নীল, অকূল ধারে কল-কল্লোলে গঙ্গা বহিয়া যায়, চরণতলে ফলহারভরা মহাসমুদ্র অনন্ত সুরে গাইয়া উঠিয়াছে,—তাহার বুকের উপর আছড়াইয়া পড়িতেছে; শিরে হিমালয় কাহার ধ্যানে নিমগ্ন! বাঙ্গলা দেখিল, তাহার আশেপাশে এত রূপ, এত সুর, এত গান,—মন প্রাণ বিচিত্র রসে ভরিয়া উঠিল। ভরা মনে, ভরা প্রাণে ব্যাকুল হইয়া শুনিল, প্রাণের ভিতর কাহার সাড়া, কাহার আকুল আহ্বান! তখন বাঙ্গালীর কবি গাইয়া উঠিল,—

"কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ"

বাঙ্গলা তখন প্রাণের ভিতর ডুব দিয়া দেখিল, কত রবি, কত মাণিক্য তাহার সেই আঁধার প্রাণের পরতে পরতে আলোক বিকীরণ করিতেছে। ভাবিল, আমার প্রাণে কে আছে, কি আছে? কে আমাকে বাহির হইতে রূপে, রসে, গানে, গন্ধে জড়াইয়া জড়াইয়া আকুল করে, আবার অন্তরের অন্তরে আসিয়া এমন করিয়া স্পর্শ করে? কাহাকে ব্যক্ত করিতে চাই? কে বিনা চেষ্টায় আপনা আপনি এমন করিয়া ব্যক্ত হইয়া উঠে; বাঙ্গলা প্রাণে প্রাণে বুঝিল, এ যে বাহিরের ও ভিতরের এক অপূর্ব্ব মিলন। এই মিলন উপভোগ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিল, অনন্ত সাগর দূরে যেখানে দিক্‌চক্রবালের পরিধিপারে মিলিয়াছে, সেখানে শুধু এক রেখার মত সরল, শান্ত, নিবিড়, যেন মিলিয়াও মিলায় নাই, মিশিয়াও মিশে নাই, প্রভেদ অথচ অভেদ। আবার ফিরিয়া দেখিল, ধরণী মহাকাশকে চুম্বন করিতেছে, চলিয়া পড়িয়া বলিতেছে, "হে আকাশ, আমাকে লও, আমি যে তোমারই।" আকাশও ধরণীকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়াছে, বলিতেছে, "এস এস, আমি ত তোমারই।" দেখিল, যে এক মহামিলন। বুঝিল, জন্মে জন্মে সকলই সার্থক! জন্ম সার্থক! মৃত্যু সার্থক! দেহ সার্থক! প্রাণ সার্থক! আত্মা সার্থক! এই মহামিলন সার্থক! বাহির শুধু বাহির নয়, অন্তর শুধু অন্তর নয়। ইন্দ্রিয় দিয়া যাহা প্রথম ধরা যায়, তাহা শুধু বহিরাবরণ। প্রত্যেক প্রত্যক্ষের, প্রত্যেক ভাবেরই একটা অন্তঃপ্রকৃতি আছে। সেই বহিরাবরণ ও অন্তঃপ্রকৃতি মিলিয়া মিশিয়া এক। তাহারই নাম বস্তু। জীবন এই মহামিলনমন্দির। কত বিচিত্র রূপ, কত বিচিত্র গন্ধ, কত বিচিত্র রস, কত না সুরের খেলা, কত না রসের খেলা;—আমরা যে তিলে তিলে নূতন হইয়া উঠিতেছি। বাঙ্গলার কবি তখন চামর দুলাইতে দুলাইতে গাইলেন,—

"নব হে নব নিত্যই নব,
যখনি হেরি তখনি নব!"

আদিম যুগ হইতে বাঙ্গলার বুকে অনেক আশা, অনেক ভাব আপনা আপনি জমাট বাঁধিতেছিল। সে যে হৃদয়ের মাঝে জানে কি অজানে, কাহার খোঁজ করিতেছিল, মিলন-পরশের জন্য আকুল হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। মনের ভিতর ডুবিয়া ডুবিয়া সেই দেখিতে পাইল, আর সে আনন্দ ধরিয়া রাখিতে পারিল না। তখন কবি গাইয়া উঠিলেন,—

"হৃদয়ে আছিল বেকত হইল
দেখিতে পাইনু সে"

হৃদয়ের মাঝে যে ভাব আপনা আপনি ফুটিতেছিল, সে যেন মূর্ত্তি ধরিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। সে রূপ কেমন? যেন,—

"চরণ-কমলে ভ্রমরা দোলয়ে
চৌদিকে বেড়িয়া থাক"

তাহাকে দেখিয়া কবি বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছিলেন, শুধু অন্তরের ভিতর মরমের সেই লুকান ঘরে বিভোর হইয়া দেখিতেছিলেন। যখন বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিতে পাইলেন—তাঁহার সেই মানস-প্রতিমা, জীবন-প্রতিমা—

"চম্পক-বরণী, হরিণ-নয়নী • • •
চলে নীল সাড়ী নিঙ্গাড়ী নিঙ্গাড়ী
পরাণ সহিত মোর।"

—ইহাই বাঙ্গলা গীতিকবিতার প্রাণ। প্রাণের সঙ্গে, মর্ম্মের সঙ্গে, ভাষার সঙ্গে, ভাবের সঙ্গে, কর্ম্মের সঙ্গে, ধর্ম্মের সঙ্গে,—জীবনের সঙ্গে, বাহিরের ও ভিতরের এমনই প্রাণস্পর্শী মিলন। বাঙ্গালী জানুক, আর নাই জানুক, বুঝুক, আর নাই বুঝুক, আমার বাংলার প্রাণ সে মহামিলনে ভোর হইয়া আছে। সেই মহা-মিলন-মন্দিরে পূজা যে নিয়ত চলিতেছে; বাংলার গান, তাহার আরত্রিক—বাংলার ভাষা তাহার মন্ত্র। সেই বাংলার কবি চণ্ডিদাস। সেই কবিতা বাঙ্গালীর কবিতা।

বাঙ্গলা দেশে সাহিত্যের অঙ্গনে এই গীতিকাব্য লইয়া আজকাল এক প্রকার যুদ্ধবুদ্ধ বাধিয়াছে। নানাপ্রকার তর্ক-বিতর্ক, দলাদলি, দ্বেষ, ঈর্ষা জাগিয়াছে। আজ দেখিতেছি, যে প্রাণের অনুভূতি লইয়া চণ্ডিদাস প্রভৃতি কবিরা গান গাহিয়াছিলেন, সে ধারা, সে প্রাণের মতন, মনের মতন, সে "বিষামৃতে একত্র করিয়া" প্রাণ-রচে সে যন্ত্রী আর যেন ঝঙ্কারিয়া উঠে না। কাব্য লইয়া, কবিতা লইয়া, সাহিত্য লইয়া রস-সৃষ্টি লইয়া নানা বিশ্লেষণ, কঠোর অনুশাসন, ধর্ম্ম ও নীতির দোহাই, আদর্শের বড়াই, স্বজাতীয়তা ও বিজাতীয়তা, মিক্তির ওজনে তোল করিয়া, কষ্টি-পাথরে খাদ কত পড়ে, এই যাচাই, বাছাই, ঝাড়াই, করিতেই দিন গত হয়, কিন্তু—

"দিন গত নহে শ্যাম, তব চরণে এ দিন গত"

সে সুরের, সে সৃষ্টির, সে আস্বাদনের, সে মিলনের কথা নাই, সে কথা বুঝিবার ইচ্ছাও নাই। সে বাঁশীর ধ্বনি আর শুনিতে পাই না—

"নিজ নিকটে যদি কণ্ঠ ডুবায়ব
কে দূর করব পিয়াস।"

আমাদের ঠিক সেই অবস্থা।

আজ এই সাহিত্যের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া সেই তর্ক, মীমাংসা, যুক্তি, এই ভাবদৈন্যের কারণ বুঝাইতে হইলে, আমি যে খুব ভাল করিয়া তাহার ঠিক মীমাংসা, ভাষ্য ও টীকাটিপ্পনির সহিত দেখাইতে পারিব, এমন হয় ত নাও হইতে পারে; তবে বাঙ্গলা কবিতার প্রাণ ও বাঙ্গলা সাহিত্যের আদর্শ যে কি, তাহা বোধ হয়, বলিবার সময় আসিয়াছে। তাই আজ এই সমবেত সাহিত্যের দরবারে আমি সেই সকল কথাই বলিতে চাই, কোন্ পথে যাইলে হৃদয়-উৎসের দেখা মিলিবে, তাহারই খোঁজ করিব। আপনারাও যদি আমার সঙ্গে একবার এই বিচিত্র রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের ভিতর দিয়া সেই অবিরাম কবি চিন্তামণির 'মণি-কোটা'র সন্ধানে আসেন;—ধৈর্য্য ধরুন, সে সে বাঁশীর রাগিনী আপনাদেরও কান জুড়াইবে, প্রাণ জুড়াইবে। ধৈর্য্য ধরিলে মুরারি মিলিবে সে নূতনের সাক্ষাৎ মিলিবেই মিলিবে। সে যে "নিতুই নব"। নিজে নূতন হইতেছে, সাথে সাথে এই জাগ্রত বিশ্বও নব নব উন্মেষে মুখরিত হইয়া উঠিতেছে।

এখন কথা হইতেছে কাব্য কি? গীতি-কবিতা কি? সাহিত্য কি? সাহিত্যের আদর্শই বা কি? ফুল যেমন তাহার ভরা রূপের ডালি লইয়া একদিনে ফুটিয়া উঠে না, তেমনি আদর্শও একদিনে, এক মুহূর্ত্তে প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে আসে না। অনন্তকালের যে অনাহত সঙ্গীতের আহ্বান চলিয়াছে, সেই আহ্বানের টানে ফুল আপনার সেই বিরাগ ও অনুরাগ লইয়া কত যুগ-যুগান্তরের স্মৃতির অশ্রু ধারার ভিতর দিয়া গৌরবে সৌরভে আপনার আত্মবিকাশ করে। বিকাশই যে

জীবনের ধর্ম :—রূপে রূপে বিকাশ, নূতন যুগের নূতন মত জন্ম ধরিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। তার সাগরের প্রতি ঢেউ উঠিয়া, দুলিয়া, আপনার ইচ্ছায় খেলিয়া, আবার সাগরে মিলিয়া যায়। জীবনের ধর্ম প্রতিকাশের ধর্মই তাই। অনন্তকাল হইতে তারা আছে অনন্তকালই থাকিবে. তাই চণ্ডীদাস গাইয়াছেন,—

"আমার জনম না ছিল যখন
তখন করেছি চাষ।
দিবস রজনী না ছিল যখন
তখন গণেছি মাস।"

নিতান্তিত কাল পক্ষ, দিবস রজনী, সবই ছিল, সবই আছে, সবই তেমনি করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে।

প্রথম কথা, গীতি-কবিতার জন্ম কোথায়? সাধারণতঃ মোদ্দা কথায় হয় ত বলিতে পারা যায় যে, ছন্দোবদ্ধ সুর তালে বাঁধা কথাই কবিতা। সমাজ-বিজ্ঞানবিদ্ তাহার এক সামাজিকতত্ত্ব বাহির করিতে চান, মনস্তত্ত্ববিদ্ তাহার মানসিক বিশ্লেষণ করিতে পারেন। কিন্তু কল-কলার স্রষ্টা যে কবি, সে তাহার হৃদয়াকারে যে স্বচ্ছ-দর্পণখানি আছে, সেইখানে নয়ন ডুবাইয়া দেখে, সে উৎস কোথায়! প্রথম যুগে আদিম মানব যখন বহিঃপ্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে বাস করিত, গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া তৃণ দিয়া ছাইয়া, পাতা দিয়া ঘিরিয়া, কুটীর রচনা করিয়া, আপনাদের থাকিবার মত আশ্রয় করিয়া লইত; তখন হইতেই তাহাদের ভিতরে একটা সামাজিক ভাব পরস্পর পরস্পরের মধ্যে জাগিয়া উঠিত। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া জীবন যাপন করিত। তখন তাহাদের শিক্ষা, অনুশীলন, ভাব ভাব, আচার-ব্যবহারের ধারা সম্পূর্ণরূপে তাহাদের স্বভাবের ভিতর দিয়াই ফুটিয়া উঠিত। সেই স্বভাব-জাত সংস্কার, জ্ঞানে পরিণত হইবার পথে, স্বাভাবিক সুখ, দুঃখ, ভাব অভাব যেমন জাগিত, তেমনি মিলিয়া মিশিয়া পূরণ করিতে চেষ্টা করিত। পূর্ণিমা রজনীতে যখন জ্যোৎস্নার অনাবিল ধারায় ধরিত্রীকে স্নাত দেখিত, বিহগ-বিহগীর মধুর স্বরলহরী শুনিত, নির্ঝরের জলধারায় আলোড়িত উপলখণ্ডের ভাষা শুনিত, তাহারা দল বাঁধিয়া নৃত্য করিত, গান করিত, আনন্দ-উদ্বেলিত হৃদয়ে অধীর হইয়া উন্মত্তবৎ কত ভাবের ও সুরের প্রকাশ করিত। পাখীর সমবেত কলরবোত্থিত গানের মত তাহাদেরও ভাষা ফুটিত, সেই প্রথম গান, সেই প্রথম প্রাণের আবেগ, সেই মানবের প্রথম রসানুভূতি, ইহাই সমাজ-বিজ্ঞানবিদের বিশদ কথা।

দিন গেল, স্বভাব অভ্যাসে দাঁড়াইল, পরস্পর পরস্পরের অনুভূতির দ্বারা নানারূপে ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। দলজনে মিলিয়া যে নৃত্য-গীত চলিত, তাহা ক্রমে অন্যরূপ আকার লইয়া অঙ্গ আবেগের ধারায় নূতন রকমের সৃষ্টি হইতে লাগিল। স্ত্রী-পুরুষে সহজাত সংস্কারবশে যুগল মিলিতে লাগিল। তখন সেই দুইয়ের ভিতরে আদান প্রদান, ভাব অভাব, মিলন ও বিরহের পাওয়া ও না-পাওয়ার রস উপজয় হইল। গানের ধারাও নূতন হইল, এমনি করিয়া কবিতার জন্ম। তুমি আমি, আমি তুমি, হাসি কান্নার বিলাস!

মনস্তত্ত্ববিদ্ বলেন যে, সেই সময়ে যত রকমের মানুষের মনে, যত রকমের সহজাত সংস্কারের খেলা হইতে লাগিল, তত রকমেই তাহার ভাব ও আকার পরস্পর আপেক্ষিক পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। প্রত্যেক পরিবর্ত্তনই এক এক পৃথক্ ভাবের প্রকাশ, প্রত্যেক সেই প্রকাশের সঙ্গে সুরের ও ভাষার সৃষ্টি হইতে লাগিল। যেখানে যেমন ভাবটি ভিতরে ছিল, তেমনিটিই বাহিরের আকার লইয়া প্রকাশ পায়। না-পাওয়ার জন্য যে ক্রন্দন, সেই ক্রন্দনে এক অপূর্ব্ব সুর উঠে, সেই সুর গানে পরিণত হয়। জীবন ও মৃত্যু, শোক ও আনন্দই সেই সংস্কার-যুগের বিশেষ লক্ষণ।

তারপর, দিন গেল, নানারূপে তাহা পূর্ণভাবে বিকশিত হইতে লাগিল। শীত কাটিয়া গেলে যেমন বসন্ত আসে, আদিম যুগের সে জড়তা কাটিয়া গেলে, তেমনি জীবনের সরসতা। বিচিত্র রসানুভূতিতে মানব উন্মুখর হইয়া উঠিল। তখন কাঁদিত, দেহের স্বাভাবিক অভাবে; ক্রমে তাহার ভিতরে মনের ভাবাভাব

জাগিল, রূপতৃষ্ণা আসিল, ভালবাসিতে শিখিল, পূর্ণ হইতে পূর্ণতর হইতে লাগিল।

কিন্তু কল্পকলার যে স্রষ্টা,—যে কবি,—সে তাহার অনুভূতির ভিতর দিয়া বলিবে, এ যে লীলা! আনন্দ-ঘন-রসাধার মায়াধীশ এমনি করিয়া রসভোগ-লীলা যুগে যুগে করেন। পাখীর বুকের ভিতরেও তিনি গান, সমীর-হিল্লোলেও তিনিই তান, জলের বুকে যে আলোকের নৃত্য, সেও যে সেই নিত্য সত্য রংয়ের রংএর খেলা! তাঁহার ত আদি অন্ত নাই। কেবল লুটাইয়া লুটাইয়া রূপে রূপে বিলাস করিয়া, ভাঙ্গিয়া, গড়িয়া জীবনের চিদানন্দঘন-রস পান করিতেছেন; বিশ্বপ্রকৃতিও সেই রস পান করিতেছে। সৃষ্টির আদি অন্ত কে খুঁজিয়া দিবে! আগে পরে কে বলিবে? ছোট বড় বিচার করিবে কে!

এই সমগ্র জীবনের অনুভূতিই সাহিত্য। প্রত্যেক পা ফেলা ও প্রত্যেক পা ফেলার দাগটি। মনস্তত্ত্ববিদ্ বলেন, এই রূপতৃষ্ণাবেভাব, সৃষ্টি-রক্ষার জন্য মিলিবার পন্থা। কল্পকলার স্রষ্টা বলেন, এ তৃষ্ণা নয়, এ স্ফূর্তি, রূপের ভিতর দিয়া রূপকে পাইবার, আপনাকে লুটাইবার, খেলা করিবার, লীলার মাধুর্য্য। মাটী কাটিয়া তৃণ তাহার শ্যামসুন্দর কোমলতা বিছাইয়া দেয়, ফুল ফোটে, পাখী গায়, আকাশে মেঘ-রৌদ্রের খেলায় রঙের পর রং বদলিয়া যায়, এ সবই আপনিই হয়; সে 'আপনি' সেই লীলায়িত রসাধার। এ সবই তাঁহারই প্রেমের বিচিত্র রূপ-রস! গভীর পঙ্ক হইতে পঙ্কজিনী শতদল বিকশিত করিয়া মৃদুল বাতাসে দুলে, সেও তাঁহারি লীলা। এ বিশ্বসৃষ্টি তাঁহারই, এ জীবসৃষ্টির সকল খেলাই তাঁহারই; ইহা মায়া নয়, মিথ্যা নয়, কৈতব নয়। ইহা পূর্ণ, রূপে রূপে পূর্ণ, পূর্ণ হইতে পূর্ণতর বিলাস-লীলার বিচিত্র ক্রীড়া। এই অনুভূতির জীবন্ত, জলন্ত প্রকাশই শ্রেষ্ঠ কল্পকলা, সেই অনুভূতিই সাহিত্যের রস!

কল্পকলার মূল কথা হইল সত্য। জীবনের বিশিষ্ট অনুভূতির সত্য। সে চিরন্তন সত্য কাল-দেশের পরিবর্ত্তনের ভিতরেও তাহার অন্তরঙ্গকে বদল করে না। কল্পকলার অন্তরঙ্গের আদর্শও দেশ-কাল-অতীত। সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির নীতি ও ধর্ম্মের অতীত। কল্পকলা সেই দিব্য দৃষ্টির কথা। এই যে সাধারণ মানুষের অনুভূতি, কল্পকলাবিদ্ তাহার ভিতরে দেখেন, সেই অনন্তের রসাভাস, সেই রসাভাসের জাগ্রত ছবিখানি তাহার জীবনের এক অনন্ত মুহূর্ত্তের গান।

কলাবিদের কাছে ভিতর বাহির একই পদার্থ, পরস্পরকে ধরিয়া আছে। সেই কলাবিদ্ Idealistও নয়, Realistও নয়, সে Naturalist. শুধু ভাব লইয়াও সে স্বপ্নের দেশে ফুল ফুটায় না, শুধু দেহের রূপ-রঙ্গের সন্ধানেই কাটায় না। অনন্ত যেমন অনন্ত মুহূর্ত্ত ধরিয়া আপনা আপনি নিজেকে স্বাভাবিক পরিণতিতে লইয়া আসে, কলাবিদও তেমনি ভাবে জীবনের ধারার সঙ্গে মিলাইয়া মিলাইয়া সৃষ্টি করেন। জীবন যে সাধনা, সে ত স্বপ্ন নয়। এই বিশ্ব যে অনুপম বিশ্বনাথের বিরাট শিল্প, এ মহাকাব্যে সকলেরই যথাযথ স্থান আছে, আলোও আছে, আঁধারও আছে। আদর্শ-জগৎই এই প্রত্যক্ষ জগৎ! বেদান্তের মায়াবাদ ভুল। এ প্রাণ সত্য, এ শ্রবণ সত্য, এ চক্ষু সত্য, এ রূপ সত্য, প্রতি অণুরেণু ধূলিকণা হইতে এই মহাবিশ্ব এক জাগ্রত প্রাণময় সত্য। মায়া বলিয়া কোন জিনিষই নাই। জগৎ মিথ্যা নয়, এই রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময়ী পৃথিবীই কলাবিদের প্রাণ। প্রকৃতির প্রাণে যেমন অন্ধকারা যামিনীতে কড়াকারা নিস্তব্ধিনীর বিদ্যুৎ-স্ফুরণ হয়, কবির প্রাণেও তেমনি হয়। এমন কোন ক্রিয়াই নাই—যাহা কলাবিদের সৃষ্টির ভূমি হইতে দেখিবার বস্তু নহে। ইহাই সত্য দিদুর প্রাণের কথা; যিনি ভাবুক, যিনি রসিক, এই রস-সাধনা যাঁহার অন্তরঙ্গের ভিতর জাগিয়াছে, তিনি সকল কথা বুঝিবেন, তাই চণ্ডিদাস গাইয়াছেন—

"বড় বড় জন রসিক কহয়ে
রসিক কেহ ত নয়
তত্ত্ব তত্ত্ব করি বিচার করিলে
কোটিকে গুটীক হয়।"

আমি যে মিলনের কথা বলিয়াছি, যিনি যথার্থ

কবি, সত্য দ্রষ্টা, তিনি সেই মিলনের উদ্দেশেই নিবেদিত হইয়া আছেন।

যেমন বিশ্বপ্রকৃতির সকল সৃষ্টি, কল্পনা সৃষ্টিও ঠিক সেইরূপ। কারণ ও অকারণের ভিতর দিয়া স্রষ্টা এই মহারূপের বিলাস করিতেছেন, কারণ ও অকারণের মধ্য দিয়া আমরাও জীবনের সেই একই বিলাসলীলা সাধন করিতেছি। এই যে সাধা, এইযে সমদর্শন, ইহাই ভারতের শ্রেষ্ঠ দান। এই সাধনার ধারায় মানুষ জীবন্মুক্ত। কলাবিদের জীবন এই ধারায় গঠিত। পাপপুণ্যের বিচার তাঁহার নাই, পাপও সত্য, পুণ্যও সত্য, ভালোর বিরাট ভাবও তাঁহার কাছে যেমন সুন্দর সংসারের খাবিলতার খেলাও তাঁহার কাছে তেমনি মধুর। সবই তাঁহার ক্ষেত্র, সব ক্ষেত্র হইতেই সকলকে এ সমদর্শনের চক্ষু দিয়া দেখিবার ও অনুভব করিবার সাধন তাঁহার প্রাণে বর্ত্তিয়া আছে। তিনি সেই সাধনা, সেই সমদর্শনের প্রেমরাশিটিতে সকলকে মোহিত করেন, নিজেও সেই সুধা পান করেন, সেই লীলার সহচর হইয়া রহেন, তাই চণ্ডিদাস গাহিয়াছেন,—

"রূপ কল্পনাতে পারিবে মিলিতে
ঘুচিবে মনের বাধা।
কহে চণ্ডিদাস পুরিবেক আশ
তবে ত যাইবে সুধা।"

এই বিশ্বসৃষ্টির রস-মাধুর্য্য উপভোগ জীবনের চরম। নিজে আত্মস্থ হইয়া এই বিশ্ব-আত্মার সহিত একান্ত যোগই মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠ অনুশাসন। এই মানব-প্রাণের অন্তর-ভূমির সহিত বিশ্বপ্রাণের যে মিলন ভূমির অপরূপ দৃশ্য, এই প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ের সহিত যে অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মমিলনের রস, তাহাই শ্রেষ্ঠ কল্পকলার রাজ্য, তাহাই সংসার ও পরমার্থের মিলনে সম্পূর্ণ জীবন। এই মহামিলনের প্রধান দূতী প্রেম, বিশ্লেষণে কোন নূতন সম্পদ্ গড়িয়া উঠে না। বিশ্লেষণে প্রাণের সমগ্র অনুভূতি হয় না, বিশ্লেষণে তারিতে পারে, সৃষ্টি করিতে পারে না। বিশ্লেষণ আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, সমগ্রতা হইতে দূরে রাখে, একাত্মবোধে অন্তরায় করিয়া তোলে,—একমাত্র প্রেমই এই মিলনের মহামন্ত্র, সেই সর্ব্বমন। সেই প্রেমের দেবতা, পরিপূর্ণ, সবল, সহজ, সরল, সোহাগ ও আবেগে সকলকেই বুকের ভিতর টানিয়া লন, তিনি এই সারা বিশ্বের, এ বিশ্ব তাঁহার! কবিতা যদি এই প্রেমের রাজ্যে না পৌঁছায়, এই প্রাণ চিন্তামণির 'মণি-কোঠা'র মণি না মিলাইতে পারে, তবে তাহা প্রাণের কবিতা নয়। প্রাণহীন কবিতা সেই প্রাণের সে অতীন্দ্রিয় রূপসাগরে ডুবিয়া সেই সাগরের কাহিনী কুড়াইয়া তুলে।

এইবার কবিতার ভাষা ও রীতির কথা। আমাদের দেশে একটা কথা আছে যে, "ছেঁদো কথায় চুন না" তাহার মানে ত সকলেই বুঝেন! কবিতার ছন্দ, তাল, সুর থাকিলেই যে তাহার মধ্যে সেই চিন্তামণির সাক্ষাৎকার মিলিবে, এমন ত নহেই, বরং অনেক সময়ে সেই মিলনের অন্তরায়। এইজন্যই যেখানে ভাবের দৈন্য, সেখানেই উপমার প্রাচুর্য্য। পরিষ্কার কাচ যেমন মানুষের দৃষ্টির অন্তরায় না হইয়া সাহায্য করে, কথাও ঠিক তেমনি ভাবকে জমাইয়া তুলে। কাচ যদি অপরিষ্কার হয়, চোখে কাপ্‌সা ঠেকে। ভাষাও তেমনি। কোন সুন্দরভাবই সুন্দর আকার না লইয়া ব্যক্ত হয় নাই। ফুলের দেহ হইতে যেমন তাহার রং ও তাহার আকার, যে যে স্থানে তাহার সেই সুন্দর সুবাস ভরিয়া রাখে, তাহাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, সেই ফুলকে নষ্ট না করিলে তাহার সুগন্ধটুকু আলাদা করা যায় না, তেমনি ভাবও ভাষাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, ভাষাও ভাবকে আশ্রয় করিয়াই ফুটিয়া উঠে। শ্রেষ্ঠ কবিতার ভাবও ভাষাকে ছাড়াইয়া উঠে না, ভাষাও ভাবকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। তাহা সুভোগ, নিখুঁত, সুন্দর ও সহজ। তাহাকে গয়না পরাইতে হয় না। অলঙ্কার সৌন্দর্য্যকে বাড়াইবার জন্য; অলঙ্কার দিয়া সৌন্দর্য্যকে ঢাকিলে তাহাকে খর্ব্ব করা হয়, তাহার রূপের অনন্ত সত্যকে অস্বীকার করা হয়। ভাষা সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, ছন্দ সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই বটে। কবিতা ও গানে কিছু প্রভেদ আছে। গানে যখন আমরা নিজেদের

ব্যক্ত করি, তখন সুরই আমাদের প্রধান সহায়, কথা ভাবানুযায়ী উপলক্ষ্য মাত্র। পর্ব্বতের গায়ে ঘাত-প্রতিঘাতে ঝরণা যেমন বিচিত্র ধ্বনিতে গিরি-গহন মুখরিত করিয়া আপনার পথ আপনি কাটিয়া অবাধে বহিয়া যায়, গানও তেমনি আপনার পথ আপনি কাটিয়া সুরের ভিতর দিয়া পরম চরমে মিলাইয়া যায়। এ জীবন অণু হইতে অণীয়ান্, মহৎ হইতেও মহীয়ান্ : জীবন ও মৃত্যু একই সুরের খেলা। আত্মিকতা সেই জীবন ও মৃত্যুর সন্ধানী, আধ্যাত্মিকতা জীবনের প্রাণ—প্রাণের অন্তরতম অনন্ত পাবক-শিখা। মানব-জীবন সেই শিখার অনন্ত জাগ্রত মূর্ত্তি, ভাব ও ভাষায় তাহার রং ও রঙের মিলন-মাধুর্য্য।

তাহার পর আর একটি কথা, তাহাকে বলে রূপান্তর। এই যে স্বাভাবিক মনের বিকাশ, তাহাকে ভাগবত সত্যে তুলিয়া ধরা। সেই রূপান্তরই বস্তু ও ভাবের সমন্বয়। বস্তুর অন্তরের যে রূপ, তাহার উৎসকে খুলিয়া দিয়া তাহাকে সেই রূপচিন্তামণির অচিন্ত্য-বৈভাবৈচিত্র্যের মধ্যে টানিয়া তোলাই রূপকলার শেষ রঙের খেলা। এই দেহ মন, এই যে ইন্দ্রিয়, তাহার অন্তরঙ্গ ভাবের সহিত সাক্ষাৎ ও সহজ করিয়া দেওয়ার নামই রূপান্তর। এই রূপান্তর দেখাইতে পারিলেই চোখের মধ্যে ভ্যাপ ফুটিয়া উঠে। তাহার মধ্যে আনন্দ আপনিই উছলিয়া উঠে। সকল জিনিষকেই এই আনন্দের দিক্ হইতে দেখিলেই এই রূপান্তরে পৌঁছান সহজ হয়। নিজের সাধনা করিতে করিতে, রূপ হইতে রূপে বিলাস করিতে করিতে, জীবনে এমন এক মুহূর্ত্ত আসে, সেই অনন্তমুহূর্ত্তে এই রূপ-রাগতরা শব্দ-স্পর্শগন্ধময়া পৃথিবীর রূপের মাঝে আসল রূপ ফলিয়া উঠে। যাঁহাকে চাই, তাঁহারই সাক্ষাৎকার হয়। সেই শুভমুহূর্ত্তের জন্যই সকল রূপকলাবিদের সাধন। সেই শুভ-মুহূর্ত্তেই সকল সৃষ্টি সুন্দর, মধুর, কল্যাণ ও মঙ্গল হইয়া উঠে।

সকল সৌন্দর্য্যের মধ্যে বিশ্বের আত্মা জাগ্রত মুখরিত, বিকশিত, সৌন্দর্য্যলীলায় লীলায়িত। প্রকৃতি ও মানব উভয়ের ভিতরই বিশ্বাত্মার সমান খেলা। সকল জীব, বৃক্ষ, লতা, পাতা, অণু, পরমাণু, সকলই প্রকৃতির মধ্যে। সাধনার পথে সাধক বিশ্বের দর্পণে তাহার নিজের মুখের ছায়া যখন দেখে, তখন তাহার সত্যরূপ প্রকটিত হয়। সে দেখে, তাহার সম্মুখে এক নূতন জগৎ,—সেই জগতের ও তাহার এক নাড়ী,—তাহার এক বিরাট হৃদয়। সেই বিরাট হৃৎপিণ্ড এই বিরাট প্রাণ-সমষ্টিকে বক্ষে করিয়া কালের ভিতর দিয়া অকালে ধাইতেছে। তখন তাহার মন সেই বিরাটের রূপের রসে মজিয়া এক অভিনব রূপান্তর সৃষ্টি করে। সেই রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে বৈচিত্র্যের মধ্যে এক মধ্য-মিলনের অনাহত সঙ্গীত ধ্বনিয়া উঠে।

বাঙ্গলার গীতিকবিতায় আমি তাহার সন্ধান পাইয়াছি। বাংলা সাহিত্যের গীতিকবিতার ধারার প্রথম যে ভাষার আমরা আজকাল গান ও কবিতা পাই, তাহাকে নাকি সন্ধ্যাভাষা বলে। সুপ্তি ও জাগরণের সন্ধি, নূতন ও পুরাতনের সন্ধি, আলো ও ঘোর-আলোর খেলা। এই সন্ধ্যাভাষার সহজিয়া ধর্ম্মের সকল গানই রচনা, আর তাহাই নাকি বাংলার সর্ব্বপ্রাচীন সম্পদ। তাহাতে যে সমস্ত পদ পাওয়া যায়, তাহার অর্থ ও রহস্য এখনও ভাল করিয়া বুঝা যায় নাই। তবে সহজিয়ার মধ্যে যে স্বাভাবিক জীবনের ফুর্ত্তির উপর জীবনকে গাঁথিয়া তুলিয়া আনন্দের আস্বাদ পাওয়া যায়, এ কথার ভাব তাহার মধ্যে আছে, তা সে যত সন্ধ্যার আলো-আঁধারি রঙই না কেন। তাহার পর গৌড়ীয় যুগ, সেই গৌড়ীয় যুগে চণ্ডিদাস প্রভৃতি কবিদের পদাবলি-গান অতুলনীয়। আমার মনে হয়, সে সন্ধ্যা-ভাষার বৌদ্ধ সহজিয়ার পদ হইতে চণ্ডিদাসের রাগাত্মিকা পদের মধ্যে কালের বিপুল প্রভাব আছে। অনেক ভাষাগড়ার ভিতর দিয়া না যাইলে ভাষার ছাঁদ ও রীতি যাহা চণ্ডিদাসে ফুটিয়াছে, তাহা হইতেই পারে না। তবে এ সমস্ত মতামত লইয়া আলোচনা করিবার মত পাণ্ডিত্য আমার নাই। আমি শু[illegible]

ভাবের ঘরজার বাড়ী, সেই অভিসের পূজারিকির আমি তাহার কথা করিব এবং চণ্ডিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী বাংলা কবিতার প্রাণের সহজ সরল ভাবগুলি মিলিনতার মালার মত গাঁথিয়া তুলিতে চেষ্টা করিব।

বৈষ্ণব-কবিতা রসভরা পাকা ফলের মত, তাহার খোসা আছে, শাঁস আছে, রসে অনুপম মিষ্টতা আছে, এমন কবিতা বাংলা দেশের পৌঢ়ত্বে যুগের চণ্ডিদাস ছাড়া আর কাহার গানে আজও পর্য্যন্ত মিলে না। চণ্ডিদাসের অনুভূতি আর কাহারও হয় নাই। একদিকে বাঙ্গালার পর্ণকুটীরের কবি চণ্ডিদাস, অন্যদিকে মিথিলার রাজকবি বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতির সিংহাসন ছিল, মহিমা ছিল, চণ্ডিদাসের ছিল—

"মানুষের মাঝে পত্রের কুটীর
নিরজন স্থান অতি"

আর ছিল রামী! একজন রাজ-অনুগ্রহে সম্মান-সুখভোগের মধ্যে পালিত, আর একজন দুঃখ দারিদ্র্য-পীড়িত। বিদ্যাপতির মহিমা দূর আকাশের কোণে উজ্জ্বল তারকার মত, আর চণ্ডিদাসের রামী তাঁহার বুকের ভিতর—প্রাণের ভিতর। দুইজনের অনুভূতি এক হয় নাই। দুইজনেই জীবনের সকল দিকের কথা ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন, দুইজনে কিন্তু সমান পারেন নাই। দুইজনেই কবিতার মিলনমন্দিরের দ্বারে পৌঁছিয়াছেন। একজন মন্দির-দ্বারে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন, আর একজন সেই মণি-কোঠার প্রাণ চিন্তামণিকে বুকের ভিতর ধারণ করিলেন, গাইলেন,—

"বঁধু হে নয়নে লুকায়ে রোব
প্রেম-চিন্তামণি রসেতে গাঁথিয়া
হৃদয়ে তুলিয়া লব।"

"রসেতে গাঁথিয়া" এও সেই সহজিয়ারই কথা। এই রসের সাধনাই পৌঢ়ীয়-বৈষ্ণবের সাধনা। এই রস যে, সেই রসামৃত মায়াদীপের প্রেমের খেলা, যাহার কাছে—

"মায়া আসি প্রেম মাগে"

কেহ কেহ বলেন, চণ্ডিদাস দুঃখের কবি, বিদ্যাপতি সুখের কবি, তাঁহারা বোধ হয়, জীবনের সুখ দুঃখকে ভাল করিয়া বোঝেন নাই। সুখ যখন রূপান্তর হইয়া ভাগবত সত্তা ফুটিয়া উঠে, তখন তাহা সুখ নয়, দুঃখ, এবং দুঃখ যখন ভাগবত সত্তা দিয়া পৌঁছায়, তখন তাহা দুঃখ নয়, সুখ; তাই চণ্ডিদাস গাইয়াছেন—

".....সুখ দুঃখ দুইটি ভাই
সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি
দুখ যায় তারই ঠাঁই।"

কাম-বিরহে রাধিকা বিবশা, পিরীতি যে সুখের সাগর তাহে দুখের মকর, ফিরে নিরন্তর, প্রাণ টলমল করে, অন্তর বাহির কুটু কুটু করে, সুখে দুখ দিল বিধি—এই অবধি যুগল প্রেমের লীলায় যে মিলন-বিরহের রস-মাধুর্য্য, তাহাই ফুটিল, কিন্তু এইটুকু হইল ইন্দ্রিয়ের বিক্ষোভ, হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা, স্ত্রীপুরুষের সহজাত মিলনের রসাভাসের মধ্যে যেটুকু তাই, কিন্তু তাহার পরই বাহির ভিতর এক হইয়া গেল, মানুষের এই সুখ-দুঃখের ভিতর হইতে চণ্ডিদাস সেই ভাগবত সত্যকে রূপান্তরে টানিয়া তুলিলেন। ইহা নীতিবিদের নীতি নয়, ইহা শুধু রসপণ্ডিতের রসশাস্ত্রের আলাপ নয়; এ যে জীবনের এক চরম অনুভূতির কথা। এই চরম অনুভূতি বিদ্যাপতির হয় নাই। অনুভূতি শুধু আনন্দের ভিতর দিয়া ত' হয় না—সকল রকম বিচিত্রতা না আসিলে জীবন কে উপলব্ধি করিতে পারে? এই সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়াই সেই প্রাণের সাক্ষাৎকার হয়, আর প্রাণের সাক্ষাৎকারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হৃদয় মন যে রসোল্লাসে উথলিয়া উঠে, তাহাই শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতায় দাঁড়ায়। একদিকে জীবনের অনুভূতি, অন্যদিকে রসের ভিতর দিয়া রূপান্তর, চণ্ডিদাসের প্রায় প্রত্যেক কবিতায় তাহার আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু বিদ্যাপতির তাহা নয়, তিনি গানে, যে রসের মধ্যে যে অবস্থার কথা কহিয়াছেন, তাহাতে শুধু ইন্দ্রিয়ের ভোগ, রূপ-রস-গন্ধের অনুপম সামঞ্জস্য ও মিলন; তিনি সেখানে স্বয়ং সেই রূপ-রসের মধ্যে

ডুবিয়া আছেন, কিন্তু চণ্ডিদাস সেই রূপ-রস-গন্ধের মধ্যে ডুবারির মত ডুব দিয়া মণি তুলিয়া উঠাইয়াছেন। বিদ্যাপতি গাইলেন, রাধার বিরহের কথা,—

"আপনহি পেম তরুঅর বাঢ়ল
কারণ কিছু নাহি ভেলা।
শাখা পলব কুসুমে বে-আপল
সৌরভ দশদিস গেলা।
সখি হে দুরজন দুরনয় পাএ।
মূর অক্রো মূড়হি সক্রো ভাগল
অপদহি গেল সুখাএ
কুলক বরম পহিলহি অলি অওল
কক্রোগে দেব পালটাএ
চোর জমনি নিজক্রো মনে মনে কম্পক্রো
রোক্রো বদন ঝপাএ।
অইসন দেহ গেহ ন সোহাবএ
যাহব যম জানি আপি।
বিদ্যাপতি কহ আপনহি আউতি
সিরি সিবসিংহে লাগি।"

প্রেমের তরুবর আপনি বাড়িল, কারণ কিছু ছিল না, শাখা পল্লব-কুসুমে ব্যাপ্ত হইল, সৌরভ দশদিকে গেল। হে সখি, দুর্জ্জনের দুর্নীতি পাইয়া যেন মূল শীঘ্রের সহিত ভাঙ্গিয়া গেল, অস্থানে পড়িয়া শুখাইয়া গেল। কুলের বরম প্রথমেই অলি আসিল, কে ফিরাইয়া দিবে; চোরের মার মত মনে মনে শোক করিতেছি। এরূপ অবস্থায়, দেহ গৃহ ভাল লাগে না, বাহিরে যেন অমি উদ্গীরণ করিতেছে। বিদ্যাপতি কহে, শ্রীশিবসিংহের লাগিয়া আপনি আসিবে। আর চণ্ডিদাস গাইলেন,—

"নিঠুর কালিয়া না গেল বলিয়া
জানিলে যাইত সাথে।
শুরু গরবিত বসতি আমার
পরাণ লইয়া যাতে।
সই, কি আর বলিব তোরে।
আপন অন্তর না কর বেকত
তবে সে কহি যে তোরে।
মনের মরম জানিব কে।
সেই সে জানে মনের মরম
এ রসে মজিল যে।
চোরের মা যেন গোয়ের লাগিয়া
দুকরি কাঁদিতে নারে।
কুলবতী হৈয়া পীরিতি করিলে
এমতি সঙ্কট তারে।
কে আছে ব্যথিত যাবে পরতীত
এ দুখ কহি যে কারে।
হয় দুখভাগী পাই তার লাগি
তবে সে কহি যে তারে।
পর কি জানয়ে পরের বেদন
সে রত আপন কাজে।
চণ্ডিদাস বলে মনের ভিতরে
কভু কি রোদন সাজে।

রসজ্ঞ সুজন মাত্রেই যিনি এই বিচ্ছেদ ও মিলনের রসে রসিক ও মরমী, তিনি উভয়ের এই দুই পদ আলোচনা করিলেই বুঝিবেন, বিদ্যাপতি শুধু মাত্র রূপের কথায় মজিয়াছেন, কিন্তু চণ্ডিদাস তাহাতে মজিয়া ডুবিয়া জীবনে এক নূতন অনুভূতির কথা বলিতেছেন। দুইটি গানে একই রকমের ভাবের ও কথার মিল পাওয়া যায়, হয় ত উভয়ে স্বতন্ত্র ভাবেই ইহার স্রষ্টা, অথবা একজন একজনের আগে কিংবা পরে, কিন্তু তাহা লইয়া এখানে আমরা আলোচনা করিতে চাই না। আমি শুধু এখানে ভাবের দিক্ দিয়াই বিচার করিব। বিদ্যাপতির রাধিকা কহিতেছেন, প্রেমের তরুবর আপনি বাড়িল, কিন্তু দুর্জ্জনের দুর্নীতেতে তাহা উপযুক্ত স্থানের অভাবে শুখাইয়া গেল। আর সেই স্থলে চণ্ডিদাসের রাধিকা কহিতেছেন,—

'শুরু গরবিত বসতি আমার'

আমি প্রাণ হাতে করিয়া বাস করিতেছি, সই রে, তোকে আর কি বলিব, এ রসে যে মজিল, সেই মনের মরম কথা জানিবে। বিদ্যাপতির রাধিকা বলিতেছেন, 'কুলের ধর্ম্ম প্রথমেই অলি আসিল, কে ফিরাইয়া দিবে?' চণ্ডিদাসের রাধা বলিতেছে,—

'কুলবতী হইয়া পীরিতি করিলে
এমতি সঙ্কট তারে।
চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া
চুকরি কাঁদিতে নারে॥'

এই জায়গায় উভয়েই একই কথা বলিয়াছেন, কিন্তু "মনে মনে শোক করিতেছি, মুখ চাকিয়া রোদন করিতেছি" র, বাসনা হইতে 'পোয়ের লাগিয়া চুকরি কাঁদিতে নারে' এই কথা কয়টিতে ভাব ও ভাষার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে, ইহাতে ওই ভাবটির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। তাহার পর বিদ্যাপতির রাধার অবস্থা 'মুখ ভাল লাগিতেছে না, বাহিরেও অনল ঢালিয়া দিতেছে' ভিতরে বাহিরে জ্বলিয়া মরিতেছেন, এমন অবস্থায় বিদ্যাপতি কহিলেন, শিবসিংহের লাগিয়া আপনি আসিবে। অর্থাৎ তাঁর 'শিবসিংহের প্রেমে বন্ধ, শিবসিংহ তাহাকে আনিয়া দেবেন,' চণ্ডিদাসের শিবসিংহ ছিল না, তাঁহাকে তত্ত্বতা জানাইতে হয় নাই, রাজার মন রাখিতে হইত না। তিনি বলিলেন রাধিকার মুখে—

'কুলবতী হৈয়া পীরিতি করিলে
এমতি-সঙ্কট তারে',

শুধু এই স্থানেই তিনি তাঁহার রাধার অন্তরের অন্তরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন,—

'পর কি জানয়ে পরের বেদন
সে রত আপন কাজে।
চণ্ডিদাস বলে, বনের ভিতরে
কভু কি রোদন সাজে॥'

এই সমস্তটাকে একটা সার্ব্বভৌমিক সত্যের উপর তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়া দিলেন। বিদ্যাপতি শুধু রাধার অন্তরে প্রবেশ করিয়া রাধার কথার সঙ্গে নিজের প্রাণের ভাব মিশাইয়া জড়াইয়া দিলেন, কিন্তু চণ্ডিদাস রাধাকে রাধাই রাখিলেন, তাহার মনের, শুধু রাধার মনের নয়, কুলবতীর মনের কথাটি এমন, সহজ সরলভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে তাহার তুলনা হয় না। তার পর নিজে রাধা হইয়া অথচ দূরে দাঁড়াইয়া তাঁহার রাধার সমস্ত ভাবটাকে বিশ্বের সার্ব্বজনীন সত্যের উপর রাখিয়া তাহাকে গাঁথিয়া দিলেন। ভারত-শিল্পের আদর্শে যেমন বিশ্বের সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্তির কথা পাওয়া যায়, ইহাও ঠিক সেই রকম। দেবালয় প্রতিষ্ঠার মধ্যে যে ধারা ভারত-শিল্পে পাওয়া যায়, সে মন্দিরের প্রত্যেক পাষাণখণ্ডের সার্থকতা থাকে; বিশ্বকে আদর্শ করিয়া যেখানে যেটি যেমন ভাবে থাকিলে সুন্দর হয়, বিচিত্র হয়, সেখানে সেটি ঠিক তেমনি ভাবে গাঁথিয়া তোলা, এমন কি সেই মন্দিরের স্থানে স্থানে স্তূপীকৃত প্রস্তরখণ্ড ও বালুর রাশ জমান থাকে, যত প্রস্তর সে পূর্ণতা লাভ করে নাই, তাহার স্বাধীন পরিণতি যে বিশ্বের স্থানে স্থানে হয় নাই, তাহার নিদর্শন। বিশ্বকে আদর্শ করিয়াই ইহার রচনা। কবি চণ্ডিদাসের পদাবলী তেমনি যেন প্রকাণ্ড মন্দির। ভারত-শিল্পে স্থাপত্য যেমন অতুলনীয়, চণ্ডিদাসের পদাবলী তেমনি সার্ব্বজনীন ও অতুলনীয়। বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসের পরস্পরের এই সমস্ত পদাবলী পূর্ব্বরাগ হইতে শেষ পর্য্যন্ত দেখাইবার স্থান এখানে নাই, কেননা, তাহা অতি বিস্তৃতভাবে, বিশদভাবে না দেখাইলে তাহার ঠিক চরম উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। তবে উভয়েরই পদাবলীর রসবিভাগ করিয়া তাহার অনুভূতির কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। বিদ্যাপতির প্রেমে বেদনা অপেক্ষা সুখের আতিশয্যই বেশী। তাহাতে দুঃখটুকু যেন সোহাগ করিয়া ঢালিয়া দেওয়া, তাহাতে প্রাণের সে তীব্রতা, আন্তরিকতা নাই। কিন্তু প্রাণের ভিতর যে অতলস্পর্শ সমুদ্র আছে, তাহাতে গাহন করিতে পারেন নাই। সে ত্রিভুবনব্যাপী তন্ময় বিরহ বিদ্যাপতির ভিতর নাই। আছে ছন্দ সুর তাল, অনন্যসাধারণ উপমার ছটা, ভিতরের কথা ভাল করিয়া অনুভূতিতে না আসিলে, উপরের কথাই বেশী হইয়া পড়ে। অলঙ্কারেই সৌন্দর্য্যকে ম্লান করে। বিদ্যাপতির কাব্যে কতকটা তাহাই ঘটিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বাঙ্গালার এই প্রেম-রসের সঘন রাধাকৃষ্ণ-লীলার গানে গৌরজনের প্রাণমন শীতল করিত। দেশে তখন অবাধ

ধাওয়া, অকূল জলধারা, শ্যামল প্রান্তর, অজস্রের-স্নেহমুখ দৈহিক জলস্রোত। পাখীতে রাধাকৃষ্ণ বুলি বলিত, মানুষে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের আদর্শে জীবনের অনুভূতি লাভ করিত। বাঙ্গালা দেশ তখন গানে গানে মুখরিত ছিল। সে কাল এখন নাই। পদাবলী সাহিত্যের গানগুলি সৈকত করিয়া, এক এক রস ভাগ করিয়া সমস্ত গাঁথিয়া দিয়াছেন। সমস্ত পদাবলী গানগুলি তাহাতে যেন ফুললতা-পাতার রঙ্গের বিচিত্র সমাবেশ। প্রত্যেকটি যেন এক একটী বিমান আর রস যেন সেই বিমানের চাবি; সেই বিমানের পর বিমান গাঁথিয়া এক বিশাল বিরাট মন্দির রচনা করিয়াছেন.—যাহাতে মানবের সকল-অবস্থার রসলীলাই তাহার মধ্যে ফুটিয়া আছে।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসের যে সকল পদাবলী ভাব-সম্মিলনে বা রাগাত্মিকার আছে, তাহারই মধ্য হইতে আমি সেই শ্রেষ্ঠ অনুভূতির ও রূপান্তরের যে ঢেউ ভাব, সুর ও ধারা পাইয়াছি, তাহাই বলিব। বিদ্যাপতির একটি সর্ব্বজনবিদিত পদ আছে, তাহাকে লোকে পদাবলীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিতা বলে,—

"সখি হে কি পুছসি অনুভব মোয়।
সেই পীরিতি অনুরাগ বখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হম রূপ নিহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলু
শ্রুতি-পথে পরশ না গেল॥
কত মধুযামিনী রভসে গমাওনু
না বুঝনু কৈসন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখনু
তৈও হিয় জুড়ন ন গেল॥
যত যত রসিক জন রসে অনুগমন
অনুভব কাহে ন পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইতে
লাখে ন মিলল এক॥"

আমার মনের ধারণা যে লোকে এই কবিতাটিকে অতি শ্রেষ্ঠ বলে, তাহার কারণ তাঁহারা চণ্ডিদাসের পদাবলী আলোচনায় যে রসজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহাই বিদ্যাপতির এই পদের উপর আরোপ করিয়া তাহার এত গভীর অর্থ করেন। বিদ্যাপতির শেষ কথা হইল,—

"লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখল
তৈও হিয় জুড়ন ন গেল,"

ইহা সেই চির-নূতন ভাবে রসোল্লাসের কথা। জন্ম হইতেই আমি রূপের মধ্যে নয়ন ডুবাইয়া রাখিয়াছি, তবু সে রূপের সীমা পাইলাম না, লক্ষ লক্ষ যুগ ধরিয়া বঁধুকে বুকে বুকে করিয়া রাখিলাম, তবুও এ হৃদয় জুড়াইল না, নয়নের তৃষ্ণা মিটিল না। বিদ্যাপতি এই মিলনের মধ্যে সেই মহামিলনের জন্য ব্যাকুল, তাহার আভাস জাগিয়াছে। বিশ্বের রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধকে তিনি জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। রূপ রস গন্ধও তাঁহাকে তেমনি আগ্রহে জড়াইয়াছিল, তিনি তাহাদের ভাল করিয়া চিনিতে পারেন নাই; এদের সঙ্গে জন্ম হইতে দেখা শুনা, তবু তাহাদের পরিচয় ভাল করিয়া হয় নাই, আকাঙ্ক্ষার বস্তুকে বুকে বুকে করিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই। তিনি "প্রেম"র মধ্যেই ডুবিয়াছিলেন, প্রেমের মধ্যে প্রেমকে দেখিতে পান নাই; আর চণ্ডিদাস গাইলেন,—

"বঁধু কি আর বলিব আমি
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বান্ধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া এক-মন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী॥
• • • •
আঁখির নিমেষে যদি নাহি দেখি
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডিদাস কয় পরশ রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি॥"

সেই কথা শুধু আঁখির তৃপ্তির কথা নয়, না দেখিলে

পরাণ যে বাঁচে না। বিদ্যাপতি সুর বন্ধ করিয়া উপরের পর্দায় উঠেন নাই, চণ্ডিদাস সুরের আসল গলাটি ধরিয়া একেবারে অন্তরের ভিতর চাহিয়া ডুবিয়া গেলেন, গাইলেন—

"বঁধু তুমি সে পরাণ-সমান হে
তুমি সে পরাণ-বঁধি।
(এক) তিলে শত যুগ মরণ মানি
ছেড়ে কি রইতে পারি যে॥"

এখানে যে সব মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গেছে। এখানে শুধু ইন্দ্রিয়গ্রামের স্তব নয়, এ সুর অন্তরের মিলন-মন্দিরের অনাহত-ধ্বনি!

তারপর বিদ্যাপতির 'প্রার্থনা'—

"যতনে যতেক ধন পাপে বটোরলো
মিলি মিলি পরিজন খায়।
মরনক বেরি হেরি কোই ন পুছত
করম সঙ্গ চলি যায়॥
এ হরি বন্দো তুয় পদ নায়।
তুয় পদ পরিহরি পাপ-পয়োনিধি
পার হোয়ব কোন উপায়।"

পাপকর্ম্ম দ্বারা যতেক ধন সঞ্চয় করিলাম, পরিজন মিলে মিলে খায়, মরণের সময় কেহ জিজ্ঞাসা ও করে না, কর্ম্ম সঙ্গে চলিয়া যায়—

অন্যত্র—

'আর জনম হম্ নিধে গমাওল
জরা শিশু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমণী রস-রঙ্গে মাতল
তোহে ভজব কোন বেলা॥
কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসান।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর-লহরি সমান।"

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, হে মাধব, আমার পরিণামে আর আশা নাই। কিন্তু প্রেমে যে মজিয়া ডুবিয়া, হসিয়া মরিয়া, বাঁচিয়া উঠিয়াছে, তার এ মরণ ভয় কেন? প্রেম যে অমৃতের অমর; সে ত মরণের সময় ভয় পাইবে না, তার ত পরিণাম ও পরিণতি নাই। সে যে নিত্য সত্য জীবন্মুক্ত, তাহার এ ত্রাস কেন? তিনি বলিতেছেন,—

"আদি অনাদিক নাথ কহাওসি
অব তারণ ভার তোহারা—"

তোমায় আদি অনাদির নাথ লোকে বলে, এখন তরাইবার ভার তোমার; হে মাধব, আমায় তরাও। কিন্তু কি চণ্ডিদাস গাইলেন,—

"মরমে মরমে জীবনে মরণে
জীয়ন্তে মরিল যারা
নিতুই নূতন পীরিত রতন
যতনে রাখিল তারা"

যাহারা প্রেমে এমন করিয়া মরিয়াছে, তাহাদের সবই সে নিতুই নব। তাহাদের ত পরিণাম ভয় নাই।

"সুজন পীরিতি পরাণ রেখ
পরিণামে কভু না হবে টোট।
ঘষিতে ঘষিতে চন্দন সার
দ্বিগুণ সৌরভ উঠয়ে তার॥"

এ যে সুজনের পীরিতি, এ যে পরাণ মন ভরিয়া রাখিয়াছে, ইহাতে ত কামগন্ধ নাই। এ প্রেমে পরিণামে কভু টুটিবার ভয় নাই। সে যে নূতনকে আরো সৌরভে স্নিগ্ধ করিয়া আনিয়া দেয়! চন্দন যেমন ঘষিতে ঘষিতে দ্বিগুণ সৌরভে আমোদিত করে, এ প্রেম তেমনি।

"পুত্র পরিজন, সংসার আপন
সকল ত্যজিয়া দেখ
পীরিতি করিলে তাহারে পাইবে
মনেতে ভাবিয়া দেখ"

চণ্ডিদাসের পাপের ভার বোধ হয় নাই। যে প্রেমের আগুনে পুড়িয়া পুড়িয়া খেদ হইয়াছে, তার আবার পাপ কি; তাহার সেই প্রেমের মধ্যে "তাহারে পাইবে।" এ বিশ্বসংসার তাঁহারি, তাঁহাকে যখন পাইলাম, তখন 'পুত্র পরিজন সংসার আপন' সকলই ত

মিলিল, তারপর চণ্ডিদাসের শেষ অনুভূতি। এখানে চণ্ডিদাস জন্ম-মৃত্যুর অতীত, সুখ-দুঃখের অতীত, শুভ-ভাবনার অতীত ইন্দ্রিয়গ্রাম সব ডুবাইয়া এক অচিন্ত্য বৈতাবৈতের রসসিন্ধুর মাঝে চেউয়ের মত দুলিতেছেন।

"মা বাপ জনম না ছিল যখন
আমার জনম হ'ল
দাদার জনম না ছিল যখন
পাকিল মাথার চুল
ভগীর জনম না ছিল যখন
ভাগিনা হ'ল বুড়া।
অনিত্য কুলের একি বিপরীত
ন পিতা ন পিতা খুড়া।
শ্বশুর শাশুড়ী না ছিল যখন
তখন হয়েছে বউ
ঘরের ভিতরে বসিয়া রয়েছে
ইহা না বুঝয়ে কেউ।
মাটীর জনম ছিল না যখন
তখন করেছি চাষ
দিবস রজনী না ছিল যখন
তখন গণেছি মাস
(এখন) একুল ওকুল দুকুল ডুবিল
পাথারে পড়িল দেহ
কহে চণ্ডিদাস কে আমি কে তুমি
ইহা না বুঝয়ে কেহ।"

ইহা চণ্ডিদাসের শেষ কথা, অনুভূতির চরমোল্লাস। এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত রকমের প্রাণের সম্পর্ক, সকলই ছিল—আছে। অনন্ত অনন্তকাল ধরিয়া আছে, খেলা চলিয়াছে, এখন একুল ও ওকুল দুকুলেরও ভাবনা নাই, লীলা-সাগরে দেহ পড়িয়া ভাসিতেছে। চিরজন্ম চিরকাল কল্পকাল ধরিয়া তুমি আর আমি এই খেলার রসে মজিয়া আছি। এ কেহ বুঝে না, যে রসিক হইয়াছে, যে ঘরের ভিতর ঢুকিয়াছে, সেই সে জানে ঘরের কথা।

চণ্ডিদাস জীবনে সকল অবস্থার ভিতর দিয়াই সকল রসের অনুষ্ঠান করিয়া তাহার অনুভূতিতে সিদ্ধ হইয়া তবে এমন কথা বলিয়াছেন। চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতির আর বিশদ সমালোচনা করিবার স্থান এ নয়, সময়ও অল্প, এই কয়টা কথা যাহা বলিলাম, ইহাতেই আমি সে কথা বোধ হয় বুঝাইতে পারিয়াছি। বিদ্যাপতির দোষের কথা যাহা বলিলাম, সে শুধু চণ্ডিদাসের সঙ্গে তুলনা করিয়া; কিন্তু বিদ্যাপতি যে খুব বড় কবি, এ কথা কে অস্বীকার করিবে? আমি শুধু এই কথাই বলিতে চাই যে, চণ্ডিদাসের জীবনে যে অনুভূতি পাওয়া যায়, বিদ্যাপতিতে তাহা পাওয়া যায় না, সে অনুভূতি আর কোন কবির হয় নাই। তবে এইটুকু মাত্র বলা যায় যে, সেই আদর্শেই বাংলা এখন পৌঁছিতে চেষ্টা করিতেছে। আশা করা যায়, হয় ত আবার সেই বাঁশীর ধ্বনি কর্ণে আসিবে, প্রাণসুন্দরের সে বিমল রূপমাধুরী আবার আমার দেশে ফুটিয়া উঠিবে।

চণ্ডিদাস গাইয়াছেন,—

"মরম না জানে ধরম বাখানে
এমন আছয়ে যারা,
কাজ নাই সখি তাদের কথায়
বাহিরে রহুন তারা।
আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা,
তোরা নিসাড় হইয়া আয় না সজনি
আঁধার পেরিয়ে আলা।
আলোর ভিতরে কালাটি আছে
চৌকি রয়েছে সেথা,
ও দেশের কথা এ দেশে কহিলে
লাগিবে মরমে ব্যথা।"

যে দেশের কথা চণ্ডিদাস গাইয়াছেন, সেই দেশের কাহিনী গানে না ফুটাইলে গানের সার্থকতা কই? কল্পকলা ও জীবনের আদর্শ তাহা না হইলে যা মিলে কই? তিনি বলিতেছেন, "বাহির দুয়ারে কপাট লাগিয়াছে, এখন ভিতর দুয়ার খোলা। তোরা নিসাড় হইয়া চুপে চুপে আয়, দেখ্‌বি, আলোর মাঝে সেই কালো।" এ সবই সেই দেশের সেই ঘরের কথা।

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির পর শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের আবির্ভাব। চণ্ডিদাসের ভালবাসায় যাহা ভাবের ও রসের অনুভূতি আশ্রয় করিয়া ছিল, মহাপ্রভুতে তাহা দৈবত্ব আশ্রয় করিয়া উঠিল। দিনমণি-সূর্য্যের সঙ্গে যেমন উষার অরুণালোকের সম্পর্ক, চৈতন্যের সঙ্গে চণ্ডিদাসের ঠিক সেই সম্পর্ক; চণ্ডিদাস অরুণের রথ বাংলায় জানাইয়া গেলেন, রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময়ী পৃথিবীর পূর্ণরূপ আসিতেছে,—উঠ উঠ জাগ—

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য দিব্যোন্মাদের পরে বলিলেন,—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥"

হে জগদীশ! আমি তোমার নিকট ধন চাহি না, জন চাহি না, মনোহর কবিতা চাহি না, এ সকলের কিছুই আমি কামনা করি না, কিন্তু জন্মে জন্মে যেন তোমার প্রতি আমার অহৈতুকী শুদ্ধা ভক্তি জন্মে, আমাকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

চণ্ডিদাসের গানে যা অভাব ছিল, মহাপ্রভুর জীবনে তাহার পূরণ হইল! মহাপ্রভু বলিলেন, "অহৈতুকী ভক্তি দাও, জগদীশ, আর কিছুরই কামনা করি না।"

হে প্রাণবল্লভ! আমি তোমারই, আর যে কিছুই জানি না; ইচ্ছা হয় দয়া করিয়া আমায় আলিঙ্গন দাও। অথবা পায়ের তলে দলিত করিয়া সুখী হও, কিংবা অদর্শনে আমার মর্ম্মকে ভাঙ্গিয়া ফেল। হে লম্পট, তুমি আমার যে বিধান কর তাহে সুখী হও, তাই কর, তাই আমার ভাল, কারণ, আমি জানি, তুমি যে আমার প্রাণনাথ—অপর কেউ ত নয়।

যখন রায় রামানন্দের সহিত মহাপ্রভুর তত্ত্ব-বিষয়ে প্রশ্নোত্তর হইয়াছিল—তাহার কথা বলিব। যদিও তাহাতে গীতিকবিতার কিছু নাই, তথাপি চণ্ডিদাসের উপলব্ধি জ্ঞানের ও রসের মধ্য দিয়া কেমন করিয়া ফুটিয়া উঠিয়া মহাপ্রভুতে তাহার শেষ পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহার কথা বলিতে চাই। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে তাহার সুন্দর বর্ণনা আছে। রায় রামানন্দকে মহাপ্রভু প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, রায় কহিতে লাগিলেন,—

"প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়॥
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সর্ব্বসাধ্য-সার॥
প্রভু কহে ইহ বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে স্বধর্ম্মত্যাগ ভক্তি-সাধ্য সার॥
প্রভু কহে ইহ বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি-সাধ্য-সার॥
প্রভু কহে ইহ বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানশূন্যা ভক্তি-সাধ্য-সার॥
প্রভু কহে ইহ হয় আগে কহ আর।
রায় কহে প্রেম-ভক্তি সর্ব্বসাধ্য-সার॥
প্রভু কহে ইহ হয় আগে কহ আর।
রায় কহে দাস্য প্রেম সর্ব্বসাধ্য-সার॥
প্রভু কহে ইহ হয় কিছু আগে আর।
রায় কহে সখ্য-প্রেম সর্ব্বসাধ্য-সার॥
প্রভু কহে ইহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে বাৎসল্য-প্রেম সর্ব্বসাধ্য-সার॥
প্রভু কহে ইহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তভাব প্রেমসাধ্য-সার॥"

ইহার পর যখন মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন রামানন্দ কহিলেন,—

'রায় কহে আর বুদ্ধিগতি নাহিক আমার'

তখন রায় রামানন্দ স্বরচিত একটি গান গাইলেন, বলিলেন, "প্রভো, শুধু একটি কথা মনে পড়িতেছে, সেই কথাটী বলিলেই আমার বলার শেষ হয়, কিন্তু তাহাতে আপনার চিত্ত-বিনোদন হইবে কিনা, তাহাতে সন্দেহ হইতেছে।" মহাপ্রভু ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, রায়রায়, বল বল, সেই রাধা-কৃষ্ণের বিলাসবিবর্ত্তের কথা শুনিতে আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়াছে।" তখন রায় গাইলেন। সর্প যেমন কথা ভুলিয়া বাঁশীর সুর শুনে, মহাপ্রভু তেমনি ভাবে দুলিয়া দুলিয়া শুনিতে লাগিলেন।

'পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥'

না সো রমণ, না হম্ রমণী।
দুঁহু মন মনোভাব পেশল জানি।"

এখানে শ্রীমতী বলিতেছেন :—

না সো রমণ না হম্ রমণী
দুঁহু মনোভাব পেশল জানি।

মন এখানে প্রেমরসে ভরপুর। ভেদ বুদ্ধি রসের অতলে ডুবিয়া গেছে। ইহাই কল্পনার শ্রেষ্ঠ রূপান্তর।

যুগল প্রেমের এই যে বিলাস-বিমর্ত্ত, চণ্ডিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে তাহার অপরূপ মূর্ত্তি হইয়াছিল। সে শুধু ভাব-রাজ্যের অনুভূতিতে নয়, দেহ মন কর্ম্মে ধ্যানে ধারণায়, তাহার সমাধিতে তাহা ভরিয়া উঠিয়াছিল। তাই মনে হয়, চণ্ডিদাস যেন মহাপ্রভুর সৃষ্টিকে আনিতেছিলেন। শতেক যুগের যে ফুল ফুটবে, তাহাই বাঙ্গালার মনে লুকাইয়াছিল, যে—

'হৃদয়ে আছিল যেবা ত হইল
এখন দেখিনু সে'

এমন করিয়া ভাব-রাজ্যের খেলা সৃষ্টিতে সহজ সরল রূপে সত্যরূপে রূপান্তর হইয়া উঠিল। কবির ভাব জাগ্রত মূর্ত্তি ধরিল, কবি যে স্রষ্টা, কবি যে ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলে। চণ্ডিদাস সেই রূপান্তরের স্রষ্টা। বাঙ্গালার গীতিকবিতার যদি আদর্শ থাকে, প্রাণ থাকে, তবে ইহা বাঙ্গলার নিজস্ব শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি। চণ্ডিদাসের গান আর মহাপ্রভুর জীবন ইহাই বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব।

শ্রীচৈতন্য প্রভুর আবির্ভাবে বাঙ্গলা গানে ও প্রেমে মাতিয়া উঠিয়াছিল। চণ্ডিদাসের গৌড়ীয় যুগে যে সকল রসের লীলার দেশ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের পর তাহার ব্যাপ্তি ও পরিধি আরো বাড়িয়া উঠিয়াছিল, আরো সার্ব্বজনীন হইয়া সেই ভাব গানে, জীবনে ও কর্ম্মে মধুর হইয়া উঠিয়াছিল।

ভাগবতে ভগবান্‌কে শুধু যুগলরস-মূর্ত্তিতে দেখে নাই, তাহার ভিতর সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের রসানুভাবনা আছে। লীলা এই বিশ্বের চরমের মধ্য দিয়া শুধু মধুরেই মিলায় নাই; তাহাতে কল্যাণ ও মঙ্গলের কথাও আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব যুগে তাহার কিছু কিছু সাধনাও হইয়াছিল। এই ভাগবত ধর্ম্মের সঙ্গে চাষাভুষ ও মাঝের ভাব শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে দেশে আসিয়াছিল। মহাপ্রভু তাহাকে আপনার করিয়া লইয়া নিজেতে তাহার সমন্বয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার জন্মের পর, আমরা যে সমস্ত পদাবলী সাহিত্যের গান পাই, তাহাতে সেই পূর্ব্বকার যুগল সম্বন্ধের কথার ভিতর দিয়াই সকলে পৌঁছিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সেই রূপান্তরই তাঁদের আদর্শ ছিল বটে, মহাপ্রভু যে পাপীর উদ্ধারের নূতন কথাটি আনিলেন, কাব্যে তাহার চরম পরিণতি ও রূপান্তর হয় নাই। জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবিরা সেই চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতিকেই অনুসরণ করিয়া সেই পথের পথিক হইয়াই চলিয়াছেন, চণ্ডিদাস হইতে কেহই অগ্রসর হইতে পারেন নাই, এমন কি, সে আদর্শের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই পদাবলীর ভিতর সেই একই সুর, একই ছন্দ, একই ভাব।

কবি জ্ঞানদাসের একটি পদকীর্ত্তন তুলিয়া দেখাইব যে, সেই একই ধারা অক্ষুণ্ণ ভাবে রহিয়াছে,—

'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে
পরাণ পীরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে
কি আর বলিব সই কি আর বলিব
যে পণ করাছি চিতে সেই সে করিব
রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে
যদি কি বলিতে পারি যত মনে উঠে
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা
যতন পরশ লাগি আউলাইছে গা
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু ঝরে
যহু যহু কহে কথা পীরিতি বিথারে।
ঘরের সকল লোকে করে কানাকানি
জ্ঞান কহে লাজ ঘরে তেজার আগুনি।'

সের একই কথা—

'রূপ দেখি হিয়ার আরতি না টুটে
রূপ দেখিয়া হৃদয়ের রূপতৃষ্ণা ত মিটে না, সে যে কি সুখ, তা কেমন করিয়া বলিয়া উঠিব,' তাহাকে দেখিয়া তাহার স্পর্শের জন্য সে যেন কেমন করিয়া উঠিতেছে। এ ত সেই পূর্ব্বরাগ। জ্ঞানদাসের পদের একটু বিশেষত্ব আছে, সে বৈশিষ্ট্য—তাঁহার মুরলী শিক্ষা—

'মুরলী কথাও উপদেশ
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানাই বিশেষ
কোন রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপাম
কোন রন্ধ্রে রাধা বলি ডাকে আমার নাম
• • •
জ্ঞানদাস শুনিয়া কহএ হাসি হাসি
রাধে মোর বোল বাজিবেক বাঁশী'

জ্ঞানদাস বলিতেছেন, রাধা নামে সাধা বাঁশী রাধার মুখেও 'রাধা' বলিবে, তার উপায় কি? বাঁশীরও সেই ভাব রূপান্তর হইয়া আছে, সেও ত রাধা ছাড়া আর কিছু বোল বলি বলিতে পারে না, তারও জীবন যে রাধা। কিন্তু এই সকল কবিতায়ই চণ্ডিদাসের ছাপ। এ কবিতাগুলির মধ্যে চণ্ডিদাসের হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করা যায়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর তিরোধানের পর আমরা যে যে কবির পদাবলী পাই, তাহার ভিতরে সেই আগেকার প্রাণশক্তিই ঝঙ্কারিয়া উঠিতেছে। তবে বাংলা দেশের একেবারে ঘরের কোণের কথার ভিতর সেই ভাব সত্যরূপে ফুটিয়াছে, এখানেও কল্পকলার সেই রূপান্তর। কবি লোচনদাস, চৈতন্যমঙ্গল প্রণয়ন করেন। তাঁহারই একটি পদে আমরা দেখিতে পাই, তাহা এই—

"এস এস বঁধু এস, আধ আঁচরে বস
আমি নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি
(আমার) অনেক দিবসে মনের মানসে
তোমা ধনে মিলাইল বিধি।
যদি মও মাণিক নও হার করে গলায় পরি
কুল নও যে কেশের করি বেশ।
(আমার) নারী না করিত বিধি তোমা হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ॥
তোমার যখন পড়ে মনে, চাই বৃন্দাবন পানে
এলাইয়ে কেশ নাহি বাঁধি।
রন্ধন-শালাতে যাই তুয়া বঁধু গুণ গাই
ধূঁয়ার ছলনা করে কাঁদি॥
কাজর করিয়া যদি নয়নেতে পরি গো
তাহে পরিজন পরিবাদ।
বাজন নূপুর হয়ে চরণে রহিব গো
লোচনদাসের এই সাধ॥"

ইহার ভিতর সেই প্রেম, প্রাণের ভিতর ফুরিয়া ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। গৌরাঙ্গের জন্মের পর বাংলায় আর এত বড় কবি জন্মায় নাই। লোচনদাস গৌরাঙ্গের ভাবে বিভোর হইয়া গাইয়াছিলেন,—

"আর শুনেছ আলো সই গোরা ভাবের কথা।
কোণের ভিতর কুলবধূ কাঁদে আকুল তথা॥
দুয়ার বাটীতে গৌরী বসিল যতনে।
দুয়ার বরণ গোরা চাঁদ পড়ি গেল মনে॥
মনে প্রাণে মৈল ধনী রূপ মন প্রাণ টানে।
ছনছনানি মনে গো সই ছটফটানি প্রাণে॥
কিসের রাঁধন কিসের বাড়ন, কিসের দুয়ার বাটা।
আঁখির জলে বুক ভিজিল ভেসে গেল পাটা॥
উঠিল গৌরাঙ্গ ভাব সম্বরিতে নারে।
লোহাতে ভিজিল বাটন গেল ছারখারে॥
লোচন বলে আলো সই কি বলিব আর।
হয় নাই হবার নয় এমন অবতার॥"

বাংলার ঘরকন্নার কথার ভিতর দিয়া এমন করিয়া আর কখন কাব্য-রস ফুটে নাই, এ অপূর্ব্ব, অনুপম। গৌরাঙ্গ জীবন্ত প্রেমের ভাবে মাতোয়ারা হইয়া দেশকে প্রেমের বন্যায় প্লাবিত করিয়া দিয়াছিলেন। ভাগবতে যে মধুর ও মঙ্গলের আভাস আছে, চৈতন্যে তাহার সমন্বয় হইয়াছিল। একদিকে নিত্যানন্দ আর একদিকে যবন হরিদাসের মিলন, আর অন্যদিকে জগাই মাধাই উদ্ধার। এই সকল লইয়া অনেক পদকীর্ত্তন আছে; এখনও বাঙ্গলার ভাহা ভিখারী বৈষ্ণবে গাইয়া বেড়ায়।

কিন্তু তাহাতে কল্পকলার সে রূপান্তর কোথাও ফুটিয়া উঠে নাই—শুধু আভাসেই থামিয়া গিয়াছে। চণ্ডিদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, লোচনদাস প্রভৃতি কবিরা যেমন রসের অনুভূতির সঙ্গে তাহাকে সেই রূপান্তরে লইয়া গিয়াছেন, ইঁহাদের ভিতর অন্যান্য কবিরা আর তেমনটা পারেন নাই। কেহ বা বলিতেছেন,—

'হরি হরি আর কি এমন দশা হব
ত্যজ্য করি মায়ামোহ ছাঁড়িয়া পুরুষ-দেহ
কবে হাম প্রকৃতি হইব।'

ইহা কবি নরোত্তম দাসের পদে আছে। পুরুষদেহ ত্যাগ করিয়া প্রকৃতি হইবার সাধ পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে, কিন্তু চণ্ডিদাস প্রভৃতির ভিতর বাহির এক হইয়া গেছে। চণ্ডিদাস যা গাইয়াছেন, কবি লোচন-দাসও তাহাই গাইয়াছেন,—

"এ দেশেতে করাট দিলে, সে দেশ তো পাই
'বাহির গাঁয়ে কাম নাই চল ভিতর গাঁয়ে যাই।'
সাপের মণি বাহির করিলে হারাই যদি মণি
মণি হারাইলে তবে না বাচয়ে ফণি॥
যতন করে রতন রাখ বাহির করা নয়
প্রাণের ধনকে বার করিলে চৌকী দিতে হয়॥
লোচন বলে ভাবিস কেনে, চোক আপন ঘর
বিয়ার মাকে ঘোরাচাঁদে মন ভুবায়ে ধর॥"

ইহা অবস্থার কথা, তাহার জ্ঞানের দ্বারা ইহা বুঝান যায় না। চৈতন্যের যুগে পরবর্ত্তী সৃষ্টি-কবিদের মধ্যে একমাত্র লোচনদাসই চণ্ডিদাসের ভাবের ও রসের অনুভূতির পর্য্যায় পাইয়াছিলেন, তাহার পর আর সমগ্র গৌর-পদ-তরঙ্গিণীর ভিতর এমন কেহ নাই, যাঁহার কবিতায় সে অনুভূতির লেশমাত্র পাওয়া যায়। সুর নামিয়া যাইবার কারণ কি? কারণ যে ঠিক কি, তাহা বুঝা কঠিন। তবে একটা কারণ বোধ হয় এই, যে ফুল শতদল ধরিয়া ফুটিতে চাহিতেছিল, যাহার জন্য সেই সন্ধ্যাতারার আধো আলো আধো আঁধারের ভিতর হইতে ভাব-কোটকোট হইয়াও ফুটে নাই, তাহার পর দিন গেছে। মানব-মনের ভিতর দিয়া অজ্ঞানে সে ভাবের ধীরে ধীরে স্ফুরণ হইয়াছে, ধীরে ধীরে কত দূর অন্ধকার ও আলোকের, আশা ও নিরাশার ভিতরে চণ্ডিদাসে দেখা দিয়াছে, বিদ্যাপতির রূপ রসাভাসে ফুটিয়াছে। সেই ফুল যখন চৈতন্যে আসিয়া সাক্ষাৎ ফুটিয়া দশদিশি গন্ধে ভরিয়া গেল, তখনই সেই শত শত যুগের কল্পনা সত্যরূপে প্রতিভাত হইল। তাহার পূর্ণ হইবার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতর হইয়া প্রকাশ হইল। ইহার পর ভাগবত ধর্ম্মের সহিত রাধাকৃষ্ণের যে লীলা ভক্তির ভাব দেশে আসিয়াছিল, সে ভাব এখনও পূর্ণ ভাবে মুকুলিত হয় নাই। চণ্ডিদাসের প্রেম, বিদ্যাপতির রূপ-বিলাস, লোচনের গৃহধর্ম্মের সরল সহজ প্রাণের কথার সঙ্গে যে দিন সেই সার্ব্বভৌমিক কল্পকলার সূচনা হইবে, সে দিন জগৎ দেখিবে, এই বাংলার প্রাণ কোথায়, তাহার মর্ম্ম কোথায়! আবার বাংলার মাটীতে তেমনি আবেগে, তেমনি সোহাগে তেমনি মধুর করুণ উজ্জ্বল লীলায় ফুটিয়া উঠিবে। পূর্ণ হইতে পূর্ণতর রূপ হইতে রূপান্তরে ফুটিয়া জাগিয়া উঠিবে।

এই নরদেহ ধারণ করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়া জগতের অন্ধ, বদ্ধ, ভ্রান্ত, তৃষিত, তাপিতের জন্য যে করুণা, মহাপ্রভুতে তাহার পূর্ণ বিকাশ আমরা দেখিতে পাই। শ্রীনিত্যানন্দে আমরা তাহার জীবন্ত, সজীব, জাগ্রত মূর্ত্তির ভাব পাই। যখন কলসীর কাণায় কপাল কাটিয়া দর-দর ধারে রক্ত ঝরিতেছে, তখন গাইতেছেন,

"মেরেছ কলসীর কাণা
তা বলে কি প্রেম দেব না।"

এই দুই ছত্র যখন মনে পড়ে, তখন মন প্রাণ এক অদ্ভুত নব-রসে উছলিয়া উঠে, আঁখি ছল ছল করে, মনে হয় আমার জন্ম সার্থক, সার্থক আমি বাংলায় জন্মিয়াছি!

বৈষ্ণব কবিদের এই অমৃতময় গানের সুধার ধারায় সারা বাংলা দেশ ভাসিয়া গিয়াছিল। সমাজে দেশে তাহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কিন্তু কালে সকলি ত বদল হয়। সেই সব-ছাড়ান প্রাণ-মাতান সুধা স্রোতে ধীরে ধীরে চড়া পড়িল, সে ধারা শুখাইয়া আসিতে লাগিল। সাহিত্যের অন্যান্য ভাগ শাখা-পল্লবে ভরিয়া গেল, কিন্তু যেমনটি ছিল, তেমনটি আর হইল না।

যখন মুসলমান বাংলায় প্রবেশ করিল, তখন বাঙালীর কীর্তিশক্তি একেবারে হারায় নাই, তখনও সমাজে মাঝে মাঝে বিপ্লব বাধিয়াছে; সুর উঠিয়া, সুর নামিয়াছে। তাহার পর সে নিজেকে হারাইয়া ফেলিল। বাংলা আপনাকে ভুলিয়া গেল। মুসলমান ধ্বংস হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য বাংলা আপনার চারিধারে আচার-ব্যবহারের একটা গণ্ডী টানিয়া দিল—সেই তাহারি মধ্যে আপনাকে ঢাকিয়া রাখিল। কিন্তু সাহিত্যে ভাবে ও ভাষায় মুসলমানের হাত একেবারে এড়াইতে পারিল না। দেশ তখন নিজের উপর বিশ্বাস হারাইয়াছে। একদিকে পীরের পক্ষ-হুঙ্কার, আর অন্যদিকে বৈষ্ণবের তুচ্ছ মালার ঠুংঠাং, আর চারিদিকে যত বৈষ্ণবের দল ধর্মের নামে ধর্মকে একেবারে বিসর্জন দিতেছে। একদিকে দেশের পতি মুসলমান, অন্যদিকে সমাজের পতি অসংখ্য ভূত প্রেত। এতদিন ধরিয়া যে শক্তি সঞ্চয় করিয়া বাংলা নিজেকে আদর্শের সমান করিয়া আনিয়াছিল, সে শক্তি কোথায় অন্তর্হিত হইল। অন্ধকারের ভিতর দিয়াই বাংলা চলিয়া আসিল। তাহার পর কত নিশি পোহাইয়াছে, কত পাখী গাইয়াছে, কত কিরণে শ্যামল অঞ্চল উড়িয়াছে, কিন্তু যে যেমনের কথা বলিয়াছি, তাহা একেবারে ঢাকা পড়িয়া গেল। মুসলমান বাংলায় আসিবার পর বাংলা শ্রীহীন হইয়াছিল, একে দেশ দুর্বল, তাহার উপর মানসিংহ বাংলার রাজা। প্রাণের কবিতা তখন দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিল।

এমনি করিয়া সুখে দুঃখে আলো অন্ধকারের ভিতর দিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের যুগ আসিল। রাজার পৃষ্ঠপোষিত সাহিত্য যাহা হইয়া থাকে, তাহাই হইয়াছিল।

ভারতচন্দ্রের উপর বৈষ্ণবের প্রভাব থাকিলেও তাঁহার কবিতা মুসলমানী ফার্সীর আরবির ছবি ও ছায়ায় পরিপূর্ণ। তাঁহার চরিত্র অঙ্কনে যথেষ্ট নিপুণতা থাকিলেও এ কথা বলিতেই হইবে যে, চণ্ডিদাস-যুগের বৃন্দা ও বড়াইয়ের জায়গায় তিনি আনিলেন, মুসলমানী কেতাবের কুটনী দাসীর কেচ্ছা। সে প্রাণ খুলিয়া প্রাণের কথা নাই, সে সখীর মত সখী নাই; সে সখীর জন্য অন্ধকারে প্রাণের আবেগে তাহার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হইবার কেহই রহিল না। ভিতরে বাহিরে প্রাণের রস মরিয়া সে ধারা শুখাইয়া গেল।

তাহার পর অকস্মাৎ কোন্ শুভ মুহূর্তে রামপ্রসাদের জন্ম হইল। দেশ আবার গানের আস্বাদ পাইল। বৈষ্ণব কবিদের ঘরসংসার ছেড়িয়া যে কান্না ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহার উত্তরে তিনি নূতন রসের অনুভূতি দেখাইলেন, তিনি গাইলেন,—

"ওরে সকলের মূল ভক্তি মুক্তি তার দাসী
নির্বাণে কি আছে ফল জলেতে মিশায় জল
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন চিনি খেতে ভালবাসি।"

এও সেই বৈষ্ণবের অহৈতুকী ভক্তির কামনা। বাঙ্গলা আবার সেই সুর খুঁজিয়া পাইল, সাধকের সাধনা, ভাবের সাধনা ফুটিয়া উঠিল, রামপ্রসাদ গাইলেন,—

"এখন সন্ধ্যাবেলায় কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চলো।"

এও সেই দেশের কথা, যে দেশের গান চণ্ডিদাস গাইয়াছিলেন। রামপ্রসাদের পর বাঙ্গলা আবার কিছুদিন গানে ভরিয়া উঠিল। কবিওয়ালাদের গানে বাঙ্গলার পল্লী মুখরিত হইয়া উঠিল। এই যুগকে বাঙ্গলার 'গানের যুগ' বলা যাইতে পারে। বিচিত্র ভাব, বিচিত্র সুর, বিচিত্র পদাবলী, ভাষা ও ভাবের অপূর্ব্ব-সংমিশ্রণ। যে বাঁশী একদিন বাঙ্গলাকে জাগাইয়াছিল, যাহার সুরে বাঙ্গলার সুখ-দুঃখ জড়াইয়া জড়াইয়া দেশের জীবন-মরণের প্রাণ হইয়াছিল, সেই সুরে আবার বাঁশী ডাকিল। তাহাতে বিচিত্র সুরের মেলা। মুসলমানী কেচ্ছার আবিল স্রোতে বাঙ্গলা সাহিত্য ঘোলা হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার জাত গিয়াছিল, তাহার ধর্ম্ম গিয়াছিল। রামপ্রসাদের গানে আবার তাহা ফিরিয়া আসিল। রামপ্রসাদের মাতৃ-প্রাণে, বাঙ্গলা মায়ের রূপে দেখা দিলেন। কখন মা আমার বাপের ঘর হইতে শ্বশুরঘরে যাইতেছেন, কখন কৈশোর ও যৌবনের মধুর অভিনয় করিতেছেন, কখন কোলের ছেলেকে হারাইয়া মা পাগলিনীর মত কাঁদিয়া আকুল হইতেছেন,—

"আমার উমা এলো বলে রাণী এলোকেশে ধায়"

বাংলার সেই আঙ্গিনা দেওয়া ঘর, সেই তুলসীর বন। সেই গৃহস্থের আঙ্গিনা, সেই মৃদুল মধুর বাতাস বহিয়া যায়।

তারপর নিধু, রাম বসু, হরু ঠাকুর, রূপচাঁদ পক্ষী প্রভৃতি কবিওয়ালারা আসিলেন। গানে দেশ তোলপাড় হইয়া গেল। সকলেই সেই কল্পকলার রূপান্তরে পৌঁছিতে যথেষ্ট সাধন করিয়াছেন। কিন্তু সে আদর্শে কেহই পৌঁছিতে পারেন নাই।

রামপ্রসাদের সমসাময়িক ছিলেন আজু গোঁসাই, তিনি কতকটা রামপ্রসাদের ছাঁদ, ধরণ লইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মত অবস্থায়, নিজেকে সে রূপান্তরে গড়ি করাইতে পারেন নাই। তাহার পর নিধু বাবুর গান। তাঁহার এক নূতন কথা, নূতন ভাব, ভাষার দিক্ দিয়া দেশের জীবনকে আত্মস্থ করিবার প্রথম চেষ্টা তাঁহাতেই প্রকাশ দেখিতে পাই। তিনি গাইলেন,—

"নানান্ দেশে নানান্ ভাষা,
বিনে স্বদেশী ভাষা, পূরে কি আশা।
কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর
ধারা-জল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা॥"

তখন হইতে বাংলা গাহিতে শিখিয়াছে। সে গানের যুগের অবতার, সাধক রামপ্রসাদ। রামপ্রসাদের পূর্ব্বে কিছু দিন যে থামিয়াছিল, তাহার পর অবিরাম জলোচ্ছ্বাসের মত গান আসিতে লাগিল। আবার সেইরূপ প্রেম, সেই ভালবাসার গান ফুটিয়া উঠিল। নিধু গাইলেন,—

"তারে দেখ্‌তে এত সাধ কেন।
তিলেক না হেরি যদি সজল নয়ন॥
আভরণ করিয়াছি লোকের গঞ্জন।
তাহারি কারণে মরি সে নহে আপন॥
তাহার রূপের কথা অকথ্য কথন।
তবে যে ভুলেছে মন জানি না কি গুণ॥"

আবার—

"তোমারই তুলনা তুমি প্রাণ এ মহীমণ্ডলে।
আকাশের পূর্ণশশী সেও কালে কলঙ্কছলে॥
সৌরভে পরশে, কে তব তুলনা হবে,
আপনি আপন সম্ভবে,
যেমন গঙ্গা-পূজা গঙ্গা-জলে॥

এই মিঠে ভাষা, এই বাংলার প্রাণের রাগিণী। শুনা যায়, নিধু মোগলের পারসী মুসলমানী টপ্পার অনুকরণে, সেই সকল সুরের ধরণে, এই সব প্রেম ভালবাসার গান বাঁধিয়াছিলেন, এই গানগুলিকেও লোকে নিধুর টপ্পাই বলে। কিন্তু সুরের মুসলমানী ঢংকে এমন আপনার করিয়া লইতে আর কেহই পারে নাই। আবার দেখুন,—

"না হতে পতন তনু দহন হইল আগে
আমার এ অনুতাপ তারে যেন নাহি লাগে।
চিতে চিতা সাজাইয়ে তাহে দুঃখ-তুষ দিয়ে,
আপনি হইব দগ্ধ আপনারি অনুরাগে।"

ইহাতে প্রাণের গভীরতা আছে, সুরের অতি মিঠা রস আছে, বাঙ্গলার ইহা নিজস্ব সম্পত্তি। বিদ্যাসুন্দরি ফার্সী বয়েতের পর এমন মিঠা গান আর হয় নাই। তাঁহার পর রাসু নৃসিংহের গান.—

"সখি এ সকল প্রেম, প্রেম নয়
ইহাতে বলিয়ে নাহি সুখের উদয়।
সুজন ভজন, লোক-গঞ্জন,
কলঙ্ক-ভাজন হতে হয়॥
এমন রীতি করি যাতে তরি দুদিক্
ঐহিক আর পারত্রিক।

"মন মধুব্রত হয়ে যেন রত, সেই নামামৃত-সুধা খায়।"

ইহাতেও সেই প্রেমের আভাস, তবে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই।

তাহার পর হরু ঠাকুরের গান—

"নিতি নিতি আসি সবে জল আনিতে
(ওগো ললিতে)
না দেখি এমন রূপ বারি মাঝেতে॥

আজু সখি কি রূপ নিরিখিলাম হায়
নীর মাঝে যেন স্থির সৌদামিনী প্রায়॥

ঢেউ দিও না কেউ এ জলে বলে কিশোরী
পরশনে লাগা দিলে হবে পাতকী
• • •
দোষের বুঝিতে নারি নারী বই ত নই
(ওগো প্রাণ-সই)
নয়নে নিরখি জলে অনিমিষে রই।
• • •
কুল শীল ভয় লজ্জা তার যায়
না রাখে জীবন আশ
তার জলে বা স্থলে বা
অন্তরীক্ষে কিবা সন্দেহ মাঝি করিবার?

হরু ঠাকুর গাইলেন, তোমরা কেউ জলে ঢেউ দিও না, আমার প্রাণকিশোর এখন চাঁপা ফুল হইলে ভাসিয়া যাইবে। নির্নিমেষ জলে, নির্নিমেষ নয়নে অনিমিষে তাকাইয়া থাকি। • • যার এমন প্রেম কূলের ভয় নাই, লাজের ভয় নাই, তার মরিবার ভয়ও নাই।

তাহার পর রাম বসুর গান। কবি ঈশ্বর গুপ্ত বলিয়াছেন, "যেমন সংস্কৃত কবিতায় কালিদাস, বাঙ্গলা কবিতায় রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র, সেইরূপ কবিওয়ালা দিগের কবিতায় রাম বসু। যেমন স্ত্রীলোকের পক্ষে পতিমধু শিশুর পক্ষে মাতৃস্তন, অপুত্রের পক্ষে সন্তান, সাধুর পক্ষে ঈশ্বর, দরিদ্রের পক্ষে ধনলাভ সেইরূপ ভাবুকের পক্ষে রাম বসুর গীত।" রাম বসুর গানে বাঙ্গালার ঘরের প্রাণের কথা যেমন ফুটিয়াছে, এমন আর পর্য্যন্ত হইল না।

দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ বদন ঢেকে যেও না
তোমায় ভালবাসি তাই চোখের দেখা দেখতে চাই
কিছু কাল থাক, বোলে ধরে রাখ্‌বো না।
শুধু দেখা দিলে তোমার মান যাবে না
তুমি যাতে ভাল থাক সেই ভাল
গেলো গেলো বিচ্ছেদে প্রাণ আমার গেল।
তোমার পরের প্রতি নির্ভর, আমি ত ভাবিনে পর
তুমি চক্ষু মুদে আমায় দুঃখ দিও না।"

এ সকল গানের তুলনা হয় না। তাহার পর—

"মনে রইল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে
তারে বলি বলি আর বলা হ'ল না
সরমে মরমে কথা কহা গেল না—
যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে—
নির্লজ্জা রমণী বলে হাসিত লোকে—
সখি ধিক্ থাক্ আমারে ধিক্ সে বিধাতারে
নারী জনম যেন আর করে না।"

রাম বসুর গানের অনুকরণে আজ কত গানই না বাঁধা হইল, কিন্তু তেমনিটি আর হয় না। তেমন করিয়া প্রাণের মধ্যে ডুব দিয়া সরমে মরম কথা বলিবার ধরণ আর নাই। আমার মনে হয়, রাম বসুর পর বাঙ্গালা আর এমন গান বাঁধিয়ে জন্মায় নাই—

চণ্ডিদাস হইতে কৃষ্ণকমল পর্য্যন্ত সেই একই ধারা-স্রোতের মত বহিয়া আসিয়াছে। কৃষ্ণকমল গাইলেন,—

সখীরা বলিল,—

"রাই ধীরে ধীরে চল গজগামিনী
অমন করে যাস্‌নে যাস্‌নে যাস্‌নে গো ধনি
• • •
না জানি কোন্ সহন বনে প্রাণ হারাবি গো
কত কণ্টক আছে গো বনে—
• • —(দেখে চল গো কমলিনী)"

বিশাখারূপে কৃষ্ণকমলের রাধিকা বলিলেন,—

আমার আবার কণ্টকাদির ভয় কি?

"যখন নব অনুরাগে হৃদয় লাগিল দাগে
বিচারিলাম আগে, পাছে কাজে
(যা যা করতে হবে গো আমার সখি বঁধুর লাগি)
জানি প্রেম করে রাখালের দিনে, ফিরতে হবে বনে বনে
ভুজঙ্গ কণ্টক পথ মাঝে (সখি আমার—
যেতে যে হবে গো, রাই বলে বাজিবে বাঁশী)
অনলে ঢালিয়ে জল করিয়ে অতি পিছল
চলাচল তাহাতে করিতাম; (সখি আমার চলতে
যে হবে গো, বঁধুর লাগি পিছল পথে)
হইল আঁধার রাতি, পথ মাঝে কাঁটা পাতি
গতাগতি করিয়ে শিখিতাম (সদায় আমার
—ফিরতে যে হবে গো,—কত কণ্টক কানন মাঝে)

এনে বিদ-বৈদগ্ধে বসিয়ে নির্জ্জন স্থানে
শুভময় শিখেছিলাম কত :
(যতন করে গো—ভুজঙ্গ দমন লাগি)
বঁধুর লাগি করলাম যত, এক মুখে কহিব কত
হত বিধি সব কৈল হত ! (হায় ! সে সব
—বৃথা যে বলো গো—সখি আমার করম-দোষে")

এমন সরল পতিতে সরল কৃষ্ণার জীবনের খেলার কেমন অনুভূতির প্রকাশ পাইয়াছে। এমন ভাষা এমন করিয়া প্রাণ মন ভরিয়া তোলা গান আর এখন শুনিতে পাই না।

কৃষ্ণকমল বৈষ্ণব-গীতি পুনরুত্থান-কালের শ্রেষ্ঠ কবি।

এখানে চণ্ডিদাসের রাধিকা, বিদ্যাপতির রাধিকা, আর কৃষ্ণকমলের রাধিকা এই তিনের মধ্যে এক অপূর্ব্ব সামরস্য পাওয়া যায়, যদি এই তিনের সাধ্যভাব এক সঙ্গে সমন্বয় করিতে কেহ পারেন, সে জগতে আজিও সৃষ্টি হয় নাই, কল্পকলার সে রূপান্তরের জন্য বাঙ্গলা উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে। বিদ্যাপতির রূপ-বিলাস, চণ্ডিদাসের প্রাণের গভীরতা, আর কৃষ্ণকমলের "রাধিতে নিজ মাধুরীতে" যে বিরহ, এই তিনের অপূর্ব্ব রস-রচনা, কোন দেশের সাহিত্যেই আজও পর্য্যন্ত সৃষ্ট হয় নাই। বাংলার মাটীতেই সেই তিন ফুটিয়াছে, আবার বাংলার মাটীতে কি একে—সেই তিন ফুটিবে না। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর যে রাধা-ভাব, সেই জীবন্ত রাধা-ভাবের ছাপ কৃষ্ণকমলের রাই উন্মাদিনীর রাধিকায় ফুটিয়াছে। ভাগবতের উক্তি চৈতন্যের প্রেমাশ্রুতে ধৌত করিয়া কৃষ্ণকমল রাধিকা গড়িয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অমৃত-রস ছাঁকিয়া কৃষ্ণকমল রাই উন্মাদিনীকে বসাইয়াছিলেন। কৃষ্ণকমলের রাধায় যে আত্মবিস্মৃতি, সেই আত্মবিস্মৃতিতে রাধার বিরহ আসিয়াছে। শ্রীচৈতন্যেও তাই ! রাধিকা আত্মবিস্মৃত হইয়া বাহ্য-প্রকৃতির রূপে রূপে কৃষ্ণ দেখিতেছেন। পূর্ব্বে যে কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা যেন রাধা আত্মবিস্মৃত হইয়া বঁধু পাইবার জন্য তাহার সে তপস্যার কথা কহিতেছেন। কৃষ্ণকমলের রাধিকা এক অভিনব সৃষ্টি।

বাংলার মধ্যযুগের 'প্রাণের দুখের' এই বিচিত্র ভাব-সম্পদের কথা আমি এইখানেই শেষ করিলাম। তার পর অন্তহীন নবীনময় আকাশ,—আর নাই। বাংলার প্রতীচ্যের নব আগমনে, তাহার আলোকে, তাহার বুকের সলিতা শুখাইয়া গেল, বাংলার দীপ নিভিয়া আসিল। বাংলা চিরদিন পূর্ব্বদিকেই সূর্য্য উঠিতে দেখিয়াছে, অকস্মাৎ পশ্চিম আকাশে বিজলী-ঝলকের মত আলোক দেখিয়া তাহার নয়ন ধাঁধা লাগিল, বাংলা একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। তাহার প্রাণের ভিতরে যে প্রাণ ছিল, সে তখন তাহার প্রাণপুট বন্ধ করিয়া দিল।

ঘোর অন্ধকারের মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাইলে যেমন সে আলোক সহ্য করা যায় না, বাংলার প্রাণেও ঠিক সেইরূপ ইউরোপ হইতে যে আলোক সহসা ধ্বনিত হইল, তাহা সহ্য হইল না। সে আপনাকে হারাইয়া ফেলিল। তারপর ঈশ্বর গুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া মধুসূদন, সুরেন্দ্র মজুমদার, বিহারীলাল, নীলকণ্ঠ, গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য অনেকেই গীতিকাব্য রচনা করিয়াছেন। এই যুগের এই কবিতার কথা অন্য সময়ে বলিবার চেষ্টা করিব। এখন শুধু একটি কথা বলিয়া রাখিব। আমি যে "রূপান্তরের" কথা বলিয়াছি, আজও পর্য্যন্ত আমাদের এই যুগের গীতিকাব্য সেই রূপান্তরের অবস্থায় পৌঁছিতে পারে নাই। ঈশ্বর গুপ্তের লেখার কোনখানেই তাহা মিলে না। মাইকেলের অশেষ ক্ষমতা সত্ত্বেও তাঁহার 'ব্রজাঙ্গনা' সেই পর্য্যায় কাছেও পৌঁছিতে পারে নাই, ব্রজ কবিতায় শুধু নিতান্ত বাহিরের জিনিষ লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছিলেন মাত্র। সুরেন্দ্র মজুমদারের "মহিলা", বিহারীলালের "বঙ্গসুন্দরী ও সারদামঙ্গল" আমাদের আদরের সামগ্রী সন্দেহ নাই—কিন্তু ইঁহাদের কবিতাতেও সেই সুর সেই ভাবে জাগে নাই। রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য প্রতীচ্য এই উভয়কে মিলাইয়া মিশাইয়া কাব্য সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সে চেষ্টা সফল হইয়াছে কিনা, সে বিচার করিবার সময় আমার বোধ হয় এখনও আসে নাই।

একমাত্র গিরিশচন্দ্র সেই গানের ধারা ও ভাবের আভাসকে কবিওয়ালাদের পদানুসরণ করিয়া কতক পরিমাণে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। আর শুধু একজন নীলকণ্ঠ—যাঁর

"সজল জলদাঙ্গ ত্রিভঙ্গ বাঁকা তরুতলে
হেরিলে হরে জ্ঞান মনপ্রাণ পড়ে পদতলে।"

সেই পুরাণ সুরকে জাগাইয়া রাখিয়াছিলেন। আজও বাংলার ভিখারী বৈষ্ণব তাহা গাইয়া বেড়ায়। কিন্তু কল্পকলার সেই রূপান্তরে কেহই পৌঁছিতে পারেন নাই। সকলেরি লক্ষ্য তাই, সাধ্য তাই, সাধনা তাই। সে সাধক এখনও আসেন নাই।

তবে বাংলা জাগিতেছে। দিনের লাগাল পাইবই পাইব। আবার সেই বাংলা কবিতা শুনিব। সে সাধক আসিলেই আসিবে। আমি যে তাহার আগমনীর সুর শুনিতে পাইতেছি। *

অতিথি।

শীতের কুহেলী দুয়ারে আজি যে এসেছে চিত্তচোর
পুষ্প মুকুল! রয়েছ এখনো কিসের স্বপনে ভোর?
কাননে কাননে পড়ে গেছে সাড়া
উৎসবে যোগ দেছে বসুন্ধরা
গাহে পিকবধূ, মলয় অনিল দুয়ারে অতিথি তোর,
পুষ্প মুকুল! এখনো কি চোখে রয়েছে ঘুমের ঘোর?
আজি সুনীল গগন, শ্যামল বসুধা, জ্যোছনায় ভরপুর,
মন্থরগামী শ্বেত-মেঘ-মালা, অলস তন্দ্রাতুর।
কতদিন পরে এলো ঋতুরাজ
ঘুম ঘোরে থাকা সাজে কি গো আজ,
শোনলো বিশ্ববীণায় আজিকে বাজে কি মধুর সুর,
পল্লব অবগুণ্ঠন তব করগো করগো দূর।
সন্ধ্যা তারকা উৎসুক ছবি হেরিতে আনন তোর,
স্পন্দিছে সুখে নিখিল ভুবন, ক্ষুব্ধ হৃদয় মোর।
দাও গো সুবাস, সুমধুর হাসি
নহিলে যে বৃথা, এত শোভা রাশি
দুয়ারে দাঁড়ায়ে মলয় অনিল, খোল গো হৃদয় দোর,
পুষ্প মুকুল! হও বিকশিত, এসেছে অতিথি তোর।

শ্রীমতী আশালতা সেন।

সুখ ও দুখ।

মেঘ ঝঞ্ঝাঘাতে অশনি সম্পাতে
দুখ পেতে দেয় বুক,
স্নিগ্ধ প্রকৃতির কুচি যবে ধীর
হেসে দেখা দেয় সুখ।
নিশীথের ঘোর দুর্ভেদ্য তিমির
দুখ নীরবেতে বয়।
দিবসের শুভ্র উজল আলোক
সুখ সনে দেখা হয়।
নিদাঘ তাপিত উত্তপ্ত পরশে
বিছাইয়া দিয়া প্রাণ
দুখ আপনারে অবনীর পায়ে
করে আত্ম সম্প্রদান।
বসন্তের মৃদু হাস্য মুখরিত
মুরতি প্রকাশে যবে
সুখ আসে বুকে কুঞ্জ মুখরিত
কোকিল কাকলী রবে।
দুখ আপনাকে বিলাইয়া দেয়
অণু রেণু কণিকায়।
সুখ আপনাকে আবরি নীরবে
মৃদু হেসে দিয়া যায়।

শ্রীবিভাবতী সেনগুপ্তা।

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের বাঁকিপুর অধিবেশন সাহিত্যশাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস কর্তৃক পঠিত।